প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৫৮

প্রকাশক
গীতা দাশ
নতুন পরিবেশ প্রকাশনী
৩০ রামকৃষ্ণ সমাধি রোড
ব্লক-'ঈ', ফ্ল্যাট-১৮, কলিকাতা-৫৪

প্রচ্ছদশিল্পী
সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রক
চন্দ্রশেখর দে
শ্রীকমলা প্রেস
২৭-সি, কৈলাস বসু স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মার্কসীয় চিন্তাচর্চার অগ্রচারী বিপ্লবী নেতা

ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী-র

অমর স্মৃতির উদ্দেশে

বিষয়সূচী

এই লেখক-কর্তৃক রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

মহাচীন

শর-সন্ধান

ভারতের যাদুঘরে

মণীন্দ্র রায় : কবি ও কবিব্যক্তিত্ব

আমার জন্মভূমি : স্মৃতিময় বাঙলাদেশ

বস্তুবাদী সাহিত্যবিচার ও অন্যমত

মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে / তৃতীয় পর্যায়

অবশেষে 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হলো। ইতিপূর্বে প্রকাশিত প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে মুখ্যত সংকলিত হয়েছিল যথাক্রমে কমিউনিস্ট পার্টির বেআইনী যুগের তাত্ত্বিক পত্রিকা 'মার্কসবাদী' সংকলনে প্রকাশিত মার্কসীয় দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিচার-বিশ্লেষণ-মূলক বিতর্কিত রচনাগুলি এবং তার প্রতিবাদে রচিত বাঙলাদেশের তৎকালীন প্রবীণ ও নবীন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও তাত্ত্বিক নেতাদের প্রবন্ধাবলী। অর্থাৎ, ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে রচিত ও বহুবিতর্কিত প্রবন্ধাবলী এবং তথ্যদলিল নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড দুটি।

আমার পরিকল্পিত এই গ্রন্থমালায় আমি চেয়েছিলাম ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর, বিশেষ করে ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কানপুরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হবার পর, মার্কসীয় দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারের ক্ষেত্রে বাঙলাদেশের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও তাত্ত্বিক নেতারা যেসব বিতর্ক উত্থাপন করেছিলেন সেগুলি সাধ্যমতো অনুসন্ধান করে সংকলিত করতে। এই অনুসন্ধান কার্যে লিপ্ত হয়ে আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করেছি যে, ১৯৪৮-৫০ সালে এই বিতর্ক সকল দিক দিয়ে এক চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। আমি তাই সেই শীর্ষবিন্দু থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে বিতর্কের সমতল ভূমিতে অবতরণ করাই শ্রেয়তর বিবেচনা করেছি। আর, ঠিক এই কারণেই 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে' শীর্ষক প্রায় দুই শত পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘতম দুটি ভূমিকা সংযোজন করে অক্টোবর বিপ্লবের পর এদেশে কীভাবে মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা ধীরে ধীরে শিল্প-সাহিত্য তথা সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তার প্রয়োগ-পদ্ধতি নিয়ে বাঙলাদেশের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা কে কোন অবস্থান থেকে তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হন, জাতীয়-আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তার তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে আমি সেই প্রায়-অজ্ঞাত পশ্চাৎপটের প্রতিও পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে প্রয়াসী হয়েছি।

সুতরাং তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় আমার বিশেষ এবং বিস্তারিত কোনো বক্তব্য নেই। অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা এই খণ্ডে সংকলিত রচনার পশ্চাৎপট

হিসেবে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা থেকে প্রয়োজন মতো তথ্য সংগ্রহ করে নিলেই আমি বাধিত হব।

প্রকৃতপক্ষে, 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিচার-বিশ্লেষণে যেসব রচনা গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখিত হয়েছিল, তৃতীয় খণ্ডে আমি সেই রচনাগুলিই সংকলিত করেছি। এই সঙ্কলনে বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক থেকে শুরু করে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত রচিত প্রবন্ধাবলী, তথ্যদলিল, প্রতিবেদন ইত্যাদি ক্রমপর্যায় অনুসারেই সন্নিবেশিত হয়েছে। সংকলিত রচনার ক্রম-বিবর্তিত ধারাটি অনুসরণ করলে পাঠকেরা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন এদেশের মার্কসীয় চিন্তা-চর্চার ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

এই প্রসঙ্গে, পরবর্তীকালে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে, প্রথম খণ্ডে পরিবেশিত একটি তথ্য-ঘটিত ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়ার জন্য আমি পাঠকদের অনুরোধ জানাই। ঐ খণ্ডের ভূমিকায় আমি লিখেছিলাম : "১৯৪২ সালের ২৮ মার্চ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হল ফ্যাশিস্ত-বিরোধী লেখক সম্মেলন এবং এই সম্মেলন-মঞ্চেই গঠিত হয় 'ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। সংঘের সাংগঠনিক কমিটিতে সভাপতি এবং যুগ্ম-সম্পাদক রূপে নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়।" [দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খণ্ড, পৃ. তেত্রিশ]

উক্ত তথ্যের মধ্যে একটি তথ্য সঠিক নয় বলে আমি এখন স্থির নিশ্চিত। আর সেই তথ্যটি হলো—সংঘের সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি রূপে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত হন নি, হয়েছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত।

এমনিভাবে আর একটি তথ্য-ঘটিত অসম্পূর্ণতার কথাও আমাকে নিবেদন করতে হচ্ছে। তৃতীয় খণ্ডের রচনাবলী অনুসন্ধানের কালে এটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়। আমি প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে, কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন সম্পর্কে তথ্য-বিবরণ পরিবেশন করি। [দ্র. ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃ. উনিশ-কুড়ি] ঐ সম্মেলনে বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক পঠিত রচনাটি নিয়ে পরবর্তীকালে 'অগ্রণী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় সরোজ দত্ত যে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেন তাও আমি উল্লেখ করেছিলুম। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু-র রচনাটি পাঠ করার পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, সেটি অনুল্লেখিত থাকে।

তৃতীয় খণ্ডে বুদ্ধদেববাবুর লেখা 'অধুনিক লেখকদের অবস্থা' শীর্ষক সেই রচনার অংশ বিশেষ এবং ১৯৩৯ সালের ১৭ মার্চ শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ-সঞ্জাত পত্রটি 'সাহিত্যের শ্রেণীবিচার প্রসঙ্গে' শিরোনামে সন্নিবেশিত হলো। এছাড়া পরিশিষ্ট ১-এ সংকলিত হলো 'শনিবারের চিঠি' ও 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ঐ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব-বিরোধী তিক্ত মন্তব্যগুলি।

এই তথ্য-ঘটিত ত্রুটি এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অনুল্লেখ ব্যতীত প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে লিপিবদ্ধ আমার ভূমিকায় অন্য কোনো মারাত্মক বিচ্যুতি কিংবা তথ্য-বিকৃতি এখনও আমি খুঁজে পাই নি। অবশ্য মুদ্রণ-বিভ্রাটে দ্বিতীয় খণ্ডের এক স্থানে যে একটু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, সেকথা স্বীকার্য। পাঠকেরা এই মুদ্রণ-প্রমাদটি সংশোধন করে নিলে খুশি হব। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকার পচাত্তর পৃষ্ঠায় যেখানে মুদ্রিত হয়েছে "...ভবানী সেন 'চোখের বালি' উপন্যাসের আলোচনাকালে 'অমিত-লাবণ্য-র মিলনের অন্তরায়' খুঁজতে বসে উভয়ের যে-৮ সামাজিক বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন..." তার সঠিক পাঠ হবে "...ভবানী সেন 'চোখের বালি' উপন্যাসের আলোচনাকালে এবং 'শেষের কবিতা'-র 'অমিত-লাবণ্য-র মিলনের অন্তরায়' খুঁজতে বসে..." ইত্যাদি।

এবার অন্য একটি বক্তব্য সহৃদয় পাঠকদের বিবেচনার জন্য পেশ করছি। আমার ইচ্ছে ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত রচনাগুলি বাদ দিয়ে উক্ত দু-খণ্ডের ভূমিকায় উল্লিখিত অন্য সমস্ত বিতর্কিত রচনাবলীই একত্রিত করে তা তৃতীয় খণ্ডে পরিবেশন করব। কিন্তু সেই বিতর্কিত রচনাসম্ভার একসঙ্গে প্রকাশিত হলে গ্রন্থের কলেবর এত বিপুল আকার ধারণ করত যে মূল্যবৃদ্ধি ছিল অনিবার্য। তবু বর্তমানে গ্রন্থের কলেবর যা দাঁড়িয়েছে তাও আমার পক্ষে কম ভীতিজনক নয়। কারণ, কলেবর বৃদ্ধি মানে—দামও বৃদ্ধি। আর, সাধারণ পাঠকের পক্ষে উচ্চমূল্যে গ্রন্থক্রয় কতখানি দুঃসাধ্য ব্যাপার তা আমি সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। এই সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিছু সহৃদয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর পরামর্শক্রমে তৃতীয় খণ্ডের জন্য নির্বাচিত শতাধিক পৃষ্ঠার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ নিয়ে 'বস্তুবাদী সাহিত্যবিচার ও অন্যমত' নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করতে আমি বাধ্য হয়েছি। এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে ১৩৫৪ সালের পৌষ-সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য'-কে ভিত্তি করে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী অমরেন্দ্রপ্রসাদ

মিত্র, শীতাংশু মৈত্র, নীরেন্দ্রনাথ রায় এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের নেতা ত্রিদিব চৌধুরী-র তৎকালে আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রবন্ধাবলী। প্রকৃতপক্ষে, আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর বিশুদ্ধ রসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে এই রচনাবলীতে সেদিন যতখানি ধূলি-ঝঞ্ঝা উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি বিচ্ছুরিত হয়েছিল ভাববাদী দার্শনিক মতবাদের 'নিরপেক্ষ' সাহিত্য-বিচারের বিরুদ্ধে মার্কসীয় দার্শনিক প্রত্যয় থেকে শিল্প-সাহিত্যে নন্দনতাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণা প্রয়োগের প্রদীপ্ত আলোকরশ্মি। এই রচনাগুলির বিচার-বিশ্লেষণকালে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমি এসব কথা সবিস্তারে তুলে ধরেছিলাম। [দ্র. ঐ, পৃ. ছিয়াশি-নব্বই]

যাহোক, আলোচ্য তৃতীয় খণ্ড থেকে উক্ত রচনাবলী বিচ্ছিন্ন করে 'বস্তুবাদী সাহিত্যবিচার ও অন্যমত' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করে আমি ভুল করেছি, না সঠিকভাবে পাঠক-গ্রাহকদের উপর থেকে এককালীন আর্থিক বোঝার ভার লাঘব করেছি, তা তাঁরাই সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবেন। আমার শুধু বক্তব্য : ঐ রচনাবলী তৃতীয় খণ্ডে সংযোজিত হলে গ্রন্থের মূল্য যতটুকু বর্ধিত হতো, দুটি পৃথক গ্রন্থের মূল্য তার থেকে এক পয়সাও বেশি ধার্য করা হয়নি।

এছাড়া তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় আমি নতুন কথা আর কী নিবেদন করতে পারি ? পারি, এই খণ্ডের মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটিত কিছু তথ্য। যেমন, সরোজ দত্ত লিখিত 'অতি আধুনিক বাংলা কবিতা' শীর্ষক রচনাটির ৭২ এবং ৭৪ পৃষ্ঠায় 'T. S. Eliot' মুদ্রণ-প্রমাদে সর্বত্রই হয়েছে 'T. S. Elliot'.। আর অমল হোম রচিত প্রবন্ধ 'কেরানী রবীন্দ্রনাথ'-এর ১৪৩ পৃষ্ঠায় 'ওরা কাজ করে' কবিতার উদ্ধৃতাংশে কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ আমার লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই গ্রন্থে অন্য কোথাও আর কোনো ভুল নেই, এ দাবী করার বিন্দুমাত্র স্পর্ধা আমার নেই। আমি জানি, কী বিপুল পরিমাণ ভুল বানানে কণ্টকিত ছিল আলোচ্য খণ্ডের অতীতে মুদ্রিত অধিকাংশ রচনাগুলি। যে ক্ষুদ্র শক্তি-সম্পন্ন প্রেসের দুর্বলতম কম্পোজিটারের হাত থেকে আমি এই প্রায় পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার গ্রন্থ শেষ পর্যন্ত মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করতে পেরেছি, সেটুকুই আমার পরম সৌভাগ্য। সুতরাং মুদ্রণ-প্রমাদ যতটুকু ঘটেছে তার থেকে আরো বেশি যে ঘটতে পারে নি এতেই আমি খুশি, কিন্তু পাঠকের কাছে অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থী।

আমার সর্বশেষ কথা, আজ থেকে পাঁচ বছর আগে এই গ্রন্থ সম্পাদনার পরিকল্পনা যখন গ্রহণ করি তখন আমার মনে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল,

দিন-রাত্রি মজুরের মতো পরিশ্রম করে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার পর মন কিছুটা তৃপ্ত হলেও, সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা এখন অনেকখানি স্তিমিত।

কেন এই প্রতিক্রিয়া, সেটাই বলি এবার। না, সাধারণ পাঠকের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। তাঁরা অযাচিতভাবে এই গ্রন্থের প্রতি ঔদার্য ও দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন। পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত সুধী বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর একাংশ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে যে-সাধুবাদ জানিয়েছেন তার জন্যও তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রজপ্রতিম নেতা গোপাল হালদার, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন উদারচেতা সজ্জন মানুষকে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করলে, পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এই গ্রন্থের প্রতি প্রদর্শন করেছেন এক চরম ঔদাসীন্য। এই কারণেই পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি-পরিচালিত কোনো পত্র-পত্রিকায় এই গ্রন্থের সমালোচনা এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।

অথচ যে-কাজটি এককভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমি শেষ করলাম, বহু পূর্বে তা তাঁদেরই তো করা উচিত ছিল। আমি শুধু চেয়েছিলাম, 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক' নামক গ্রন্থমালায় প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের অতীত ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ সম্ভারগুলি গ্রথিত করে নতুন প্রজন্মের মানুষদের হাতে তুলে দিতে। আমাদের ভুল-ভ্রান্তি, সফলতা-ব্যর্থতার দলিলগুলি হাতে পেয়ে নতুন আলোকে তাঁরাই বিচার-বিশ্লেষণ করুক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মপন্থা। কিন্তু আমাদের একাংশ, যাঁরা মার্কসবাদী রূপে পরিচয় দেন, তাঁদের ঘাড় থেকে সেই পেটি-বুর্জোয়া অহংসর্বস্ব ঈর্ষার ভূত এখনও যে নামে নি, এই গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে পদে পদে তা উপলব্ধি করার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে। তবু আশা দুর্মর, এই সান্ত্বনা নিয়েই বেঁচে আছি এবং থাকব।

আমি ইতিপূর্বে প্রকাশিত দুটি খণ্ডের ভূমিকায় বারংবার বলেছি, এই ধরনের গ্রন্থের সম্পাদনা একক মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমার অজ্ঞাতে এই গ্রন্থ-সম্পাদনায় কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি কিংবা ভুল-ভ্রান্তি ঘটে থাকলে তাই আমি নিরুপায়। তবে কোনো সহৃদয় পাঠক এবং শুভানুধ্যায়ী যদি এ-সম্পর্কে আমাকে তাঁদের বক্তব্য জানান তবে বিশেষ উপকৃত হব এবং ভবিষ্যতে সেই ভুল-ভ্রান্তি অবশ্যই সংশোধন করব।

দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদনাকালে পুনর্মুদ্রিত রচনার ক্ষেত্রে যে-নীতি

অবলম্বিত হয়েছিল, তৃতীয় খণ্ডের সম্পাদনার সময় সেই নীতিই অনুসৃত হয়েছে। অর্থাৎ, মূল রচনার প্রতিটি শব্দ অক্ষুণ্ণ রেখে শুধুমাত্র বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন ও পরিবর্তন করা হয়েছে। আর, মূল রচনা যেসব গ্রন্থ বা পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে তার নির্দেশ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজিত হয়েছে 'পাদটীকা'-য়।

এই গ্রন্থের সম্পাদনায় অনেক বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ীই আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বন্ধুবর নেপাল মজুমদার প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপট অনুধাবনের পক্ষে একান্ত সহায়ক তাঁর দুটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট ২-এ প্রকাশ করার অনুমতি দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি প্রতিবেদনও এই গ্রন্থে সংযোজন করতে পারায় আমি কৃতার্থ বোধ করছি। আর, পূর্বের মতো প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের অগ্রজ নেতা চিন্মোহন সেহানবীশ এবারও তাঁর দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা ও বই দিয়ে আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন, সে-কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণযোগ্য। এই প্রসঙ্গে বন্ধুবর সত্যপ্রিয় ঘোষ, 'পরিচয়', 'চতুষ্কোণ' ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছেও আমার ঋণ স্বীকার করছি।

বর্তমান খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে বন্ধুবর নির্মল সাহা, আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী গীতা দাশ, দুই পুত্র শ্রীমান সুদীপ্ত দাশ ও সুস্নাত দাশসহ শ্রীমতী বেণু ভৌমিক (সোম), শ্যামল চক্রবর্তী, সুবীর দাশ, রঞ্জন সেনগুপ্ত এবং অসীম কুণ্ডু-র অক্লান্ত শ্রমের কথাও আমি সানন্দে স্বীকার না করে পারছি না।

যাহোক, গত পাঁচ বছরের বিরামহীন পরিশ্রমে ক্লান্ত হলেও পরিকল্পিত গ্রন্থের শেষ খণ্ডটি পাঠকের হাতে অবশেষে তুলে দিতে পারায় আমি আজ পরিতৃপ্ত। 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক' গ্রন্থের তিনটি খণ্ডসহ 'বস্তুবাদী সাহিত্য-বিচার ও অন্যমত' গ্রন্থের মাধ্যমে এদেশের প্রগতি-সাংস্কৃতিক আন্দোলন যদি বিন্দুমাত্র লাভবান হয়, অতীতের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের কাজে এই গ্রন্থগুলি যদি সামান্যতম সহায়ক রূপে বিবেচিত হয়, তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে। এইটুকুই সহৃদয় পাঠক-সমীপে আমার বিনীত নিবেদন।

ধনঞ্জয় দাশ

সমাজধর্ম ও সাহিত্য / ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ধর্ম বলতে সাধারণত শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত ধর্ম বুঝি। যে পরিমাণে প্রত্যেক নর-নারীর বিকাশ, তার শ্রেণীর কিংবা সমাজের অবস্থা ও অভিব্যক্তি এবং সমাজ-নায়কদের আদর্শের ওপর নির্ভর করে, সেই পরিমাণে ব্যক্তিগত ধর্ম সামাজিক ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে বাধ্য। ব্যক্তিগত ধর্মই সামাজিক ধর্মের প্রেরণা। ব্যক্তিগত ধর্মের অর্থ যতটুকু ধারণ করবার শক্তি, ততটুকু ধর্মই সহজাত। কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম মানে শুধু ধারণ করবার শক্তি নয়, সৃষ্টি করবারও শক্তি। সংক্ষেত্রেই, অবস্থার বিপর্যয়ে পুনর্গঠনের শক্তিই ধর্মের প্রাণ। সামাজিক ধর্ম যখন রক্ষণ ও ধারণ করে ক্ষান্ত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, সে সমাজে মানুষের মতন মানুষের দুর্ভিক্ষ হয়েছে, সে সমাজে আছে শুধু কঙ্কাল। ব্যক্তিগত ধর্ম যখন কেবল পুরাতনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা ছাড়া অন্য কাজ পায় না, তখন বুঝতে হবে যে, সে ধর্ম বহুদিন পূর্বে মারা গিয়েছে। সৃষ্টির অর্থে জীবজগতের সৃষ্টি যতদূর হোক আর না হোক, রূপ-জগতের, মানসিক জগতের, ব্যবহারিক জগতের এবং আনুষ্ঠানিক সৃষ্টিই বুঝতে হবে। সমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে মুক্ত ব্যক্তি, সমাজ সেই মুক্তিযজ্ঞের মাল-মশলা জোগান দেয় মাত্র। বাংলা দেশের বর্তমান সমাজ এই জোগান দিতে পরাঙ্মুখ হয়েছে বলে সকলেরই মনে হচ্ছে স্নেহান্ধ পিতামাতা যেমন সন্তানের অর্বাচীনতা বয়সের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেরা দোষমুক্ত এবং দায়িত্বশূন্য হন, তেমনি অনেকে পূর্বোক্ত পরাঙ্মুখীনতাকে যুগধর্মের স্বভাব বলে বেশ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন দেখেছি। কিন্তু অক্ষমতাকে যুগধর্ম বলে যারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন তাঁরা এই কথাটির মধ্যে ধর্মের যথার্থ মানে না বুঝে, ধর্মকে বাদ দিয়ে, যুগেরই উপাসনা করেন। যে কোনো দু'টি মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তন ঘটছে সেই কালই সেই পরিবর্তনের সম্পর্কে যুগ। কালও পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত রয়েছে— কালাতীত পরিবর্তন হতে পারে না। দুটি ক্ষণস্থায়ীর মধ্যে একটি বুঝতে হলে, সুবিধার জন্য, হয় একটি স্থির ভাবতে হবে, না হয় তৃতীয় একটি স্থিরসত্তা ভাবতে

হয়। যুগ অনবরত সরে যাচ্ছে, ধর্মও অনবরত বদলাচ্ছে—ঐ ক্ষেত্রে যুগধর্ম মানে জার্মান অধ্যাপকের আবিষ্কৃত Zeit Geist-এর তর্জমা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কালের, যুগের এমন কোনো সত্ত্ব, কিংবা গুণ, কিংবা প্রাধান্য থাকতে পারে না, যার জন্য ধর্মের সত্তা, গুণ কিংবা প্রাধান্য লোপ পাবে। এ বৎসরের পঞ্জিকায় যে ১৯০০ সাল লেখা নেই,—১৯২৮ সাল লেখা আছে, এই তথ্যটি পরিবর্তন-ক্রিয়ার কর্তা নয়। তবে কর্তা কে? সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, কর্তা হচ্ছে সমাজ কিংবা শ্রেণী, অর্থাৎ ব্যষ্টির সমবেত শক্তি। কিন্তু যাঁরা মানব-মনের অনুকরণেচ্ছা লক্ষ্য করেছেন তাঁরা বোধ হয় অ-সাধারণ ব্যক্তিকে কর্তা বলতে দ্বিধা বোধ করবেন না। যাঁরা অসাধারণত্বে অবিশ্বাসী, তাঁরাও ভেবে দেখেছেন যে ব্যক্তিই হচ্ছেন কর্তা; যদিও কর্তৃত্ব করবার সুযোগ ঠিক করে ঐ সমাজ, এবং আজকালকার যুগে ঐ শ্রেণী।

সে যাই হোক্, আর্থিক কিংবা পারমার্থিক কারণে সমাজ না হয় বদলে গেল। কিন্তু স্রষ্টা এবং অ-সাধারণ ব্যক্তি জন্মায় কি করে? সুপ্রজনন-বিদ্যার সাহায্যে অসাধারণত্বের খানিকটা প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সমাজ এখানেও বাধা দিচ্ছে। যে সমাজে শিক্ষিত যুবকের দল পর্যন্ত জন্মরোধের সুফল সম্বন্ধে সন্দিহান, যেখানে জীবনের বিবাহাদি প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক এবং প্রেতমূর্তি পিতামাতা এবং পত্নীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে সুপ্রজনন-বিদ্যার বিস্তৃত প্রয়োগ আপাতত অসম্ভব। অবশ্য এই বিদ্যাটি রসায়নশাস্ত্র কিংবা পদার্থ-বিজ্ঞানের মতন এমন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি যে, তার সিদ্ধান্তের সাহায্যে কোনো ভবিষ্যৎ-বাণী করা যায়। তবুও মানুষের নির্বাচন-শক্তির দ্বারা অনুপযুক্ত লোকের জন্মরোধ, আর্থিক দুর্গতি থেকে পরিত্রাণ এবং উপযুক্ত লোকের মৃত্যুহার কমানো সম্ভব, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। যে দেশে উপযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা বেশি, সেখানে এই হলেই যথেষ্ট। আমাদের দেশে দুঃখ থেকে নিস্তার পেলেই চলবে না, সুখের রীতিমত ব্যবস্থা করতে হবে। তবে উপযুক্ত ব্যক্তি কে—কিরকম বিবাহে কোন্ ধরনের উপযুক্ত ব্যক্তি জন্মাবেন—আগে থেকে ঠিক করা অসম্ভব। কেননা, যেমন সুপ্রজনন-বিদ্যাটি অপরিণত, তেমনি বিদ্যার্থীর মনে উপযোগিতা সম্বন্ধে কোনো মতের ঐক্য নেই—ফলে সুপ্রজনন-বিদ্যা, হিন্দুশাস্ত্রের মতন উদার হয়ে উঠেছে। যে বিদ্যায় যে কোনো পূর্বতন সংস্কারের নজীর পাওয়া যায়, সে বিদ্যা অল্প জানলেই নিজের মতকে দৃঢ়তর করা যায়। বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের

মনে উপযোগিতা সম্বন্ধে অনৈক্যের অন্যতম কারণ—প্রেমের প্রতি অন্ধবিশ্বাস। জাতিবিচার নিরর্থক হবার পরেই যৌন-বিচারের অন্য পদ্ধতি আবিষ্কার করার দরকার হলো। বাংলা দেশে প্রেম নামক পদ্ধতিটি আবিষ্কার করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কর্তাদের বারণ কেউ মানল না। তারপর এলেন রবিবাবু, তিনিই আমাদের সকলকে প্রেমে পড়তে শিখিয়েছেন। তাঁরই ভাষা দিয়ে আমরা প্রেম করি, তাঁরই ভাব দিয়ে আমরা প্রেমে পড়ি—গুরুজন ও গুরুদাসবাবুর বাধা সত্ত্বেও। প্রেম আমাদের ধাতে এসে গিয়েছে। ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যের প্রকোপে অন্য কিছু হতেই পারত না। সে যাই হোক, প্রেম করে বিবাহের মধ্যে এমন একটি দৈহিক ও মানসিক মাদকতা এবং অন্তত কয়েক মাসের জন্যও যৌন-সম্বন্ধের এমন একটি সম্পূর্ণতা আছে যার ফলে পুত্রকন্যারা ঢের বেশী স্বাধীনতাপ্রিয় ও নির্ভীক হয়ে ওঠে। যাঁরা বর্তমান হিন্দু-বিবাহের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা খুঁজে পান, এবং হিন্দু-বিবাহে আধ্যাত্মিকতা ছাড়া অন্য কিছু নেই, এবং থাকা উচিত নয় মনে করেন, তাঁদের অবশ্য প্রেমে আস্থা নেই। যে আধ্যাত্মিকতা খুঁজে বার করতে হয়, তার চেয়ে দৈহিক ও মানসিক মাদকতা জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে করা স্বাভাবিক। প্রেমে পড়ে বিবাহ, এক্ষেত্রে মন্দের ভালো মানতেই হবে। এ গেল সুপ্রজনন-বিদ্যার উপকারিতা সম্বন্ধে ইংরাজী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত যুবকদের ধারণা। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং অন্যধরনে শিক্ষিত ব্যক্তির মনে সামাজিক উপযোগিতা সম্বন্ধে নানাপ্রকার ধারণা থাকলেও একটি গড়পড়তা মত পাওয়া যায়। উপযুক্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্য থাকবে, সাধারণ বুদ্ধি থাকবে, টাকা রোজগারের ক্ষমতা থাকবে, এবং সে ব্যক্তি অন্তত প্রকাশ্যে সামাজিক প্রথা মেনে চলবে। স্বাস্থ্য, অর্থ ও বুদ্ধিসম্পন্ন সন্তানের জন্যও সুপ্রজনন-বিদ্যার প্রয়োগ প্রয়োজনীয়, কিন্তু সুবোধ, সুশীল সন্তানদের জন্য সে প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। যে বিবাহের ফলে সুবোধ, সুশীল বালক-বালিকা জন্মগ্রহণ করে, সে বিবাহের নামই বিংশ শতাব্দীর 'হিন্দু-বিবাহ'। আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশে লোক যে দেহে ও মনে এত ভীরু তার একটি কারণ এই যে, দেশের পিতামাতার বিবাহিত জীবনে কোনো প্রকার স্বাধীনতা ও স্ফূর্তির ছাপ নেই, বরঞ্চ এমন একটি সঙ্কোচ আছে যার আওতায় দেহ ও মন ফুটে উঠতে পারে না। ভবিষ্যতে যুবক-যুবতীর মন থেকে ভীরুতা দূর করবার এবং তাদের সাহসী

করবার একমাত্র উপায় যৌন-নির্বাচন। যতদিন সে উপায়টি অবলম্বিত না হচ্ছে ততদিন প্রেমে পড়ে, বিবাহকেই বরণ করে নিতে হবে।

অ-সাধারণ ব্যক্তির জন্মগ্রহণের সুযোগ দেওয়া ভিন্নও সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার দ্বারা সমাজের সাধারণ স্তরকে উন্নত করা যায়, অনেকে বিশ্বাস করেন। এই উপায়ের বিপক্ষে অনেক আপত্তি আছে। প্রথমত, উপায়টিই উপায়ের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত, সুপ্রজনন-বিদ্যায় যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির খুব বেশি উন্নতি করা যায় বিশ্বাস করেন না। একথা সত্য যে, সাধারণের মধ্যে বুদ্ধির এবং জ্ঞানার্জনের ক্ষমতার বিভাগ এবং বিস্তার সহজাত শক্তির ওপর যতটা নির্ভর করে, শিক্ষার তারতম্য এবং বিস্তারের ওপর ততটা করে না। শিক্ষিত হবার ক্ষমতাও যৌন-নির্বাচনের দ্বারা বাড়ানো যায়। তৃতীয়ত, সুপ্রজনন-বিদ্যা সম্বন্ধে যেমন মতের অনৈক্য আছে, শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশি বৈ কম অনৈক্য নেই। শুধু তাই নয়, প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা সমাজের বড় বেশি উন্নতি করা যায় না। অবশ্য, এগুলি ঠিক আপত্তি নয়, বিপত্তি। অতএব ধীরে ধীরে বিপত্তিগুলি দূর হবে আশা করা যেতে পারে। যে কোনো ভালো কাজেই বাধা-বিঘ্ন আছে—যে কোনো সত্যেরই অন্তরায় আছে—সে অন্তরায় দেখাতে পারলেই সত্যকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে অন্তরায় হচ্ছে সাধারণের অশিক্ষা। অতএব সুপ্রজনন-বিদ্যার কথা মনে রেখে শিক্ষাবিস্তার করতে হবে। সেইজন্য বাংলাদেশে একটি মানসিক ভূগোল তৈরি করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় একা একাজ হাতে নিতে পারে না—রাজারও ইচ্ছা নেই, কল্পনা নেই। অতএব বিবাহিত জীবনকেই সংস্কৃত করতে হবে। বিবাহিত জীবনই সামাজিক জীবনের মেরুদণ্ড, সেটিকে সোজা রাখতে হবে। উপায়—প্রেম ও সুপ্রজনন-বিদ্যার সাহায্যে যৌন-নির্বাচনের সামঞ্জস্য রক্ষা করা। এক কথায়, উপায়—জীবনকে, জীবনের প্রধান প্রধান অধ্যায়কে বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত করা। আমার বক্তব্য এই যে, বর্তমান মাসিকপত্রের পাতায় পায়াত পরোক্ষে বিবাহ ও যৌন-সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু খোলাখুলি অথচ ভদ্র-ভাবে কেউ এ সম্বন্ধে লেখেন না। আমার বিশ্বাস আর্টিস্ট এই নিয়ে গল্পও লিখতে পারেন। কিন্তু সকলেই প্রেম নিয়ে ব্যস্ত। নব্য-সাহিত্যিকরা মনে করেন, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের যুগ চলে গিয়েছে—যদি গিয়েই থাকে তাহলে তাঁদের আবিষ্কৃত প্রেমও মাসিক-সাহিত্যের পাতা থেকে চলে যাক না কেন? সামাজিক

ধর্ম বদলাচ্ছে, ব্যক্তি বলছে যে, সে শুধু ধর্ম রক্ষা করে শান্ত হতে পারছে না। সে এমন একটি ধর্ম গড়তে চায় যার সাহায্যে তার শক্তির স্ফুরণ হবে। তার ক্ষমতাগুলি শতদলের মতো বিকশিত হবে। আপাতত, ব্যক্তি কাঁটা হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তির সঙ্গে পুরাতন সংস্কারের গরমিল হচ্ছে। সমাজ পেছিয়ে পড়ছে, ব্যক্তির অভাব পূরণ করতে পারছে না। ব্যক্তিও জোর গলায় বলছে না যে, সে বড় একটা কিছু করতে চায়। তার আকাঙ্ক্ষা ছোট। এ সময় মানুষ যা চাচ্ছে তার মধ্যে বীরত্ব নেই, সমাজ যেভাবে বদলাচ্ছে তার মধ্যে ব্যক্তির প্রবল ইচ্ছা নেই, তার পেছনে বুদ্ধির চালনা নেই, তার সামনে কোনো বিজ্ঞানসম্মত আদর্শ নেই। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের লেনদেনের মধ্যে মানুষের চাওয়া কম—এর মধ্যে অনেকখানি ইচ্ছাশক্তির অতিরিক্ত, অর্থগত ও বিদেশী ভাবগত অসামঞ্জস্যের প্রেরণা রয়েছে। যা পরিবর্তন হচ্ছে সবই আমাদের অনিচ্ছায়—এ পরিবর্তন ভগবানের লীলার মতন বীর্যহীন। যা কিছু করতে হবে—সব যেন চোখ খুলে করি, নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে করি, নিজের শক্তি খাটিয়ে করি। Social force-এ বিশ্বাস করাও যা, বাইরের ভগবানে বিশ্বাস করাও তা—সবই আত্মপ্রবঞ্চনা।

এক বছর পরে দেশে ফিরে তিনটি ঘটনা আমার চোখে পড়েছে। একটি সাহিত্যিক ঝগড়া, দ্বিতীয়টি কলকারখানায় ধর্মঘট, এবং তৃতীয়টি যুবক-সম্প্রদায়ের জাগরণ। প্রত্যেক ঘটনার পিছনে আছে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ। প্রথমটির সম্বন্ধে এত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে যে, সে বিষয়ে কোনো নতুন কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একটা অতি পুরাতন কথা না বলে থাকা যায় না। নবীন সাহিত্য, অতিআধুনিক সাহিত্য বলতে আমি 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি'র ভালো লেখাকে যেমন ধরি, তেমনি ধরি 'শনিবারের চিঠি'র ভালো ব্যঙ্গ-রচনাগুলিকেও। দুই দলের লেখাতেই স্বাতন্ত্র্য আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। রস জিনিসটি দেশ ও কালের অতিরিক্ত হলেও যে বস্তুর, যে রূপের, যে আধারের সাহায্যে সেটি তৈরি হয়, সে বিষয়বস্তু, সে রূপ ও সে আধার সাধারণত দেশ ও কালের অন্তর্ভূক্ত সমাজসংক্রান্ত চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রতিক্রিয়াও এক ধরনের যোগ। শুধু প্রতিক্রিয়ার দ্বারা অবশ্য সাহিত্য হয় না, কিন্তু সব প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র বৈপরীত্যের বিকার নয়। বৈপরীত্যের পিছনে নতুন ভাবের তাড়না থাকতে বাধা—যেমন মাইকেলী যুগে ছিল। অতি-

মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক ৩

আধুনিক সাহিত্য আমাকে রাজনারায়ণ বসুর আত্মজীবনী, মাইকেলের জীবন-কথা, এবং নিমচাঁদের চরিত্র স্মরণ করিয়ে দেয়। ভূত যখন ছাড়ে তখন ছাড়ার চিহ্নস্বরূপ গাছের ডালপালা ভেঙ্গে দিয়ে যায়। অত্যন্ত প্রপীড়িত হয়ে মানুষ যখন শাসনের বিপক্ষে বিদ্রোহ করে, যখন সে বিদ্রোহ দমন করতে শাসনকর্তা শাস্ত্র আওড়ান এবং শস্ত্র ধরেন, তখন সে বিদ্রোহের মধ্যে, সে শাস্ত্র ও অস্ত্রক্ষেপের মধ্যে সঙ্গতি, সামঞ্জস্য, সুবিচার, সুরুচি থাকে না—কারণ এক দৈহিক পীড়ন ছাড়া অন্য কোনো পীড়ন সামাজিক পীড়নের মতো নিষ্ঠুর, নিবিড় ও ব্যাপক নয়। কিন্তু মানুষ বিরক্ত হয়ে মহাপুরুষদের মতন সংসার ত্যাগ করতে পারে না—সে যখন সমাজের মধ্যে থাকতে বাধ্য তখন তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিও অসামাজিক হতে বাধ্য। সেইজন্য মানুষের সঙ্গে তারই রচিত সমাজের মনকষাকষি চিরকালই চলছে—নিজের রচনার সঙ্গে বিবাদ করা বোধহয় মানুষের ধর্ম। যে কর্মী, সে এই অসামঞ্জস্যজনিত শক্তিকে সংস্কারের কাজে লাগায়, সেই নবযুগের পুরুষ। যে সাহিত্যিক কোনো মতামত প্রচার না করেও গোটা মানুষের সঙ্গে বাহিরের সমাজ ও অন্তরের প্রকৃতির নতুন প্রকার বিরোধকে রূপ দিতে পারে সেই নব্য-সাহিত্যিক। এইরূপ সামাজিক হবে না, অ-পরিচিত হবে জনসাধারণের কাছে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিরোধের সঙ্গে পরিচিত সে এই নতুনত্বের খাতির করবে। সাহিত্যের সঙ্গে যুগধর্মের ও সমাজের সম্বন্ধ এই বিরোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য, যতদিন সাহিত্যের বিষয় মানুষ থাকবে এবং যতদিন সাহিত্যিক বুঝতে কল বুঝব না, মানুষ বুঝব।* সমাজ-

* ১৬ই মে তারিখের আমেরিকান 'নেশন' পত্রিকায় দুটি উপাদেয় প্রবন্ধ পড়লুম। একটির বিষয় বর্তমান ফরাসী সাহিত্যের ধারা, অন্যটির বর্তমান রুষ-সাহিত্য। লেখকদ্বয় নামজাদা সমালোচক। Rene Lalou লিখছেন—"The most striking feature in every field of French literature at the present moment seems to be a general disinclination to treat art for art's sake ; our writers deliberately use it as an instrument for the probing of social or psychological problems"—লেখক বিস্তর দৃষ্টান্ত দিয়ে লিখছেন—"…in our time the true traitor is the artist who does not take sides. Even in psychology, neutrality seems impossible… From that point of view literature may be said to play its part in the

তত্ত্ববিদ অবশ্য রূপ সৃষ্টি করে না, কিন্তু সেও মানুষের দীর্ঘনিশ্বাস শুনতে পায়, সেও সামাজিক অত্যাচার লক্ষ্য করে, এবং অত্যাচার উপশম করবার জন্য জ্ঞানত অসামাজিক মতামত পোষণ ও প্রচার করতে বাধ্য হয়—এই হতে বাধ্য, যতদিন সমাজতত্ত্বের বিষয় প্রথমে মানুষ, পরে মানুষের অনুষ্ঠান থাকবে —যতদিন সমাজতত্ত্ব লিখতে মানুষের দরকার হবে। বিজ্ঞান-সম্মত সমাজতত্ত্বেও সামাজিক অত্যাচার নিরাকরণের অধ্যায় বাদ পড়বে না। অতএব যদি সমাজের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়ে থাকে, যদি সমাজ-শাসনের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে থাকে এবং সে প্রতিক্রিয়ার যদি কিছু মূল্য থাকে ; যদি লোকে বুঝতে পেরে থাকে যে, বড় আদর্শ, পুণ্য, ধর্ম, পবিত্রতার নামে সেই পুরাতন ব্রাহ্মণের বংশধর, সমাজরক্ষকের দল পৈতা ফেলে, plain dress constable সেজে agent provocateur-এর কাজই করছে, তাহলে সে বিদ্রোহের, সে প্রতিক্রিয়ার সুফল, কুফল মাসিক-সাহিত্যের পাতায়, সমাজতত্ত্বের পাতায় ধরা পড়বে। অবশ্য যদি এই সব সত্য হয়, তবেই ধরা পড়ব, নচেৎ নয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। নব্য মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, complex ভাঙবার একমাত্র উপায় সাহসভরে তাকে বোঝা, তাকে প্রকাশ করা। সেইজন্য মনে হয় যদি কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি ও শনিবারের চিঠির লেখকবৃন্দের মধ্যে যে কেউ প্রতি মাসে বর্তমান সমাজের বিপক্ষে যুবক-সম্পদায়ের আপত্তিগুলি দাখিল করেন, তাহলে নিছক সাহিত্য সৃষ্টি না হলেও যুবক-সম্প্রদায়ের জাগরণ সত্যকারের জাগরণ হয়, যুবকদের মনে প্রতিক্রিয়ার অসার বৈপরীত্যবোধ লোপ পেয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হয়, এবং তাঁরা নিজেদের ধর্ম খুঁজে পেয়ে সংযত হন।

national effort to build up France again. Louis Fischer ঐ সংখ্যায় রুষ-সাহিত্য সম্বন্ধে একই কথা লিখছেন—"...To the Soviet critic an author's social philosophy is the first criterion...: The only decisive difference between seven or seventeen literary armies is their realism or futurism"—মন্তব্যগুলি ফরাসী কি রুষ-সাহিত্য সম্বন্ধে সত্য কি মিথ্যা যাচাই করার ক্ষমতা নেই। বিদেশে যা হচ্ছে এদেশে তাই হওয়া উচিত তাও বলছি না। তবে সামাজিক পরিবর্তনকে অর্থাৎ বিরোধকে সাহিত্যিক সাহিত্যের বস্তু হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য, এই আমার ধারণা।

সংযমী হবার এই একটি উপায় আছে। দেশে জনকয়েক Calvins of East Bengal-এর দরকার হয়েছে—ব্রাহ্মধর্মের কাজ এখনও ফুরোয় নি। নতুন সাহিত্য গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সমাজের দোষত্রুটি লোকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার সময় এসেছে। নব্য-সাহিত্যের অতিরঞ্জনের জন্য সমাজকেই দায়ী করি। মানুষের দোষ বেশি দেখতে পাই না, যদি তার দোষ থাকে সেটি এই যে, সে এতদিন সমাজের দোষগুলি বুঝতে পারে নি।

নব্য-সাহিত্যে এই অতিরঞ্জনের মধ্যে বিদ্রোহ এবং প্রতিক্রিয়ার অংশটুকু বাদ দিলে অন্য কোনো সাহিত্যগুণ আছে কিনা সে বিষয় আলোচনা আমি করছি না। রসবোধ রুচিসাপেক্ষ। রুচি শুধু স্বাভাবিক বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, শুধু বিচার-বুদ্ধির দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না, শিক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হয় না—শুধু conditioned reflex বা learned reaction দ্বারা তার ব্যাখ্যা করা যায় না —রুচি নিউটনেরও তোয়াক্কা রাখে না, ওয়াটসনেরও খাতির রাখে না। রুচি অভ্যাস নয়, স্মৃতিও নয়। রুচি ব্যক্তির একটি সম্পূর্ণ অনুভূতির প্রতিবিম্ব। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ হয় নি, তার অনুভূতি একদেশদর্শী, তার অনুভূতি প্রবৃত্তির নামান্তর —অতএব তার রুচির কোনো বিশেষ মূল্য নেই—অন্তত রসের ক্ষেত্রে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্তরের জন্য রুচিগত পার্থক্য হয়। রুচির অভিব্যক্তি আছে, ইতিহাস আছে, অতএব ভিন্নস্তরের রুচির সঙ্গে মিল সম্ভব নয়। সেইজন্য রুচির কথা ছেড়ে দিচ্ছি। পূর্বেই বলেছি যে বোঝবার সুবিধার জন্য সাহিত্যের বক্তব্য এবং বিষয়বস্তুকে রস থেকে পৃথক করতে হয়। বক্তব্য বিষয়ে অতি-আধুনিক সাহিত্যিক সচেতন কিনা, রূপে কতখানি মতামতের খাদ থাকা উচিত, কিংবা কতখানি খাদ থাকলে অলঙ্কার তৈরি হতে পারে, একই বিষয়বস্তুর একই রূপ হওয়া উচিত কিনা, আমি জানি না। আমি জানি এইটুকু—যদি ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের মনোমালিন্য হয়ে থাকে, যদি এই মানসিক ঘর্ষণের ফলে ব্যক্তির মধ্যে কোনো নবশক্তির উদ্রেক হয়ে থাকে, তবে সে শক্তিকে মাত্র একটি রূপে পর্যবসিত করলে সে শক্তিকে অপমান করা হয়।

একটি রূপ বলতে একধারে যৌন-সম্বন্ধমূলক সাহিত্য এবং অন্যধারে সেই সাহিত্যের প্রতিক্রিয়ার ব্যঙ্গরচনাকেই নির্দেশ করছি। যৌন-সম্বন্ধ মানুষের খুব বড় সম্বন্ধ, পুরুষ স্ত্রীজাতির ওপর অত্যাচার করে এই সম্বন্ধ নিয়ে, যৌন-সম্পর্কেই অত লুকোচুরি, অত জুয়াচুরি ; এবং সে অত্যাচার, সে জুয়াচুরি যত

শীঘ্র সমাজ থেকে যায় ততই মঙ্গল। ব্যঙ্গরচনাও উচ্চ সাহিত্যের একটি অঙ্গ। 'পরশুরাম' বাংলা সাহিত্যে অমর থাকবেন—সতীশ ঘটকের 'রঙ্গ ও ব্যঙ্গ' সকলেরই প্রিয়। কিন্তু হিন্দুবিবাহের বাধাবিপত্তির বিপক্ষে বিদ্রোহটাই যেমন রচনাশক্তি নয়, তেমনি বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এমন শক্তি নেই যেটি স্বতঃ-স্ফূর্ত হয়ে উঠতে পারে। যৌন-সম্বন্ধ মানুষের সম্বন্ধ, ব্যঙ্গ-শক্তি মানুষেরই শক্তি। মানুষকে ভুলে গিয়ে তার বিশেষ কোনো শক্তি এবং সম্বন্ধ বিচার করা বৈজ্ঞানিক হিসাবে সুবিধার কথা হলেও রসানুভূতির পথ নয়। যেখানে ব্যথা, যেটি সহজ গম্য নয়, সেখানেই চোখ পড়া স্বাভাবিক—অতএব সাহিত্যের বিষয়বস্তু অবৈধ অর্থাৎ অসামাজিক প্রেম হতে বাধ্য। প্রেমে পড়া—কি বৈধ কি অবৈধ প্রেমে পড়া—মানুষের সবচেয়ে exacting profession হলেও সাধারণত এমন প্রেম ত দেখি নি যার জন্য মানুষের সব চিরকালের জন্য বদলে গেল। আর যাদের সব বদলে যায় তাদের সাহিত্যসৃষ্টি করবার কোনো স্থিরবুদ্ধি থাকে না। প্রেমে ভাটা পড়লে তবে পলি পড়ে এবং সেই পলিতেই আর্ট ও সাহিত্যের ভালো ফসল তৈরি হয়। রাগ থামলে তবে ব্যঙ্গরচনা সম্ভব হয়। সাহিত্য detumescent অবস্থার চিহ্ন। অবশ্য এসব কথা রসস্রষ্টার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধেই খাটে—কিন্তু রাগ এবং অনুরাগের সব অবস্থাই সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে না বলি কি করে! ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে রক্তের স্রোত বইত, দু'শ বছর পরে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাবে রঙ্গমঞ্চে খুন-খারাপি বন্ধ হলো, আবার আজকাল সে দেশে এমন নাটকও লেখা হচ্ছে যার প্রথম দৃশ্যেই বন্দুক চলছে। রোদ্যাঁর বৃদ্ধা বেশ্যাকে দেখলে লেসিং লাওকুনের হাসি-মুখের অন্য ব্যাখ্যা করতেন নিশ্চয়। সব জিনিসই রসবস্তু হতে পারে, তবে রসোৎপাদনের জন্য বস্তুর কতটুকু প্রকাশ্য, কতটুকু বেছে নিতে হবে তার ভার রসস্রষ্টার হাতে। আমার বক্তব্য এই যে, কামবিষয়ে নিরর্থক এবং নিতান্ত অপকারী লজ্জাকে ভাঙতে আমাদের সব শক্তি যেন নিয়োজিত না হয়—সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য complex-কেও ভাঙতে হবে। আসল কথা, মনের ভয় ভাঙা; কাম ছাড়া মনের অন্য জুজু নেই কি? আমার বিশ্বাস, সাহিত্য জুজু তাড়াবার ভার বেশ নিতে পারে। হয়ত সেটি মাসিক-সাহিত্য হবে, তা হোক, এই মাসিক-সাহিত্যের চিরস্থায়ী হতে কোনো বাধা নেই। অনেক নজির দেখান যায় যে, মাসিক-সাহিত্য সনাতনত্বের কোঠায় উঠেছে। সমসাময়িক সভ্যতা গড়ে তোলা কি এক দলের কাজ, না একঘেয়ে কাজ, না শুধু সমাজ-

সংস্কারকের একচেটে ব্যবসা? এ কাজ সাহিত্যিকের, বৈজ্ঞানিকের এবং ঐতিহাসিকের, পরে সমাজ-সংস্কারকদের, এককথায় এ কাজ প্রবুদ্ধ ব্যক্তির। আমি সব দলকে নিবেদন করছি, যেন তাঁরা ক্ষোভের বশে, দাম্ভিকতার বশে, রাগের বশে সভ্যতা তৈরি করার ভার অন্যের হাতে ন্যস্ত না করেন।

কথাটা অন্যভাবে বলা যাক। বাস্তব-সাহিত্য বলে যদি কোনো সাহিত্য থাকে তাহলে সে সাহিত্যের methodology হবে বৈজ্ঞানিক এবং বিষয় হবে প্রকৃতি ও মানুষের অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাত। এই বচনটি বস্তুতন্ত্রবাদের গুরু জোলা লিখেছিলেন গত শতাব্দীতে, যখন বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের মোহে সকলেই আচ্ছন্ন। কিন্তু এখনও সে মোহ সকলে কাটিয়ে উঠতে না পারলেও অনেকেই বেশ বুঝেছেন যে, মোটামুটিভাবে বৈজ্ঞানিকের মনোভাবের সঙ্গে রূপকারের মনোভাবের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। মধ্যযুগের শিল্পী তাঁর সততা, নির্বাচন-শক্তি এবং একনিষ্ঠতার সাহায্যে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের সমকক্ষ। অবশ্য সাধারণ লোকের, যাদের মন শিল্পীরও নয়, বৈজ্ঞানিকেরও নয়, অথচ শিল্প ও বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত, তাঁদের ধারণা এই যে, ঐতিহ্যের সঙ্গে, আদর্শের সঙ্গে objective outlook-এর একটি আন্তরিক বিরোধ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ বিরোধ বিজ্ঞানের সঙ্গে আর্টের নয়, এ বিরোধ ঐতিহ্যবাদী আদর্শবাদীর সঙ্গে বিজ্ঞানবাদীর—রূপ ও রসসৃষ্টির স্বাধীনতার সঙ্গে প্রভুসম্মত বাণীর। আমরা সাধারণ লোক, কিছুই সৃষ্টি করতে পারি না—কিছুই ভাঙ্গতে চাই না কিংবা ভাঙ্গবার সাহস আমাদের নেই—আমাদের বিজ্ঞান পড়া ইংরাজী, সংস্কৃত ও ইতিহাস না জানার দরুনই হয়। কিন্তু যাঁরা বস্তুতন্ত্রবাদী তাঁদের কাছেও বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং বর্তমানের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন প্রত্যাশা করা কি অসঙ্গত? শনি-মণ্ডল বস্তুতন্ত্রবাদী নন, কিন্তু তাঁরাও বলেন যে, তাঁরা নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা করে থাকেন—কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করেন না, কেবল ধারা নিয়ে সমালোচনা করেন—অর্থাৎ ব্যবহারে তাঁরা বৈজ্ঞানিক এই প্রমাণ করতে চান। কিন্তু তাদের কারুর মধ্যে Scientific spirit আছে বলে তো মনে হয় না। কল্লোল-দল কাম ও ক্রাইম নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে লিখবেন, কেউ রাগতে পাবে না, শনি-মণ্ডল কোনো বিশেষ ব্যক্তির অযথা ও অন্যায় সমালোচনা করবেন, তাঁর বন্ধুরা রাগতে পাবে না—এইটুকুই কি বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সঙ্গে তাঁদের একমাত্র সম্বন্ধের চিহ্ন হবে? নব্য-সাহিত্যিক বাল্য-বিবাহের বিরোধী, প্রেমে স্বাধীনতা চান, বিবাহকে সংস্কার

গণ্য করেন—কিন্তু হিন্দু-সমাজকে, হিন্দু-মনোভাবকে ভেঙ্গেচুরে দিতে হবে বলতে ভয় পান কেন? আমি জানি দু'দলের কোনো কোনো মহারথীরা হিন্দু-ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করতে শতমুখ হন—হিন্দু-সমাজ এতদিন বেঁচে এসেছে বলেই শ্রেষ্ঠ সমাজ, কায়দায় পড়ে, না জেনেশুনে, অন্য সমাজকে, অন্য ধর্মাবলম্বীকে আশ্রয় দিয়েছে বলেই খুব উদার, হিন্দু-ধর্ম সর্বধর্মকে সমন্বয় করবে, এইসব ধারণা হৃদয়ে পোষণ করেন, এবং তাঁদের মস্তিষ্কটি হৃদয়ে অবস্থিত বলেই হিন্দু-ধর্ম নিয়ে অনেক ভাবপ্রবণ 'চিন্তাশীল' লেখা লেখেন; নব্য-সাহিত্যিকরা সব খদ্দর পরছেন—মনের কোণে বোধ হয় এই বিশ্বাস আছে যে, খদ্দর পরলে দেশ স্বাধীন হোক আর না হোক সাহেব জব্দ হবে। এঁরা কেউ কেউ দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় ব্যস্ত—অথচ সত্যকারের বৈজ্ঞানিক মনোভাবের কাছে, গণতান্ত্রিক মনোভাবের কাছে, দরিদ্র-নারায়ণের যথার্থ সেবকবৃন্দ, অর্থাৎ সোশিয়ালিস্টের কাছে না আছে দেশী, না আছে বিলেতী। সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রবাদ কি তাহলে অসাহিত্যিক মনের কাজ ছাড়া অন্য কিছু নয়? একটি নতুন ভঙ্গিমার বিস্তার মাত্র? এর মধ্যে সত্য কি কিছুই নেই? আধুনিক সাহিত্যিকরা শুধু Realism-এর ভক্ত—না সত্যকারের Realists? শনি-মণ্ডলের লেখা পড়লে মনে হয় যে, তাঁরা সব ব্রাহ্মণ-সভার পরিপোষক, গোপনে গোপনে বোধ হয় চাঁদাও দেন। বস্তুতন্ত্রবাদীরা না হয় অবৈজ্ঞানিক হলেন, কিন্তু তাঁদের হতে আপত্তি কি? তাঁরাও তো নব্যভব্য—তাঁদের রস-রচনাও তো বাংলা সাহিত্যে নতুন সম্পদ এনেছে? স্রেফ্ গালাগালি দেওয়া তাঁদের উদ্দেশ্য কখনই হতে পারে না। উদ্দেশ্য, মাত্র এক সমসাময়িক সভ্যতার মূল্য নির্ধারণ করাই হতে পারে, পুরাতন সভ্যতার মূল্য নতুন আদর্শে নতুন অবস্থার অনুপাতে নতুন করে যাচাই করা এবং পরবর্তী সভ্যতা ভব্যতা ও বৈদগ্ধ্যের ভিত্তি গাঁথাই আদর্শ হতে পারে। কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি এবং শনিবারের চিঠি আমি পেলেই পড়ি এবং প্রায়ই পড়ি। কিন্তু কোথাও contemporary culture-এর সমালোচনা পড়েছি বলে মনে হয় না। শনি-মণ্ডলের সমালোচনাশক্তি কল্লোল-দলের অপেক্ষা বেশি আছে অনেকে সন্দেহ করেন, তারাই এ কাজটি করুন না? আমি 'শনি-মণ্ডল'কে কালো নীরে ঝাঁপ দিতে অনুরোধ করি। নিজেদের ছায়া দেখে ভয় করলে চলবে না। আমার সন্দেহ হয়েছে যে, শনি-মণ্ডল কল্লোল-সম্প্রদায়ের মতনই সমাজ ও জীবনের first and last things নিয়ে নাড়া চাড়া করতে ভয় পান, কিংবা সময় পান না, সমাজের

সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধে যে শক্তি জন্মগ্রহণ করেছে তাকে ঘাটাতে ভয় পান কিংবা সময় পান না! আমাদের মতন কাপুরুষ বোধ হয় কুত্রাপি নেই—নচেৎ যাঁরা দেহ সম্বন্ধে এত খোলাখুলি লিখতে সাহস পান—যাঁরা যে কোনো সাহিত্যিকের লেখা সমালোচনা করতে ব্যগ্র এবং জনমতের বিপক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করতে উদ্যত, তাঁরাও লজিকের শেষবেশ দেখতে নারাজ।

কার্ল মার্কসের শিষ্যেরা সমাজ অর্থে মূলত শ্রেণী বোঝেন। তাঁদের মতানুসারে সামাজিক ধর্মের মানে শ্রেণীগত ধর্ম—সে ধর্ম বদলাচ্ছে; পূর্বে, পরে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত ধর্মও বদলাচ্ছে। যৌন-সম্পর্ক সমাজ-ধর্মের একটি মূল কথা, সে সম্বন্ধে ধারণা বদলাচ্ছে (অনেকস্থলে সাহিত্যের সাহায্যে), বিষয়বস্তুর নির্বাচনে এই পরিবর্তনের আভাস ভালো করেই পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সমাজে অন্যান্য ঘটনাও ঘটছে—সেগুলির মূল্য আমরা দিতে শিখি নি। বিবাহপদ্ধতি বদলানো যেমনভাবে দরকারী মনে করি, দেশের অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তনও তেমন আগ্রহের সঙ্গে দরকারী মনে করি না। সেগুলি সাহিত্যের বিষয়বস্তু বলে গ্রাহ্য করছেন অনেকে, দু'একজনের হাতে সেগুলির সাহায্যে রসসৃষ্টিও হয়েছে। কিন্তু সেই ঘটনাগুলির প্রভাবে যে নতুন মানুষ তৈরি হচ্ছে সেই নতুন মানুষের স্থান সাহিত্য এখনও নিরূপণ করে নি। সাহিত্য সেগুলিকে tendency বলে ছেড়ে দিয়েছে—সেই tendency-র ফলে সংস্কৃত ব্যক্তির আচরণ লিখতে অনেকেই ভয় পান। এই যে ধীরে ধীরে বাংলা দেশের লোকেরা গ্রাম ছেড়ে ছোট বড় শহরে বাস করছে, এই যে লোকেরা ব্যবসা শুরু করেছে, ধান ডাল যবের ক্ষেত না করে পাট এবং রপ্তানীর উপযোগী শস্যের চাষ আরম্ভ করেছে, এই যে টাকার আধিপত্য শুরু হয়েছে, যেখানে কল-কারখানা সেখানে মুটে-মজুরের দর ঝুঁকে পড়েছে অথচ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘরকন্না করতে পারছে না, কিংবা যে ঘরে ঘরকন্না করছে সেটি বাসের উপযুক্ত মোটেই নয়, এই যে মধ্যবিত্ত ও ভদ্রসম্প্রদায় শহরের মেসে বাস করছে, এর ফলে কি ধর্ম, সমাজ এবং গোষ্ঠী ভেঙ্গে যাচ্ছে না—এবং সেই ভাঙনের ফলে মানুষের আচরণ ব্যবহারগুলি কি বদলে যাচ্ছে না? মুটেমজুর চাকরবাকর, বাড়ীর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, চাষী ও গরীব কেরানীর দল সকলেই অত্যাচারের বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, সঙ্ঘ বাঁধছে, ধর্মঘট করছে, টাকা দিয়ে মানুষের মূল্য ঠিক করছে, এককথায় 'জড়বাদী' হয়ে উঠেছে। আগে লোকেরা কতখানি আধ্যাত্মিক ছিল জানি না, তবে ভগ্নী নিবেদিতার পর থেকে অক-

সাধারণের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা বিরল হয়ে উঠেছে দেখছি। তবে ভণ্ডামীও সেই অনুপাতে বাড়ছে বলা যেতে পারে। জড়বাদ ভালো কি মন্দ সে কথা উঠছে না এবং সাহিত্য জড়বাদের ব্যাখ্যা করুক তাও বলছি না। তবে জড়বাদ যে বর্ত্তমান যুগে নিতান্তই স্বাভাবিক, সেকথা ক্ষুধার্ত ব্যক্তি এবং শহুরে লোক কি করে অস্বীকার করে? যতক্ষণ অঙ্গ অসুস্থ থাকে ততক্ষণ মন অসুস্থ অঙ্গের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে—অবশ্য তুলনাটি ঠিক হলো না, কেননা ক্ষুধা অসুস্থতা নয়, সুস্থদেহেরই লক্ষণ। যাই হোক, মানুষের মনোবৃত্তিগুলি এবং আচার-ব্যবহার এমনিভাবে বদলাচ্ছে যে, সেগুলি সকলেরই নজরে পড়া উচিত। নজরে পড়লে অনেকে তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করে ফেলেন। মনের মধ্যে একধারে ঐতিহ্যরূপ চেড়ীর দল চাবুক নিয়ে শাসাচ্ছে, অন্যধারে গালফুলো ভুঁড়িওয়ালা, গগন ঠাকুরের ব্যঙ্গ-চিত্রের ভটচাযি্য মশাই-এর মতন আত্মপ্রসন্ন দেশাত্মবোধ সর্বদাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, আমরা সব আধ্যাত্মিক; ফলে মন কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। বস্তুতন্ত্র-বাদীদের সোশিয়ালিস্ট হবার সাহস আছে কি? সামাজিক পরিবর্ত্তনের ফলে দেশের মতিগতি কোন ধারে যাচ্ছে তার খতিয়ান শনি-মণ্ডল কবে করবেন? সবই নারায়ণ করছেন বলে আশ্বস্ত হলে চলবে না। বীর্য্যবান পুরুষ ভগবানের মুখ চেয়ে থাকে না। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি, প্রপীড়িত ব্যক্তি ধীরে ধীরে বুঝছে যে তার রচিত, কিংবা ধনীর, কিংবা ব্রাহ্মণের রচিত ভগবান সকল্পিত দুঃখের অবসান করতে পারেন, কিন্তু প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক দুঃখের অবসান করা সেই স্বকল্পিত ভগবানের ক্ষমতার অতিরিক্ত। নাটকের ছয়টি চরিত্রের কোনোটিও নাট্যকারের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারে না। দরিদ্রবৎসল, প্রপীড়িতবৎসল ভগবান, হয় দরিদ্র ও পীড়িত মস্তিষ্কের, না হয় স্বার্থপর মস্তিষ্কের উদ্ভূত।

তরুণ দলের অনেকে দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় রত হয়েছেন। দরিদ্র ব্যক্তির সেবকদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু দেশের আত্মার সন্ধান যাঁরা পেয়েছেন তাঁরাই দরিদ্রের ভগবানকে খুঁজে বার করেছেন। যাঁরা নিজেদের আবিষ্কৃত দেশাত্মার উপাসনা করে ও পূজারী হয়ে অন্নের সংস্থান করেন, সাধারণত তাঁরাই সর্বদেশে দরিদ্র-নারায়ণের সেবায়েৎ হন। এঁরা সকলেই প্রায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। এঁরা যখন মুখ খোলেন এবং সেই মুখ থেকে যখন অনুকম্পার দুধ ক্ষরণ হয়, তখন সেই দুধের সাধ হয় একটু ঘোলের মতন। যে কোনো নামজাদা বিলেতী নভেলের পাতায় গরীবদের জীবনকাহিনী এবং বর্ত্তমানে

মাসিক-পত্রিকায় বর্ণিত মুটে-মজুর বেশ্যার জীবনকাহিনী পড়লেই বেশ বুঝা যায় তফাৎ শুধু আর্টের ক্ষেত্রে নয়, sincerity of feeling-এও। এ লেখায় মধ্যে মধ্যে এমন একটি patronising-এর সুর পাওয়া যায় যেটি সত্যকারের অভিজ্ঞ ব্যক্তির কলম থেকে আশা করা যায় না। এ ধরনের লেখা মন্দের ভালো। একধারের যেমন মজুরদের শিক্ষার অভাবে তুলসী গোঁসাই ও দেওয়ান চমনলাল নেতা হতে বাধ্য হয়েছেন, তেমনি বাধ্য হয়ে অধ্যাপকের দল ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মজুর-সাহিত্য লিখতে শুরু করেছেন। আর একটি কারণে এই ধরনের বর্ণনার মধ্যে ভুল সুর থাকে। যে পরিমাণে যৌবন আদর্শবাদী, সেই পরিমাণে যৌবন দুঃখবাদী নয়। বুদ্ধদেব যাই থাকুন না কেন, বর্তমান যুগে খুঁজে খুঁজে দুঃখ বার করা এবং সেই দুঃখের সঙ্গে প্রেমে পড়ে যাওয়া, নয় বিকারের চিহ্ন, না হয় এক ধরনের ভাববিলাস মাত্র। দুঃখ চোখের সামনে এসে না পড়লে, মনকে বিশেষ রকম ধাক্কা না দিলে, দুঃখকে তাড়াবার এবং উড়িয়ে দেবার চেষ্টা বিফল না হলে আর কেউ দুঃখকে গ্রহণ করে না। দুঃখকে বুঝে তাকে দূর করবার জন্য উপায় অবলম্বন করবার সঙ্গে যে সাম্য ও মৈত্রীভাব আসে সেই ভাবই স্থির ও কার্যকরী, কিন্তু সে ভাব আনতে রীতিমত সময় লাগে। শিশুরা পর্যন্ত ভীষণ অর্থাভিমানী হয়। অনেক দেখে শুনে, অনেক পোড় খেয়ে, অনেক অভিজ্ঞতার পর, অনেক বিচারের ফলে মানুষ সত্যকারের জ্ঞানী হয়। সহানুভূতি স্থির বুদ্ধির ফল, অর্বাচীনতার ফল নয়। যৌবনে দরিদ্র-নারায়ণের পূজা করা সাহিত্যের রোমাণ্টিসিজম্ ছাড়া সাধারণত অন্য কিছু নয়। শুধু তাই নয়, যেমন প্রেম শেষ হবার সময় সাহিত্য সম্ভব হয়, রাগ থামলে ব্যঙ্গরচনা সার্থক হয়, তেমনি পরের দুঃখে কান্না বন্ধ হলেই ব্যথার সাহিত্য সম্ভব হয়। আমার মনে হয় মুটেমজুর বেশ্যাকে দেখবামাত্রই যে কান্না আসে, সে কান্না চোখের দোষেই। সত্যকারের দরদ আনবার জন্য সহানুভূতি ছাড়া কার্ল মার্কসের বই পড়তে হয়, তাঁর মত এদেশে কতখানি খাটে ভেবে দেখতে হয়, এক কথায় কিছু বুদ্ধি খরচ করতে হয়। দেখে শুনেও যদি দুঃখ ঘোচাবার প্রবৃত্তি থাকে তাহলে পুরোপুরি সোশিয়ালিস্ট হতে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রীতিও উড়ে যাবে জেনে রাখা ভালো। দরিদ্র-নারায়ণ দেশমাতার ভীষণ শত্রু। দুটোর একটিকে ছাড়তেই হবে—না একটিকে রাখা চলে? মাসিক পত্রিকা পড়ে মনে হয় যে, নব্য-সাহিত্যিকবৃন্দ দুই-ই রাখতে চান। ভাবপ্রবণতার সরু গলিতে জুড়ী হাঁকানো অসম্ভব।

সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। সমাজ ও ধর্মের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির সূক্ষ্মপুরুষটি না বদলালেও তার মানসিক অভ্যাসগুলি বদলে যাচ্ছে। সেই পরিবর্তনের বিবরণ চাই। সেই বিবরণই ভবিষ্যৎ সাহিত্যের বিষয়বস্তু হবে। তারপর অ-সাধারণ ব্যক্তির কথা—আর্টিস্টের কাজ। সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না।*

সন ১৩৩৫

* চিন্তয়সি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৩৩, কুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক ৯, রুস্তমজী স্ট্রীট, বালিগঞ্জ থেকে প্রকাশিত, পৃঃ ৯১-১১৩। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করা হয়েছে।—সম্পাদক

প্রগতি সাহিত্যের সংজ্ঞা / ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

সাহিত্যে প্রগতির ধারার সন্ধান পাওয়া যায় বলিয়া একটা রব উঠিয়াছে এবং তজ্জন্য তাহার অনুসন্ধানও চলিতেছে। ফলত দেশের সর্বত্র এক তরুণ দলের অভ্যুদয় হইয়াছে যাঁহারা সাহিত্যে প্রগতির অনুসন্ধানকারী। অন্যপক্ষে একদল পুরাতন সাহিত্যরথীও রহিয়াছেন যাঁহারা এই প্রগতির অনুসন্ধানকারী-দিগকে 'মতলববাজ দল' বলিয়া নিন্দা করেন। সাহিত্যের এই সনাতনীদের বক্তব্য যে, সাহিত্য হইতেছে শাশ্বত ও সনাতন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রূপ' ও 'রস' নামক যে দুইটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাও ইঁহাদের তূণীরে অস্ত্রস্বরূপে ব্যবহৃত হয়। এই জন্যই ইঁহারা বলেন রূপ, রস নিয়াই সাহিত্য, তাহাতে প্রগতি বা অ-প্রগতি আবার কি?

সনাতনী সাহিত্যিক সমালোচকেরা কিন্তু সাহিত্যকে Realism, Neo-realism, Idealism, Neo-idealism, Romanticism, Expressionism, Impressionism, Decadent period প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করেন। হালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রুশ সমাজতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সরোকিন সাহিত্য তথা মানবসংস্কৃতিকে Ideational, Sensate এবং উভয়ের মিশ্রিত Idealistic or Mixed এইভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদেরা মানবের সভ্যতার ইতিহাসকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা, বর্বর যুগের শেষকালীন ও সভ্যতার উন্মেষের প্রথমাবস্থার— Heroic Age; সভ্যতার বিকাশের পরে সামাজিক যুগকে Classical Age বলা হয়; যেসব দেশে রাষ্ট্রমধ্যে সামন্ততন্ত্রীয় প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকে Feudal Age বলা হয়। আবার যেসব দেশে এই যুগের অবসান হইয়া বুর্জোয়া-ন্যাশনাল স্টেট বিবর্তিত হইয়াছে তথায় বুর্জোয়া যুগের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হয়। পুনরায় যে রাষ্ট্রে শ্রমজীবীরা শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেই দেশে প্রোলেটারীয় যুগ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া নির্ধারিত করা হয়। রাষ্ট্রের এই বিবর্তন সমাজে ও সেই লোকসমষ্টির সংস্কৃতিতে বিশিষ্টভাবে

প্রতিফলিত হয়। রাষ্ট্রের যে-যুগের যেসব লক্ষণ আছে তাহার চিহ্ন সাহিত্যে পাওয়া যায়। কাজেই সাহিত্যকে যদি এই প্রকারের সমাজতাত্ত্বিক বিভাগের দ্বারা চিহ্নিত করা যায়, তাহা হইলে কোনো অপরাধ হয় না। সমাজের প্রত্যেক যুগের অবস্থা তৎকালীন সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয় এবং সমাজের তৎকালীন কর্ণধারদের মনস্তত্ত্বও তাহাতে প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যের লেখক তাঁহার আবেষ্টনীর বাহিরে গিয়া কিছু লেখেন না। তাঁহার লেখার মধ্যে তাঁহার শ্রেণীগত শিক্ষাদীক্ষা ও আদর্শ প্রতিফলিত হয়। ফলত একটি যুগের সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করিলে তাহার মধ্যে তৎকালীন ক্ষমতাশালী শ্রেণী বা শাসকবর্গের মনস্তত্ত্ব ধরা পড়ে এবং প্রত্যেক শাসকবর্গের নিজেদের একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পন্থার নির্দেশের সংবাদ সমকালীন সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। ফলত যুগধর্মানুযায়ী রাষ্ট্রীয় আদর্শ প্রত্যেক যুগের সাহিত্য বহন করে। সেইজন্য সাহিত্যকে যদি আমরা উপরোক্ত ভাগে বিভক্ত করি তাহা হইলে কোনো দোষ হয় না। আর লেখকদের যদি সাহিত্যকে উপরোক্ত নানা প্রকারের ভাগে বিভক্ত করিবার অধিকার থাকে তাহা হইলে আমাদেরও এই প্রকারের বিভক্ত করিবার পূর্ণ অধিকার আছে। ইহাতে কোনো 'মতলববাজের' কর্ম প্রকাশ পায় না।

এক্ষণে আমাদের এই বিশ্লেষণের অনুসরণ করা যাক। প্রথমে আমরা বর্বর অবস্থার কথা বলিয়াছি। মানবসমাজের এই কালেই বীরত্বের যুগের (Heroic Age) নিদর্শন পাই। এই কালের বীরদের অলৌকিক কীর্তির উল্লেখ ছাড়া সাহিত্যে আর কিছুই দেখিতে পাই না। গ্রীসের হারকুলিস, পারস্যের রোস্তম, ভারতের ভীষ্ম এই প্রকারের বীর। তাঁহাদের বীরত্বগাথা classical যুগের সাহিত্যেই লিপিবদ্ধ হইতে দেখা যায়। এই বীরেরা তৎকালীন যুগের আদর্শ-পুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইতেন। তৎপরে আসে classical যুগ। এই যুগ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে আরম্ভ হইয়াছে। এই যুগকেও সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়: গ্রীসের হোমারীয় কাল হইতেছে সেই দেশের সামন্ততন্ত্রীয় যুগ; আর পেরিক্লিসের যুগ হইতেছে এথেন্সের বুর্জোয়া-ডেমোক্রাটিক যুগ। অন্যপক্ষে রোম যখন এটোলীয়ান্ লীগকে পরাজিত করিয়া গ্রীসকে বিধ্বংস করে তখনই এই পার্বত্য গ্রীকেরা সভ্যতার গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করে নাই। আবার ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্রীয় যুগ হয় তো সুদূর অতীতে কোনো সময় আরম্ভ হয়, কিন্তু

গুপ্ত যুগ হইতে মোগল যুগের পূর্ব পর্যন্ত ইহাকে জাজ্জ্বল্যভাবে দেখিতে পাই ; এবং রাজপুতানায় ইহা এখনও বর্তমান আছে।

এক্ষণে দেখা যাক কি কি লক্ষণ দ্বারা আমরা সামন্ততন্ত্রীয় প্রথা বা 'জায়গীর-দারী'* সভ্যতা নির্ধারণ করিতে পারি। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে নিম্নলিখিত কয়েকটি লক্ষণ দ্বারা ইহা নির্ধারিত হয় :

(১) জমির ভোগদখলের অধিকার রাজা হইতে স্তরে স্তরে কৃষক পর্যন্ত নামিয়া যায়, (Subinfeudation of land), (২) স্বামীধর্ম (Nobless-oblige), (৩) বৈরদেয় (Blood feud and blood bond), (৪) তালুকের উপর স্বত্বভোগ (benefice), (৫) স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান (gallantry), (৬) বীরত্বের লড়াই (chivalry) প্রভৃতি। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মিক তত্ত্ব হইতেছে "স্বামীধর্ম"। ইয়োরোপের মধ্যযুগে দক্ষিণ ফ্রান্সের ক্রুবাদুরেরা, এবং উত্তর ফ্রান্সের ত্রুভেয়ারদের গাথা এবং ভারতবর্ষে মহাভারত থেকে রাজপুতানার চারণ গাথাতে এই স্বামীধর্মকেই বীরের আদর্শ বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ফ্রান্সের চারণ রোলাঁ তৎকালীন রাজনৈতিক আদর্শের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাঁবেদার লোকের কর্তব্য হইতেছে তার প্রভুর জন্যে যুদ্ধ করা (It is the duty of the liege-man to fight for his liege-lord)। এই যুগের সাহিত্যে একজন অভিজাত জায়গীরদার ব্যক্তি হইতেছেন সমাজের কেন্দ্রস্থল। আর সব লোক তাঁহার সেবার জন্য নিযুক্ত হয়। এই যুগে অভিজাত শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা জগৎকে দেখা হয়। যে-সাহিত্যে আমরা এই যুগের চিত্র পাই এবং যে-সাহিত্য এই দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা হয় সেই সাহিত্যকে আমরা সামন্ততন্ত্রীয় সাহিত্য বলিয়া নির্দেশ করিব।

এক্ষণে আমরা পরবর্তীকালের বিষয় অনুসন্ধান করিব। সামন্ততন্ত্রীয় সভ্যতা ও রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া দিয়া বুর্জোয়া বা ব্যবসায়ীশ্রেণী রাষ্ট্রে ও সমাজে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। এই সময় হইতে Nationalism বা 'জাতীয়তা' রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই এই যুগকে বুর্জোয়া-ডেমোক্রাটিক যুগ বলা হয়। এই যুগে ব্যবসায়ীগণ 'মহাজনী' সভ্যতা (capitalist civilisation) বিস্তার করিয়া প্রাচীন সভ্যতাকে বিধ্বংস করে। এই যুগে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকই

*৺প্রেমচাঁদজী Feudal civilisation-এর এই পরিভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন

হয় সমাজের কেন্দ্রস্থল। ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গীতেই জগৎকে দেখা হয়। ফরাসী বিপ্লবের পরে সেই দেশের সাহিত্য এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্য ইহার প্রকৃত নিদর্শন। এই অভিজাত সভ্যতার বিপক্ষে প্রথম অভিযান দেখিতে পাই ফরাসী বিপ্লবের সময়ে লেখা বোমারখিসের 'ফিগারো' নামক নাটকে। একজন অভিজাতকে সম্বোধন করিয়া ফিগারো বলিতেছেন, "মসিয়ে কাউণ্ট, তুমি জগতের জন্য কি করেছ?—কেবল একজন অভিজাতের ঘরে জন্ম নেবার সুবিধেটা গ্রহণ করেছ, আর সেইজন্য সমাজের সব দ্বারই তোমার প্রবেশের জন্য বিমুক্ত। অন্যপক্ষে আমি একজন গরীব বুদ্ধিজীবী, আমি জানি না কি উপায়ে আমি গ্রাসাচ্ছাদন করব!" এই সময়েই আবে শিয়ে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তিকা 'তৃতীয় স্টেট (মধ্যবিত্ত শ্রেণী) কি?'—প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বলেন যে তৃতীয় স্টেটই (মধ্যবিত্ত শ্রেণী) সব। এতদ্বারাই বুর্জোয়াশ্রেণীর দর্শনশাস্ত্র ও জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী নির্ধারিত হয়।

এই সময় থেকে ফ্রান্সের সাহিত্যকে 'বুর্জোয়া'-সাহিত্য বলা হয়। অবশ্য ইহার মধ্যেও ভাবের দিক দিয়া বিভাগ আছে।* আমেরিকায় স্বাধীনতা পাইবার পর হইতে বুর্জোয়া-সাহিত্য সৃষ্ট হয়। আর ইংলণ্ড ও জার্মানীতে সভ্যতা ধীরে ধীরে ক্রমবিকশিত হওয়ার ফলে প্রাচীন সভ্যতা ও 'মহাজনী' সভ্যতা সমাজে একীভূত হইয়াছে। সেই জন্যেই এই দুই দেশের সাহিত্যে একটা বিপ্লবের দ্বারা বিভাগ সৃষ্টি হয় নাই। যেসব দেশ বা রাষ্ট্র, রাজা বা অভিজাত দ্বারা শাসিত সেসব দেশে যে একটা খাটি বুর্জোয়া-সাহিত্যের বিকাশ হইয়াছে তাহা বলা যায় না, যদিও তথায় একটা জনসাহিত্যের সৃষ্টি নিশ্চয়ই হইয়াছে।

তৎপরে আসে প্রোলেটারীয় যুগ। এই যুগে শ্রমজীবী শ্রেণীসমূহ রাষ্ট্রের পরিচালনা করিবে এবং প্রোলেটারীয় দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা জগৎ নিরীক্ষিত হইবে। যে-সাহিত্যে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয় এবং এই শ্রেণীর আদর্শের নির্দেশ থাকে, তাহাকে প্রোলেটারীয় সাহিত্য বলা যায়। এই শ্রেণীর সাহিত্য কেবল একমাত্র রুষেই বিকাশ পাইতেছে।

*K. T. Butler—'History of the French Revolution,' P. 276—286, Vol. 11.

অবশ্য এইখানে ইহাও বক্তব্য যে এই সব বিভাগীয় সাহিত্যকে একটি নির্দিষ্ট বাঁধাধরা শর্তের (category) মধ্যে ফেলা যায় না। আজকাল পৃথিবীর অনেক স্থলেই মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকদের জীবনী লইয়া সাহিত্য লেখা হইতেছে এবং এই সাহিত্যকে 'জন' (people's) সাহিত্যও বলা যাইতে পারে কিন্তু খাঁটি বুর্জোয়া সাহিত্য বলা যাইতে পারে না। অন্যদিকে বিগত ১৯১৪ সালের যুদ্ধের পূর্বে জার্মানী ও অন্যান্য দেশে সোশ্যালিস্টগণ প্রোলেটারিয়েট-জীবনী ও আদর্শ নিয়া সাহিত্য লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময় থেকেই তাঁহাদের দ্বারা Proletarian Literature ও Proletarian culture— এই দুইটি কথার সৃষ্টি হয়। কিন্তু 'মহাজনী' সভ্যতার আওতা হইতে শ্রমজীবী-সংস্কৃতি ও শ্রমজীবী-সাহিত্য গড়িয়া ওঠা সম্ভবপর নয়। সেই জন্য এই সাহিত্যকে আমরা গণশ্রেণীর (masses) সাহিত্য বা গণ-সাহিত্য বলিতে পারি, কিন্তু প্রোলেটারীয় সাহিত্য বলা সমীচীন হইবে না। অতি প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত যে সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহা ওই সামন্ততন্ত্রীয় যুগের অন্তর্গত বলিতে হইবে। বর্তমানে বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভাতীয় সাহিত্য এখনো জমিদারের ফটক পার হয় নাই। প্রচীন সভ্যতার আওতা হইতে ভারতে একটি বুর্জোয়াশ্রেণী সম্পূর্ণভাবে বিবর্তিত হয় নাই বা রাষ্ট্রে ও সমাজে তাহার আধিপত্যও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাজেই একটা যথার্থ বুর্জোয়া সাহিত্যের উদয় এখন সম্ভবপর নয়। ইহার মধ্যে, যে সকল তরুণ-তরুণীদের কার্যকলাপ নিয়া গল্প বা পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে তাহাও বিলাতীর নকল মাত্র। তবে বাংলার গ্রামের পরাণ মণ্ডল ও পাঁচু শেখ অতি দীন ও অলক্ষিতভাবে বাংলা সাহিত্যের এক কোণে দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহারা এখনো উপেক্ষার বস্তুই হইয়া আছেন। অন্যপক্ষে রামদীন ও রহিম হিন্দী সাহিত্যের পুরোপুরি একটা বড় স্থান অধিকার করিয়া ফেলিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙলায় প্রসাদজী ও প্রেমচাঁদজীর মতো গণের জীবনী সম্বন্ধে শক্তিশালী লেখকের উদয় হয় নাই।

কেবল কতকগুলি ভাবদ্বারাই সমাজ ও তাহার সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। রূপ ও রস যুগে যুগে এবং জাতিতে জাতিতে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। ইতিহাসের আর্থনীতিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী (Historical Materialism) সমাজপটে যে প্রকারের পরিবর্তন দেখা যায় সাহিত্যেও তাহার প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। আর

যে আদর্শ সমাজকে আরও অগ্রগমনশীলতার দিক নির্দেশ করে তাহাকে 'প্রগতিশীল' বলা হয়। প্রগতি আপেক্ষিক বস্তু। সামন্ততন্ত্রীয় সভ্যতা হইতে বুর্জোয়া সভ্যতা আপেক্ষিকভাবে অগ্রসর বলিয়া এই সভ্যতাকে 'প্রগতিশীল' বলা হয়। আবার যাহারা সমাজতন্ত্রবাদকে মানবের পক্ষে আরও প্রগতিশীল বলিয়া মনে করেন তাঁহারা প্রোলেটারীয় সভ্যতা ও সাহিত্যকে আরও প্রগতিশীল বলিয়া মনে করেন। শেষ কথা এই যে একটি অনুষ্ঠান (Phenomenon) প্রণিধানের বস্তু যে, বর্তমানে ভারতীয় সাহিত্যে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ অপেক্ষা প্রোলেটারীয় শ্রেণীর বিকাশের সংবাদ বেশী পাওয়া যাইতেছে। *

* সাহিত্যে প্রগতি, পূরবী পাবলিশার্স, ৩৭/৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৪৫, পৃ. ১-৭। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক।

সাহিত্যে প্রগতি / ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

আজকাল দেশে প্রগতি-সাহিত্য বলিয়া রব উঠিয়াছে। ইহার মানে অনেকেই ধরিতে পারেন না। সাধারণ লোক বলিতেছেন, ইহা আবার কি? আর সনাতনী সাহিত্যিকরা বলিতেছেন, রস ও রূপ নিয়ে সাহিত্য ; সাহিত্যে পশ্চাদগমনশীলতাই বা কি আর প্রগতিই বা কি ? সাহিত্যে একটা সনাতন ধারাই চলে, তাহা অখণ্ড এবং তাহা রস ও রূপের বিকাশই ব্যক্ত করে। অতএব সাহিত্যে এই কথার কোনো মূল্য নাই।

এখন কথা এই, যাঁহার যা ধারণা তাহা তিনি নিজের হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন এবং লোকসমাজে প্রচার করিতে পাবেন, কিন্তু তাহা বলিয়া সত্যের অপলাপ হয় না। এই স্থাণুবৎ নড়ন-চড়নশীলতাবিহীন দেশে সকলেই জীবনের সব দিকেই সনাতন ও অখণ্ড ধারার প্রভাব দেখেন। যে দেশে সমাজ-ক্ষেত্রে, অর্থনীতিক্ষেত্রে, রাজনীতিক্ষেত্রে, ভাষার ক্ষেত্রে, ধর্মক্ষেত্রে ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সনাতন ধারার আবিষ্কার করাই বাহাদুরী বলিয়া গণ্য হয়, সে দেশে সহিত্যক্ষেত্রে সনাতন ও অখণ্ডভাব আবিষ্কার করা বিচিত্র নয়। এই চলমান শ্মশানরূপ ভারতীয় সমাজে সনাতন ধারার এবং আধ্যাত্মিকতার মাহাত্ম্যের যতই বাহাদুরী থাকুক না কেন তাহা বাস্তব নহে। সত্য এই যে, মানবসমাজ গতিশীল, স্থাণুবৎ স্থিতিশীল নহে। যে সমাজ স্থাণুবৎ জড়তাপ্রাপ্ত তাহার মৃত্যু অনিবার্য এবং তাহা শ্মশানে পরিণত হয়। এই শ্মশানে সনাতন ধারার আবিষ্কার কিছু অদ্ভুত ব্যাপার নয় এবং তাহার অতীন্দ্রিয় (Mystic) মাহাত্ম্যও কিছু নাই। বাস্তব কথা এই যে একটা জীবন্ত জাতির জীবনে সর্ববিষয়ে পরিবর্তনের যে অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় সাহিত্যে তাহা প্রতিফলিত হয়। এই জন্যই সাহিত্যের মধ্যে দিয়া একটা জাতির ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। সাহিত্যের এই অভিব্যক্তির অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় সাহিত্যকে যেমন বীর-রসাত্মক, ধর্মাত্মক প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা যায় তেমনি অন্যান্য প্রকারেও বিভক্ত করা হয়।

ইহার মধ্যে একটি শ্রেণী বিভাগ হইতেছে নিম্নপ্রকারের :

প্রাচীন সহিত্যগুলিতে আমরা নানা জনশ্রুতির মধ্যে কতকগুলি বীরের অমানুষিক বীরত্বগাথার সংবাদ পাই, ইহাকে Heroic age বলা হয়। যথা, Homer-এর Achilles, পারস্যের রোস্তম, ভারতের ভীষ্ম প্রভৃতির বীর-গাথাকে Heroic age-এর অন্তর্গত বলা যায়। আবার Homer-এর Iliad, Virgil-এর Aenid, ফেরদৌসীর "শাহনামা" আর ভারতের রামায়ণ, মহাভারত Classical age-এর পরিচয় প্রদান করে। তৎপরে আসে সামন্ততান্ত্রিক যুগের সাহিত্য। ইয়োরোপের এই যুগের সাহিত্যের যথেষ্ট নিদর্শন আছে। ফরাসী চারণ রোলাঁর Chansons (গীতি) এবং অন্যান্য চারণদের Geste-তে এই যুগের সমাজের চিত্র প্রকাশ করে। তৎপরে আসে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় সমাজ। এই যুগে ইয়োরোপের সমাজতন্ত্র ধ্বংস করিয়া বুর্জোয়া এবং ধনীতন্ত্রীয় সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাকে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সমাজ বলা হয়। ইয়োরোপের এই যুগের সাহিত্যে আমরা তাহার নিদর্শন পাই। ফ্রান্সের ডুমা, বালজাক, ভিক্টর হুগো, রোমাঁ রোলাঁ প্রভৃতি সেই দেশের বুর্জোয়া সমাজের চিত্র ও মনস্তত্ত্ব সাহিত্যে প্রকট করিয়াছেন। ইংলণ্ডে সেক্সপিয়রও সমাজের চিত্র তাঁহার নাটকসমূহে প্রকাশ করিয়াছেন। আর Dickens থেকে Galsworthy পর্যন্ত আধুনিক ইংরেজ লেখকরা বুর্জোয়া সমাজেরই প্রতিচ্ছবি তাঁহাদের লেখার মধ্যে পরিস্ফুট করিয়াছেন। রুশের সাহিত্যিকেরা সমাজের প্রত্যেক চিত্র লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিয়াছেন। রুশের গোগল থেকে টলস্টয় পর্যন্ত সাহিত্যিকেরা নিজ নিজ যুগের প্রতিচ্ছবি দেখাই-য়াছেন। রুশের বুর্জোয়া সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার আগেই বিপ্লবের দ্বারা প্রোলেটা-রিয়েট সমাজ সংগঠিত হয়। এইজন্য তথায় আমরা একটা যথার্থ বুর্জোয়া সমাজের সন্ধান পাই না। আবার ঊনবিংশ শতব্দী থেকে আজ পর্যন্ত রুশ-বৈপ্লবিক সাহিত্যিকদের লেখার মধ্যে রুশীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্তরের সংবাদ আমরা পাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে December বিপ্লবের সাহিত্য ডস্টয়েভস্কি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক রুশের প্রোলেটারিয়ান সাহিত্যিকদের লেখার মধ্যে সমাজের এই স্তরের কার্যের সংবাদ আমরা পাই।

ভারতীয় সাহিত্যকে এই চাবিকাঠির দ্বারা উদ্ঘাটন করিলে আমরা তদ্রূপ ফলই প্রাপ্ত হই। ভারতীয় সাহিত্যে ইহার কোনো ব্যতিক্রম হয় না। এ বিষয়ে

বিশদভাবে অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে Heroic যুগ থেকে সামন্ততন্ত্রীয় সমাজের নিদর্শন পাওয়া যায়। অবশ্য ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত একটা যথার্থ বুর্জোয়া সমাজ এখনও অভিব্যক্ত হয় নাই। এই জন্য সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার নিদর্শন নাই। তবে কথা আসে বাংলা সাহিত্যে কি পাই? বাংলার সমাজ যেভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে সাহিত্যেও তাহার প্রতিচ্ছবি পড়িতেছে। বাংলা সাহিত্য কিছু আগে পর্যন্তও সংস্কৃত সাহিত্যের পোঁ ধরিয়া চলিয়াছিল; এই জন্যেই আমরা রবিবাবু পর্যন্ত সাহিত্যের মধ্যে রাজারাণী, জমিদার, বরকন্দাজ প্রভৃতির সংবাদ পাই। যদিচ খাস বাংলা সমাজে রাজারাণীর দরবার, সেপাইসান্ত্রী প্রভৃতির পাট অনেকদিন আগেই উঠিয়া গিয়াছে। বাংলার সমাজ আজ পর্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান আছে, এই জন্যেই পুরাতনের মোহ সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারে নি। কিন্তু উপস্থিত যুগের আলেখ্য হালের কোনো কোনো সাহিত্যিকের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ একটা মধ্যবিত্তীয় সমাজ ভারতের সর্বত্র গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এই জন্যে তাহার আভাসও কোনো কোনো সহিত্যিকের লেখার মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। অন্যপক্ষে ভারতীয় সমাজশরীর মধ্যে একটি শ্রমিকশ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য তাহারও কিঞ্চিৎ সংবাদ আমরা বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যে পাইতেছি।

সাহিত্যের এই যৎকিঞ্চিৎ সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিয়া আমরা আমাদের প্রশ্নে আসি। আমাদের জ্ঞাতব্য এই যে, সাহিত্যে প্রগতি কাহাকে বলে, অর্থাৎ প্রগতিশীল সাহিত্য কথার মানে কি? আমরা উপরোক্ত সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা এই তথ্যে উপনীত হই যে, রাষ্ট্রে যে সামাজিক শ্রেণীর প্রভাব থাকে জাতীয় জীবনের সংস্কৃতির সর্ব বিষয়ে যেমন সেই শ্রেণীর ছাপ অঙ্কিত হয়, সাহিত্যেও তেমন তাহা পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ যে-শ্রেণী সমাজে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে সাহিত্যে সেই শ্রেণীরই দৃষ্টিভঙ্গীর (World view) পরিচয় পাওয়া যায়। যে-শ্রেণী রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনা করে সেই শ্রেণী নিজের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সমাজকে পরিচালিত করে। সেইজন্য তাহারই পরিচয় সেই শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মধ্যে দিয়া পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। সামন্ততান্ত্রিক যুগের সাহিত্যের মধ্যে যেমন আমরা রাজারাণীর ব্যাপার, ব্যারনদের বীরত্বের খবর ও তাহাদের প্রেমের সংবাদ পাই, বুর্জোয়া সমাজের সাহিত্যিকদের মধ্যে তদ্রূপ সেই শ্রেণীর মনস্তত্ত্ব ও জীবনের কার্যের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। যেমন ফ্রান্সের চারণ

রোলঁ। তৎকালীন রাজনৈতিক আদর্শের বিষয় বলিয়াছেন, প্রজার কর্তব্য হইতেছে তার ভূস্বামীর জন্যে লড়াই করা। আর এই কথার প্রতিধ্বনি আমরা গীতা থেকে আরম্ভ করিয়া রাজপুতানার চারণদের মুখ থেকে "স্বামীধর্ম" আদর্শের কথায় পাই। কিন্তু আবার ইয়োরোপীয় আধুনিক বুর্জোয়াসমাজে democracy-র আদর্শের কথা শুনি এবং ভারতে যে বুর্জোয়া সমাজ উদ্ভূত হইতেছে তাহার মুখে সেই democracy প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিতে পাইতেছি।

আজ ভারতীয় সমাজে, গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়ের আদর্শ বা হলদিঘাটের "ঝালা স্বামীধর্ম ভোলে না"—এই উক্তির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে আজ ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজ বলিতেছে, "ডেমোক্রেসি চাই, কনস্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলী চাই।" আবার পাশ্চাত্য দেশীয় proletariat শ্রেণী যেমন সাম্যের উপর সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে ভারতের প্রোলেটারীয়শ্রেণী তেমনি গণতন্ত্র চাই, সাম্য চাই বলিয়া ধ্বনি তুলিয়াছে। ইহার অর্থ প্রত্যেক শ্রেণী নিজের দৃষ্টিভঙ্গীতে জগতকে দেখে এবং জগতকে তদনুযায়ী গঠিত করিতে চায়। এই কারণ বশত এই সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণকারীগণ বলিল যেমন সমাজ ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতেছে তেমনি তাহার সাহিত্যও ধাপে ধাপে প্রগতিশীল হইতেছে। যেমন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে বুর্জোয়া সমাজ অধিকতর সভ্যতাসম্পন্ন তজ্জন্য অগ্রগমনশীল, তদ্রূপ সামন্ততান্ত্রিক সাহিত্য থেকে বুর্জোয়া সাহিত্য অধিকতর প্রগতিশীল। আবার ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া সমাজ থেকে গণতান্ত্রিক সাম্যবাদীয় সমাজকে অধিকতর অগ্রগমনশীল বলা হয়, তদ্রূপ শেষোক্ত সমাজের সাহিত্যকে অধিকতর প্রগতিশীল বলা হয়। প্রগতি একটি আপেক্ষিক জিনিস। যেমন বর্বর অপেক্ষা সামন্ততান্ত্রিক যুগ অধিকতর সভ্যতা-সম্পন্ন, তদ্রূপ তাহার সাহিত্যকেও অধিকতর প্রগতিশীল বলা যায়। আবার যে সাহিত্যের মধ্যে সভ্যতার পূর্বাবস্থা থেকে অধিকতর অগ্রগমনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, তুলনা দ্বারা তাহাকে আপেক্ষিক প্রগতিশীল মনোভাবের বলা হয়; এই জন্যই যে সাহিত্যে সভ্যতার ও প্রগতির নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাকেই আপেক্ষিকভাবে "প্রগতিশীল" বলা যায়। এই কারণ বশত যে সাহিত্যমধ্যে সমাজের অগ্রগমনশীলতার দ্যোতনা, অর্থাৎ অধিকতর উন্নত অবস্থার দিকে গমনের আকাঙ্ক্ষা বা স্পৃহার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাকেই প্রগতিশীল সাহিত্য বলিয়া ধার্য করা হয়। যে সাহিত্য সমাজের অচলায়তন ভাঙ্গিয়া উন্নত

অবস্থার দিকে পথনির্দেশ করিয়া দেয় সেই চেষ্টাকেই প্রগতি সাহিত্য বলা হয়।

এক্ষণে শেষকথা এই, সনাতনীরা যে বলেন রস ও রূপ নিয়াই সাহিত্য এই জন্যে তাঁহা একটি অখণ্ড বস্তু, কিন্তু উপরে আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি যে সমাজে যেমন যেমন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর আধিপত্যের ছাপ অঙ্কিত হইতে দেখা যায়, সংস্কৃতিতেও সেই ছাপ সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। তজ্জন্য রস ও রূপ বিভিন্ন যুগে আপেক্ষিকভাবে প্রকাশ পায়। ইহার অর্থ, প্রত্যেক যুগের সাহিত্যই রস ও রূপ নিয়া সংগঠিত হয় বটে, কিন্তু সেই রস ও রূপ বিভিন্ন শ্রেণীর ছাপ বহন করে। যাঁহারা **Art for Art's sake** বলেন তাঁহারা একটা অসঙ্গত ও অবৈজ্ঞানিক কথার উল্লেখ করেন। এমন কি প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সমাজ-তাত্ত্বিক সোরোকিন বিশদভাবে দেখাইয়াছেন যে ইহা একটি অর্থশূন্য উক্তিমাত্র। রস ও রূপ অর্থাৎ Art প্রত্যেক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত বিজড়িত। যেমন মধ্য-যুগীয় বা সমান্ততান্ত্রিক সাহিত্যের মধ্যে যে রস ও রূপ পাওয়া যায় তাহা বুর্জোয়া সাহিত্যের রস ও রূপ হইতে পৃথক। যেমন ফ্রান্সের সামন্ততন্ত্রীয় ক্রবাদুরদের সাহিত্যের রস ও রূপ থেকে আনাতোল ফ্রান্সের লিখিত সাহিত্যের রস ও রূপ সম্পূর্ণ পৃথক, যেমন বৈদিক যুগের সাহিত্যের, তৎপরে ক্লাসিকাল যুগের এবং বর্তমানের ভারতীয়দের মধ্যে রূপ ও রসের ধারণাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পুনঃ, শ্রেণীসমূহেরও রূপ এবং রসবোধ বিভিন্ন প্রকারের।*

* সাহিত্যে প্রগতি, পূরবী পাবলিশার্স, ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৪৫, পৃ ২৩৬-৪১। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

প্রোলেটারীয় সাহিত্যের স্বরূপ / ড ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

এইবার আমরা 'গণ' বা 'প্রোলাটারীয়' সাহিত্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই কথাটির প্রথম উৎপত্তি হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষকালে জার্মানীর সোশ্যালিস্টদের মধ্যে। ধনীশ্রেণীদের আদর্শ বিজড়িত কৃষ্টির বিকল্পে, অর্থাৎ তাহা হইতে পৃথকভাবে জার্মানীর প্রোলেটারিয়েটশ্রেণী নিজের কৃষ্টি বা সংস্কৃতি উদ্ভব করিবার চেষ্টা করে। স্বীয় শ্রেণীর আদর্শানুযায়ী কৃষ্টি ও তাহার বাহন সাহিত্য, রঙ্গমঞ্চ, খেলাধূলা প্রভৃতির বিবর্তনকে "প্রোলেটারীয় কৃষ্টি" বলিয়া তাঁহারা নামকরণ করেন। এতদ্বারা গণ-শ্রেণীসমূহের নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীয় আদর্শানুযায়ী (কৃষ্টির) সৃষ্টি করাকে 'গণ-সংস্কৃতি' (Proletarian culture) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

এই ভাবধারাই স্বামী বিবেকানন্দ-দ্বারা এদেশে 'শূদ্রের জাগরণ' এবং গণ-সমূহ দ্বারা উদ্ভূত সভ্যতার কথা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যখন তিনি বলিয়াছেন, "বেরুক নূতন সভ্যতা ভূনুরির উনান থেকে, চাষীর লাঙ্গল থেকে, জেলের চুবড়ী থেকে" ইত্যাদি, তখন তিনি অনাগত প্রোলেটারীয় কৃষ্টিরই কথা বলিয়াছেন।

আজ সোভিয়েট সংঘের রাষ্ট্রসমূহ ব্যতীত জগতের অন্যত্র এই কৃষ্টি অনাগত বটে, কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রসমূহে এই কৃষ্টি ও তাহার বাহন—সাহিত্য আজ বিশেষ ভাবে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। আজ সেই সব রাষ্ট্রে কোনো লেখক প্রাসাদস্থিত রাজকুমারীর বিরহ-বেদনার কথা বিনাইয়া বিনাইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করে না, আজ তথায় রাজকুমারের মৃগয়াকালে এক সুন্দরীর সহিত আকস্মিক সাক্ষাৎ ও প্রেমালাপ ইত্যাদির রূপকথা আর কেহ লেখেন না, কিংবা ধনী যুবক ও যুবতীর মহানগরী পারীর বুলেভারে আমোদোৎসবের বর্ণনা করিয়া নিরন্ন ও কুটিরবাসী গরীবের ছেলেদের মন ভুলাইয়া রাখে না। আজ তথায় গরীব "গণ" নিজেকে চিনিতে পারিয়াছে। আজ তথায় শোষিত ও পদদলিত শূদ্র তাহার স্বাধিকার পাইয়াছে, তাহাদের "আত্মদর্শন" হইয়াছে। এইজন্য তাহার সভ্যতাও তদনুযায়ী

অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহার দৃষ্টিকোণ দ্বারা দৃষ্ট ভাবধারা দ্বারা বিবর্তিত হইতেছে। এই কৃষ্টিকে এককথায় সে আজ "প্রোলেটকুল্ট" নামে অভিহিত করিতেছে।

প্রোলেটারীয় রাষ্ট্র না হইলে প্রোলেটারীয় কৃষ্টির উদ্ভব হয় না, ইহা ঠিক। ইহার কারণ, প্রোলেটারীয় রাষ্ট্র, সামন্ততান্ত্রিক বা জমিদারশাহী রাষ্ট্রও নয় অথবা বুর্জোয়াতন্ত্র বা ধনিকশাহী রাষ্ট্র নয়। এই রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক বা সোশ্যালিস্ট রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে শ্রেণীভেদ নেই, বর্ণভেদ নেই; আছে কেবল মানুষ এবং তাহার সমুচিত মূল্য প্রদান। কাজেই অতীতের দিকে চাহিয়া "হা হতোস্মি" করার লোক এই সভ্যতার অন্তর্গত রাষ্ট্রে নাই, এইজন্য অতীতের সুখের গল্পের (রোমান্স) স্থান এই সাহিত্যে নাই।

প্রোলেটারীয় সাহিত্যের ভিত্তি বাস্তব বস্তুতান্ত্রিক জগতের ঘটনাবলীর উপর স্থাপিত। এই কারণবশত ইহা প্রধানত বাস্তববাদী (Realist সাহিত্য। ইহার প্রথম কথা যে ইহা পুঁজিবাদী প্রকাশক ও সেই শ্রেণীর কবল বিমুক্ত। এই সাহিত্য অর্থোপার্জনোদ্দেশ্যে বাবুদের খোশ মেজাজ চরিতার্থ করিবার জন্য লিখিত হয় না। ইহা সমাজসেবা কর্মেই আত্মনিয়োজন করে। ইহার কর্তব্য হইতেছে সমাজের অবস্থা ব্যক্ত করা এবং অগ্রগমনশীলতার পথ নির্দেশ করা। "বহুতম লোকের প্রচুরতম উপকার" করাই এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। ফ্রয়েডের মত যে, যৌন সম্পর্ক (Edipus complex) উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া মানব সভ্যতা ও তাহার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানাদি গড়িয়া উঠিয়াছে (Totem and Taboo দ্রষ্টব্য)। এই মত প্রোলেটারীয় সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে। এই সব কারণের জন্য প্রোলেটারীয় সাহিত্যিকের দায়িত্বই অধিক।

পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত কৃষ্টি (cultural heritage) যেমন তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়, তদ্রূপ বর্তমানও তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়। অতীত কৃষ্টির অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কতটা বর্তমানের 'ধোপে টিঁকিবে' ইহা আবিষ্কার করা যেমন তাহার দরকার, তেমনি বর্তমানের পরিস্থিতি কতটা তাহার পক্ষে কার্যকরী ইহাও নির্ধারণ করা প্রয়োজন। অতীতের স্মৃতির মোহে অন্ধ হইয়া 'নিত্য', 'সনাতন', 'জাতীয়তা' প্রভৃতি ছেঁদো বুলি আবৃত্তি করিলেই একটা নেশন উন্নতিশীল হইতে পারে না। আজকাল, এই দেশের এই মনোবৃত্তির লোকদের মুখ থেকে "আমাদের কৃষ্টি" বলিয়া একটা গাল ভরা কথা প্রতিনিয়ত শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু জিজ্ঞাসা

করি, এই কৃষ্টি ক্যজনের ছিল ? আজও অতি উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণবংশীয় ভারতীয় পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, "হিন্দুব কৃষ্টি কেবল জনকতক পুরোহিতশ্রেণীয় লোক দ্বারাই উদ্ভূত হইয়াছে। তাহা হইলে সমাজের বেশীর ভাগ লোক কী সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কেবল ভারবাহী পশু হইয়াছিল ? ব্রাহ্মণ্যবাদীয় শাস্ত্রসমূহের প্রত্যেক পত্রে ধর্মাচার, ব্যবহার, সামাজিকপদ প্রভৃতিতে বর্ণগত পার্থক্যের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, আজও তাহা অনুস্যত হয়। এইজন্য "আমাদের কৃষ্টি" বলিয়া কোনো কথা থাকিতে পারে না। এই বিষয়েই ইঙ্গিত করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন,"**You talk of Your philosophy, that is class philo sophy**"(তুমি তোমার দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে অহঙ্কার কর, তাহা একটা শ্রেণীগত দর্শন)!

পুনঃ জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণের যে কৃষ্টি, শূদ্রের কি সেই কৃষ্টি? প্রত্যেক বিষয়ে কি তাহাদের পার্থক্য নাই ?' অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীত হবে যে "আমাদের" বলিয়া গোঁড়ামী করা সঙ্কীর্ণতা ও অজ্ঞতারই পরিচায়ক। ভারতের ইতিহাসের প্রত্যেক পত্রেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, 'সভ্যতা' শাসক-শ্রেণীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া গঠিত হইয়াছে। পুনঃ, আর্থনীতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক বিবর্তন এবং তজ্জন্য রাষ্ট্রিক পরিবর্তন হয়। ভারতের ইতিহাসে এই সব বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান হয় নাই বলিয়াই তাহা 'এই দেশে হয় নাই' বলা অজ্ঞতারই পরিচয় প্রদান করা হয়। এই বিষয়ে কার্ল মার্কস যাহা বলিয়াছেন তাহা ধ্রুব সত্য : "জড়জগতে বেঁচে থাকিবার জন্য 'উৎপাদন পদ্ধতি', সামাজিক, রাজনীতিক এবং চিন্তাজগতের জীবনের সমগ্র গতিই নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের জ্ঞান তাহাকে বাঁচাইয়া রাখে না, বরং তাহার সামাজিক অস্তিত্ব তাহার জ্ঞান নিরূপণ করে। এই ক্রমোন্নতির একটা অবস্থায় সমাজের উৎপাদনের বস্তুতান্ত্রিক শক্তিসমূহ, উৎপাদনের তৎকালীন অবস্থিত সম্বন্ধ সমূহের—অর্থাৎ আইনের ভাষায় সেই সময়কার বৈষয়িক সম্বন্ধের সহিত সংঘর্ষ হয়। এই অবস্থা থেকেই সামাজিক বিপ্লব আরম্ভ হয়। সমাজের আর্থনীতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে উপরের সৌধ কমবেশী শীঘ্রই রূপান্তরিত হয়।" যখনই এই আর্থনীতিক পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে, তখনই সমাজ পরিবর্তিত হইয়াছে। আজকের ভারতের সামাজিকাবস্থা ইংরেজ-শাসন প্রবর্তনের পূর্বের অবস্থায় অবস্থিত নাই। অনুসন্ধান করিলেই তাহা প্রতীত হইবে। পূর্বেকার দাস-প্রথার ভিত্তিতে স্থাপিত সমাজ আর নাই, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তযুক্ত জমিদারী প্রথাও অল্পদিনের। আজ

ভারতে, সর্ব ধর্ম-সম্প্রদায়ই মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিকশ্রেণী উদ্ভূত করিতেছে। আজ ব্রাহ্মণ শ্রমিক হইতেছে এবং অসংশূদ্রও তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' রাষ্ট্রে অতিউচ্চ পদ পাইতেছে। আজ পুরাতন অভিজাত বংশীয় লোক শ্রমজীবী হইতেছে (ইহা চাক্ষুষ উপলব্ধি করা ব্যাপার) এবং কৃষকের সন্তান "মাননীয় মন্ত্রী" হইতেছে। উৎপাদন-প্রণালী এই দেশে যত দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে, সমাজবিপ্লবও তত শীঘ্র সংসাধিত হইতেছে। উট পক্ষীয় নীতি অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করিলে মনে শান্তি আসে বটে কিন্তু তাহা বাস্তবকে অস্বীকার করা হয়।

এই সব কারণেই মার্কস বলিয়াছেন, একজন বুদ্ধিজীবীর উপর বস্তুতান্ত্রিক জীবন-পদ্ধতি তাহার প্রভাব বিস্তার করে। মানবের মনে এই পরিবর্তন জন্য অহর্নিশি দ্বন্দ্ব বিরাজ করে, অতীতের পিছটান ও বর্তমানাবস্থা তাহার মধ্যে সংগ্রাম করিয়া তাহাকে ক্রমশ পরিবর্তন করে। এই মানসিক দ্বন্দ্ব আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের মনে আজ চলিতেছে, বর্তমানের চিন্তাধারা এবং সাহিত্যে নানাপ্রকারের স্বর ও ভাবই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভারতীয় সর্ব ভাষার প্রগতিশীল সাহিত্যে এই দ্বন্দ্বের স্বর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। উপস্থিত সময়ের রাজনীতিক-আর্থনীতিক দ্বন্দ্বভাব (Dialectic) চিন্তাক্ষেত্রের এই বেসুরো ভাবের জন্য দায়ী।

এই গোলমেলে সুরের মধ্য থেকে এইটুকু বেশ বোধগম্য হয় যে, ভারতে বুর্জোয়াসমাজ আজও স্বীয় শ্রেণীগত লীলা প্রকট করিতেছে না, অর্থাৎ এই দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী অতীতের সামন্ততন্ত্রীয় সভ্যতা ও সমাজের বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। অতীত, ভারতের বুকে জগদ্দল পাথরের ন্যায় চাপিয়া আছে। এইজন্য বুর্জোয়া ক্রমবিকাশ দ্বারা নির্ধারিত আবর্তন আজ অনাগত আছে। অন্যপক্ষে দৃষ্ট হয় যে, শ্রমশিল্প দ্বারা একটা সর্বহারা প্রোলেটারিয়েট শ্রেণী সর্বত্র উত্থিত হইতেছে। পাশ্চাত্যদেশ সমূহের ন্যায় নির্ধন বা ভূমিশূন্য কৃষক-সন্তান দ্বারাই এই শ্রেণী গঠিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। তাহারাও রাজনীতিতে আসিয়া নিজের দাবী পেশ করিতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, হয় রুশ না হয় চীন সর্বপ্রথম প্রোলেটারীয় রাষ্ট্র সংগঠন করিবে, কারণ তথায় একটি নিপীড়িত ও শোষিত বিশাল কৃষকশ্রেণী আছে। তাঁহার ভবিষ্যত বাণী রুশদেশে সফল হইয়াছে, চীনের কিয়দংশে হইয়াছে কিন্তু ভারতেও সেই সমস্যা আছে। পুনঃ, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দাবী করেন

যে, ইহা কৃষক ও শ্রমিকের রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। এইজন্য যাহা আজ অনাগত এবং চক্ষুর অগোচর, ভবিষ্যতে তাহার রূপ পরিগ্রহণ করা আশ্চর্যের কথা নয়।

ভারতে বুর্জোয়াশ্রেণী তাহার শ্রেণীগত চেতনা প্রাপ্ত হইয়া রাষ্ট্রে ও সমাজে স্বীয় ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা প্রকট করিতে পারিতেছে না বলিয়া এবং একটা বুর্জোয়া শ্রেণীগত বৈপ্লবিক সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া, সর্বহারাশ্রেণী নীরব হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের ঐতিহাসিক কর্ম রাষ্ট্রে ও সমাজে তাহারা প্রকট করিয়া যাইবে। প্রোলেটারীয় কৃষ্টির কথা জার্মানীতে বিগত শতাব্দীতেই উত্থিত হইয়াছিল এবং রুশে চেকফের সমসাময়িক কালেই গর্কি ও ব্লকের উদয় হয়। প্রোলেটারীয়শ্রেণী উত্থিত হইলে, এবং সংঘবদ্ধভাবে নিজের অস্তিত্ব প্রকট করিলে, তাহার মনস্তত্ত্বানুযায়ী সাহিত্যও প্রকাশ হইবে। প্রোলে-টারিয়েটের অভাব ও অভিযোগ, তাহার অধিকার ও দাবী, তাহার মনস্তত্ত্ব ও যে দৃষ্টিকোণ দ্বারা সে সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিরীক্ষণ করে তাহা অবশ্য প্রথম যুগে বিবর্তিত হইবে। যখন রাজনীতির আসরে প্রোলেটারিয়েটশ্রেণী আবির্ভূত হইবে তখন তাহার আশা ও অবস্থার প্রতিপাদ্য সাহিত্যও নিশ্চয়ই সৃষ্ট হইবে। ইহাই গণ-সাহিত্যের প্রথম যুগ।

এই সাহিত্য কে লিখিবে তাহার কোনো নির্দেশ ইতিহাস দেয় নাই। তবে ইহা ঠিক যে, যিনি প্রেলেটারিয়েটের প্রাণের কথা, তাহার আকাঙ্ক্ষা ও আশার কথা সম্যকভাবে ব্যক্ত করিতে পারিবেন তিনিই এই সাহিত্যের একজন স্রষ্টা হইবেন। প্রোলেটারিয়েট সাহিত্যের প্রথম যুগের লেখকদের স্বীয় শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণভাবে কক্ষচ্যুত হইতে হইবে, তাঁহাদের প্রোলেটারিয়েট মনোভাবাপন্ন হওয়া চাই। এইখানেই হয় আশঙ্কা, ইতিহাসে তাহার নজীরও আছে। রুশে বিপ্লবের কবি ব্লক, অক্টোবরের প্রোলেটারিয়েট বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া বোলশেভিস্টরা অনুযোগ করিয়াছেন (Trotsky—Revolution and Literature দ্রষ্টব্য)। তিনি The 12 (১৯১৮) নামক কবিতায় রূপক-ভাবে বিপ্লবের গতি বর্ণনা করেন। তিনি বিপ্লবকে, নগরের অতি গরীব লোকদের বিশৃঙ্খলভাবে উত্থান বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "শ্বেত গোলাপের জ্যোতি-র্মণ্ডল" দ্বারা পরিবেষ্টিত "রক্তাক্ত পতাকা" হস্তে খ্রীষ্টের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার দৃশ্য তাহাদের চোখে প্রতিভাত হইয়াছিল। পুনঃ, এ. বেলী নামক একটি দার্শনিক কবিতা দ্বারা এই বিপ্লবকে সম্বর্ধনা করেন। তিনি বর্ণনা করেন যে,

মানবের আত্মা যাহা পুরাতন সমাজ ক্রমে নিহত করিয়াছিল, তাহারই পুনরুত্থান এই বিপ্লব দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে (U S. S. R Handbook, P-45,)। এতদ্বারা উদারনীতিক বুর্জোয়া মনস্তত্বই প্রকাশ পাইয়াছে।

সনাতনী সাহিত্যিকেরা ইতিহাসে এক একটা সামাজিক শ্রেণীর নির্দিষ্ট লীলা (Role) বুঝিতে পারে না, এবং পারিপার্শ্বিক অসামঞ্জস্যকে ঢাকিবার জন্য নানা-প্রকারের ধর্মের ব্যাখ্যা, অতীন্দ্রিয়বাদ, কর্মফল, অদৃষ্ট প্রভৃতি দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। ইহার অর্থ, লেখকের শ্রেণীচেতনানুসারে জ্ঞাতভাবে বা অজ্ঞাতভাবে তিনি পারিপার্শ্বিক অনুষ্ঠান সমূহের অর্থ না বুঝিতে পারিয়া ধর্মের আবরণে তাহা ঢাকা দিবার চেষ্টা করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মানীর শতচ্ছিন্ন অবস্থার কারণ অনুসন্ধান না করিয়া শ্রমজীবী (মুচি) শ্রেণীর বোয়েম নামে এক ব্যক্তি অতীন্দ্রিয়বাদের উপদেশ প্রদান করিতে থাকেন। তিনি বলিলেন, "লোক, আকাশ, তারা, প্রকৃতি, স্বর্গ, নরক, দেবদূত সকলের উপর ধ্যান নিয়োজিত করিবে।" এতদ্বারা তদানীন্তন শাসকশ্রেণী তাঁহার উপর বড় খুশি হয় এবং তিনিও একজন মহাপুরুষ mystic) বলিয়া ইতিহাসে গণ্য হইলেন। এই প্রকারে ভারতেও বৈষ্ণব পদাবলীসমূহ সৃষ্ট হইয়া লোককে ঘুম পাড়াইতে লাগিল। এই প্রকারের কারণবশত ১৯১৮ খ্রীঃ জার্মান বিপ্লবের পর, একদল লোক ধর্ম নিয়া হৈচৈ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন ধর্মজ্ঞানের অভাবেই তাঁহাদের পতন হইয়াছে! তাঁহারা এই বিপ্লবের পশ্চাতের ঐতিহাসিক কার্যকারণসম্বন্ধ আবিষ্কার করিলেন না। আর ইহাঁদের মুরুব্বী রাজনীতিকেরা "Stab behind the back" (পাশ্চাৎদিক হইতে ছুরিকাঘাত) মত প্রচার দ্বারা পরাজয়ের গ্লানি ও বিপ্লবের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে, একটা অনুষ্ঠানের (Phenomenon) ভীমমূর্তি দেখিয়া তাহার প্রকৃত কারণ নিরূপণ করিবার অনিচ্ছা বা অস্বীকৃতি, বা 'যেমন আছি তাহা বেশ আছি' বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা দ্বারা চিন্তাশক্তিরই দৈন্য প্রকাশ পায়। এই প্রকারেই প্রাচীন কালের জৈন, বৌদ্ধ ও মধ্যযুগের বৈষ্ণব ও সন্ত আন্দোলনগুলির ব্যাখ্যা আমাদের দেশের অতীতের পণ্ডিতেরা করেন নাই। ইহা তাঁহারা বরাবর বেদ-বিদ্বেষী স্বার্থপরদের কুচক্র (খ্রীষ্টীয় সাহিত্যের Anti-Christ রূপ অনুষ্ঠানের ন্যায় বর্ণাশ্রম বিরোধী অনুষ্ঠানগুলিকে ভারতীয় সনাতনীরা এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন); আর মধ্যযুগে তুলসীদাস বলিলেন, 'কেহ বর্ণাশ্রম মানে না। শূদ্র বলে আমি

ব্রাহ্মণ থেকে কিসে ছোট।' এইজন্যই তিনি তাড়াতাড়ি 'রামচরিত মানস' রচনা করিয়া রাম-রাজত্বের পরিকল্পনা করিলেন। আর, বিংশ শতাব্দীতে এই 'ফ্যাসিবাদ' একদলের আদর্শ হইয়াছে। এই সব ব্যাপারের উপরের আবরণ একটু আঁচড়াইলেই ধনীশ্রেণীর বনিয়াদী স্বার্থ বাহির হইয়া পড়ে!

ভারতের গণ-শ্রেণীকে চিরকালই অন্ধকারে রাখা হইয়াছে। সে বেদ পাঠ করিলে তাহার কানে তপ্ত তৈল বা সীসা ঢালিয়া দিবার, ব্রাহ্মণের আসনে বসিলে তাহার পশ্চাৎভাগের চামড়া ছাড়াইয়া লইবার, ব্রাহ্মণী হরণ করিলে তাহাকে মাদুরে জড়াইয়া পুড়াইবার ব্যবস্থা এই দেশের ধর্ম ও অর্থশাস্ত্রসমূহে আছে। কিন্তু উপরের স্তরের লোক নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি এইরূপ দোষ করিলে তাহার অতিলঘু দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই "বৈরদেয়" হিন্দুর আইনে বরাবরই আছে। অথচ বলা হয়, শূদ্র নিম্নস্তরের জীব এবং জ্ঞানার্জনের অনুপযুক্ত। বিগত জন্মের কর্ম সে ইহজগতে ভোগ করিতেছে আর এই জন্যে দেবদ্বিজে ভক্তি করিলে পরজন্মে সুখভোগ করিবে। এই প্রকারে শ্রমজীবী শ্রেণীসমূহকে চিরকালই বঞ্চিত ও দাবাইয়া রাখা হইয়াছে। অবশ্য ইহার ভীষণ প্রতিক্রিয়াও ইতিহাসে সংঘটিত হইয়াছে; ভারত পরাধীন হইয়াছে।

আজও যখন গণ-শ্রেণীসমূহ মস্তকোত্তোলন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন নানা দার্শনিক তত্ত্ব, নানা প্রকারের রাজনীতিক চালবাজী, রামরাজত্ব, রাজনীতিক জাতীয়তাবাদীয় সাহিত্য প্রভৃতি সৃষ্ট হইতেছে। রুশে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পূর্বে ভূতপূর্ব বৈপ্লবিক পল স্ট্রুভেও এই প্রকারে গণ-শ্রেণীকে পুঁজিবাদীদের সহিত মিলিতে উপদেশ প্রদান করেন। এই কারণবশতই আজ 'জাতীয়তাবাদী সাহিত্যে'র নাম শ্রবণ করা যাইতেছে, যেন শ্রমজীবীশ্রেণীসমূহ জাতির এবং জাতীয়তাবাদের বাহিরে! তাহা হইলে "জাতীয়তাবাদ" অর্থে কি কেবল জমিদার, পুঁজিবাদী, কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ী দোকানদারদের স্বার্থ? অবশ্য ভাড়াটিয়া রূপে ক্ষুদ্র বুর্জোয়া এই সঙ্গে আছেন। কিন্তু এই শ্রেণীর মনস্তত্ত্বানুযায়ী লোকেরা সর্বদলেই ছোটাছুটি করে, সর্বস্থানেই তাহাদের প্রাপ্ত হওয়া যায়। আসল কথা এই, ভারতের গণশ্রেণীর শক্তির প্রকাশ যেখানে যে সময়ই হইয়াছে তাহার রূপ দেখিয়া আমাদের পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদ ভয় পাইয়াছে, তাই এই শক্তিকে চাপ দিবার নানা প্রকারে তুকতাক, ঝাড়ন-ফোড়নের চেষ্টা চলিতেছে, ভূতকে হাঁড়িচাপা দিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু

ইহারা ইতিহাসের গতির সহিত পরিচিত নহে, ভারতের ইতিহাসে যুগানুযায়ী প্রত্যেক শ্রেণীর লীলার অনিবার্যতার মর্ম ইহারা হৃদয়ঙ্গম করেন না। তৎপরিবর্তে নানা অবাস্তব ব্যাপার দ্বারা সাহিত্য ভরপুর করিয়া রাখেন। এই কারণবশত ফ্রয়েডের প্রতি ইঁহাদের এত প্রীতি। এই সব সাহিত্যকে আমরা Decadent period-এর (হ্রাস বা ক্ষয়ের যুগ) সাহিত্য বলিয়া নামকরণ করি।

চিন্তাশীল ব্যক্তিদের এই সত্য স্বীকার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে যে, গণ-শ্রেণীদের পরিশ্রমই কৃষ্টির মূল উপাদানসমূহ সৃষ্ট করে এবং তদ্বারা নানা ভাব-তরঙ্গের উদয় হয়। এই সত্য সোভিয়েট রুশে সম্যকরূপে বোধগম্য হইয়াছে বলিয়াই আজ অর্ধশিক্ষিত শ্রমিক ও অশিক্ষিত এবং সভ্যতার পশ্চাদভাগে অবস্থিত কৃষক স্বীয় সমাজের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে, এবং একটি বিশাল অজেয় রাষ্ট্র গঠন করিতেছে। এই রাষ্ট্রের লোকদের মধ্যে আর শ্রেণী ও বর্ণ-বিভেদ নাই। সকলেই শ্রমজীবী বা শ্রমিক, অর্থাৎ সকলকে শ্রম করিয়া খাইতে হয়।

এ হেন প্রোলেটারীয় রাষ্ট্রে যে সাহিত্য সৃষ্ট হইতেছে তাহাতে নূতন সুরই উত্থিত হইতেছে। ইহার ভিত্তি হইতেছে বাস্তবিকতা (Realism)। ইহাতে নিরাশা, অতীন্দ্রিয়বাদ, হাহুতাশ নাই, আছে শ্রমের কথা, আছে সংগঠনের কথা, আছে আশার কথা, আছে জীবনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আস্বাদনের কথা, আছে আনন্দের কথা। সৎ-চিৎ-আনন্দ এই সমাজই ভোগ করিতে পায়। এই প্রোলেটারিয়েট সাহিত্যের নায়ক হইবেন একজন "শ্রমিক" যিনি শ্রমশিল্পের সমস্ত তথ্য করায়ত্ত করিয়া নিজের সঙ্ঘবদ্ধাবস্থায় আছেন এবং অপরকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া শ্রমকে শিল্পের স্তরে উন্নীত করেন। শ্রমকে এই সাহিত্য 'সৃষ্টি' বলিয়া বুঝিবেন (Gorky—Problems of Soviet Literature)। যখন শ্রমজীবী বুঝিতে পারিবেন যে তিনি নিজের জন্যই পরিশ্রম করিতেছেন, অপরকে স্বীয় শ্রম বিক্রয় করিতেছেন না, তাঁহার শ্রমের বিনিময়ে সমাজ তাঁহার অব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহ প্রদান করিতেছে; যখন শ্রমজীবী বুঝিতে পারিবেন যে তিনি সমাজের একটি শোষণ বিহীন অঙ্গ; যখন তিনি তাঁহার সম্যকভাবে আত্মজ্ঞান লাভ করিবেন, তখন তাহার রচিত সাহিত্যও অন্য রূপ ও রস প্রকাশ করিবে। তখন চণ্ডীদাসের বাণী:

"শুনহে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই—"

সকল হইয়া সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যপ্রকার হইবে। এইটি হইবে প্রোলেটারীয় সাহিত্যের দ্বিতীয়াবস্থা। তখন প্রোলেটারিয়েট সাহিত্য আশার বাণী উচ্চারণ করিতেছে, জগতকে নূতনভাবে গড়িবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, সমাজে সকল লোকের সাধ্যমত পূর্ণ বিকাশের সুযোগ প্রাপ্তির গান গাহিতেছে। তখন সমাজে Decadent (ক্ষয়শীল) যুগ অন্তর্হিত হইয়াছে, সাহিত্যে অতীন্দ্রিয় ধোঁয়াটে কথাতেই লোককে ভুলাইবার জন্য তখন "বিরিঞ্চি বাবা"র ভৌতিক ক্রিয়া অতীতের গল্প হইয়া গিয়াছে, আছে জগতের Stern Reality (কঠোর বাস্তব ঘটনা)। তখন এই শ্রেণীশূন্য সমাজের সাহিত্য, প্রকৃতিকে স্বীয় কার্যে নিয়োজিত করিবার জন্য উপায় নির্দেশ করিতেছে। তখন এই প্রোলেটারিয়েট সাহিত্য নূতন সাম্যবাদী সমাজ ও তাহার সংস্কৃতির সৃষ্টির কথা বলিবে। প্রোলেটারিয়েট সাহিত্য সুস্থ ও সবল জাতির চিহ্ন বহন করিবে। এইজন্যই লেনিন কম্যুনিস্ট তরুণদের ফ্রয়েডের বই পড়িয়া ভাব সংগ্রহ করিবার বিশেষ বিপক্ষে ছিলেন। (Klara Zetkin-এর Reminiscences of Lenin দ্রষ্টব্য)।

এই প্রোলেটারীয় সাহিত্যের প্রথমাবস্থার বাস্তবরূপ কি, তাহা প্রদর্শনজন্য এশিয়ার সোভিয়েট রাষ্ট্রসমূহে নবোত্থিত সাহিত্য হইতে কিঞ্চিৎ উদাহরণ এই স্থলে প্রদত্ত হইল (এই কবিতাগুলি Joshua Kunitz দ্বারা লিখিত, "Dawn Over Samarkand." নামক পুস্তকে ইংরাজিতে ভাষান্তরিত করা হইয়াছে): "আমরা তাজিকেরা যাহা দেখি সে বিষয়ে গান করি···যাহারা প্রায় তিন যুগ আগে গত হইয়াছে, ফুল ও সুন্দর নারীর কথা বলিত। কিন্তু তাহারা আর নারী ও ফুলের বিষয়ে গান করে না। তাহারা আমাদের নূতন মুক্তির কথায় গান করে, তাহারা উড়ো জাহাজের বিষয় গান করে, তাহারা ভবিষ্যতের সুন্দর দিনের বিষয়ে গান করে।"

তাজিক কবি সুখাএলি বলিতেছেনঃ "একটি বরের ন্যায় উজ্জ্বল সজ্জাকৃত একটি নূতন শহর দেখিবে, তুমি বরের সুখী গান শুনিবে, শুন! একটা যন্ত্র (Propeller) গুন গুন করিতেছে, রাস্তায় তাড়াতাড়ি একটা অটোমোবিল যাইতেছে, ধোঁয়া ও ধূলায় মেঘাচ্ছন্ন করিয়া একটি লৌহ রেল গাড়ী যাইতেছে।"

পুনঃ, ইনি গাহিতেছেন: "সূর্য অস্ত যাবার আগে, একটি কৃষকের কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ কর, সে যে গান গাহিতেছে তাহা শুন, তাহর তাম্বুরিনের নৃত্যের ছায়া লক্ষ্য কর। দেখ, আকাশে মুক্তির সূর্য উদয় হইয়াছে। ঝরণার জল মুক্ত হয়ে

আমাদের উপত্যকাসমূহ দিয়া গর্জন করে, প্রবাহিত হইতেছে। এবং আমাদের সোভিয়েট লোকেরা সর্বত্র গান করিতেছে।"

মানসার নসো নামক একজন কবি বলিতেছেনঃ "পূর্বে তিনি ডাণ্ডাদ্বারা প্রহৃত হতেন···অন্ধকার গর্তে তাহাকে ফেলে রাখা হত···চল্লিশ দিন বিনা আহারে তাহাকে রাখা হয়েছিল···কিন্তু অতীতকে স্মরণ করে লাভ কি?

আমার হৃদয় নূতন যুগের কথা গাহে। তাজিকভূমি! অবশেষে তোমার দিন এসেছে! নিষ্ঠুর যুগ অবসান হয়েছে, তোমার সময় অবশেষে এসেছে। মেসিন, যাহা আমাদের মাঠে জমি চষে, তোমার সময় অবশেষে এসেছে! ও সোভিয়েট, তোমার দিন এসেছে অবশেষে!"

আবার, তাজিক কবি লাখুটি তাঁহার কবিতাতে কল্পনাপ্রসূত পুরাতন অলঙ্কার না ব্যবহার করিয়া আজকালকার সোভিয়েট সভ্যতাগত ভাষার শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহার কবিতাতে তিনি 'কারখানার সাইরেন বংশী,' 'কারখানার ধূম,' 'স্টালিনগ্রাড ট্রাক্টর,' 'এখনও গরম ইস্পাত,' 'ভারী হাতুড়ি,' 'প্রত্যেক কলহজে (সমবায় কৃষিক্ষেত্র) শস্যের শীর্ষ,' ইত্যাদি তাঁহার কবিতায় অলঙ্কার রূপে প্রয়োগ করিতেছেন। "প্রাভদা" পত্রিকায় রিপোর্ট করিয়া একটি কবিতার শেষে তিনি বলিতেছেন—"Our unions call for brigades. Shock work in our shops and our schools" (আমাদের সংঘগুলি পল্টন চায়। আমাদের দোকানে এবং স্কুলে ধাক্কা দেওয়াব কার্যের জন্য।)

পুনঃ, কলহজের একটি তাজিক কৃষক গাহিতেছেন—"যখন আমি দেখি আমাদের শুষ্ক মাঠে ফুল ফুটে, যখন জমিতে তুলার জল বহে যায়, যখন একটি বাঁধা বান্দ দেখি, তখন আমার নিশ্বাস মুক্ত ও গরম হয়।···যখন আমি দেখি আমার পুত্র মাঠে মেসিন চালাইতেছে, যখন আমি দেখি শস্য জমিতে শিকড় গাড়িতেছে, তখন আমি উচ্চৈস্বরে বলি, যাহারা পরিশ্রম করে তাহারা জয়যুক্ত হউক!"

অবশ্য ভারতের গণশ্রেণীর পারিপার্শ্বিকাবস্থা এখনও এই প্রকার গড়িয়া উঠে নাই, সেইজন্য তাহার গানের উচ্ছ্বাস আমরা আশা করিতে পারি না। কিন্তু তাহার নিজের মর্মবেদনার উচ্ছ্বাসের পরিচয় আমরা কোথায় পাইতেছি? জন ও গণের সম্বন্ধে যাহা আজ সাহিত্যাকারে প্রকাশিত হইতেছে তাহা উপরের স্তরের শিক্ষিত লোকদের দ্বারা লিখিত হইতেছে। এতদ্বারা আমরা সমাজের

Liberal bourgeois (উদারহৃদয় বুর্জোয়া) শ্রেণীর লোকদের মনোভাবই পরিলক্ষিত করি। ইহা গণের নিজস্ব সাহিত্য নয়; বরং বর্তমান ভারতীয় সাহিত্যের ধারা দেখিয়া ইহাই প্রতীত হয় যে ভারতে Decadent Feudal (ভগ্নমান সামন্ততান্ত্রিক) যুগের পরই গণ-শ্রেণীয় যুগ আসিবার চেষ্টা হইতেছে।

এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে প্রোলেটারিয়েট সাহিত্যে কেবল বাস্তব ঘটনার চিত্র থাকিবে না। Art for Art's sake বলিয়া একটি কথার মূল্য নাই, "আর্ট কিছুর জন্য" (Art for something's sake) ইহাই হইতেছে বৈজ্ঞানিক সত্য। এইজন্য প্রোলেটারিয়েট সাহিত্য যখন নূতন জীবনের কথা বলিবে, তখন নূতন শিল্পের রস ও রূপে থাকিবে, রোমান্স ইত্যাদিও থাকিবে, কিন্তু সকল দ্রব্যেরই নূতন মূল্য প্রদত্ত হইবে।

এই দেশের decadent সাহিত্যকে পরিহার করা আশু প্রয়োজন। গোলামী ও পরাজিত মনোবৃত্তিপ্রসূত এই সাহিত্য মনস্তত্ত্বকে অস্বীকার করিয়াই চলিতেছে। মানব মনস্তত্ত্ব, সামাজিক মনস্তত্ত্ব, যৌন-মনস্তত্ত্ব কিছুরই বালাই নেই এই সাহিত্যে। ইহাতে স্ত্রীলোককে তাহার সম্মান প্রদান করা হয় না। "মহাসুখবাদ"ই এই ভোগেচ্ছু সাহিত্যের লক্ষ্য। শিক্ষিতা মহিলা কিরণ্ময়ী থেকে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দুঃস্থা নারী পর্যন্ত সকলেই যেন ইন্দ্রিয়ের দাস। স্ত্রীলোক যেন কেবলমাত্র পুরুষের ভোগার্থ সৃষ্ট! তাহার স্বভাব ও শিক্ষাজাত Inhibition (সঙ্কোচনশক্তি বা সরম) এবং মনস্তত্ত্ব এই সাহিত্যে অস্বীকৃত হয়। এই সাহিত্যে পুরুষ ও স্ত্রী-লোকের দৌর্বল্যই কেবল অঙ্কিত হয়। নায়ক-নায়িকার প্রেমই এই সাহিত্যের প্রতিপাদ্য। ইহাতে সামাজিক মনস্তত্ত্বের কোনো সংবাদ নাই। এই স্থলেই এই ক্ষয়শীল যুগের সাহিত্যের সহিত সেভিয়েট সাহিত্যের প্রভেদ! তথায় প্রত্যেক সাহিত্যিক স্বীয় সময়ের সামাজিক চিত্র স্বীয় নভেল মধ্যে প্রকাশ করিতেছেন। তথাকার সাহিত্যে কালোপযোগী সামাজিক তথ্যেরই পরিবেশন হয়। আর এই দেশে, যথায় "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু", "ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী" প্রভৃতির আর্তনাদ উঠিয়াছে, যথায় লোকে বহু দিন ধরিয়া পরাধীনতায় আত্মবিস্মৃত হইয়া আছে তথায় অযৌক্তিক ও মনস্তত্ত্ব বিরুদ্ধ যৌন-সম্পর্কীয় গল্প তরুণ ও বিকারগ্রস্ত মনে প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে কিন্তু তাহা সুস্থ ও সবল সাহিত্য নয়। এই Decadent সাহিত্য নিরাশা ও পরাজিত মনোবৃত্তিই প্রকাশ পায়। যে সাহিত্যে জাতির মন-ক্ষুণ্নতা এবং হতাশাকে ঢাকিবার জন্য যৌন সম্বন্ধের অস্বাভাবিক গল্প,

বুর্জোয়া রোমান্সের চাঞ্চল্যকর প্রেমকাহিনী জাতীয়তাবাদের ছদ্মবেশে শ্রেণীস্বার্থের কথা ভরপুর হইয়া আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া দেশের শোষিত ও পদদলিত লোকদের আশার কথা, নূতন সমাজ-সংগঠনের কথা, ভবিষ্যতের সোনার ভারত এবং সোনার বাঙলা গঠনের উপায়ের পথনির্দেশক সাহিত্যের সৃষ্টির প্রয়োজন। এই দেশের গণসমূহ যুগ-যুগান্ত ধরিয়া অন্ধতার তিমিরে পড়িয়া আছে এবং পদদলিত হইয়াছে বলিয়া তাহার শ্রেণীচৈতন্য এখনো জাগ্রত হইতেছে না। তাহাকে জাগ্রত রাখিবার জন্যই তাহার মনস্তত্ত্বানুযায়ী সাহিত্য চাই। এই দেশের গণ-সাহিত্যের প্রথম স্তরের ইহাই কার্য। উপরের স্তরেব উদারনৈতিক লেখকদের দ্বারা লিখিত "গণ" সম্বন্ধীয় পুস্তকের গরীবের উপর দয়ার ভাবে পিঠ-চাপড়ানী আজকাল ফ্যাশান হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা "গণ-সাহিত্য" নহে। এবম্প্রকারের সাহিত্যে, পুঁজিবাদী মালিকের দুঃখী শ্রমিকের প্রতি এবং কৃষকের প্রতি জমিদার পুত্রের 'দরদ' দেখাইয়া গণের আত্মচেতনা বিনষ্ট করিবারই চেষ্টা আছে। এই প্রকারের সাহিত্যে গণকে তাহাব যথার্থ মূল্য দেওয়া হয় না। যে সাহিত্য গণকে তাহার যথার্থ মূল্য প্রদান করিবে, সেই অনাগত সাহিত্যের অপেক্ষায় আমরা বসিয়া আছি। কিন্তু, ইতিহাসের দ্বন্দ্বজনিত গতি সেই অনাগতকে একদিন লোকচক্ষে সমূর্ত করিবে। সেই জন্যই বৈদিক ঋষির কথা প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলি—আগে চল, আগে চল।*

* সাহিত্যে প্রগতি, পূরবী পাবলিশার্স, ৩৭/৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৪৫, পৃঃ ২৪২-৫৫। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

'প্রগতি'-র ভূমিকা / নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রগতি লেখক-সঙ্ঘের এই প্রথম বইখানি প্রকাশিত হইল। এই সঙ্ঘের সম্বন্ধে অনেকের একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে। সেটা সাধারণত সঙ্ঘের অনুকূল নয় এবং সম্পূর্ণ সত্যও নয়। হয়তো এই সংগ্রহগ্রন্থ হইতে সে ধারণা কতকটা সংশোধিত হইবে। সঙ্ঘ কি চায়, ইহার মূলসূত্র কি, তার পরিপূর্ণ ধারণা ইহাতে পাওয়া যাইবে না, কিন্তু একটা আভাস পাওয়া যাইবে।

প্রগতি-লেখক-সঙ্ঘ সাহিত্য ও সমাজে প্রগতিকামী—সে অভীপ্সিত প্রগতি সাধনের পক্ষে সঙ্ঘের উপায় সাহিত্য। যে সাহিত্যের পুষ্টি ও সমৃদ্ধি সঙ্ঘ কামনা করেন তাহা সমাজের প্রগতির অনুকূল হইবে—কিন্তু তাহা সাহিত্য হওয়া চাই—সাহিত্যরসভূয়িষ্ঠ হওয়া চাই।

সার্থক সাহিত্য প্রগতিশীল হইতে বাধ্য। প্রগতি ছাড়া সাহিত্যই হয় না। যাহা গতানুগতিক, যাহা কেবলমাত্র পুরাতনের বিজৃম্ভণ তাহাতে কাব্য-কুশলতা যতই থাকুক তাহা সাহিত্য বলিয়া স্থায়ী প্রতিষ্ঠা কোনো দিনই পায় না। গতানুগতিকের বাঁধা খাত ছাড়িয়া যিনি কোনো নূতন পথ—রসের নূতন ধারা আবিষ্কার করিতে পারেন তাঁরই সাহিত্য রচনা সার্থক হয়।

কোনো এক লোকোত্তর প্রতিভাশালী লেখক একটি নূতন পন্থা অনুসরণ করিয়া সাহিত্য রচনায় সার্থকতা লাভ করিলে সঙ্গে সঙ্গে বহুতর ব্যক্তি তাঁর সে পথ ধরিয়া তাঁরই অনুকরণে সাহিত্য রচনা করে। তার মধ্যে যাহা শুধু অনুকরণ, যার ভিতর নিজস্ব নূতন কিছু নাই, তাহা মুহূর্তে বিলুপ্ত হইয়া যায়, নূতন যাহা, যার ভিতর রসবস্তুর নূতন কোনো বিকাশ থাকে, তাহাই চিরকাল স্থায়ী হইয়া থাকে।

রস-সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, সে সাহিত্যের প্রগতিশীল না হইয়া উপায় নাই। কেননা সে সাহিত্যের উপজীব্য মানব-জীবন, সমাজ-জীবন। ম্যাথু অর্নল্ড জীবন-জিজ্ঞাসা (criticism of life) বলিয়া কবিতার স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। সকল এপিগ্রামের মতো তাঁর এই

সূত্রাকার উক্তিটিও সম্পূর্ণ সত্য নয়, আংশিক সত্যমাত্র—কিন্তু ইহার ভিতর একটা খাঁটি সত্যের প্রকাশ আছে। কথাসাহিত্য সম্বন্ধে একথা আরও নিশ্চয়তার সহিত বলা যায়—কেননা কথাসাহিত্য মানব-জীবন লইয়াই লেখা। জীবনের একটা রসরূপ প্রকাশই কথাসাহিত্যের লক্ষ্য। মানব-জীবন এমন বিচিত্র, এমন জটিল, তার ভিতর রসের এত অফুরন্ত উপাদান অপর্যাপ্ত পরিমাণে ছড়ানো আছে যে, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া লোকে সে রসের পরিচয় দিয়া তার রসসমৃদ্ধি নিঃশেষ করিতে পারে নাই, কোনও দিন পারিবে না।

এই মানব-জীবন, সমাজ-জীবন, ইহা স্থাণু নয়, চঞ্চল। যাহা অতীত, তার মধ্যে যাহা চিরন্তন, তাহা লুপ্ত হয় নাই, কিন্তু সেই অতীতের অভিজ্ঞতা, নিত্য সমৃদ্ধ ও রূপান্তরিত হইয়া উঠিতেছে প্রতিমুহূর্তের নব সৃষ্টিতে, প্রতিদিন মানব-সমাজ নবজন্ম লাভ করিতেছে। তার অনুভূতি, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার দৃষ্টিক্ষেত্র নিয়ত রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত হইতেছে। যুগে যুগে সাহিত্য সেই রূপান্তরিত জীবনের নূতন রসমূর্তি প্রকাশ করিয়া সার্থক হইতেছে।

চলিষ্ণু সমাজ ও মানবচিত্তের এই প্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়া যে সাহিত্যিক রস-রচনা করেন তিনিই সার্থকতা লাভ করেন। সমাজের নবজীবনের নূতন বার্তা যে না জানে, নবযুগের নূতন প্রাণের পরিচয় যে দিব্য চক্ষে না দেখিতে পারে, শুধু অতীত কৃতীদের রচনার মুখে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করিয়া যে সাহিত্য রচনা করিতে যায় তার রচনা হয় অসার্থক।

সেক্সপীয়ার পড়িয়া, কালিদাস পড়িয়া, ইউরিপিডিস পড়িয়া আমরা তৃপ্তি পাই—চণ্ডীদাসের পদাবলীতে অপূর্ব আনন্দ লাভ করি। কেননা এই সব মহামনীষীর মধ্যে কেউ গতানুগতিক ছিলেন না—জীবনের পরিচয় তাঁরা পরের মুখে ঝাল খাইয়া পান নাই। প্রত্যেকে তাঁর নিজের যুগের সমাজ ও মানবজীবন সাক্ষাৎ-দৃষ্টিতে দেখিয়া তার রসমূর্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু আজ যদি কোনো সাহিত্যিক ঠিক সেক্সপীয়ারের শ্রেষ্ঠ একখানি নাটকের মতো একখানি নাটক লেখেন, কিম্বা চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ একটি পদের অনুকরণ করেন তবে তাঁর অনুকৃতির কৌশলের লোকে যতই তারিফ করুক, তাঁর লেখা সাহিত্যপদবাচ্য হইবে না। কেননা আজকের যে সাহিত্য তাহা সার্থক হইতে হইলে আজকের দিনে মানব-জীবনের সাক্ষাৎ অনুভূতির উপর তাকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। মানব-জীবনের যে রসমূর্তি আজকের অভিজ্ঞতায়

আমরা লাভ করিতে পারি তার পরিচয় যে সাহিত্যে না পাই তাহা সাহিত্য নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লোকাতীত প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন যে সাহিত্যে তাহা রসিকসমাজ চিরদিন মাথায় করিয়া রাখিবে। কিন্তু যে সাহিত্যিক আজ উপন্যাস লিখিতে বসিয়া গোবিন্দলাল বা নগেন্দ্রনাথ, কুন্দনন্দিনী বা ভ্রমরের মনের ক্ষেত্রের বাহিরে পদক্ষেপ করিতে পারেন না তাঁর উপন্যাস লিখিয়া সার্থকতা লাভের আশা বিড়ম্বনা। কেননা আজ যে পুরুষ বা নারী আছে তার জীবন, চিন্তা, অনুভূতি বা দৃষ্টিক্ষেত্র গোবিন্দলাল, নগেন্দ্রনাথ, কুন্দ বা ভ্রমরের জীবন, চিন্তা, অনুভূতি বা দৃষ্টিক্ষেত্র নয়। আজকের গল্পলেখককে আজকের সমাজের ও মানব-জীবনের সাক্ষাৎ অনুভূতি লাভ করিয়া তারই রসচিত্র আঁকিতে হইবে, আজকের কবি রসিকচিত্তে যদি আঘাত করিতে যান তবে তাঁর আজকের জীবনের সাক্ষাৎ অনুভূতি হইতে করিতে হইবে তাঁর রসসঞ্চয়।

বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি প্রজ্ঞামূলক সাহিত্য যেমন নিত্য-নূতন আবিষ্কারের দ্বারা আপনাকে সজীব ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে, সাহিত্যও তেমনি নিত্য-পরিবর্তনশীল মানব-জীবনের ভিতর চক্ষু ডুবাইয়া রসের নিত্য-নূতন খনির সন্ধান করিয়া সজীব থাকে।

কাজেই সাহিত্য মাত্রেই প্রগতিশীল ; প্রগতি ও সাহিত্যের সম্বন্ধ নিত্য।

তবু প্রগতি লেখক সঙ্ঘের "প্রগতি"র উপর ঝোঁকটা নিরর্থক বা অতিরিক্ত নয়।

'প্রগতি' কথাটার সম্বন্ধে লোকের মতভেদ আছে। সংসারের বেশীর ভাগ লোক গতানুগতিক। বাঁধা খাতে চলিবার নিশ্চিন্ততাই বেশীর ভাগ লোকে এত পছন্দ করেন যে, নূতন পথ মাত্রকেই বিপথ মনে করিয়া তাঁরা চঞ্চল হন।

নূতন পথে চলিবার আকাঙ্ক্ষা বা সাহস যাদের আছে তাদের মধ্যেও মতভেদের অভাব নাই। আমার পথই একমাত্র পথ, আর সব বিপথ, এমনি একটা ধারণা ইহাদের অনেকের মনে থাকে। তাই একজন যাহাকে প্রগতির পথ মনে করেন, অপরে তাহাকে অনেক সময়ই অধোগতির পথ বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রত্যেকে যে প্রগতির বিশিষ্ট স্বরূপ সম্বন্ধে একমত, ইহা হইতে পারে না। তবু তাঁদের ভিতরে প্রগতির সাধারণ রূপ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে কতকটা মিল আছে।

প্রগতির একটা সাধারণ লক্ষণ চলিত-সংস্কার হইতে মুক্তি। যাহা কিছু চলিয়াছে তাহাই চিরদিন চলিবে, প্রগতিশীল সাহিত্যিক এ ধারণা রাখেন না। ভিন্ন ভিন্ন লেখক সংস্কারের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, কিন্তু তাঁদের সাধারণ লক্ষণ সংস্কার-মুক্তি।

চলিত-সংস্কারের বিরোধিতা মাত্রেই প্রগতি সূচিত করে না। চোর, ডাকাত, খুনে, দাঙ্গাবাজ প্রভৃতি বিশেষরূপে সংস্কারবিমুক্ত, কিন্তু তারা প্রগতির দূত নয়। প্রগতিকামী সংস্কার শুধু ভাঙ্গে নয়, সে তার স্থানে কিছু গড়িতে চায়। তার চক্ষে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছে জীবন ও সমাজের একটা নূতন ও পূর্ণতর আদর্শ, সেই আদর্শের কাছে বর্তমান সংস্কার যেখানে খাটো, প্রগতিকামী সেই খানেই সংস্কার ভাঙ্গিয়া নূতন আদর্শের অনুকূল সংস্কার গড়িতে চায়।

প্রগতি লেখক সঙ্ঘের লক্ষ্য সেই সাহিত্যের পুষ্টি ও অভ্যুদয় যাহা সমাজ ও জীবনের একটা বৃহত্তর, পূর্ণতর আদর্শের আলোকে বর্তমানকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে চায়।

সে আদর্শ সবার এক নয়। এক একজন হয়তো সমাজ-জীবনের এক একটা অঙ্গ লইয়া ভাঙ্গা-গড়া করিতে চান। কেহ চান নীতিশাস্ত্রের নব সংস্কার করিতে, কেহ চান সমাজের আর্থিক অবিচার-অনাচারের প্রতিবিধান করিতে, কেহ চান রাষ্ট্রীয় নীতির ভাঙ্গা-গড়া করিতে। ইহাদের সকলের মধ্যে একটি মাত্র সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করা যাইতে পারে, যাহা প্রগতি লেখক সঙ্ঘ আপনাদিগের নিজস্ব বলিয়া দাবী করেন। সে সাধারণ লক্ষণ এই যে, যে-আদর্শই যাহার লক্ষ্য হউক, সে আদর্শের লক্ষণ—স্বাধীনতা—ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণতম স্বাধীনতা। যাহা কিছু মানবের মানবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশলাভের অন্তরায় তাহা বিদূরিত করিয়া মানবত্বের পূর্ণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা প্রয়োজন, সেই স্বাধীনতা প্রগতি-সাহিত্য সঙ্ঘের লক্ষ্য।

যাঁরা সাহিত্য রচনা করেন তাঁরা সকলে আদর্শবাদী নাও হইতে পারেন, তাঁদের চক্ষে আদর্শের এই পূর্ণরূপ নাও প্রকাশিত হইতে পারে। কোনো আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা লইয়া সকলে সাহিত্য রচনা না করিতে পারেন। কিন্তু যে সাহিত্যিকের চিত্তের স্বভাব ও গতি এই আদর্শের অনুকূল, যাঁর রচিত সাহিত্য হয়তো তাঁর অজ্ঞাতসারেও এই আদর্শের রঙে রঙীন, প্রগতি লেখক সঙ্ঘ তাঁহাকেই তাঁহাদিগের সমধর্মী বলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিয়া লইবেন।

মানব-সমাজ ও সংস্কৃতির অগ্রগতির যাহা কিছু অনুকূল, সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার আদর্শের যাহা কিছু সহায়ক, তাহাই প্রগতি সাহিত্য বলিয়া সঙ্ঘ স্বীকার করিবেন।

বলিয়াছি, মানব-সমাজ প্রগতিশীল। সঙ্ঘ স্বীকার করিবেন সমাজের উপচীয়মান জীবন প্রতিদিন অতীতের জীবন ও অভিজ্ঞতার উপর নূতন সৃষ্টির অঙ্কুর ফুটাইয়া তুলিতেছে এবং তাহা হইতে নিত্য নবজীবন স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু মানবের এই প্রগতির পদে পদে করিতে হয় সংগ্রাম। অতীতের সংস্কার, অসামাজিকের বিদ্রোহ প্রভৃতি ধ্বংসের অনুচর সমাজের বাঁচিবার ও বাড়িবার নিয়ত প্রচেষ্টাকে রুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য লড়াই করিতেছে।

আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যস্থলেও প্রগতিশীল সমাজের বিরুদ্ধ-শক্তির অভাব তো নাই-ই, নিত্য নূতন শত্রু মাথা তুলিয়া মানবের প্রগতি চেষ্টাকে বিধ্বস্ত করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

মানুষ প্রকৃতির বুক ফুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে সম্পদ, তাহার জীবন সুখসমৃদ্ধ করিবে বলিয়া, সেই সম্পদ ধনিকের অর্থলিপ্সার ফলে আজ কোটি কোটি মানবের কত না দুঃখ কত অকল্যাণের হেতু হইয়াছে। বিজ্ঞান মানবের প্রধান গৌরব, মানবের কল্যাণ সাধনের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র, সেই বিজ্ঞান আজ ধ্বংসের সেবায় বদ্ধপরিকর। সমাজ বাঁধিয়াছিল মানুষ জীবন পূর্ণতর ও অধিকতর আনন্দময় করিবার জন্য, তাই সমাজের বন্ধন আজ কঠিন নিগড় হইয়া তার মনুষ্যত্বকে নিষ্পেষিত করিতে চাহিতেছে।

অত্যাচার অনাচার দৃপ্ত পদক্ষেপে মেদিনী কম্পিত করিতেছে, নিপীড়িত মানব তার পদতলে নিষ্পেষিত হইতেছে। দোর্দণ্ড প্রতাপে হিংস্র শক্তি আজ আন্দোলন করিয়া মানবের মানবত্ব ধ্বংস করিয়া তাহাকে ভোগ ও বিলাসের ক্রীতদাস করিতে স্পর্ধা করিতেছে।

দিকে দিকে আজ ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে পীড়িত ও শঙ্কিত মানবের করুণ আর্তনাদ, তাহাদের বাঁচিবার, সার্থকতা লাভ করিবার ব্যাকুল আবেদন।

মানবের মানবত্বকে আশঙ্কিত ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে সর্ব-মানবের সংহত চেষ্টার প্রয়োজন। মানবের সকল শক্তির আজ প্রয়োজন হইয়াছে সংহত হইয়া এই দুর্ধর্ষ ধ্বংসপ্রচেষ্টার গতিরোধ করিবার। যাহার

বাহুতে বল আছে, চিত্তে আছে যার ধীশক্তি ও ভাবুকতা, কণ্ঠে আছে যাঁর বাগ্মিতা, লেখনী যার শক্তিমান—সকলের সমবেত চেষ্টার আজ প্রয়োজন, মানবের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রগতিকে দৃপ্ত শক্তির মূর্ত অকল্যাণের হস্তে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার।

সেই ব্রতের উদ্‌যাপনকল্পে প্রগতি লেখক সঙ্ঘ একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

দল বাঁধিয়া সাহিত্য রচনা হয় না। প্রগতি করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়াও সব সময়ে সু-সাহিত্য রচনা করা চলে না। দল বাঁধিয়া প্রগতি সাহিত্য রচনা করিব এ উদ্দেশ্য এ সঙ্ঘের নাই। সঙ্ঘের সভ্যগণের উপর প্রগতির দাবী ধরিয়া বাঁধিয়া প্রচার করিতেও সঙ্ঘ চাহেন না। কিন্তু যারা প্রগতিকামী সাহিত্যিক তাঁহাদিগকে সমসূত্রে গ্রথিত করিয়া, প্রগতি-সাহিত্যের সম্যক প্রচার আলোচনা ও গবেষণা করিয়া, পরস্পর আনুকূল্যের দ্বারা প্রগতি-লেখক সঙ্ঘ সাহিত্যে নিয়ত প্রগতির অনুকূল অবস্থা ও আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবার ভরসা রাখেন। ইহাই সঙ্ঘের লক্ষ্য ও ব্রত।*

* সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রগতি', প্রথম সংস্করণ, ১৩৪৪, পৃঃ ১১-২০ আনা; বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ কর্তৃক ১৩৪৪ সালে 'প্রগতি' সংকলন-গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের তৎকালীন সভাপতি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এই সংকলন-গ্রন্থে যে 'ভূমিকা'টি রচনা করেন সেটিই এখানে প্রকাশ করা হলো। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

প্রগতি / ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বহুপূর্বে প্রগতি নামে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখি। 'বিচিত্রা'য় সেটি প্রকাশিত হয়। তার শেষে লিখেছিলাম, 'আপাতত আমি এই বুঝি'। ইতিমধ্যে, অর্থাৎ গত দশ বৎসরে আমার মতের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রগতিশীল লেখকদের অনুরোধেই আমার বর্তমান মতামত সাজাবার সুযোগ হল। সেজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।*

প্রগতির অর্থ পরিবর্তন, এবং যে ব্যক্তি প্রগতি কথা ব্যবহার করছেন তাঁর মতানুযায়ী দিকে পরিবর্তন। কিসের পরিবর্তন? যে বিষয়ের আলোচনা হচ্ছে তার, এক্ষেত্রে সাহিত্যের। কিন্তু সাহিত্য মানুষের কাজ, এবং মানুষ সামাজিক জীব, অতএব সর্ববিষয়ের পবিবর্তনের সঙ্গেই সমাজের পবিবর্তন সূচিত হচ্ছে। সমাজ একটি নিরালম্ব বস্তু নয়, তার জন্ম-মৃত্যু উত্থান-পতন আছে, অর্থাৎ জীবন আছে। সমাজের জীবন এক হিসেবে ব্যক্তির জীবনের সমষ্টি। কিন্তু একটি ব্যক্তিরও অন্য ব্যক্তি-সমষ্টি, অর্থাৎ সমাজ ভিন্ন পৃথক সত্তা নেই। এই সংযোগ কেবল আধিভৌতিক দৈনন্দিন ব্যবহারেই নিবদ্ধ নয়, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক আচরণেও সত্য। শেষের দুটি স্তরের ব্যবহারও প্রথম স্তবের উপর নির্ভব করে। পূর্বে খাওয়া-পরার সংস্থান, পরে ভাবসম্পদ, অতএব পূর্বে সেই সংস্থান-সৃষ্টির পরিবর্তন। কিন্তু এদের মধ্যে হারের তারতম্য আছে। একটি সংস্থান-পদ্ধতির আশ্রয়ে জনকয়েক লোক লাভবান হয়, আইনকানুন, ধর্মনীতির সাহায্যে লাভ অক্ষুণ্ণ রাখাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক, তাই সংস্থান-পদ্ধতি স্থাণু হয়ে পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞানের বৃদ্ধিতে মন্দা পড়ে না। এই দুটি হারের বৈষম্যই স্থিতিস্থাপক ও গতিশীল দলের চিরন্তন বিরোধের প্রধান হেতু। সমাজের দিক থেকে, অর্থাৎ মানব-জীবনের সংজ্ঞায় পূর্বোক্ত বৈষম্যই প্রগতির প্রকৃত তাগিদ। বিরোধ না থাকলে গতি থাকত না, অতএব প্রগতিও অসম্ভব হতো। বিরোধের রূপান্তর প্রগতির একটি ধাপ। এই বিরোধের অবসানে প্রগতি নিরর্থক।

---

* 'চিন্তয়সি'-র শেষ কয়েক পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

ইতিমধ্যের ইতিহাসেই প্রগতির আলোচনা করা চলে, কারণ জীবনটাই অনাদি ও অনন্ত।

বলা বাহুল্য, প্রগতি সম্বন্ধে ধারণাও পরিবর্তনশীল। তবে এ-টুকু জেনে তার প্রকৃতি বুঝতে চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত। যুক্তিকে নিরালম্ব না করলেই চলে। জ্ঞানের দ্বারা যে সমস্ত মূল্য ও স্বার্থ (values and interests) যাচাই করা হয়েছে তার সমর্থনই যুক্তির সামাজিক কর্তব্য। এই হিসাবেই প্রগতির প্রকৃতি আলোচনা করছি।

প্রগতির তিনটি স্তর আছে: তথ্য (facts), ঘটনা (events) এবং মূল্য (values)। প্রত্যেক স্তরের এক একটি উপযোগী মনোভাব আছে। তথ্যের বেলা বৈজ্ঞানিক, ঘটনার বেলা organismic (বাংলা প্রতিশব্দ পাই নি), এবং মূল্যের বেলা দার্শনিক। মনোভাব অর্থে কর্মরহিত ও স্তর অর্থে ইতর-ব্যাবর্তক অবস্থার ইঙ্গিত করছি না। বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কেবল এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, যতদূর মেক্যানিস্টিক ব্যাখ্যা চলে ততদূর গ্রহণ করা, এবং তারপর যেখানে চলছে না সেখানে সে ব্যাখ্যা খাটাবার চেষ্টা করাই প্রগতিশীল লেখকদের তথ্য সম্বন্ধে কর্তব্য। যদি নেহাৎ অসম্ভব হয় তবে চুপ করে যাওয়াই ভালো, অন্তত ইমার্জেণ্ট এভোলিউশনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করার চেয়ে—কারণ শেষোক্ত ব্যাখ্যায় অজ্ঞানতাকে গালভরা নাম দিয়ে পদ্ধতিতে পরিণত করবার চেষ্টা অনেকস্থলে লক্ষ্য করেছি। আকস্মিক পরিবর্তন জীবনে ঘটে, কিন্তু আকস্মিকতা সময় সংক্ষেপ মাত্র, নতুন ধরনের পরিবর্তন নয়। আরেকটি কথা বৈজ্ঞানিক মনোভাব সম্বন্ধে বলা উচিত। এরও একটা ইতিহাস আছে; আদিম যুগের যাদুকরও বৈজ্ঞানিক ছিলেন, মধ্যযুগের জ্যোতিষীও বৈজ্ঞানিক, আবার পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের অধ্যাপকও বৈজ্ঞানিক। এমন পদার্থবিদও আছেন যারা কাগজে-কলমে সিদ্ধান্ত কষে দেন, অন্য লোকে তার যাচাই করে। অর্থাৎ, ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায়, অবরোহ ও আরোহ দুই প্রণালীকেই বৈজ্ঞানিক ব্যবহার করেছেন, আজও করছেন। একই পরীক্ষায় অনুসন্ধানের অবস্থা ও ব্যবস্থা অনুসারে আরোহ অবরোহ পদ্ধতি উপযোগী। অতএব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যখন ক্রমবিকাশ আছে তখন বৈজ্ঞানিক মনোভাবও চিরন্তন, সনাতন, শাশ্বত পদার্থ নয়। এ যুগে পরীক্ষার জয়জয়কার কোনো কোনো বিজ্ঞানে, যেগুলি অপেক্ষাকৃত অপরিণত সেগুলিতে এবং পরিণত বিজ্ঞানে, যেমন ভূতবিদ্যায়,

অবরোহ প্রথারই প্রচলন। কেন এই পদ্ধতির ও মনোভাবের পরিবর্তন হচ্ছে বুঝতে গেলেই আমরা সমাজের দ্বারস্থ হব। হিন্দুদের মধ্যে বীজগণিতের এবং গ্রীকদের মধ্যে জ্যামিতির প্রত্যয়ের আবির্ভাবের জন্য সমাজে বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর স্থানভেদই প্রধানত দায়ী, এ সত্য হগবেন দেখিয়েছেন। তেমনই আজকাল গণিতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনেও, অর্থাৎ তার ফলে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের রূপভেদেও সমাজের নির্বাচন-প্রক্রিয়া চোখে পড়ে। ব্যাপারটা এই: কোন্ সময় কোন্ পদ্ধতির রূপটি প্রচলিত হবে নির্ভর করছে সেই বৈজ্ঞানিক সমস্যার ইতিহাসের উপর, এবং সেই ইতিহাস ভালো করে পড়লে বোঝা যায় যে সে সমস্যার আদিতে কোনো না কোনো ব্যবহারিক সমস্যাই ছিল। মধ্যের অংশে সমাজ-নির্বাচনের ক্রিয়া সুস্পষ্ট নয়। অন্তে, অর্থাৎ কিছুকাল পরে ফলিত বিজ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞানের সাথে সমাজের পুনর্মিলন হয়। সে যাই হোক, প্রগতিশীল লেখকদের তথ্যসংগ্রহ সম্বন্ধে মনোভাব বর্তমান ও আগামী কালের বৈজ্ঞানিক মনোভাবই হওয়া চাই। বলা বাহুল্য, শ্রদ্ধা সহকারে তথ্যকে বোঝাটাই প্রথম কথা। সব তথ্য অবশ্য নয়, যে তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে তাদের কথা বলছি। মানুষের মন, ভয়-ভাবনাকে কেন্দ্র করে তথ্য সাজানো পুরাতন সাহিত্যিকের লক্ষণ। বাইরের প্রকৃতির সাথে মানুষের সহানুভূতি দেখানো রোমান্টিক মনোভাবের নিদর্শন। প্রগতিশীল লেখকের চাই প্রাকৃতিক তথ্যের অন্তরানুভূতি, 'সিম্প্যাথি' নয়, 'এমপ্যাথি'।

তথ্যের পর ঘটনা। পুরাতন সাহিত্যের পরিণতি ছিল একটি মাত্র সঙ্কটময় মুহূর্তে। সময় সম্বন্ধে কর্তাদের ধারণা ছিল আলোকের মতো। আলোকের রশ্মিগুলি যেমন লেন্সের ভেতর দিয়ে এসে একটি বিন্দুতে পরিণত হয়, তেমনই চরিত্রের অভিব্যক্তির ভেতর দিয়ে এসে গোড়াকার শান্ত জীবন একটি চরম মুহূর্তে পরিণত করানটাই তখনকার রীতি ছিল। এরই নাম গল্প বলার টেকনিক··· ইত্যাদি। এখন, সময় সম্বন্ধে ধারণা বদলেছে, অতএব সঙ্কট ও কালান্তর এখন শেষে অবস্থান করে না। তারা গল্পের মধ্যে কবিতার মাঝ-মধ্যখানেও অধিষ্ঠিত হয়েছে। প্রগতিশীল সাহিত্যে ঘটনার স্থান নির্দিষ্ট নেই, কারণ কাল সম্বন্ধে পূর্বেকার ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে।

ঘটনা সম্বন্ধে দুটি মন্তব্য করতে চাই। কালকে উড়িয়ে দেওয়া একাধিক পণ্ডিতের মত। তাঁরা বলেন যে প্রত্যেক ঘটনাই বিচ্ছিন্ন, টুকরোভাবে দেখাই

বৈজ্ঞানিকের কাজ, এবং জীবনটা পৃথক্ পৃথক ঘটনার সমাবেশ মাত্র, যেমন বায়স্কোপের চলন্ত ছবি ভিন্ন ভিন্ন ছবির দ্রুত পরিচালনা মাত্র। কিন্তু এ যুক্তিতে গলদ আছে। এখানে তথ্যের সঙ্গে ঘটনার পার্থক্য প্রকাশ পাচ্ছে না, অথচ সে পার্থক্যটা প্রকৃত। তাছাড়া, চলন্ত ছবি চালায় কে, কিভাবে চলছে, কোন হারে চলছে—এসব প্রশ্নের উত্তর পূর্বোক্ত যুক্তির সাহায্যে পাই না। অথচ জীবনটা চলন্ত, বিশেষভাবে চলে, কখনও ঠায়ে, কখনও ধুনে, কখনও আমাদের বাঞ্ছিত দিকে, কখনও উল্টো দিকে। কিন্তু যে কোনো অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত সময়ে জীবনের মধ্যে একটা না একটা ভালোমন্দ ছক্ খুঁজে পাওয়া যায়। এ ছক্ কি করে তৈরী হয়? উত্তর আসে—স্মৃতির সাহায্যে। কিন্তু স্মৃতির দোহাই দিলে জড়েরও স্মৃতি মানতে হয়, তাও আজকাল বলা হচ্ছে। কিন্তু তার প্রকৃতিটা কি? লৌহদণ্ডের স্মৃতি আছে যখন বলা হয়, তখন কি তার এই অর্থ নয় যে পুনঃ পুনঃ আঘাতের ফলে তার অণু-পরমাণুর নক্সা একটি বিশেষ রূপে সজ্জিত হয়েছে? পুনরাবৃত্তিরই মধ্যে কালের খেলা রয়েছে। অতএব সময় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে বিজ্ঞানের চলে না। অথচ প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে সান্তরতা ভিন্ন অন্য পন্থা নেই। সমগ্র জীবনটাকে ঐভাবে দেখলে সাহিত্য হয় বিফলতার বিবরণ, ব্যর্থতার কাহিনী, অর্থাৎ মূল্যহীন। কিন্তু প্রগতির মূল্য আছেই আছে, যখন কথাটি ব্যবহার করছি।

অতএব ঘটনা সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে এই যে, কাল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সদর্থক হওয়া চাই। কোনো দার্শনিক আলোচনা না করে বলা চলে যে, হিন্দুদের মতন মহাকাল নামক দেবতার কল্পনা করবার প্রয়োজন নেই বটে, তবু তার নিতান্ত ব্যক্তি-সম্পর্কহীনতা স্বীকারের প্রয়োজন আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একটি তথ্য অন্য তথ্যের সঙ্গে মিশে আছে নিতান্ত ঘনিষ্ঠভাবে, কার্যকারণ-সম্বন্ধের তাগিদেই সাধারণত। এই কার্যকারণ-সম্বন্ধ বিচারের ফলে আমরা বুঝি যে সব সময় যতটুকু কার্য একটি কারণের জন্য হওয়া উচিত তার বেশী কিংবা কম হচ্ছে। কখনও বা একই কার্যের একাধিক কারণ। এরূপ হয় কেন? তার ব্যাখ্যার জন্য কালাতিপাত মানতেই হয়। অর্থাৎ মাত্র অতিপাত কিংবা অতিক্রমের ফলে পূর্বেকার তথ্য একটি বেগভার অর্জন করে পরের তথ্যকে ধাক্কা দিচ্ছে। যখন পরের তথ্য সেই বেগভার হজম করতে

পারে না তখনই তাকে ঘটনা (event) বলাই শ্রেয়। ঘটনারও আবার বেগভার আছে, যার ফলে অন্য ঘটনা তৈরী হয়। এই চলল চিরকাল। প্রগতি-শীল সাহিত্যে ঘটনার প্রত্যাশা করি, যার বেগভার থাকবে, নতুন ঘটনা সৃষ্টি করবার ক্ষমতা থাকবে। পারম্পর্য (sequence) প্রগতির মূল কথা নয়। বেগভার প্রকাশ পাবার ঠিক পূর্বেকার অবস্থা পর্যন্ত সমাবেশের প্রকৃতি বাঁধাছাদা জৈবদেহের মতন, অর্থাৎ একটা তার ছক আছে। একটি 'ক্রাইসিস' থেকে অন্য 'ক্রাইসিসে' যাবার মধ্যে এই নক্সারই ছবি প্রগতিশীল সাহিত্যিককে আঁকতে হবে।

বর্তমান জগতে যে প্রকার জীবন সম্ভব তাতে নক্সাগুলি অত্যন্ত একঘেয়ে। এই সমাজে ব্যক্তিগত জীবনে ঘটনা ঘটতে পারে না, যা পারে তার নাম তথ্যের পুনরাবৃত্তি ও বিচ্ছিন্নতা। সেইজন্য যন্ত্রকে দায়ী করা রোমান্টিকেরই সাজে। যুক্তিতে বলে, যন্ত্রের সঙ্গে গতানুগতিকতার সম্বন্ধ থাকলেও তার নিকটতম আত্মীয় হল যন্ত্রের উপর অধিকার-বিভাগ। এক কথায়, সমাজে অধিকার-বৈষম্যের জন্যই জনসাধারণের জীবন অত একঘেয়ে। প্রগতিশীল লেখকদের এই সামাজিক তত্ত্বটুকু ধরতে হবে। যেভাবে বাঁচছি তার চেয়ে ভালোভাবে বাঁচতে চাওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। ভালোভাবে মানে ঘটনাবহুল ভাবে। এটা একাধারে তথ্য ও তত্ত্ব।

ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই মূল্যের উৎপত্তি। ভালোভাবে এবং আরো ভালোভাবে জীবন চালাবার ইচ্ছার মধ্যেই মূল্য নিহিত রয়েছে। যে হিসেবে ঘটনা ধরেছি সেই হিসেবে ঘটনাবাহুল্যকে মূল্যের একটি অঙ্গ ধরা যায়। কিন্তু বাইরে থেকে মনে হয় যেন মূল্য একটি আবির্ভাব (emergent quality)। 'যেন' কথাটিতে সত্য-সন্ধানের কাল্পনিকতা ও আনুমানিকতাই সূচিত হচ্ছে। স্বার্থ (interests) এবং প্রাসঙ্গিকতার দ্বারা যখন তথ্যসমুদয় গ্রথিত হচ্ছে তখনই, যখন ভাব ও উদ্দেশ্যের দ্বারা এবং পূর্ব ঘটনার বেগভারে নতুন ঘটনা সজ্জিত হচ্ছে তখনই মূল্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়ে গিয়েছে। মূল্যজ্ঞান জন্মায় সঙ্গে সঙ্গে এবং পরে। পূর্বকাল থেকে, কিংবা পিছনে বসে সেটি পুতুলনাচের মাস্টারের মতন নক্সা কাটছে না। ভিন্ন ভিন্ন মূল্য যখন তৈরী হচ্ছে তখন মূল্যজ্ঞানও নিত্য নয়।

পূর্বেই বলেছি বর্তমান জগতে ঘটনা বড় একঘেয়ে এবং তার কারণ যন্ত্রের

আধিপত্য নয়, যন্ত্রাধিপতির আধিপত্য। অতএব মূল্যের দ্রুত পরিবর্তন এযুগে সম্ভব নয়, অতএব মূল্যজ্ঞানের ইতিহাসও চলন্ত কি জীবন্ত নয়। কিন্তু ভালোভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবার উপায়ের জ্ঞানে, অর্থাৎ বিজ্ঞানে ভাটা পড়েনি। মূল্যজ্ঞান আটকে রইল, অথচ বিজ্ঞান অগ্রসর হল। এ যেন আরবী ঘোড়ার সঙ্গে খোঁড়া গাধা জুতে গাড়ী হাঁকানো। তাই গাড়ি উল্টে যায়। পাছে বিপ্লব বাধে এই ভয়ে কর্তৃপক্ষ বল্লেন যে মূল্যজ্ঞানটাই সনাতন, এবং গতিটা মায়া। কোনো মূল্যজ্ঞানকে শাশ্বতে পরিণত করার মধ্যে একটি শ্রেণীর স্বার্থ আছে। সাহিত্যে সনাতন তত্ত্বের, ঐতিহ্যের নজীর দেখানোর মধ্যে একটি শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখবার, কোনো একটি মুমূর্ষু মূল্যকে বোতলে পুরে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টাই প্রতিফলিত হয়। শবের দৌরাত্ম্য প্রগতিশীল লেখক মানতে পারেন না।

অস্বীকার করাটা মস্ত কাজ, কিন্তু সুশ্রী নতুন সৃষ্টি করাটাই উদ্দেশ্য। মন্দকে নাকচ করা ছাড়া ভালোকে খাড়া করারও কর্তব্য রয়েছে। প্রথমটা না হলে দ্বিতীয়টি অসম্ভব। কিন্তু সম্ভব-অসম্ভবের অপরপারে আরেকটি জগৎ রয়েছে সন্দেহ হয়। বিরোধের অবসান কি নেই? লেখকের চিত্ত বিক্ষুব্ধ থাকলে কলম নড়ে না, কে না জানে? অথচ লেখবার সময়েও শান্তি নেই, ভাষা, ভাব তখনও বিদ্রোহী জড়ের মতন ব্যবহার করে। তাদেরও বশে আনতে হয়। যতক্ষণ না নতুন ভাবের উপযোগী ভাষা করায়ত্ত হচ্ছে ততক্ষণ নতুন প্রচেষ্টা গতির চিহ্ন মাত্র। কেবল নিদর্শন কিংবা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকাটাই কি চরম কথা? সুষ্ঠু সমাবেশের দায়িত্ব কখনও ঘোচে না।

শুনেছি বাংলা সাহিত্যে প্রগতিশীল লেখক আছেন। তাঁরা কেউ আঙ্গিকের উন্নতি করছেন। ভাবের দিকে বিশেষ কোনো নতুনত্ব পাই নি। সকলে এখনও ব্যক্তিবাদী। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথবাবু ও শরৎচন্দ্রের যুগে হিন্দুসমাজের বিপক্ষে লড়াই করার প্রয়োজন ছিল, তাই ব্যক্তিবাদ তখন ছিল প্রগতিশীলতার মূলমন্ত্র। এখন সমাজ বদলেছে। নতুন সাহিত্যিকের লেখায় পরিবর্তন সম্বন্ধে সন্দেহের সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু কেন হল, কিভাবে হল, এই জ্ঞানের কোনো পরিচয় পাই না। ভদ্রলোকের ছেলে লেখাপড়া শিখে খেতে পাচ্ছে না, তাই কষ্ট পাচ্ছে, কষ্টের কারণ সে নিজে ফুটতে পারছে না—মাত্র এইটুকু কথাসাহিত্যে ফুটেছে। কবিতায় বিষাদের ছায়া দেখেছি, কিন্তু কিসের বিষাদ? সেই একই কারণে, অর্থাৎ কবি

নিজে ভালোভাবে থাকতে পারছেন না। এঁরা যেন সকলে ভালো চাকরী খুঁজছেন। বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্য বড চাকরীর দরখাস্ত লেখার সামিল হয়েছে। যাঁরা গরীব গৃহস্থের দুঃখে হা-হুতাশ করেন তাঁহা লোক ভালো, কিন্তু রোমান্টিক। আমাদের সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে তথ্য, ঘটনা ও মূল্যজ্ঞানের কোনো যথার্থ তাগিদ নেই। যখন তা নেই তখন আঙ্গিকের কেরামতী ঝুটো মনে হয়। জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান আসুক, তার ওপর রূপসৃষ্টি হোক, তবেই প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা হবে। ঐ বস্তুটির অস্তিত্ব মানি, তার প্রয়োজন স্বীকার করি, তার আগমন বাঞ্ছনীয় ভাবি, অন্যদেশে তার সৃষ্টি হচ্ছে জানি, এবং সেই সঙ্গে আমাদের দেশে আঙ্গিকের অনুকরণ হচ্ছে, তার বেশী কিছুই হচ্ছে না আমার বিশ্বাস হয়েছে, তাই স্বাদেশিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে শেষ প্যারাগ্রাফটি লিখলাম। জীবনে অনেক নতুন লেখককে ভিন্ন ভিন্ন কারণে সুখ্যাতি করেছি। সেজন্য আমার তিলমাত্র অনুশোচনা হয় না। কিন্তু সমাজ-জীবনের রূপ পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলেও যে নতুনত্ব সাহিত্যে আনা যায় তাকে প্রগতিশীল সাহিত্যের অভিনবত্ব বলে আমি আর ভুল করতে রাজী নই। *

* সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রগতি', প্রথম সংস্করণ, ১৩৪৪, পৃ ১-১০; প্রগতি লেখক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ২৩/১ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। ১৩৩৪ সালে ধূর্জটিবাবু 'প্রগতি' শীর্ষক যে নিবন্ধটি রচনা করেন এবং পরবর্তীকালে যা তাঁর 'চিন্তয়সি' গ্রন্থে সংযোজিত হয়, বর্তমান রচনাটি তারই পরিবর্ধিত রূপ [দ্র 'চিন্তয়সি', পৃ ১৫২-৫৬]। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

সাহিত্যে বাস্তব ও কল্পনা / সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

সাহিত্যের সঙ্গে কল্পনার যেমন একটি নিত্য সম্বন্ধ আছে, তেমনি অবাস্তবের সঙ্গে তার নিত্যবিরোধও অপবিহার্য। কল্পনা ও বাস্তবের দ্বন্দ্বের মসীকলঙ্কিত ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে ঐ উভয়ের সামঞ্জস্য একান্ত অসম্ভব। বাস্তব জীবনের কঠিন মৃত্তিকার সঙ্গে কল্পলোকের ছায়াময় নীহারিকাপুঞ্জের আলোকবর্ষ দূরত্বের ব্যবধান লোকদৃষ্টিতে অনতিক্রম্য, তাই এ দ্বন্দ্বের মধ্যে ঐক্যসূত্রের সন্ধানে বহু সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক বাক্যারণ্যে পথভ্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশুদ্ধ সূক্ষ্মদর্শনের উপর নিশ্চিন্ত নির্ভরশীল নয়; সুতরাং যুক্তিবাদী চিন্তাপদ্ধতির সাহায্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় নব্যন্যায়ের বাক্য যোজনার কুশাগ্র বুদ্ধির নিষ্ফলতা ও কীর্তনের মাদকতার উন্মত্ত লম্ফনের রসিকতা সযত্নে পরিহার করে ধীর অথচ সক্রিয় পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সঙ্গে অন্বীক্ষার ঐকান্তিক সমন্বয়ে উভয়ের মূলগত ঐক্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে।

বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের ভারসাম্য ব্যাহত হলে ক্ষণপ্রভ আলোক বিস্ফুরিত হয় কিন্তু তার সম্ভাব্যতা অন্তরাশ্রয়ী; কল্পনাও সেইরকম ব্যক্তির চিত্তে প্রকৃতি ও সমাজের বিরোধজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে সহজ সমাধানের অভাব সূচিত করে। সমস্যার সমাধানে পূর্ণচ্ছেদ না পড়া পর্যন্ত কল্পনার বিশ্রামের অবসর নাই। কালিদাসের যক্ষের মেঘের চেয়েও কল্পনার অক্লান্ত পক্ষবিস্তার বিরতিহীন। এমন কি অলকায় উত্তীর্ণ হলেও তার পক্ষবিধূনন ক্লান্তিলাভের অধিকারী নয়; যক্ষপত্নীর নির্দিষ্টপথে পক্ষসঞ্চার করে আবার তাকে নবরামগিরি পর্বতে যক্ষের কাছে ফিরে এসে সদ্য শাপমুক্তির নূতনতম গুপ্ত সংকেতটি নিবেদন করতে হবে। যক্ষের শাপমুক্তির ফলে কেবল প্রিয়ার সঙ্গে মিলন নয়, কর্মজীবনের সঙ্গে যোগ পুনরায় স্থাপিত হলে তবে তার গতিচঞ্চল পক্ষপুটের সাময়িক অবসর ঘটবে, তার পূর্বে নয়।

বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে যে সমস্যার সৃষ্টি করে, সাহিত্যকে তার পরিচয় দিতে হয় বলেই,

সাহিত্যিক কেবলমাত্র অবাস্তবকে বর্জন করেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার সাহায্যে সে সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও তাঁকে করতে হয়। কারণ, যত সমস্যার সৃষ্টি হয়, তত সমস্যার সমাধান ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করে সাহিত্যের আসরে উপস্থাপিত করা লোকোত্তর সাহিত্যিকের পক্ষেও অসম্ভব। সুতরাং কল্পনার সঙ্গে সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য যোগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কল্পনার বন্ধহীন আতিশয্য অনেক সময় মনকে সমস্যা থেকে সমস্যান্তরে বিভ্রান্ত করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়; তার ফলে যে সমস্যার সমাধানের তগিদে কল্পনার প্রয়োজন হয়েছিল, স্বৈরিণী কল্পনা সে উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়ে অবাধ অনুষঙ্গে ক্লান্তিনীল মৃত্যুর পথে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে।

শেষোক্ত কল্পনা সর্বদাই সুস্থতার সীমারেখা অতিক্রম করে, কখনও কখনও ঘোর বিকারের অবস্থায় পর্যন্ত পৌছায়; মানুষের কল্পনায় এরকম বিকারের লক্ষণ দেখা দিলে তাকে উন্মাদ পর্যায়ে ফেলা হয়, কিন্তু সমাজের দুর্ভাগ্যবশত ও বিকার-গ্রস্ত সাহিত্যিকের সৌভাগ্যবশত সাহিত্যে এ রকম লক্ষণ উপস্থিত হলে তাকে নূতন টেকনিক বা আঙ্গিক আখ্যা দিয়ে লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করা হয়। সাহিত্য গণিত বা বিজ্ঞানের মতো নয়; সুতরাং তার আঙ্গিক বিষয়বস্তু-নিরপেক্ষ হতে পারে না। এমন কি বিজ্ঞানের আঙ্গিকও পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হয়। আর গণিতের বেলায় পরীক্ষা না থাকলেও পরস্পর অবি-রুদ্ধতার সঠিক সামঞ্জস্যের মাপকঠিতে তার আঙ্গিকের বিচার হয়। কিন্তু কাব্য ও উপন্যাসে এ শ্রেণীর টেকনিক বা আঙ্গিকের স্থান কত দূর আছে তা সন্দেহের বিষয়। অবশ্য ভাষার সৌন্দর্য বা ধ্বনির মাধুর্য রসাত্মক বাক্যের সঙ্গে আত্যন্তিক রূপে সংপৃক্ত, কিন্তু শুদ্ধ ভাষাশিল্পের পরীক্ষার ক্ষেত্ররূপে সাহিত্যকে গ্রহণ করা যায় না। ভাষাশিল্প কারুকার্য মাত্র, কারুকার্য কখনও স্বয়ং-সিদ্ধ ও আত্মসম্পূর্ণ হতে পারে না। পটভূমি অনুযায়ী তার রূপান্তর ঘটে। পটভূমির বন্ধন পরিত্যাগ ক'রে ভাষাশিল্পের মুক্তিলাভের চেষ্টা জলচর মৎস্যের পক্ষে জলের বন্ধন ত্যাগ করে স্বাধীনতা লাভের মতোই করুণ।

এ জাতীয় বিকৃত কল্পনার কথা ছেড়ে দিলে, সাহিত্য বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার যোগ স্থাপন করে। লোকায়ত সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বৈচিত্র্য অন্তহীন। সমাজের বিশিষ্ট অবস্থার পটভূমিতে এই বেদনা যে রূপ ধারণ ক'রে নূতন পরিস্থিতি ও সমস্যার সৃষ্টি করে, তার সর্বাঙ্গীণ সমাধান কোনো সাহিত্যিক নিজের বা অন্যের

বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার অল্প পরিসরের মধ্যে অনুভব কতে পারেন না ; কিন্তু কল্পনা এখানে তাঁকে পথ দেখায় ও সমাধানের ইঙ্গিত প্রদান করে। সুস্থ ও সাবলীল কল্পনার অঙ্গুলিসংকেতে সাহিত্যিক তাঁর সমস্যা সমাধানের প্রেরণা পান। কিন্তু এ ইঙ্গিত যে আলেয়ার আলো নয় তা সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গির সাহায্যে বুঝতে পারেন। কারণ সমাজেব পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক জীবনের ধারা অতীন্দ্রিয় অদৃষ্ট শক্তির লীলাক্ষেত্র নয়, ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টনের পদ্ধতি ঐতিহাসিক ধারার নিয়ামকরূপে সর্বদাই বর্তমান থাকে। সুতরাং সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা যে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির রূপায়িত সমস্যা, তার সমাধানের জন্য কল্পনাব অঙ্গুলিনির্দেশ ঐতিহাসিক অগ্রগতির পূর্ব-সঙ্কেতরূপে গ্রহণ করা যায়। কারণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে সাহিত্যিক কল্পনার শুভদৃষ্টি ঐতিহাসিক ভবিষ্যতের গতিপথের দিকে বদ্ধলক্ষ্য না হয়ে পারে না। ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পরিণত ফল বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও সাহিত্যিক কল্পনা উভয়েরই কাম্য।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সার্বজনীনতাব মতো কল্পনারও একটা সার্বজনীনতা আছে। কল্পনার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পূর্বসঙ্কেত মাত্র। ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সার্বজনীনতা কল্পনার পূর্বসঙ্কেতের মূর্তিতে সাহিত্যিক দেখতে পান, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যেমন কাল্পনিক সমাধানে সন্তুষ্ট না হয়ে যেখানে সম্ভব বাস্তবিক পরীক্ষা করে দেখেন, অথবা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিধির সঙ্গে এই কাল্পনিক সমাধানের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে চেষ্টা করেন, সাহিত্যিককেও তেমনি কাল্পনিক সমাধানকে যেখানে সম্ভব ইতিহাসের নজিরের সঙ্গে বা আগম্যমান বিশিষ্ট সামাজিক পরিবর্তন এসে উপস্থিত হলে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। যেখানে সমস্যার ঐতিহাসিক সমাধানের বিলম্ব থাকবে, সেখানে তাঁকে অন্যান্য ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধির সঙ্গে তাঁর কাল্পনিক সমাধানের সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে। সাহিত্যিক সামাজিক অগ্রগতির কাজে সহায়তা করতে পারেন যদি তিনি সার্বজনীন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কাল্পনিক দৃষ্টিকোণকে সংযুক্ত করে ইতিহাসের সমগ্র রূপের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য স্থাপন করেন।

যদি সন্দেহ হয় যে সমস্যার সমাধান হলেই যখন কল্পনার প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে, তখন কল্পনাকে সার্বজনীন বলা ভুল, তবে তার উত্তরে এই বলা যায় যে

প্রকৃতি, সমাজ ও ব্যক্তির পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতে এত বেশী ও এত বিচিত্র সমস্যার উৎপত্তি হয় যে, তাকে অনন্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং প্রত্যেকটি সমস্যা সমাহিত হয়ে নূতন সমস্যা ও প্রশ্নের অবতারণা করে। ফলে মানুষের চিরন্তন সমাধান প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তনী কল্পনাও অব্যাহত থাকে। অতএব সাহিত্যেরও প্রয়োজন কখনো নিঃশেষিত হয় না। বিজ্ঞান ও সাহিত্য, বুদ্ধি ও কল্পনা পরস্পরের হাত ধরা-ধরি করে সমাজের ঐতিহাসিক অগ্রগতির যাত্রাপথে মানুষের মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। একমাত্র ফ্যাশিজ্‌ম্‌ ও যুদ্ধের বর্বর উপদ্রব বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অগ্রগতির পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। বিষবাষ্প ও অন্যান্য রণসম্ভার সৃষ্টির কাজে বিজ্ঞানের অশুভ প্রয়োগ, স্পেনের সমর-প্রাঙ্গনে র‍্যালফ্‌ ফক্সের মতো সাহিত্যিকের প্রাণদান, আঁদ্রে মালরোর ফ্যাশিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে ও সভ্যতা-সংস্কৃতির স্বপক্ষে যুদ্ধে যোগদানের বেদনাময় ঘটনা বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পক্ষে অত্যন্ত অশুভ ও সর্বনাশকর। এ দেশে যাঁরা ফ্যাশিস্ট-পন্থী আছেন তাঁদের নিয়ে আমাদের সাহিত্যিকেরা বার্ণার্ড শ'র প্রস্তাবিত "জেনেভ"-এর মতো একখানি বই লিখলে উপভোগ্য হবে বলে মনে হয়।

এই আসন থেকেই আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন যে সাহিত্য সমাজ-বিশেষের হৃদগত প্রতীতির অভিব্যক্তি ; তাঁর কাছে আমার মতো ক্ষুদ্র শিষ্যের সশ্রদ্ধ নিবেদন এই যে, চিন্তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য বিশুদ্ধ হৃদয় নিষ্পাপ আদিম অবস্থার মতোই অবাস্তব। প্রতীতির অন্তর্লীন কল্পনা বুদ্ধিগত সমস্যা সমাধানের পূর্বরূপ মাত্র। সমাজবিশেষের হৃদয়গত প্রতীতির সাহিত্যিক অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে লব্ধ ঐতিহাসিক বিধির সার্বজনীনতাও স্বীকার করা প্রয়োজন। নচেৎ বৈশিষ্ট্যের আতিশয্য কূপমণ্ডূক-তায় পরিণত হয়ে সাহিত্যের দৃষ্টি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও অনুদার দেশাচারের গণ্ডিতে আবদ্ধ হবার আশঙ্কা আছে। সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সমস্যার মূলগত সার্বজনীনতার ভিত্তিতে সমস্যাসমাধানের পূর্বসঙ্কেত-রূপ কল্পনার সার্বজনীনতাও স্বীকার্য। যদি বিশিষ্ট সমাজ সম্পূর্ণ স্থিতিশীল ও অন্য সমাজ নিরপেক্ষ হতো তবে শুদ্ধ বৈশিষ্ট্যকে সাহিত্যের প্রাণরূপে গ্রহণ করতে আপত্তির কারণ থাকৃত না। কিন্তু ঐতিহাসিক পরিবর্তনের অবিরাম গতির ফলে পার্বত্য নির্ঝরিণীর স্রোতোবেগে চালিত উপলখণ্ডের মতো কোনো বিশিষ্ট সমাজের একান্ত বৈশিষ্ট্য চিরস্থায়ী থাকতে পারে না। কিন্তু সার্বজনীনতার

অবিরুদ্ধ বৈশিষ্ট্য সমাজে ও সাহিত্যে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য। সার্বজনীন ভূমির উর্বর প্রাচুর্যে পরিপুষ্ট সাহিত্যের বিশিষ্ট রসই সামাজিক মানবের বুদ্ধি ও হৃদয়ের উপজীব্য।

বাঙালীর কল্পনাপ্রবণ জাতি বলে যে সুখ্যাতি বা অপবাদ আছে তার মূলে আছে সাহিত্যপ্রীতি। বাঙালীর সাহিত্য আজ বিশ্বের দরবারে তার সম্মানিত স্থান গ্রহণ করেছে। যে সমস্ত শক্তিমান ও প্রতিভাশালী লেখকের ঐকান্তিক চেষ্টার পরম্পরার ফলে বাঙলার সাহিত্যের এ গৌরব লাভ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সৃষ্টি কাল্পনিক ও বাস্তব সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও শোভন। কিন্তু তাঁদের সম্মানিত পদে প্রণাম জানিয়ে সাহিত্যিকদের উপলবন্ধুর ও বিঘ্নসঙ্কুল যাত্রাপথে অভিযান করতে হবে। স্থিতিশীল জড় বাস্তবতা বা নভোচারী মুক্তপক্ষ কল্পনা দুরারোহ পার্বত্যপথ অতিক্রমের উপযুক্ত পাথেয় নয়। বাস্তব ও কল্পনার যৌগিক রসায়ন বাঙলা সাহিত্যকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে দুর্গম অগ্রগতির পথে আপনাদের চিত্তে নবজীবনের শক্তি সঞ্চার করুক, এই আমার একমাত্র কামনা।*

---

* শ্রীরামপুর "বনফুল সাহিত্য সমিতির" অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রগতি', পৃ. ৭২-৮৫। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক

সাহিত্যে প্রগতি-২ / ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

[এই গ্রন্থে "সাহিত্যে প্রগতি" শীর্ষক একটি রচনা ছাপা হয়েছে (পৃ. ২২-২৬ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তীকালে এই রচনাটিই আরও বর্ধিত আকারে ১৯৩৭ সালে প্রগতি লেখক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রগতি' সংকলন-গ্রন্থে স্থান পায়। ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যেহেতু এই রচনায় পরিবর্ধিত আকারে নতুন কিছু বক্তব্য সংযোজন করেন, সেইহেতু উক্ত প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় অংশটুকুই শুধু 'সাহিত্যে প্রগতি-২' নামে প্রকাশ করা হলো।—সম্পাদক]

"...বর্তমানের বাংলা সাহিত্যে একটা anachronism (কাল-ব্যতিক্রম) রয়েছে। আমরা আছি একযুগে, কিন্তু সাহিত্যের চিত্র হইতেছে আর এক যুগের! ইহা সত্য বটে যে, ভারতীয় সমাজ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু ইংরেজ শাসনের জন্য এবং কলকারখানার জন্য যে মধ্যশ্রেণী বা বুর্জোয়াশ্রেণী সর্বত্র উদ্ভূত হইয়াছে এবং যাহারা ভারত শাসনে ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহাদের অস্তিত্বের চিহ্ন আমাদের সাহিত্যে কোথায়? তৎপর, আজকাল যে ভারতের সর্বত্র শ্রমিক ও কৃষক জাগরণ হইতেছে, তাহারাই যে স্বরাজ-শাসনের ভার লইবার অধিকারী বলিয়া দাবী করিতেছে তাহারও নিদর্শন সাহিত্যে কৈ? ইহার বদলে আমরা দেখি যে হঠাৎ মাথায় টিকি ও এক হাতে মনু ও রঘুনন্দন, আর অন্য হাতে কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চুক্তিপত্র নিয়ে লোকসমাজে আবির্ভূত হয়েছেন "বিপ্রদাস"! সমগ্র ভারতে আজ গণশক্তির জাগরণ, সর্বত্র কায়েমী স্বার্থ (vested interests) উঠিয়ে দেবার কথা ও আন্দোলন চলিতেছে, সাম্যস্থাপনের কথা উঠিতেছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য ও জমিদারের উচ্চ আদর্শ দেখাইবার জন্য এই commercial ও industrial যুগে বিপ্রদাসের আক্রমণের রাজনীতিক চালবাজী অনেকের নিকট ঢাকা থাকে নাই। আমরা জানি বনিয়াদী বা কায়েমী স্বার্থ নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য বড় বড় অধ্যাপক দিয়ে প্রচারকার্য চালাইতেছে, সেইজন্য এই যুগে বিপ্রদাস একাধারে ব্রাহ্মণ ও জমিদাররূপে আবির্ভূত হইয়া

এই দুই বনিয়াদী স্বার্থের পক্ষে ওকালতি করাতে আমরা আশ্চর্য হই নাই, যদিচ ইহাও বাঙ্গলা সাহিত্যের anachronism-এর আর একটি প্রমাণ। আমরা বিপ্রদাসকে শ্রেণীসংগ্রামেরই প্রতীক বলিয়া গণ্য করি, আর সাহিত্যকে এইরূপ ব্যবহার করার উপায় ফ্যাশিস্ট দেশ সমূহেও গৃহীত হইতেছে।

"এইরূপে আমরা দেখি যে, বুর্জোয়াযুগে বাঙলায় একটা বুর্জোয়া-সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে না। তবে আজকালকার অনেক লেখক মধ্যবিত্তশ্রেণীর নায়ক ও নায়িকাকে কেন্দ্র কবিয়া নভেল নাটক লিখিতেছেন। কিন্তু কেবল মধ্য-শ্রেণীয় নায়ক ও নায়িকার গল্প নিয়ে একটা বুর্জোয়া-সাহিত্য গড়িয়া উঠে না। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী ও আমেরিকার সাহিত্যকে যেমন আমরা সম্পূর্ণরূপে বুর্জোয়া-সাহিত্য বলিয়া গণ্য কবিতে পারি, সেই প্রকারে সামন্ততন্ত্রী যুগের প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক ও তাহার কৃষ্টিকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য গডে উঠে তাহাকেই বুর্জোয়া-সাহিত্য বলে। রোমাঁ রোলাঁর ও জোলার পুস্তকসমূহ, আমেরিকায় এমার্সন, হুইটিয়ার, লংফেলো, ওয়াল্ট হুইটম্যান প্রভৃতি এই সাহিত্যিক যুগের প্রতীক। সমাজ সম্পূর্ণরূপে মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থোদ্দেশে চালিত হইলে সেই সমাজের সাহিত্যও নিজের নূতন খাত সৃষ্টি করিবে।

"অবশ্য বাঙলার সমাজ এখনও সম্পূর্ণভাবে "বুর্জোয়াত্ব" প্রাপ্ত হয় নাই, সেইজন্য আমরা একটা খাঁটি বুর্জোয়া-সাহিত্য এখনও উদ্ভূত হইতে দেখি না। কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর কাহিনী নিয়ে যে সাহিত্য গডিয়া উঠিতেছে তাহা এখনও প্রাচীনের প্রভাব কাটিয়া উঠিতে পারে নাই। বুর্জোয়া-সাহিত্যে সাধারণত আমরা আধুনিক লোকের চরিত্র অঙ্কিত হইতে দেখি। তাহারা প্রাচীনের মোহ কাটাইয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৌশলে জগতের ধনসম্পদ ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত। এই জন্য প্রাচীন আইন, বিধিনিষেধ, সমাজবন্ধন ছেদ করে সমাজকে নূতন ছাঁচে গড়িতে চায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমেরিকা, ফ্রান্স, কেমালের তুর্কি প্রভৃতি। কিন্তু আমাদের হালের সাহিত্যে সামাজিক আবর্তনের সেই সুর কোথায়? তাই "পণরক্ষার" মধ্যে দেখি যে নায়ক যৌবনে সমাজ-সংস্কার কর্মে উৎসাহ প্রকাশ করিলেও যখন তাঁহার "তেতালা বাড়ী হইল" তখন "কোনোমতে পারিবারিক পূর্ব-ইতিহাসের এই অধ্যায়টাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সমাজে উঠিবার জন্য তাঁর রোখ চাপিয়া উঠিল। নিজের মেয়েটিকে সমাজে বিবাহ দিবেন এই

তাঁর জেদ······শিক্ষিত সৎপাত্র না হইলেও চলে, কন্যার চিরজীবনের সুখ বলিদান দিয়াও তিনি সমাজ-দেবতার প্রসাদ লাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন।" আবার "হালদার-গোষ্ঠী" পুস্তকে পড়ি—"বড় ঘরের দাবী কি সামান্য দাবী! তাহার যে নিষ্ঠুর হইবার অধিকার আছে। তাহার কাছে কোনো তরুণী স্ত্রীর কিংবা কোনো দুঃখী কৈবর্তের সুখ-দুঃখের কতটুকুই বা মুল্য!" ইহাতে আমরা সেই পুরাতন সামন্তযুগেরই প্রতিধ্বনি শুনি। আবার "চোখের বালি"-র মধ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ঘরের কথা পাই, "এডিপুস কম্প্লেক্স" তথায় বিরাজ করিতেছে। তাহার অনুসরণ ও পশ্চাৎ অনুসরণের পর, victim (বলি) বিনোদিনী বলিতেছে, "ছি ছি, একথা মনে করিতে লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনও হইতে পারে না! ছি, ছি, একথা তুমি মুখে আনিও না।" আবার সে বলিতেছে, "কিন্তু ছি, ছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে! তোমার ঔদার্যে সব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি অকাজ করি—তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহজীবনে আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না।" এই পুস্তকে এডিপুসের victim স্ত্রীলোক হল কাশীবাসিনী আর পুরুষ গোঁফে চাড়া দিয়ে সমাজে মাননীয় হইয়া রহিল! এই নভেলেও পুরুষ প্রাধান্যযুক্ত সমাজের (androcentric theory of society) ছবি প্রদত্ত হইয়াছে, যদিচ এই পুস্তকের যুগেই নরতাত্ত্বিক ও জীবতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিকগণ স্ত্রীলোক ও পুরুষের সমানাধিকারের তথ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

"এই প্রকারে দেখি যে, আমাদের হালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকেরা মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবন অঙ্কিত করিতে যাইয়া সনাতনী খাতে গিয়ে নিমজ্জিত হইতেছেন। এখনও বাঙলার বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে প্রাচীন "অবধূত-গীতা" ও শঙ্করাচার্যের স্তোত্র "কা নরকস্য দ্বারং নারী" মতটা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তবে হালে যে এক প্রকার নূতন সাহিত্যের উদয় হইয়াছে, তাহা একটা বুর্জোয়া-সাহিত্যের অভিমুখে যাইতেছে মনে হয়। কিন্তু ইহা যেন কেবল "এডিপুস কম্প্লেক্সের" অনুসরণ করেই পরিশ্রান্ত হইতেছে। ইহাতে সমাজকে আধুনিক ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার কোনো আদর্শই প্রদত্ত হইতেছে না। ইহাতে জনের সন্ধান বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না—গণের তো নয়-ই। কেবল পাওয়া যায় যৌন-সম্বন্ধের কাহিনী। কিন্তু যৌন-সম্বন্ধই সমাজের একমাত্র অনুষ্ঠান নয়। এই

সাহিত্যে সমাজের বর্তমান সমস্যাগুলির আলোচনা হইতেছে না। অনুমান হয় এক প্রকারের ইয়োরোপীয় ভাবধারা বাঙালী সমাজে আরোপিত করিয়া একটা অস্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা গঠন করা হইতেছে। যৌন-সম্বন্ধের শুধু বিচার করিলেই পুরুষ ও নারীর শেষ প্রশ্নের সমাধান হয় না। আবার নারীর ক্রমাগত স্বামী বা প্রণয়ী পরিবর্তন করাই তাহার সামাজিক "শেষ প্রশ্ন" নয়। ইহা কোন্ সমাজের আদর্শ তাহা জানি না। অন্তত সাম্যবাদী গণশ্রেণী সমাজের তাহা নয়, ইহা নিশ্চিতভাবে জানি। এইজন্য এই সাহিত্যকে পূর্ণভাবে বুর্জোয়া-সাহিত্য বলা যাইতে পারে না। খুব সম্প্রতি আসিয়াছে একটি নূতন ধরনের সাহিত্য,—তাহা গণশ্রেণীর জীবনের বৃত্তান্ত আলোচনা করে। এই বিষয়ে দু' একটি সুন্দর পুস্তিকাও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে একটু "realistic" ছাপ আছে, কিন্তু ইহাকে গণসাহিত্য বলা যায় না। পুস্তকে গণশ্রেণীর জীবন সম্বন্ধে লিখিলেই তাহা গণসাহিত্য হয় না।

"গণশ্রেণীর দুঃখ ও দারিদ্র্য, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের কথা, হৃদয়ের বেদনা ও সুখেচ্ছার কথা লইয়া এবং তাহাকে সমাজের কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার world-view নিয়ে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে তাহাকে গণসাহিত্য বলা যায়। ভারতে অর্থনৈতিক কারণে একটা গণ-আন্দোলন চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহার একটা সাহিত্য এখনও গড়িয়া উঠিতেছে না—ইহাও একটা কাল-ব্যতিক্রম। যেদিন গণশ্রেণীর লোক সাহিত্যে লোকসমাজের চিত্র অঙ্কিত করিবে, সেইদিন একটা জীবন্ত গণসহিত্য উদ্ভূত হইবে।

আমাদের সাহিত্যের পরিস্থিতির কথা যৎসামান্য আলোচনা করা গেল। মোটের উপর দেখি যে আমাদর সাহিত্যে একদিকে সনাতনী খাত প্রবাহিত হইতেছে, অন্যদিকে অদ্ভুত বৈদেশিকভাব আসিতেছে। আমার মতে উভয়ই বেখাপ্পা। আমাদের সাহিত্যে "realism"-এর অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে। আমরা "space and time"কে ঠিকভাবে ধরিয়া চলিতেছি না। তাই একদল নূতন শ্রেণীর লেখকের প্রয়োজন, যাঁহারা বিভিন্ন স্তরের যথার্থ অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন ও পরিবেষণ করিবেন, যাঁহারা সমাজ ও সাহিত্যকে সনাতন গণ্ডী হইতে বাহির করিবেন এবং কালব্যতিক্রমের অসামঞ্জস্যের কবল হইতে রক্ষা করিবেন। সাহিত্যে প্রগতি আনিতে হইলে এগুলির বিশেষ প্রয়োজন। যাহাতে সমাজ যথার্থই অগ্রগতিশীল হয়, তাহাই প্রগতি লেখকদের লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন।"*

* সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রগতি', পৃ ৪৯-৫৪। সমগ্র প্রবন্ধটির জন্য 'প্রগতি' সংকলনের ৩৫-৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য ঃ
আধুনিক লেখকদের অবস্থা / বুদ্ধদেব বসু

"...বাংলাদেশের বুর্জোয়া সমাজ আজ অবক্ষয়ের মুখে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনায় একটি বিরাট জিনিস সম্পন্ন হয়ঃ তা হচ্ছে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসসাধন এবং সেই সঙ্গে দেশে এমন এক বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর উদ্ভব হল ইতি-পূর্বে যার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীটা ছিল অবাধ উন্নতি ও বিকাশের যুগ। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই দুরন্ত প্রভাবে বাংলাদেশে এক মহান সাহিত্যের উদ্ভব হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তই হলেন আধুনিক ভারতের সত্যিকারের প্রথম শ্রেষ্ঠ কবি। যে দুর্বার সাহিত্যধারা তিনি প্রবাহিত করে গেলেন তা শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথে পরিণতি লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের এবং পারিপার্শ্বিক এক শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে দেশের এক সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্যধারার অধিকারী হয়েছিলেন। হিন্দুধর্ম-সংস্কার আন্দোলন—আমরা যাকে বলি ব্রাহ্মধর্ম—তিনি তারই প্রবল অনুপ্রেরণা বা উন্মাদনা লাভ করেছিলেন, শেষপর্যন্ত যা আমাদের এই বুর্জোয়া-সংস্কৃতির শিখরে চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করল। যে সমাজের মধ্যে তিনি অবস্থান করেছিলেন তার সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ উপস্থিত হয় নি এবং নিঃসন্দেহে বলা যায়, তিনি আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করেছেন, এই কাব্যরচনার ব্যাপারটা খুবই প্রয়োজনীয় বা মূল্যবান কাজ। তাঁর অতুলনীয় ব্যক্তিস্বরূপ এবং এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাঁর যে ক্রমবিকাশ বা ক্রমপরিণতি অংশত তা এরই ফলস্বরূপ। কোনো প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য এমন কি কতকগুলি সংস্কারের উত্তরাধিকারলাভ—বিশেষ করে তা যদি প্রাণবন্ত থাকে, কবিদের পক্ষে তা খুবই সহায়ক হয়ে থাকে, যেমন নাকি দান্তে ও মিল্টনের ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

"বোধ হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রতিভা আমাদের বুর্জোয়া-সংস্কৃতির সমস্ত সৃজনশীল ও প্রগতিশীল শক্তিকে আত্মস্থ করে তা প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছে। কেননা কাব্যে অথবা গদ্যে যাঁরাই তাঁর অনুগামী তাঁরা তাঁকে অন্ধভাবে অনুসরণ করলেন আর আজ তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।...যে যুগ

রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করেছে বহুদিন আগেই তা অতিক্রান্ত হয়েছে। আর রবীন্দ্রোত্তর শিল্পীরা,—যাঁরা তাঁদের যুগের তুলনায় অনেক পরে এসেছেন—অতি সহজেই তাঁরা এমন সব প্রচলিত সাহিত্যিকীধারার আকর্ষণে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, আজকের দিনে যার কোনো বাস্তব সত্যতা বা বাস্তবের সঙ্গে যার কোনো মিল নেই। এমনি করে তাঁরা কতকগুলি সংস্কারের ভারবাহক হয়ে পড়েছিলেন—তা যে সমাজেই তাঁরা বাস করুন না কেন। এমনকি শরৎ চট্টোপাধ্যায়—গল্প বলার কলাকৌশলে যিনি খুবই দক্ষতা লাভ করেছিলেন, সামগ্রিকভাবে তাঁর রচনাকার্যও খুব সাফল্য লাভ করতে পারে নি এবং সেটা কতকগুলো মৃতসংস্কার ও গোঁড়ামির প্রতি তাঁর মোহ অনুরক্তির জন্যই সম্ভব হয় নি।

"১৯২০ সালের আগে পর্যন্ত এই নূতনের কণ্ঠস্বর শোনা যায় নি,—আর এই নতুন কণ্ঠস্বর হলো, নজরুল ইসলামের। আমরা তখন বালক, স্বপ্নাবিষ্টের মতো তন্ময় হয়ে আমরা তা শুনতাম। আজ অবিশ্যি মনে হচ্ছে তা খুবই উচ্চ-মানের ছিল, অনেকটা নাটুকে ধরনের।·· কিন্তু এটাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, নজরুলই প্রথম রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের ধারাকে ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যিকারের তরুণবিদ্রোহী এবং দুর্ভাগ্যবশত তিনি আর বেড়ে উঠতে পারলেন না। বাংলাকাব্যে তিনি এমন একটা দুর্দান্ত আকরিক প্রাণশক্তি—এমন এক বন্য ও উদ্দাম উচ্ছ্বাস-উন্মাদনা এনে দিলেন যার অভিঘাতে যা-কিছু ঢিলেঢালা ভাব কোথায় ভেসে গেল। কিন্তু আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যে তিনি তাঁর স্বাক্ষর রেখে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রত্যাবৃত্ত হওয়াব সূচনা হলো এবং বহু দিন আগেই যার বিলুপ্তি ঘটেছে সেই 'কল্লোল' সাহিত্যপত্রকে ঘিরে এক নূতন সাহিত্যসৃষ্টির আন্দোলন শুরু হলো।······

"আজ একথা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যে এই মূষিক-বিবর থেকে জোর করে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের নূতন সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। কোনো সন্দেহ নেই, গণসংযোগ (mass-contact) অর্থে এখানে কৃষক ও কলকারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কথাই বলা হচ্ছে। কেন-ই বা তাদের সম্পর্কে না-লিখব?—নতুন সমাজব্যবস্থার সম্পর্কে কেনই বা চিন্তা করব না? সত্যি কথা, প্রকৃত জনসংযোগ স্থাপিত হলে পরে আমাদের সাহিত্যে এক অভূতপূর্ব প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হবে। কিন্তু সত্যিকারের অভিজ্ঞতা আর তত্ত্বগত

অনুভূতি— এ দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় তা আমাদের বুঝে নিতে হবে। ···আমাদের সাহিত্যিকী ভাবাবেগগুলির সম্পর্কে লেখাটা সহজ হলেও, মূলত তা ভুল পথে হবে। কেননা এখনো পর্যন্ত খুব অল্প সংখ্যক লেখকদেরই শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে, কারণটা স্পষ্ট। আজ যদি আমরা ওদের সম্পর্কে লিখি তাহলে আমাদের নীচে তাদের স্তরে দাঁড়িয়েই তাদের মতো করে লিখতে হবে, কেননা আমাদের মতো দেশে যেখানে অক্ষরজ্ঞানের সংখ্যাই অতীব নগণ্য, সেখানে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে আছে। আর এই নীচে তাদের স্তরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলে আমরা তাদের প্রতি এবং সেই সঙ্গে নিজেদের প্রতিও সুবিচার করব না। সে যাই-ই হোক, কাব্য লিখে কিন্তু আমরা সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে পারব না ;—তার জন্য আমাদের 'কাজ' করতে হবে।······

"যদি কোনো তরুণ লেখক মনে করে থাকেন যে মজুর ধর্মঘট অথবা সাংহাই বোম্বারি ইত্যাদি লিখলেই তাঁর দ্রুত সাফল্য লাভ ঘটবে তাহলে তাঁর এই অন্বেষণ সত্যিই খুব দুঃখজনক ব্যাপার হবে, – বিশেষ করে তিনি যদি প্রতিভাসম্পন্ন হন। অবশ্যি আমি এ কথা মুহূর্তের জন্যও বলিনা যে, যখন চারিদিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তখন লেখক তা থেকে দূরে বা নির্লিপ্ত থাকবেন কিংবা থাকতে পারবেন। পরন্তু, প্রয়োজন হলো আরও মহত্তর ও আশু লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে আসুন আমরা সমস্ত লেখকরা মিলে প্রোপাগ্যাণ্ডা বা প্রচার-কার্যে নিজেদের নিয়োজিত করি। কিন্তু একথা যেন না বলি যে এটাই হচ্ছে সাহিত্যের সর্বোচ্চ দিক বা আদৌ এটা সাহিত্য। কেননা যদিও সমস্ত শিল্প-কর্মই গভীর অর্থে প্রচারকার্য, সমস্ত প্রচারকার্যই কিন্তু শিল্পকর্ম বা আর্ট নয়।" *

---

* দ্র. নেপাল মজুমদার, 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ', পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৭৬-৭৯।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার আশুতোষ হলে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে-র দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে বুদ্ধদেব বসু 'Bengali literature To-day : Position of modern writers' নামক যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন তার প্রয়োজনীয় অংশের নেপাল মজুমদার-কৃত ভাবানুবাদ এখানে প্রকাশ করা হলো। এই রচনাটিকে কেন্দ্র করে তৎকালে প্রচণ্ড বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। —সম্পাদক

সাহিত্যের শ্রেণীবিচার প্রসঙ্গে / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"…ডিক্টেটরি বুদ্ধি যতই গরম হয়ে ওঠে ততই সেই নেতারা ভুলে যায় যে, তারা সর্বজ্ঞ নয়। মানুষকে চালনা করবার নেশা এমনি তাদের পেয়ে বসে যে সকল বিষয়েই মানুষকে নাকে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে উগ্রভাবে উদ্যত হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য ডিক্টেটররা কেবল রাষ্ট্রিক ব্যাপারে নয়, সামাজিক বিধানে নয়, সাহিত্যে-আর্টেও আপন শাসন রুদ্রভাবে প্রকাশ করছে।……

"তোমার মনে আছে কিনা জানিনে, যখন মস্কৌতে গিয়েছিলুম তখন প্রসঙ্গক্রমে চেকভ-এর প্রতি সমাদর প্রকাশ করেছিলুম। তখনি দেখা গেল সেটা স্থানকাল পাত্রোচিত হয় নি। চেকভ আধুনিক রুশ-বিদ্রোহকালের পূর্বেকার লেখক। তিনি বুর্জোয়া, তাঁর রচনা প্রোলিটেরিয়েট যুগের সম্মান পংক্তিতে বসতে পারে কি না বোধ করি এই সংশয় প্রবল ছিল। আমার আশা ছিল তাঁর চেরি অর্চর্ড নাটকখানির অভিনয় দেখবার সুযোগ ঘটবে। সেটা সম্ভব হোলো না। হিটলারি শাসনেও শুনতে পাই ভালো ভালো বই জাতের ছুতো তুলে তিরস্কৃত। ছবি প্রভৃতিরও সেই দশা। হিটলারই মেলবন্ধন করেন। নাজি-নীতি অনুসারে সাহিত্যের কে কুলীন কে অন্ত্যজ, তাঁর উপরেই তার নিষ্পত্তির নির্ভর। ব্যাপারটা যে অত্যন্ত হাস্যকর, সেটা চাপা পড়ে গিয়েছে এর শোচনীয়তার তলে।

"সেদিন কোনো এক বাংলা কাগজে দেখা গেল, আমরা এখানকার কবিরা যদিও রাশিয়ান নই, তবুও আমাদের কবিতারও শ্রেণীবিচার হচ্ছে সোভিয়েট আদর্শে; ভাবের দিকে সে রচনা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে নয়, জাতের দিকে সে বুর্জোয়া কি প্রোলিটেরিয়েট এই নিয়ে। সেদিন কাগজে দেখলুম—সত্যমিথ্যা জানিনে,—কোনো বিভাগে হিন্দুর চাকরি দুর্লভ হওয়াতে কোনো হিন্দু উমেদার মুসলমান ধর্ম নিয়েছিল। আধুনিকতার বাজারে আন্তরিকতা বা ভালোমন্দ বিচার না ক'রে রচনাকে প্রোলিটেরিয়েট সাজে সাজানো হয় তো কালক্রমে দায়ে পড়ে চলতি হোতে পারে। আমাদের সন্তোষ এক কালে কতকগুলি

সাঁওতালি গান সংগ্রহ করেছিল, জানিনে সে গান বুর্জোয়া কি প্রোলিটেরিয়েট। না জেনেও তার মধ্যে কোনো কোনো গান খুব ভালো লেগেছিল। তার থেকে প্রমাণ হবে কি যে, সেগুলি বুর্জোয়া। যখন ময়মনসিংহ গীতিকা হাতে পড়ল খুব আনন্দ পেয়েছিলুম। শ্রেণীওয়ালাদের মতে এসব কবিতা হয়তো বা প্রোলিটেরিয়েট, কিন্তু আমি তো জাত-বুর্জোয়া, আমার ভালো লাগতে একটুকুও বাধে নি। ভাঁটার দিনে যখন উপরকার প্রবাহের প্রবল ঐশ্বর্যের চেয়ে তলাকার নুড়িপাথর-পাঁকের প্রাধান্য জোর পেয়ে ওঠে তখন প্রোলিটেরিয়েট নুড়ি-বালির আদর্শেই কি নদীর শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করতে হবে। মানুষত্বের আদর্শের চেয়ে জন্মগত শ্রেণীগত আকস্মিকতা বেশি অভ্যর্থনা পায় সমাজের দুর্দিনে। সে দুর্দিন সকল সমাজে সকল সময়েই দেখা যায়। কিন্তু সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আন্তরিক শ্রেষ্ঠতার আদর্শ বাহ্যিক শ্রেণীভেদের উপর নির্ভর করে নি —এখন পাশ্চাত্য মহাদেশের কোনো কোনো প্রদেশে সামাজিক গোঁড়ামি সাহিত্য নিয়েও যদি জাত-ঠেলাঠেলি করতে থাকে তাহলে আমরা তাতে কেন যোগ দিতে যাব।

"আমাদের সামাজিক বৈঠক কি এতকাল জাত-যাচনদারি নিয়ে যথেষ্ট সরগরম ছিল না—শেষকালে কি জাত-মানা মত্ত হস্তী সাহিত্যেরও পদ্মবনে ঢুকে পড়বে। আমি বুঝতে পারি এর আন্তরিক কারণটা। নতুন যুগে সাহিত্য আপন রচনায় আপন কালের বিশেষ সাক্ষ্য দেবে, সময়ের এই দাবিটা মনকে চঞ্চল করেছে। যুগে যুগে গুটি কেটে বেরোয় সাহিত্যের প্রজাপতি, বাণীর ডানায় নূতন রঙের ছাপ লাগিয়ে। কিন্তু সেটা লাগে সহজে প্রাণধর্মের তাগিদে। আমাদের বর্তমান সাহিত্যে তেমনি ক'রেই কি একদিন নবজীবনের রং লাগে নি। এমন কি অল্পকাল আগে হেম বাঁড়ুজ্যে নবীন সেন তাঁদের কাব্যে যে প্রসাধন নিয়ে দেখা দিয়েছিলেন সে কি আজ সম্পূর্ণ বদলে গেল না। তা নিয়ে সাহিত্যের চণ্ডীমণ্ডপে জাতবদলের কি কোনো তর্ক উঠেছে। রাধিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় বিদ্যাপতি কিছু মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন, বলেছেন, 'শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল'। এ তো মিলেই থাকে—এ নিয়ে তো সমাজে শৈশব এবং যৌবনের দুই বিরুদ্ধ দলে হাতাহাতি করে না। তার পরে স্বভাবের নিয়মে প্রৌঢ় বয়সও আসে, তখন সাজগোজ আপনি ঘুচে যায়, আগেকার মতো সংকোচ ক'রে সামলে কথা কওয়াটার প্রয়োজন থাকে না। ভাষাটা স্পষ্ট হয়, তার মধ্যে বুদ্ধির

পরিণতি দেখা দেয়—কিন্তু তাই ব'লে যে সেটা বেহায়াগিরি আকারে তা নয়—তার ভাষার অকুণ্ঠিত তেজটা সহজ; সহজেই সে ভাষা অশ্লীল হয় না যদি সে ভদ্রঘরের মেয়ে হয়। সাহিত্যেও আয়ুর পর্বে পর্বে বয়ঃসন্ধি ঘটে। যদি সত্যিই ঘটে তাহলে সেটাকে নিয়ে অস্বাভাবিক ভাবে গলা চড়াবার দরকার হয় না।—দাবি বুঝে দরজি আপনিই মাপের এবং ছাঁটকাটের বদল ক'রে থাকে।

"আমাদের সাহিত্যে সেই আন্তরিক পরিণতি স্বভাবত ঘটে নি। প্রকাশে নতুনত্ব হওয়া উচিত এই ব্যগ্রতা মনকে অস্থির করেছে। নকল নতুনত্ব দেখলেই চিনতে পারি কোন দোকান থেকে তার আমদানি। কেননা যে-সব স্বকীয় রীতি বা মুদ্রাভঙ্গী ব্যক্তিবিশেষে স্বাভাবিক তারও অনুকরণ দেখলে বোঝা যায় এটা আধুনিকতার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সাজ। এক বয়সে মোলায়েম মুখে গোঁফ ওঠাবার জন্যে কিশোরদের অধৈর্য দেখা যায় এও তেমনি। এ ক্ষেত্রে এই উপদেশ মানতে হবে আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে গোঁফ আপনিই উঠবে। যদি প্রকৃতির বিশেষ খেয়ালে গোঁফ একেবারে না ওঠে তাহলে মেয়েলি মুখের উপর বার বার ক্ষুর বোলাতে থাকো, হয়তো ফল পাবে, হয়তো ফল পাবে না। উপায় কী।

"ইতিমধ্যে সাহিত্যের প্রোলিটেরিয়েট-বুর্জোয়ার অর্থাৎ অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদের ছাপ মারবার যে অদ্ভুত উত্তেজনা আমাদের দেশে দেখা গেল সেও ঐ একই উত্তেজনার অঙ্গীভূত। সাহিত্যে এ-রকম শ্রেণীভেদ অত্যন্ত নূতন সন্দেহ নেই, কেননা অত্যন্ত অসংগত। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে সম্প্রতি রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় মুসলমান কর্তৃত্বের উপলক্ষ্যে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক শাসনের যে নূতনত্ব রুদ্রমূর্তি ধরল তার উপরে সোভিয়েট বা নাজি শাসন চালানো যায় যদি তাহলে তো নৌকাডুবি হবে। সাহিত্যে রাষ্ট্রনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পায় না তা বলি নে কিন্তু সে যদি ফৌজদারি মামলা চালাবার মোক্তারি করতে ব্যস্ত হয়ে বেড়ায় তাহলে দেশবিদেশের সাহিত্যে মড়ক লাগবে যে। তাহলে সাম্প্রদায়িক শাসনকর্তারা একদিন ইংরেজি সাহিত্যকেও আমাদের বিদ্যালয় থেকে নির্বাসন দেবেন—কেননা ঐ সাহিত্য খ্রীষ্টানের সাহিত্য হোলেও পৌত্তলিক দেবদেবীর নামে ও ভাবরসে সমাকীর্ণ, অভিষিক্ত। অবশেষে কোনো এক ভবিষ্যতে যদি দেশে বলশেভিক নীতি ও ব্যবস্থার প্রাধান্য ঘটে, তাহলে? এখন

তো কর্তাদের আমলে আমার রচনা এখানে ওখানে মুসলমানি ছুরির খোঁচা খায়, তার নাকের সামনে তর্জনীও ওঠে। মার্ক্সিজমের কোন্ গোরস্থান সামনে আছে ?" *

[প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪৬ ; পৃ. ৮-১০]

* রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠির নির্বাচিত অংশ। এই চিঠিখানি ১৯৩৯ সালের ১৭ মার্চে লেখা। 'প্রবাসী'তে এটির শিরোনাম ছিল 'পত্রালাপ'। ১৯৩৮ সালে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সারা ভারত সম্মেলনে বুদ্ধদেব বসু যে-প্রবন্ধটি পাঠ করেন এবং রবীন্দ্রনাথ 'ডাক্তার অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী, কল্যাণীয়েষু'-কে সেই প্রবন্ধের জবাবে প্রসঙ্গক্রমে যে মতামত ব্যক্ত করেন, আমরা নতুন শিরোনামে সেই প্রাসঙ্গিক বক্তব্যটুকুই এখানে প্রকাশ করছি। এখানে উল্লেখ্য, বুদ্ধদেব বসু-র প্রবন্ধটি তৎকালে 'শনিবারের চিঠি' ও 'পূর্বাশা' পত্রিকাতেও যথেষ্ট তীব্রতার সঙ্গে সমালোচিত হয়। সেই সমালোচনার প্রাসঙ্গিক অংশের জন্য এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। —সম্পাদক

"ছিন্ন কর ছদ্মবেশ" / সরোজকুমার দত্ত

বিগত প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনে বুদ্ধদেব বসু-র অভিভাষণ[1] আমরা যথাযোগ্য অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছি। কিছুদিন হইতে বিস্মিত আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিতেছিলাম তাঁহার দৃষ্টিতে একটি আকস্মিক স্বচ্ছতা আসিতেছে, মর্মাহত কবির আত্মাভিমান সামাজিক চেতনার উত্তাপে তরল হইয়া আসিতেছে। ইহারই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি আশা করিতেছিলাম তাঁহার প্রগতি সাহিত্য-সম্মেলনের বক্তৃতায়। আমরা নিরাশ হইয়াছি। কেন হইয়াছি এই সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনা করিতে চাহি।

সমাজের শ্রেণীবিভক্ত রূপ, সাহিত্যের সমাজসাপেক্ষতা ও সাহিত্যিকের সামাজিক অস্তিত্বের প্রাধান্যকে স্বীকার করিয়া বুদ্ধদেব বাবু আমাদের আলোচনাকে অনাবশ্যক বিস্তৃতির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আধুনিক বাঙালী সাহিত্যিকের অবস্থা সম্পর্কেও তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদ নাই। কিন্তু যে 'Solid block of middle class opinion'-এর অশ্রদ্ধায়, বিদ্বেষ ও প্রতিবন্ধকতায় তাঁহাদের রচনা পঠিত ও বিক্রীত হয় না বলিয়া শ্রীযুক্ত বসু দুঃখ করিয়াছেন, যদি সেই 'Solid block'-এর বিরুদ্ধে তিনি লেখনী চালনা করিয়া থাকেন, তবে এই পরিণামকে তিনি অনিবার্য জানিয়াই করিয়াছেন, কারণ নিজের নিন্দা কেহ পয়সা দিয়া শোনে না। আপনার নির্যাতনের এই সাড়ম্বর বর্ণনায় যদি কেহ আশাভঙ্গের দীর্ঘশ্বাস শুনিতে পায় তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়ের সক্রিয়তা সম্বন্ধে আমরা সন্দেহ করিতে পারি না। রাজা লিয়ায়ের উন্মত্ততার

১. ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে বুদ্ধদেব বসু 'Bengali literature to-day: Position of modern writers' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধটির কথাই এখানে লেখক উল্লেখ করেছেন। —সম্পাদক

মূলে স্নেহাস্পদের বিশ্বাসঘাতকতা, পিতার কন্যাবিদ্বেষ নহে। এই 'Solid block'-এর বাহিরে যাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা শ্রীযুত বসু ও তাঁহার সম্প্রদায় আশা করিয়াছিলেন তাঁহাদের একদলের অর্থ ও সময়ের অভাব অপর দলের সম্বন্ধে—"the greatest imaginable gulf between the working class and the intelligentia." অতএব অবস্থা শোচনীয় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নাই। সমস্ত ব্যাপারটি সংক্ষেপে দাঁড়াইতেছে এই—pro-middle class middle class-এর বিদ্যা ও বুদ্ধির অভাবে, anti-middle class middle class-এর অর্থ ও সময়ের অভাবে ও working class-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাবে বুদ্ধিজীবীর শ্রদ্ধা ও অন্ন জুটিতেছে না। অথচ শ্রদ্ধা ও অন্ন না জুটিয়ে বুদ্ধিজীবী বাঁচিতে পারে না একথা বুদ্ধদেব বাবু স্বীকার করিয়াও অস্বীকার করিতেছেন। Positive দারিদ্র্যের সহিত কাল্পনিক কৌলীন্যের ব্যর্থসমন্বয়ের বিকৃতি বুদ্ধদেব বাবুর ভাষায়ই সুপরিস্ফুট—"The fact that Bengali Literature is produced by the bourgeoisie and for the bourgeoisie need not depress us ; for a piece of genuine literary work must be above all honest. Even if he has no more than a dozen readers, the writer can but write as he feels. But it is bad, very bad, for a writer to have a dozen readers……" তথাপি বুদ্ধদেব বাবু লিখিতেছেন, "We have the great virtue of not having any illusion. We feel in our bones that the present state of things is intolerable and a new social order must come in its time. And meanwhile ? Suffering, boredom and horror in life and so in literature." এখানে বুদ্ধদেব বাবুর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব দিবালোকেব মতো সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শোষণমুক্ত নবীন সমাজ আসিবেই, যতদিন না আসিবে ততদিন সমাজে যন্ত্রণা, বিরক্তি ও বিভীষিকা থাকিবেই এবং সাহিত্যেও ইহাই প্রতিফলিত করিবে। অর্থাৎ সাহিত্যের কোনো দায়িত্ব নাই, কাজ নাই—সমাজে যাহা ঘটিতেছে সাহিত্য mechanically তাহাই প্রতিফলিত করিয়া যাইবে এই ধারণা যেমন অবৈজ্ঞানিক আত্মপ্রতারণা মাত্র, তেমনই বিপ্লবোত্তর সমাজ এই সাহিত্যের রক্ষণভার গ্রহণ করিবে ইহাও শিশুসুলভ দুরাশা ভিন্ন

আর কিছুই নহে। প্রগতি আন্দোলন মাত্রেই আশা ও সাহসের আন্দোলন— বিরক্তি ও বিভীষিকার স্থান তাহাতে নাই। বিরক্তি ও বিভীষিকার সাহিত্য প্রগতি সাহিত্য নহে, ইহা বিশদভাবে বুদ্ধদেব বাবুকে বুঝাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। ঐতিহাসিক অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস কর্মবিমুখতার ছদ্মরূপ।

শ্রমিকজীবন লইয়া সাহিত্যরচনায় বুদ্ধদেব বাবু অভিজ্ঞতার অভাবজনিত অক্ষমতা স্বীকার করিয়াছেন। এ স্বীকৃতি মূল্যবান। এ আবহাওয়া তাঁহার নিকট অপরিচিত ও এ সম্বন্ধে তিনি 'as a man' বোধ করিতে পারেন না, অথচ শ্রমিকজীবন লইয়া সাহিত্যরচনার প্রয়োজনকে তিনি পরোক্ষভাবে বৈপ্লবিক প্রয়োজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমান সমাজের যে স্তর সমাজবিপ্লবের অগ্রগামী পরিচালক তাহার সম্বন্ধে actual experience তাহার নাই— কেবলমাত্র Ideological Sympathy সম্বল—একথা সুস্পষ্ট স্বীকার করিয়াও ন নিজেকে প্রগতি সাহিত্যিক বা বিপ্লবী আর্টিস্ট বলিতে চাহেন, তিনি প্রগতি ও বিপ্লবের অনিষ্ট করেন, এ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু দ্বিমত হইবেন না আশা করি। মসীকৌলীন্যের অভিমান ত্যাগ করিয়া Individual talent ধ্বংসী সমাজের ধ্বংসে Individual talent সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিয়া Individual talent প্রতিপালক নবীন সমাজসৃষ্টির প্রচেষ্টায় লেখনীধারণই একমাত্র প্রগতি-সাহিত্য রচনা।

আমরা আশা করিয়াছিলাম বুদ্ধদেব বাবু আপনাদের অপূর্ণতা, ভ্রান্তি ও অক্ষমতা আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া নূতন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিবেন,— নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের declassed দুর্গতদের Ideological clarity-র জন্য লেখনী ধারণ করিবেন, কিম্বা বর্তমান কালের প্রগতি সাহিত্যরচনায় আপনাদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া সাহিত্যমঞ্চ হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। এই অক্ষমতা অভিভাষণে তিনি পরোক্ষভাবে একাধিকবার স্বীকার করিয়াছেন। তিনি সব স্বীকার করিয়াও আপনার অভিমানকে স্বীকার করিতে পারেন নাই, এবং পারেন নাই বলিয়া আমাদের প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের Ideological front দুর্বল হইয়া পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা। ব্যক্তিগতভাবে সমগ্র অভিভাষণটি বুদ্ধদেব বাবুর প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি। আশাকরি অচিরেই তিনি এই সংশয় কাটাইয়া উঠিয়া নিজের অর্ধোচ্চারিত আহ্বানকে পরিষ্কার

কণ্ঠে ব্যক্ত করিবেন—'for a greater and more immediate end, let us harness all writers to obvious propagnada work.' বুদ্ধদেব বাবুর পাণ্ডিত্য ও রচনাশক্তিতে আমরা চিরকালই বিশ্বাসবান—আমরা তাঁহার প্রখর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আশা করি। উপসংহারে তাঁহার ভাষাতেই তাঁহাকে বলি, 'বৃহন্নলা, ছিন্ন করো ছদ্মবেশ'।*

*অগ্রণী, প্রথমবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯, পৃ. ৮১-৮৩। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক

অতি আধুনিক বাংলা কবিতা / সরোজকুমার দত্ত

১৯৩৮ সালের শেষভাগে কলিকাতায় নিখিল ভারত প্রগতি সম্মেলনের যে অধিবেশন হয় তাহাতে শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীসমর সেন আপন আপন সাহিত্য-রচনার বৈপ্লবিকতা ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়া দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুত বুদ্ধদেব বসু-র প্রবন্ধ সম্পর্কে আমরা প্রথম বর্ষের 'অগ্রণী'-র দ্বিতীয় সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি, উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুত সমর সেনের রচনার সমালোচনা করিতে বসিয়া তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন। কারণ, প্রথমত ঐ প্রবন্ধটি (In Defence of Decadents) নাকি বিশেষ প্রতিপত্তিশালী উদীয়মান এক লেখক-সম্প্রদায়ের সাহিত্যিক অভিমত সুসম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতেছে, অর্থাৎ উহা কোনো সুসম্বদ্ধ দলবিশেষের সরকারী ইস্তাহারের সামিল এবং দ্বিতীয়ত উহা আলোচ্য কাব্য-পুস্তিকার গ্রন্থাকারের আত্মসমর্থন—In defence of 'Decadents.' সমালোচকের সময়াভাব ও 'অগ্রণী'র স্থানাভাব বশত প্রবন্ধটি হইতে বিস্তৃত আক্ষরিক উদ্ধৃতি সম্ভব নহে। সংক্ষেপে উহার মুখ্য বিষয়গুলি এই : (১) ধনতন্ত্রী সমাজে যে প্রগতি শুরু হইয়াছে বিপ্লবোত্তর সাম্যবাদী সমাজে সেই প্রগতি অব্যাহত চলিবে, অতএব প্রবন্ধকার আশাবাদী ও প্রগতিতে বিশ্বাসী ; (২) ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রী সমাজ 'decadent' অতএব এ সমাজে সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা অসম্ভব এবং decadent সাহিত্যই একমাত্র আন্তরিক সাহিত্য। এই আন্তরিকতার জন্য decadent হইয়াও তাঁহাদের সাহিত্যে বৈপ্লবিক শক্তিমত্তা বর্তমান। নজীর ইংরেজ কবি T. S. Elliot-এর কাব্য ; (৩) ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে কোনোরূপ অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি ; (৪) কিষাণ-মজদুর লালঝাণ্ডা-ব্যারিকেড সংঘর্ষ লইয়া নাকি তাঁহাদের উত্তেজক সাহিত্য রচনার নির্দেশ অথবা ফরমাইস দেওয়া হইতেছে এবং ঐ সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহাদের না থাকায় রোমান্টিক হইবার ভয়ে ঐ নির্দেশ বা ফরমাইস তাঁহারা পালন করিতে পারিতেছেন না।

অতএব, গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা, সমর সেন, কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ কলিকাতা, ১৩৪৬।১

কবির (১) অভিমত সম্পর্কে কবির সহিত আমাদের কোনো বিরোধ নাই, আমরাও আশাবাদী ও সাম্যবাদী সমাজ ও প্রগতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু (২) অভিমতে কর্মভীরু বুদ্ধিজীবীর চিন্তার অন্তঃসারশূন্যতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রী সমাজ (আমাদের সমাজ কি সম্পূর্ণরূপে ধনতন্ত্রী?) যে decadent, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সে সমাজে সত্য, শিব ও সুন্দরের (as they are) সাধনা অসম্ভব, স্বীকার করি। কিন্তু বিগতপ্রাণ সত্যশিবসুন্দরের পুনরুজ্জীবনের (Revival-এর নহে) সাধনাও কি অসম্ভব? এ সাধনা চক্ষু মুদিয়া, শিরদাঁড়া খাড়া করিয়া পন্দিচেরী-মার্কা সাধনা নহে, কিংবা মাঘোৎসবের সাম্বৎসরিক শান্তিপাঠ ও মানবকল্যাণ কামনাও নহে। এ সাধনার অর্থ—সংগ্রাম, stuggle. সমাজ যেখানে decadent, সামাজিক কোনো আন্দোলনকে সেখানে বিপ্লবীরূপ পরিগ্রহ করিতে হইলে আপনার অঙ্গ হইতে decadence-এর শেষ দাগ পর্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে হইবে, সেইজন্য decadent-সমাজ হইতে উদ্ভূত সামাজিক বিপ্লবী আন্দোলন communism-এ হতাশা, অবসাদ, আত্মবিলাপ সাফল্য-স্বপ্নভীরু পরাজিতের ক্লীবকান্নার স্থান নাই। চিন্তা, কর্ম ও উৎপাদনের উদ্দাম বিশৃঙ্খলার মধ্যে classical শৃঙ্খলাই এই আন্দোলনের উপজীব্য ও justification. Decadence-এর অবলুপ্তি প্রচেষ্টাই communism-এর সার্থকতা। বর্তমান decadent যুগের যদি কোনো আন্দোলনে যুগধর্মের অজুহাতে decadence প্রবেশ করে এবং যুগধর্মেরই দোহাই পড়িয়া কায়েমী হইয়া বসে, রাষ্ট্রিক হোক, সাহিত্যিক হোক, সে আন্দোলনকে decadent অতএব reactionary বলিবার নিষ্ঠুর কর্তব্যজ্ঞান যেন আমাদের থাকে। কোনো সাহিত্য যদি ক্ষয়িষ্ণু গলিত সমাজের উপদংশ ক্ষতগুলিকে যথাসম্ভব যথাযথভাবে প্রতিফলিত করে, এবং তথাপি উদ্দেশ্যবিহীন হয় কিংবা কোনো ভাবাদর্শের সহিত সংশ্লিষ্ট না হয় তবে

১, 'অগ্রণী' পত্রিকায় প্রবন্ধটি এইভাবেই সাজানো আছে। সমর সেন-এর কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গেই প্রবন্ধ-লেখক ১৯৩৮ সালে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে পঠিত ও বহুবিতর্কিত সমর বাবুর 'In Defence of the Decadents' প্রবন্ধটিকেও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। —সম্পাদক

উহা যান্ত্রিক ও জড়ের জঞ্জাল হইতে বাধ্য এবং সাহিত্যিকের পক্ষে উহা এক নিকৃষ্ট শ্রেণীর লালসা নিবৃত্তির উপায়ও বটে। উপায় ও ভাবাদর্শই সাহিত্যের অন্তর, ইহাদেরই যুগল নিকষে সাহিত্যের আন্তরিকতার পরীক্ষা হয়। Decadent সমাজের সাহিত্যে decadence আন্তরিকতার লক্ষণ নহে, ইহা কর্মবিমুখতা ও গোপন বিপ্লব-বিরোধিতার নামান্তর মাত্র। ইহা subjective initiative-এর অস্বীকার এবং আত্মনিষ্ক্রিয়তা সমর্থনকল্পে ঐতিহাসিক অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস। ইহা marxism নহে। বর্তমান জগতে marxism ভিন্ন অন্য কোনো ভাবাদর্শ যে বৈপ্লবিক নহে একথা আমি বলিতে চাহি না; আমি বলিতে চাহি যে, যাহা marxism নহে তাহাকে marxism বলার মধ্যে বিপ্লব বা প্রগতির নামগন্ধও নাই। নিজের কাব্যের বৈপ্লবিকতা সপ্রমাণের জন্য শ্রীযুত সেন ইংরেজ কবি T.S. Elliot-এর নাম করিয়াছেন কিন্তু একথাটি সুকৌশলে চাপিয়া গিয়াছেন যে T.S.Elliot নিজেকে কোনোদিন marxist বলেন নাই, বরঞ্চ তাহার সাম্যবাদ-বিরোধিতা যে Roman Catholic Church ও মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রে বিশ্বাসে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহা তিনি স্পষ্টরূপেই স্বীকার করিয়াছেন। এ উক্তি তাঁহার সাহিত্যের সহিত সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস। ব্রিটিশ Decadence-এর সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা T. S. Elliot নিষ্কলুষ decadence-এর সুদীর্ঘ পদাবলী রচনা করিয়া গেলেন অথচ তিনি Roman Catholic Monarchy-তে বিশ্বাসী। বলা বাহুল্য, সাম্যবাদের শত্রু, চিরজীবন ধরিয়া তিনি Decadence নিঙড়াইয়া গেলেন, এক ফোঁটা বিপ্লব পাওয়া গেল না। শ্রীযুত সেন হয়তো বলিবেন যে তাহার সাহিত্যের objective মূল্য সম্পর্কে তিনি সচেতন নহেন, প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যিকের সাহিত্য বিপ্লবী সাহিত্যের ভিৎ তৈয়ারী করিয়াছে। কিন্তু তিনি গলিত ক্ষত দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া পাতার পর পাতায় তার বর্ণনা-বিলাস করিলেন, গলিত ক্ষত আর কাহারও দেখিতে না হয় তজ্জন্য যাহার কাব্যে কোনো উৎকণ্ঠা বা প্রচেষ্টা দেখা গেল না, বিপ্লবী উৎকণ্ঠা বা বিপ্লবী প্রচেষ্টাহীন এই বিশুদ্ধ cynicism-এর উপর ভবিষ্যৎ বিপ্লবী সাহিত্যের ভিৎ যাহারা গড়িতে চাহেন তাহারা হয় নির্বোধ, না হয় প্রবঞ্চক। সাম্যবাদীগণ ইলিয়টী সাহিত্যকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেন, marxist সেন তাহাকে বিপ্লবী বলেন, কারণ 'Peoples-say.'

ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে কোনোরূপ অভি-

ব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি নহে, living, Passionate ও Sensitive মনে এই অন্তঃসারশূন্যতার প্রতিক্রিয়াই প্রতিফলিত হয় বিপ্লবী সাহিত্যে, আন্তরিকতার খড়গাঘাতে নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কবিলাস সেখানে মুহূর্তে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। তাই একদা যখন রোমাঁ রোলাঁ গান্ধী-রামকৃষ্ণে বিশ্বাসী ছিলেন তখনও তাঁহার সাহিত্য বিপ্লবী সাহিত্য ছিল, প্রাকৃবলশেভিক গর্কির সাহিত্যের বৈপ্লবিকতাকে বলশেভিকরা অস্বীকার করিতে পারেন নাই, অহিংস টলস্টয়ের সাহিত্য সম্পর্কে লেনিনের প্রশংসোচ্ছ্বাস তো বহুবিদিত। ভাবাদর্শের দিক হইতে দেখিলে D. H. Lawrence-এর সাহিত্যে প্রতিক্রিয়ার চূড়ান্ত কিন্তু ভাবাদর্শ তো এখানে মুখ্য নহে। তাহার ভাববলিষ্ঠ জীবন্ত মন পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে যে রক্তসিক্ত পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, তাহার বিপ্লবীরূপকে অস্বীকার করিব কোন দুঃসাহসে? অপরপক্ষে অলডাস হাক্সলির গান্ধীবাদে বিশ্বাস কি আন্তরিক? যিনি জীবনে ভালোমন্দ কিছুতেই কোনোদিন বিশ্বাস করিলেন না, তাহার এই হঠাৎ-বিশ্বাসের পশ্চাতে কি বিরাট ফাঁকি নাই? মন যেখানে জাগ্রত ও জীবন্ত, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও প্রবহমান পারিপার্শ্বিকতার আঘাতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও ভাবাদর্শ সেখানে আন্তরিকতায় উদ্বেল এবং ক্রমবিবর্তনের বেদনাময় পথে সত্য উপলব্ধির অভিমুখে গতিমান। এই সত্য উপলব্ধির পথে পরিবর্তনশীল ভাবাদর্শের প্রতিটি মুহূর্ত বৈপ্লবিক, বেদনায়, উৎকণ্ঠায়, আর্তক্রন্দনে নিবিড়। Decadence-এর প্রতিটি বন্ধন-রজ্জু ছেদনের সঙ্গে সঙ্গে তাই তাহার আর্ট হইতে যন্ত্রণার আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠে। শেষরজ্জু ছিন্ন হইবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাহার শান্তি নাই। এই অশান্তি, উদ্বেগ ও আর্তনাদ, মহাভুজঙ্গের নির্মোক পরিহারের এই প্রতিটি মুহূর্ত বৈপ্লবিক—Revolutionary evolution towards a revolutionary ideology. ইহা নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কজীবীর বিলাপ-বিলাস নহে। ইহা decadent সমাজের progressive বুদ্ধিজীবীর প্রাক্‌বিপ্লবী জীবনের বৈপ্লবিক পাথেয়। বর্তমান ইয়োরোপীয় সাহিত্যে রোলাঁ, বার্বুস ও মালরোর শ্রেণীবিচ্যুতির পশ্চাতে এই প্রচণ্ড বেদনার ঐতিহ্য বর্তমান।

শ্রীযুত সেন ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের অধিবাসী অথচ বিপ্লবী। অতএব, স্বভাবতই আমরা তাঁহার কাব্যে ভাবাদর্শের বেদনাময় পরিণতির একটি পথরেখা আবিষ্কার করিব। কিন্তু কোথায় সে পরিণতি? ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ক্ষয়িষ্ণু কবি শ্রীযুত সমর সেনের সাম্যবাদী ভাবাদর্শ উর্বশীর মতো "যখনি জাগিলে বিশ্বে

যৌবনে গঠিতা, পূর্ণ প্রস্ফুটিতা"। কবি ক্ষয়িষ্ণু বলিয়া কাব্যও ক্ষয়িষ্ণু হইবে, কিন্তু ভাবাদর্শ হইল সমস্ত ক্ষয়, অপচয়ের ঊর্ধ্বে সুগঠিত, সুসম্পূর্ণ, সুসম্বদ্ধ সাম্যবাদ। কোকেনের প্যাকেটে ঔষধের লেবেল মারিয়া দিবার মধ্যে যেটুকু বাহাদুরী আছে তাহা শ্রীযুত সেনেরই প্রাপ্য। একটি উদাহরণ দিই :

তবু জানি,—
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে, চূর্ণ হবে, ভস্ম হবে
আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে
ততদিন
ততদিন নারীধর্ষণের ইতিহাস
... ...

'তবু জানি'—কিন্তু তিনি জানিলেন কি উপায়ে? জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে, চূর্ণ হবে, ভস্ম হবে, এ জ্ঞান তাঁহার কোথা হইতে আসিল? বিপ্লবী আন্দোলনের ভিত্তিমূল শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তো তাঁহার নাই। অভিজ্ঞতার পরিধি তো একদিকে অশিব, অসত্য, অসুন্দর মধ্যবিত্ত-জীবন ও অন্যদিকে—

"আবার নিঃশব্দ হিংস্র প্রান্তরে,
রক্ত-পাতাকা আকাশে ওড়ে,"

এই পর্যন্ত। তিনি তো Marxist—তিনি তো গান্ধীর মতো Inner voice কিংবা সুভাষ বসু-র মতো Intuition-এ বিশ্বাস করেন না। এ ভাবাদর্শ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ও বেদনার সংঘাতে? বর্তমান decadent মধ্যবিত্ত সমাজে বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবীর ভীড়ের মধ্যে Text Book Marxism-এর যে সহজ সিদ্ধির পথ শ্রীযুত সেন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বৈষয়িক ধূর্ততার প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। 'রোমান্টিসিজম'-ভীরু কবির ভাবাদর্শ যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিচ্যুত হইয়া রোমান্টিক হইয়া উঠিয়াছে, কবির কি সে খেয়াল নাই।

কিষাণ-মজদুর, লালঝণ্ডা-ব্যারিকেড সংঘর্ষ লইয়া উত্তেজক কাব্য-রচনার হুকুম কেহ কোনোদিন শ্রীযুত সেনকে দিয়েছেন কি না জানি না, বোধ হয় এ অভিযোগ শ্রীযুত সেনের স্বকপোলকল্পিত। কিন্তু কেহ যদি বিপ্লবী-কবিযশাকাঙ্ক্ষী কাহাকেও সমাজের অগ্রগামী বিপ্লবীশ্রেণীর জীবন বৈপ্লবিক ভঙ্গীতে দেখাইবার অনুরোধ

করেন, তবে কি তাহার অনুরোধ অযৌক্তিক হইবে? শ্রীযুত সেন বলিবেন, তিনি বিপ্লবী কবি বটে তবে বিপ্লবীশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই, অর্থাৎ কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করিতে হইলে বিপ্লবীশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সাহিত্যে কিংবা কাব্যে নহে। Revolutionary Training এড়াইয়া বিপ্লবী সাজিবার ইহা এক অদ্ভুত কৌশল। শ্রীযুত সেনের এ ফাঁকিকেও না হয় আমরা ক্ষমা করিলাম, কিন্তু যে মধ্যবিত্ত জীবনের সহিত তাঁহার জন্মগত ও ঐতিহ্যগত প্রাত্যহিক পরিচয় তাহার গলিত, স্থবির ও নপুংসক রূপটিই তাঁহার চোখে পড়িল, অথচ ইহার ইস্পাত-কঠিন যে অংশ ব্যক্তিগত ভাবাদর্শে কিংবা নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিকতার আঘাতে বিপ্লবপ্রবাহের সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছে ও দিতেছে তাহার কঠোর সুন্দর রূপ, তাহার শ্রেণীবিচ্যুতির বেদনা-ইতিহাস, তাহার বুদ্ধিবিদগ্ধ আশাবাদের কোনো আভাস শ্রীযুত সেনের কাব্যে মেলে না। শ্রীযুত সেন যে কাব্য-আন্দোলনের উত্তর-সাধনা করিতেছেন তাহা অতীতে মধ্যবিত্তপরিচালিত বিপ্লবী আন্দোলনকে উপেক্ষা করিয়াছে—অসহযোগে, আইন অমান্য ও সন্ত্রাসবাদেব সহিত কোনো সম্পর্কই রাখে নাই, তাই আজ সাম্যবাদী আন্দোলনেব সহিত তাহার এই ঐতিহ্যহীন একত্ববোধের পশ্চাতে যে বিরাট প্রবঞ্চনা রহিয়াছে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

সমালোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, এইবার শ্রীযুত সেনের কাব্যের আঙ্গিক সম্পর্কে কিছু বলিয়া উপসংহার করিব। শ্রীযুত সেনের কবিতা সাধারণের বোধগম্য নহে—কেবলমাত্র 'chosen few'-এর উপভোগ্য। আমি যথেচ্ছ দুইটি স্থান উদ্ধার করিতেছি:

> আকাশচরের শব্দ আকাশ ভরায়।
> নীবিবন্ধে কূটগ্রন্থি,
> শিবিরে আর নিবিড় মায়া নেই
> তুষার পাহাড়ের শান্তি যদিচ শিশিরে ঝরে।

কিংবা,

> পেস্তাচেরা চোখ মেলে শেষহীন পড়া
> অন্ধকূপে স্তব্ধ ইন্দুরের মতো,
> ততদিন গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনে
> বণিকের মানদণ্ডের পিঙ্গল প্রহার।

এ কবিতা 'Intellectual clique'-এর জন্য লেখা, আমার আপনার জন্য নহে। পাঠক-সম্প্রদায়ের প্রতি এই সানুনাসিক অবহেলা, আপনার কাব্যকে সর্বসাধারণের উপভোগ হইতে বাঁচাইয়া দুর্বোধ্য করিবার এই গলদঘর্ম প্রয়াস, ইহা আর যাহাই হউক, বিপ্লবী মনোভাবের পরিচায়ক নহে। মসীকৌলীন্যের অভিমানে শ্রীযুত সেন আজ আর্টের প্রচাররূপ ও communicativeness-কে পরোক্ষভাবে অস্বীকার করিতেছেন। রচনার আবেদনের পরিধি সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া ক্রমে আত্মতৃপ্তিতে পরিণত হইতে বসিয়াছে। এই শম্বুকবৃত্তিকে কি বিপ্লব প্রচেষ্টা বলিব? ইহা বিপ্লবের নামে Individual anarchy-র চরম অবস্থা মাত্র। সমুদ্রপারে Subjective individualism-এর যে ঐতিহাসিক আন্দোলন একদা বিপ্লবীরূপে উদ্ভূত হইয়া অবশেষে কালের কঙ্কাল-পথে বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে, সাম্যবাদের ছদ্মরূপে ইহা তাহারই অনুকরণহীন অনুকরণ মাত্র।

কাব্যের বিষয়বস্তু, কাব্যের উৎসমুখ, কাব্যের দায়িত্বের প্রশ্নকে ছাপাইয়া আজ কাব্যের আঙ্গিকের প্রশ্ন বড় হইয়া উঠিয়াছে। যৌবনের তাগিদে বল্কল পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, খুশিমতো বল্কল পরিবর্তন করিলে সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও পরিবর্তন হইবে, ইহা মনে করা বাতুলতা। বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে ও অভ্যন্তরীণ তাগিদেই আঙ্গিকের পরিবর্তন হইবে, ইহার জন্য সচেতন প্রচেষ্টা হয় নির্বোধ কালক্ষয় নতুবা সংগ্রাম এড়াইবার প্রচেষ্টা। Technique fetishism-এ ইহার অনিবার্য পরিণতি। ঘোড়া আসিলে চাবুকের জন্য ভাবিতে হইবে না। স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে আমাদের বক্তব্য যথাযথভাবে বলিবার সুযোগ মিলিল না, বারান্তরে এসম্বন্ধে আরও লিখিবার ইচ্ছা রহিল। ইতিমধ্যে শুধু এই কথাটি পাঠককে স্মরণ রাখিতে বলি যে, ইণ্টেলেক্‌চুয়ালী কুসংসর্গ হইতে সাম্যবাদের সাবধান হইবার দিন আসিয়াছে। *

* অগ্রণী, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৪০; পৃ. ২১৩-২৯৭। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক

অতি আধুনিক বাংলা কবিতা / সমর সেন

উপরোক্ত নামের একটি সমালোচনা 'অগ্রণী'র এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে, কারণ সমালোচক বিনাকারণে শূন্যে ঘন ঘন ছোবল মেরেছেন, এবং আমার লেখা 'In Defence of the Decadents' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি সম্বন্ধে তাঁর ঘোরতর আপত্তি, তার সারাংশ দিতে গিয়ে আমার বক্তব্যের বিকৃতি অনেক জায়গায় করেছেন। 'In Defenee of the Decadents' New Indian Literature-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু পত্রিকাটি কাছে না থাকায় পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করতে হয়েছে, ফলে দু'এক জায়গায় ভাষার অদল-বদল থেকে যেতে পারে। কিন্তু তাতে ভাবের দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য নেই।

হাওয়ায় ছোবল মারার কথা এক্ষেত্রে নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক নয়। সমালোচকের কী কারণে জানি না দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে আমি নিজেকে "বিপ্লবী" কবি বলে প্রচার করি, অথচ আসলে আমি নির্বোধ, কিংবা প্রবঞ্চক, বিপ্লবী নই; এ নিদারুণ জুয়াচুরীর জন্য তিনি মর্মাহত ও ক্ষিপ্ত বোধ করছেন। তাঁর এই মূল অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কারণ জ্ঞাতসারে কোনো কবিতা কিংবা অন্য লেখায় আমি নিজেকে 'বিপ্লবী' বলে জাহির করি নি, উপরন্তু কর্মভীরু, পলাতক, আধা-বাস্তব, আধা-রোমাণ্টিক ভাবেই আমার কাব্যের নায়ককে বর্ণনা এবং বিদ্রূপ করে এসেছি। 'গ্রহণ'-এর নাম-কবিতায় যে টাইপের জীবন, এবং আত্মপরিক্রমার কথা আছে সে টাইপ বিপ্লবী নয়, মুমূর্ষু শ্রেণীর প্রতীক, সেটা বোঝাবার জন্য একটি লাইনও উদ্ধৃত হয়েছিল: The waking have a common world but the sleeping turned aside each into a world of his own. যদি লোকমুখে 'অগ্রণী'র সমালোচক 'বিপ্লবী' বিশেষণ আমার সম্বন্ধে শুনে থেকে ক্রুদ্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে আমি নিরুপায়। আমার প্রবন্ধটি বাংলা কবিতা এবং সমালোচনার কয়েকটি ধারার বিষয়ে লিখিত, "আপন সাহিত্য রচনার বৈপ্লবিকতা……ব্যাখ্যা" করার কোনো উদ্দেশ্য তাতে ছিল না; বাংলা

কবিতার আলোচনাকে নিজের কবিতার আস্থায় রূপান্তরিত করতে আমি সচেষ্ট হই নি। বরং তাছাড়া, উপরোক্ত প্রবন্ধটির যে ব্যাখ্যা সোজা বাংলায় তিনি করেছেন, তাতে আমার মতো বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবীর বিস্মিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। তিনি নম্বর করে প্রবন্ধটির সারাংশ (!) দিয়েছেন। সে নম্বরগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে প্রবন্ধের কয়েকটি অংশ পড়লে মন্তব্যের প্রয়োজন আশা করি বিশেষ হবে না।

"(২) ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রী সমাজ 'decadent' অতএব এ সমাজে সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা অসম্ভব এবং decadent সাহিত্যই একমাত্র আন্তরিক সাহিত্য। এই আন্তরিকতার জন্য decadent হইয়াও তাঁহাদের সাহিত্যে বৈপ্লবিক শক্তিমত্তা বর্তমান।" (অগ্রণী, ২১৩ পৃঃ)

আমার প্রবন্ধের একটি অংশ: In these times of dereliction and dismay, of wars, umemployment and revolutions, the decayed side of things attracts us most······Perhaps that is because we have our roots deep in the demoralised petty-bourgeoisie and lack the vitality of a rising class."

"(৩) ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে কোনোরূপ অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি।"

"Consciousness of decadence is certainly a power." (In Defence of the Decadents) এখানে "শক্তির" কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বৈপ্লবিক বিশেষণটি সমালোচক যোগ করেছেন। উপরোক্ত পংক্তিতে সচেতনতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে; "Subjective initiative" আধুনিক কবিতায় অত্যন্ত প্রয়োজন সে কথা সমালোচক স্বীকার করেছেন। তাঁর অভিধানে সচেতনতার কী অর্থ সেটা আমার জানা নেই।

আর একটি জায়গায় তিনি লিখেছেন: "শ্রীযুত সেন বলিবেন, তিনি বিপ্লবী কবি বটে তবে বিপ্লবী শ্রেণীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই, অর্থাৎ কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করিতে হইলে বিপ্লবী শ্রেণীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সাহিত্যে কিংবা কাব্যে নহে। Revolutionary training এড়াইয়া বিপ্লবী সাজিবার ইহা এক অদ্ভুত কৌশল।"

এ প্রসঙ্গের প্রথম বক্তব্য যে, আমার প্রবন্ধে আধুনিক বাংলা কবিতা কী

আমার নিজের কবিতা সম্বন্ধে "বিপ্লবী" বিশেষণ একবারও ব্যবহৃত হয় নি, শুধু বলা হয়েছে যে গত দশ বছরের মধ্যে বাংলা কবিতার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। উন্নতি এবং বিপ্লব আশা করি এক কথা নয়। তাছাড়া গণআন্দোলনে যোগদানের সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধে এই কয়েকটি কথা শেষের দিকে ছিল: "Consciousnes of decay is certainly a power. But a critical situation arises where we find that at a certain stage this also is not enough....... We will reach that stage very soon, and we must make a choice if we are to continue as living writers. This involves an entire reconstruction of our ways of living. An active part in the mass-movement will certainly help that poet who has been able to preserve his integrity. ...He who is bent on living in a little cell, all will be dying with a little patience."

এলিয়টের নাম উল্লেখ করে আমি সমালোচকের বিরাগভাজন হয়েছি। তিনি লিখেছেন: "সাম্যবাদীগণ ইলিয়টী সাহিত্যকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেন, Marxist সেন তাহাকে বিপ্লবী বলেন, কারণ 'Peoples say.'

আমার প্রবন্ধে এলিয়টকে বিপ্লবী কবি বলা হয় নি, তবে এটা বলা হয়েছে যে আধুনিক প্রগতিক ইংরেজ কবিদের উপর তাঁর প্রভাব অসামান্য। অডেন প্রমুখাদি সাম্যবাদী কবিরা এলিয়টের প্রভাব এবং ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করতে কখনো কার্পণ্য করেন নি, এবং সাহিত্যে যে অন্তর্দৃষ্টি থাকলে এলিয়টী সাহিত্যের মূল্যবিচার সম্ভব তার উপস্থিতি কডওয়েলের 'Illusion and Reality' নামক পুস্তকে আছে। এবং আমার যতদূর জ্ঞান তাতে কডওয়েলকে সাম্যবাদী বলেই জানি। শক্তি থাকলে ধনতন্ত্রের অনেক গলিত অংশ নিঙড়ে বিপ্লবের ফোঁটা সংগ্রহ করা যে সম্ভব সেটা আমাদের সাম্যবাদী সমালোচক জানেন না কিংবা মানেন না, কিন্তু এলিয়টের "decadence" নিঙড়ে অনেক ফোঁটাই আধুনিক ইংরেজ কবিরা কাজে লাগিয়েছেন (এ প্রসঙ্গে Day Lewis-এর 'A Hope for Poetry', Spender-এর 'The Destructive Element', 'The Arts To-day'-তে Macniece-এর প্রবন্ধ পঠিতব্য)।

আধুনিক বাংলা কবিতা যাঁরা লেখেন তাঁদের অনেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনে

যোগদান করেন নি, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই শক্তিমান লেখক, তাঁরাই এতদিন রাজত্ব করে এসেছেন, এবং মধ্যবিত্ত সমাজের উপর কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। এর কারণ কী? কারণ এদের অনেকে মধ্যবিত্ত জীবনের গ্লানি এবং বহুমুখী ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতন, এবং সত্য শিব সুন্দরের অবাস্তব মায়া কাটিয়ে দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রকাশভঙ্গীতে পরিবর্তন এনেছেন। নিপীড়িত শ্রেণীর আশা-ভরসা, কিংবা সংগ্রামের সংযম এদের লেখায় আজ পর্যন্ত বিশেষ মেলে না, কারণ গণআন্দোলনের সঙ্গে এরা সংশ্লিষ্ট নন। এবং যেহেতু যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং আছেন (মধ্যবিত্ত সমাজের "ইস্পাতকঠিন যে অংশ ব্যক্তিগত ভাবাদর্শে কিংবা নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিকতার আঘাতে বিপ্লব প্রবাহের সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছে বা দিতেছে") তাঁরা এখন পর্যন্ত বিপ্লবী সাহিত্য রচনা করতে পারেন নি, সেহেতু প্রথমোক্ত ভদ্রলোকদের কানামামা হিসেবে নেওয়াই কর্তব্য। নেই মামার চেয়ে কানামামা শ্রেয়। ভবিষ্যতে ইতিহাস অন্তত কানা মামা হওয়ার জন্য এঁদের মূল্য দেবে, এবং যদি তাঁরা জীবন ও সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী পরিবর্তন আনতে অক্ষম হন, তাহলে বিদায় দেবে। কিন্তু সে সময় 'নির্বোধ', 'প্রবঞ্চক' ইত্যাদি ছাড়া অন্যান্য বিশেষণ বোধহয় সাম্যবাদী সমালোচনা-সাহিত্যের অভিধানে পাওয়া যাবে। বর্তমানে ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং নিষ্ফল আক্রোশ Marxist সমালোচনার নামে যদি চলে তাহলে বিস্মিত হওয়াটা মানসিক বিলাস, কারণ বাংলাদেশের আজ যে অবস্থা তাতে অগ্রগামী ব্লক রাতারাতি গুণ্ডাব্লকে পরিণত হলেও বাহবা পায়। যে গালি-গালাজ, যে উগ্র বামপন্থা আজ সাম্যবাদের নামে সমালোচনা-সাহিত্যে আস্ফালনরত সেটা পূর্বতন বাঙালী সন্ত্রাসবাদের দায়ভাগ।*

*অগ্রণী, দ্বিতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, মে ১৯৪০ ; পৃ ৩০৮–৩১০। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক

অতি আধুনিক বাংলা কবিতা / সরোজকুমার দত্ত

১৯৩৬ সালের ১০ই এপ্রিল লক্ষ্ণৌ-এ নিখিল ভারত প্রগতি সাহিত্যিক সঙ্ঘের যে প্রথম অধিবেশন হয়, তাহাতে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটিতে বলা হইয়াছে : "...We consider that collectively and individually we stand in the ranks of those who are striving to bulid up a new social order......"

উক্ত সঙ্ঘের যে তৃতীয় অধিবেশন[১] ১৯৩৮ সালের শেষভাগে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে এই অংশের কোনো পরিবর্তন করা হয় না, উপরন্তু মোটামুটিভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজম্-বিরোধী পূর্বতন চারিটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, সংগ্রামাত্মক প্রস্তাবই গৃহীত হয়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণার্থ ভারত-গভর্নমেণ্ট কতকগুলি স্বেচ্ছাচারী দমন আইন প্রণয়ন করিয়া ও অন্যান্য নানাভাবে প্রগতি চিন্তাধারার কণ্ঠরোধ করিতে যে অভিযান চালান, তৎসম্পর্কে প্রথম প্রস্তাবটির শেষাংশে বলা হয়, "The conference considers these restrictions to be a serious attack on the free cultural development of the country and calls upon all Indian writers to organise country-wide protests against the Govt. policy and to support all other efforts to secure the repeal of these laws." চতুর্থ প্রস্তাবে বলা হয়, "This confernece considers that it is necessary for free cultural development of the students that they should have freedom to express themselves on all social and political subjects," এই প্রস্তাবটিতেও পরোক্ষভাবে সংগ্রামের সংকল্পই প্রকাশ পাইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের গ্রাস হইতে সংস্কৃতিকে বাঁচাইবার যে সংকল্প এই অধিবেশনে গৃহীত হয় তাহাও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপেই

---

১. প্রকৃতপক্ষে, ১৯৩৮ সালে কলকাতায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। —সম্পাদক

আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। কারণ, যে দেশে 'huge and vital section of our population illiterate', অর্থাৎ সংস্কৃতি-বর্জিত, যে দেশে সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার অর্থ এই huge and vital section-এর অশিক্ষা অসংস্কৃতির নগ্নরূপ, ইহার কারণ ও প্রতিকারের নির্দেশ, 'aesthetic medium'-এর সাহায্যে সংগ্রামমূলক মনোভাব লইয়া প্রস্ফুটিত করিয়া তোলা, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী বা মেঘনাদ সাহার গবেষণাবলী এই 'huge ও vital section'-এর আয়ত্তাধীনে আসিবার পথে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া সাহিত্যসম্ভোগক্ষম পাঠক-সাধারণে রাজনৈতিক চেতনায় ও সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ করা।

এই স্বীকৃতি, এই ইস্তাহার ও এই প্রস্তাবাংশসমূহ হইতে আমার ধারণা হইয়াছিল, প্রগতি সাহিত্য সঙ্ঘ একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান, কারণ তাহার গৃহীত কার্যসূচী বৈপ্লবিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের ভিত্তিতে রচিত। এই কার্যসূচী উক্ত সঙ্ঘের বঙ্গীয় শাখা কতদূর অনুসরণ করিয়াছে, সে প্রশ্ন এখানে না তোলাই ভালো। তবে বঙ্গীয় শাখার একজন বিশিষ্ট ও উদ্যোগী সভ্য হিসাবেই শ্রীযুত সেনকে জানি। তাই ভাবিয়াছিলাম কোনো বিপ্লবী সঙ্ঘের সহিত পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে যিনি সংযুক্ত তিনি নিজেকে বিপ্লবী না বলিলেও বলেন বৈ কি? তাঁহাকে বিপ্লবীমন্য ভাবিবার আরও কারণ আছে। প্রবন্ধকাররূপে যখন শ্রীযুত সেনের সাক্ষাৎ পাই, তখন দেখিতে পাই ভাবাদর্শে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে সম্পূর্ণ সাম্যবাদী ঢং আনিবার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন। 'কবিতা' ত্রৈমাসিকের ১৩৪৫ সালের বৈশাখ সংখ্যায় 'বাংলা কবিতা' শীর্ষক যে প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে লেখকের সাম্যবাদীমন্যতা সম্পর্কে পাঠকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

"পারিপার্শ্বিকের প্রভাব বিশিষ্টভাবে উপলব্ধি করা মেনে নেওয়া স্বাধীনতার সূত্রপাত" (Freedom is the recognition of necessity.)।

"কাব্যের ইতিহাসে অন্তরায় আসে, তার কারণ কবিতা বিশুদ্ধ নয়, পরিবর্তনশীল শ্রেণীগতির স্থান কাল পাত্রের মুখাপেক্ষী"……

"ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে কাব্যের মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব…"।

"দাস দেশে বুর্জোয়া (?) সভ্যতার অগ্রগতি অল্পদিন পরেই দমিত হয়, কারণ বর্ধিষ্ণু দাস দেশ বুর্জোয়া প্রভুর স্বার্থবিরোধী।"

"রিয়ালিটির থেকে নিষ্কৃতির চেষ্টা পরাজয়ের দুর্বল ভঙ্গী, প্রকৃতির স্বপ্নলোক ক্লীবের অলীক স্বর্গ।"

এই সকল বিপ্লবী মূলসূত্রের (Revolutionary principles of criticism) ভিত্তিতে যিনি সমালোচনা-সাহিত্য (Critical Literature) রচনা করেন এবং বলেন, "জ্ঞাতসারে কোনো কবিতা বা অন্য লেখায় আমি নিজেকে বিপ্লবী বলে প্রচার করি নি" তাঁহাকে বলিবার আমার কিছুই নাই।

In Defence of 'Decadents' প্রবন্ধটির বেলায়ও ঐ কথাই প্রযোজ্য।

তাঁহাকে বিপ্লবীমন্য ভাবিবার তৃতীয় কারণ, 'কবিতা' ত্রৈমাসিক পত্রিকায় একাধিকবার তাঁহাকে বিপ্লবী বা সাম্যবাদী বলা হইয়াছে, "বিপ্লবী অঙ্গীকার সমর সেন ও বিষ্ণু দের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট।"—কবিতা, আষাঢ় ১৩৪৬, পৃ ৮৭।

"সাম্যবাদী শিল্প যে নিছক বন্ধ্যাপ্রসূতি নয় তার উদাহরণ তো বিদেশে মাইকেল শোলোকভ, আপটন সিনক্লেয়ার, অডেন, ইশারউড ইত্যাদি। বাংলা কবিতাতেই বা সম্ভব হবে না কেন? সমর সেন বা বিষ্ণু দে তো এ ক্ষেত্রে কয়েক জায়গায় অপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছেন।"—কবিতা, আষাঢ় ১৩৪৬, পৃ ৯০।

শ্রীযুত সেন 'কবিতা' ত্রৈমাসিকের অন্যতম সম্পাদক, প্রত্যেক প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্পর্কে তাঁহার সম্পাদকীয় দায়িত্ব রহিয়াছে।

এই সকল কারণে আমার ধারণা হইয়াছিল শ্রীযুত সেন নিজেকে বিপ্লবী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শ্রীযুত সেন বলিতেছেন, বিপ্লবী তো তিনি ননই, উপরন্তু কর্মভীরু, পলাতক, আধাবাস্তব, আধারোমাণ্টিকভাবেই তিনি তার নায়ককে বর্ণনা ও বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছেন। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য, তাঁহার এই উক্তি যদি সত্য হয় (অর্থাৎ মহাত্মা ব্যক্তির বৈষ্ণব বিনয় না হয়) তবে এই উক্তিটি তাঁহার বহু পূর্বেই করা উচিত ছিল, বিলম্বে সত্যভাষণ সত্যগোপনের নামান্তর মাত্র।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য, 'আধাবাস্তব ও আধারোমাণ্টিক' কথাটি ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার সাম্প্রতিক আধা-সমাজতন্ত্র আধা-সাম্রাজ্যবাদের মতোই অর্থহীন ও কৌতুকাবহ। 'আধা-বাস্তব আধা-রোমাণ্টিক' না লিখিয়া শুধু রোমাণ্টিক লিখিলে শ্রীযুত সেন মানসিক সততার পরিচয় দিতেন। তৃতীয় বক্তব্য, এই স্বীকৃতি উপযুক্ত সময় করিলে আমার পরিশ্রমের অনেকটা লাঘব হইত।

ছোবল হয়ত শূন্যেই মারিয়াছি, কিন্তু বিষ বোধকরি যথাস্থানেই পৌঁছিয়াছে,

নচেৎ অবিলম্বে এই তাগা বাঁধিবার প্রয়োজন হইত না। আত্মপরিক্রমাপথে 'মুমূর্ষু শ্রেণীর প্রতীকে'র যদি এই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, The waking have a common world but the sleeping turn aside each into his own, অর্থাৎ তিনি যদি নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নজগতের অবাস্তবতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মুমূর্ষু শ্রেণীর হইলেও তাঁহার স্বীয় শ্রেণীর 'প্রতীকত্ব' ঘুচিয়া গিয়াছে, তিনি declassed বা শ্রেণীবিচ্যুত হইয়াছেন, এবং তখনও যদি তাঁহার আত্মপরিক্রমা অবিশ্রাম চলিতে থাকে, তখন তাঁহাকে সুকৌশলী জ্ঞানপাপী ভিন্ন আর কি আখ্যা দেওয়া চলিতে পারে? In Defenec of 'Decadents' প্রবন্ধ সম্পর্কে আমার অভিমতকে খণ্ডনোদ্দেশ্যে শ্রীযুত সেন বলিয়াছেন, "আপন সাহিত্য রচনার বৈপ্লবিকতা·· ব্যাখ্যা" করার উদ্দেশ্য তাতে ছিল না। প্রবন্ধটির নাম In Defence of 'Decadents' এবং তাঁহারই স্বীকৃতি অনুসারে তিনি নিজে একজন Decadent (অবশ্য সচেতন) এবং বর্তমান সমাজে এই সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রয়োজনীয়তাই যে এই প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, প্রবন্ধকার যদি তাহা অস্বীকার করেন, তবে তিনি সত্যকে অস্বীকার করিবেন। এই সমাজ-বিপ্লবের যুগে (In these times of···wars ···and revolutions—In Defence of Decadents) সামাজিক প্রয়োজনীয়তা বলিতে সমাজবিপ্লবের পরিপোষকতা—অর্থাৎ বৈপ্লবিকতাই বুঝিয়াছি, বোধ হয় ভুল বুঝি নাই। "There is no middle position between Revolution and Reaction"—T Cornford

শ্রীযুত সেনের তৃতীয় অভিযোগ, আমি তাঁহার মূল প্রবন্ধটির কয়েকটি অংশের অর্থ বিকৃত করিয়াছি। কি কারণে আমি প্রবন্ধটি হইতে আক্ষরিক উদ্ধৃতি করিতে পারি নাই, আমার সমালোচনায় তাহা পরিষ্কাররূপেই লিখিয়াছি। শ্রীযুত সেন লিখিতেছেন, "In these times of dereliction and dismay, of wars, unemployment and revolutions, the decayed side of things attracts us most. The boredom and horror, rather than glory of life is our immediate reality. Perhaps that is because we have our roots deep in the demoralisid petty-bourgeoisie and lac the vitality of a rising class. It is best to admit this and write about the class you

know well than to exult in the future glories of a classless society." (কে তাঁহাকে exult করিতে বলিয়াছে জানি না, তবে এই প্রফেসরীয়, একাডেমিক ও নিতান্ত শিশুসুলভ আশাবাদ তাঁহারই কবিতা পড়িতে গিয়া পাতায় পাতায় চোখে পড়িয়াছে, যথা, 'তবু জানি···আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে···) কারণ consciousness of decay is also a power অবশ্য এ co isciousness honest (আন্তরিক। হওয়া চাই (If he tries to be honest ইত্যাদি, ২য় প্যারা In Defence of Decadents). অর্থাৎ, নৈতিক শক্তিহীন পেটিবুর্জোয়া সমাজের প্রাণশক্তিহীন লেখকের রচনায় যদি নিষ্ক্রিয় সচেতনতার (লেখকের শ্রেণীরূপ নিষ্ক্রিয় হইতে বাধ্য) আভাস পাওয়া যায় (এই নিষ্ক্রিয় প্রাণশক্তিহীন ও consciousness-সর্বস্ব সাহিত্যকে আমি decadent সাহিত্য বলিয়াছি) তবে তাহা আন্তরিক, কারণ তাহা ' Eternal principles of art, truth and beauty'-তে বিশ্বাস করিয়া মানসিক অসাধুতার পরিচয় দেয় না। এই সচেতনতাই একটি শক্তি।

শ্রীযুত সেনের এই বক্তব্যকেই আমি আমার ভাষায় লিখিয়াছিলাম, "ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রীসমাজ আজ decadent, অতএব এ সমাজে সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা অসম্ভব এবং d.cad nt সাহিত্যই একমাত্র আন্তরিক সাহিত্য। এই আন্তরিকতার জন্য decadent হইয়াও তাঁহাদের সাহিত্যে বৈপ্লবিক শক্তিমত্তা বর্তমান।" সমাজবিপ্লবের যুগে সামাজিক ক্ষয়িষ্ণুতা সম্পর্কে চেতনা যদি শক্ত হয়, তবে সমাজে বা সমাজসাপেক্ষ সাহিত্যে তাহা বৈপ্লবিক শক্তি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ইহা কি অর্থ বিকৃতি? "Consciousness of decadence is cerainly a power" (In D.fence of Decadents)। আমি ইহার অর্থ করিয়াছি, ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে কোনোরূপ অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি। শ্রীযুত সেনের আপত্তি 'বৈপ্লবিক' বিশেষণটির ব্যবহারে। এ আপত্তির অযৌক্তিকতা আমি পূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। Consciousness ও Subjective Initiative-এর অর্থ এক নহে। নিছক নিষ্ক্রিয় চেতনার উদ্দেশ্যহীন অভিব্যক্তি ও সক্রিয় চেতনার উৎকণ্ঠা, উদ্যম ও কর্মরূপের মধ্যে পরিবর্তন আছে বৈ কি? কর্মভীরুজ্ঞান ও সজ্ঞান-কর্ম এক বস্তু নহে।

শ্রীযুত সেন যখন স্বীকার করিয়াছেন তিনি বিপ্লবী কবি নন তখন তাঁহার

পরবর্তী অনুযোগ সম্পর্কে উত্তর প্রদান করিয়া পূর্বতন বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না। তিনি বলিতেছেন, "গত দশছরের বাংলা কবিতার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।" এই দশ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা অবিশ্বাস্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অতি দ্রুত বৈপ্লবিক পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে, সারা প্রদেশময় শ্রমিক ও কিষাণ অশান্তি দিনে দিনে সঙ্ঘবদ্ধ বিপ্লব-প্রচেষ্টার রূপ পরিগ্রহ করিতেছে, নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে বেকারের সংখ্যা মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সেখানে অতিদ্রুত শ্রেণীবিচ্যুতি চলিয়াছে, গভর্নমেণ্টের দমনমূর্তি রুক্ষ হইতে রুক্ষতর হইয়া উঠিয়াছে, চাষী ও দিনমজুরের দৈনন্দিন খণ্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যাপক সংগ্রাম সংহত হইয়া উঠিয়াছে, মধ্যবিত্তশ্রেণীর নিম্নাংশ কিষাণ মজুরশ্রেণীর সহিত স্বার্থসাম্যে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে এবং রাজনীতি সাধারণের জীবনের সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। অথচ এই দশ বছরের বাংলা কবিতায় স্থানীয় রাজনীতির ছায়ামাত্র পড়ে নাই, 'Sickening Sentimentalism' বলিয়া ভাবাবেগকে পরিহার করা হইয়াছে এবং সৌখীন সাম্যবাদের বাক্‌বিভূতি দিয়া নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কবিলাসের প্রবর্তন করা হইয়াছে। শিক্ষিত সাধারণের নিকট কবিতাকে ক্রমশ দুর্বোধ্য করিয়া তোলা হইয়াছে, লেখক ও পাঠকের মধ্যেকার স্বাভাবিক ব্যবধানকে অস্বাভাবিক উপায়ে বাহুবিস্তৃত করিয়া তোলা হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের কবি সত্যেন্দ্র দত্ত ও নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের কবি কাজী নজরুলকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে। টেকনিকের বহু পরিবর্তন করা হইয়াছে, অর্থাৎ একই কথা বহুবার বহুভাবে বলা হইয়াছে। গত দশ বছরে যখন মানুষের জীবনে রাজনীতি অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে বংলাদেশের কাব্য হইতে নজরুল-সত্যেন দত্তীয় সামান্য রাজনৈতিক ঐতিহ্যটুকু পর্যন্ত মুছিয়া ফেলা হইয়াছে, অবশেষে ১৯৪০ সালের মে মাসে সাম্প্রতিক কালের বাংলাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট প্রগতিক কবি স্বীকার করিলেন, আধুনিক বাংলা কবিতা যাঁরা লেখেন তাঁরা অনেকেই রাজনৈতিক আন্দালনে যোগ দেন নি, সেটা তাঁহাদের দুর্ভাগ্য। "কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই শক্তিমান লেখক, তাঁরাই এতদিন রাজত্ব করে এসেছেন এবং মধ্যবিত্ত সমাজের উপর কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন।" এই প্রভাব বিস্তারের একটু নমুনা দিতেছি : "The damning is thus complete. He then thinks of perhaps of a dozen or so of his admirers and

continues to use a medium of expression whose beauties commend themselves to a dozen or so…" (In Defence of Decadents)· প্রভাব বিস্তারের নমুনাই বটে। ভয় হয়, পাছে এই সাংঘাতিক উন্নতি আমাদের কপালে না টেকে। বর্তমানে তাঁহাদের সামাজিক চেতনা যথেষ্ট উদগ্র হইয়াছে, সামাজিক ক্ষয়িষ্ণুতা সম্পর্কে অনুভূতি সুতীব্রতম হইয়াছে, সাম্যবাদী সমাজের অবশ্যম্ভাব্যতা সম্পর্কে তাঁহারা নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রীত্বগ্রহণ মন্ত্রীত্ববর্জনে তাঁহাদের কাব্যের তুলাদণ্ড উঠানামা করিতেছে (It would have been easier with the congress out of office and an activer body in the anti-imperialist front—Ibid.) তথাপি এখনও রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রতিফলিত করিবার সময় তাঁহাদের আসে নাই, তবে ভয় নাই বোধ হয় শীঘ্রই আসিবে, কারণ উপসংহারে শ্রীযুত সেন আমাদের বড় আশার বাণী শুনাইয়াছেন: "But a critical situation arises when we find that this (consciousness) also is not enough even from the point of view of poetic integrity. We will reach that stage very soon and we must make a choice if we are to continue as living writers. This involves an entire reconstruction of our ways of living. An active part in the mass movement will certainly help that poet who has been able to preserve his integrity…He will perhaps then cease to soliloquise and will begin to be representative. Such a reconstruction of living is not an easy job for the present generation of Bengali poets most of them settled in life and approaching the critical age of thirty". অর্থাৎ এখনও তাঁহারা আলগোছে গণস্পর্শ বাঁচাইয়া, 'dozen or so' হাত ধরাধরি করিয়া কিছুকাল আত্মপরিক্রমায় অতিবাহিত করিবেন, তারপর গণআন্দোলন আরম্ভ হইলে (অর্থাৎ এখনও হয় নাই, অতএব তাঁহাদের আপাতত কোনো কর্তব্য নাই) তাঁহারা রাতারাতি স্বগতোক্তি পরিত্যাগ করিয়া গণ-কবি হইয়া বসিবেন। রাতারাতি তখন তাঁহারা জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বদলাইয়া ফেলিবেন, কিন্তু মুস্কিল হইবে

সেইসব কবিদের লইয়া যাহাদের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, এবং জীবনযাত্রা একরূপ পাকা হইয়া গিয়াছে। সাংঘাতিক 'প্রবলেম', ভাবিয়া কূলকিনারা পাইতেছি না। দশ বছরের প্রগতির কি এই পরিণাম? কিন্তু শ্রীযুত সেন বলিতেছেন, "To sacrifice all these in order to widen the appeal and rouse the people by direct propaganda will be a dangerous sacrifice."

আমি 'গ্রহণ' পুস্তিকার সমালোচনায় বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি সরাসরি প্রোপাগাণ্ডা দ্বারা গণ-জাগরণ আনয়নের জন্য কেহ তাঁহাকে বলে না, বলিবেও না; কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের শ্রেণীবিচ্যুত দুর্গতগণের দুর্গতির বাস্তব ইতিহাস রচনা কিংবা শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর বাহিরে শ্রীযুত সেনের নিজের শ্রেণীর যে অংশ নানা কারণে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে অক্ষম, তাহাদের জন্য aesthetic medium-এর সাহায্যে "literature of exposure" (Lenin) রচনা, তাহাদিগকে গণআন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তোলা, এক কথায় যে সাহিত্যিক-ঐতিহ্যের তাঁহারা উত্তরাধিকারী তাহার নিঃস্বার্থ সামাজিক সদ্ব্যবহার—তাঁহাদের আয়ত্তাধীন এটুকুই যদি তাঁহারা করিতেন তবে নিঃসঙ্কোচে তাঁহাদিগকে আমরা প্রগতিক ও বিপ্লবী বলিতাম। (আশা করি ইহা অগ্রগামী ব্লক বা তাহার অনুচরী দলের উগ্র বামপন্থী ভাবাদর্শ নহে)। কিন্তু শ্রীযুত সেন বলিতেছেন: "With huge and vital sections of our population illiterate and dim in the background···We can at present only soliloquise, we cannot address the real audience." কিন্তু এই 'real audience' (গণ-সাধারণ কিংবা Dozen or so নহে) address করিবার ক্ষমতা, ঐতিহ্য ও সাহিত্যিক উত্তরাধিকার তাঁহাদের আছে, অভাব subjective initiative-এর। এই অভাবকেই কি বলে, "To preserve one's personal integrity?" ইহাই কি 'in the long run' 'progressive cause'-কে help করিবে? করে তো ভালোই। শ্রীযুত সেনের সম্প্রদায় গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন। এবং যেহেতু যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং আছেন তাঁরা এখনও পর্যন্ত বিপ্লবী সাহিত্য রচনা করতে পারেন নি, সেহেতু প্রথমোক্ত ভদ্রলোকদের কানামামা হিসাবে নেওয়াই ভালো। "নেই মামার চেয়ে কানামামা শ্রেয়" (আমার সমালোচনার উত্তরে শ্রীযুত সেনের উক্তি)।

আমার বক্তব্য, কানামামা যখন জানেন তিনি কানা (অর্থাৎ, এ সম্পর্কে তাঁহার consciousness আছে) এবং ছানি কাটানো যখন তাহার আয়ত্তাধীন তখন অন্ধ অবস্থায় নিষ্ক্রিয় বিলাপ-বিলাসে দিন যাপন করা বিপ্লবে বিশ্বাসী কানামামার পরোক্ষে বিপ্লব-বিরোধিতা। অতএব, ছানি না কাটিলে ভবিষ্যৎ ইতিহাস ইহাকে মূল্য দেওয়া দূরের কথা, সমাজ-বিপ্লবের যুগে Demoralised petty bourgeoisie-এর এই স্বার্থপর সংক্ষোভের প্রতি হয়ত কোনো মনোযোগই দিবে না। না হয় বড় জোর উহার কাপুরুষ পলায়ন প্রবৃত্তিকে ঘৃণার সহিত অঙ্কিত করিবে। এবং সে সময় 'নির্বোধ', 'প্রবঞ্চক' ইত্যাদি ছাড়া অন্যান্য বিশেষণ সাম্যবাদী সাহিত্যের অভিধানে পাওয়া যাইবে সত্য (এখনো যায়) কিন্তু ঐ দুইটি বিশেষণও থাকিবে। যদি সাম্যবাদ-অসহিষ্ণু অথচ honest কোনো বুদ্ধিজীবীর রচনার সমালোচনা আমাকে করিতে হইত, তবে আমাকে আরও objective আরও ব্যাপক ও আরও নৈর্ব্যক্তিক হইতে হইত, কিন্তু সাম্যবাদে বিশ্বাসে ও সাম্যবাদী আন্দোলনে সহানুভূতিশীল শ্রীযুত সেনের কাব্যের আলোচনায় আমি কতকগুলি কাব্যের বিশেষণ ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছি, এই প্রসঙ্গে Marxist সমালোচনার নামে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও নিষ্ফল আক্রোশের অভিযোগ আনিয়া শ্রীযুত সেন ব্যবহারিক সুরুচি ও মানসিক শুচিতার পরিচয় দেন নাই।

গত দশ বছরের বাংলা কবিতায় প্রগতি (?) আলোচনা আমি পূর্বে করিয়াছি এবং তৎসম্পর্কে 'To be able to preserve one's personal integrity'-র (Ibid) তাৎপর্যও দেখাইয়াছি। এই personal integrity সংরক্ষণ সম্পর্কে শ্রীযুত সেন আধুনিক ইংরেজী কাব্য হইতে ইলিয়টকে নজীর টানিয়াছেন ও ইলিয়টী কাব্যের দুর্বোধ্যতা ও সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণুতা সম্পর্কে সুতীব্র চেতনার বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে গত দশ বছরের বাংলা কাব্যধারার সহিত ইলিয়টের কাব্যধারার সমান্তরালতা প্রদর্শনের ইঙ্গিত পাঠকমাত্রের নিকট স্পষ্ট হইয়া ওঠে। অবশ্য যাঁহারা ভারতীয় বা বঙ্গদেশীয় অবস্থা সম্পর্কে 'বুর্জোয়া যুগ' 'বুর্জোয়া সভ্যতা' 'বুর্জোয়া সমাজ' 'বুর্জোয়া কবি' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন না, তাহাদের নিকট হইতে ইহার বেশী আশা করাও অন্যায়; ঐতিহাসিক বস্তুবাদ যে বহু কমরেডকে ইতিহাস পাঠের পরিশ্রমের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছে, একথা একদা ফ্রেডরিশ এঙ্গেল্‌স্ বহু দুঃখেই বলিয়াছিলেন। আমার বক্তব্য ছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে

ইংল্যাণ্ডে বসিয়া সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণুতা সম্বন্ধে যে মনোভাব বা attitude লইয়া ইলিয়ট কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহার surrealism ও anarchist রূপ ব্রিটেনের সমাজবিপ্লবের বিন্দুমাত্র সহায়ক নয়, বরঞ্চ তাহার ফ্যাসিস্ত ভাবাদর্শে পরিণতিই স্বাভাবিক বেশী। পরবর্তী সাম্যবাদী লেখক তাঁহার কাব্যের কতটুকু বৈপ্লবিক সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবেন সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর, স্পেংলার ও হাক্স্‌লির লেখা পড়িয়াও অনেক বিপ্লবীর উপকার হইতে পারে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু উদ্দেশ্যহীনভাবে যে Decadence নিঙড়ায়, তাহার কপালে (অন্যের নয়) যে তাহা হইতে এক ফোঁটা বিপ্লবও জোটে না, বরঞ্চ ভয়াবহ ফ্যাসিস্ত ভাবাদর্শে তাহার পরিণতি হয়, যে বঙ্গীয় কবিগোষ্ঠী ইলিয়টী ঢং-এ কাব্য রচনা করিয়া ভবিষ্যৎ বিপ্লবী কাব্যের ভিৎ রচনা করিতে চাহিতেছেন, একথা তাঁহাদের মনে রাখা উচিত; তাঁহারা যেন নিজের ভবিষ্যৎ আগে ভাবিতে বসেন। ইংল্যাণ্ডের সামাজিক পরিমণ্ডলীতে ইলিয়টের হয়ত কোনো সামাজিক উপযোগিতা আছে, বাংলাদেশে ইলিয়ট সম্পূর্ণ সমাজসম্পর্কহীন, তাঁহার অবস্থা কলিকাতার ছাদের টবে বিলাতী মৌসুমী ফুলের মতো। কাব্যে ঐতিহ্যবাদী ইলিয়টের সহিত বঙ্গীয় কাব্যের কোনো ঐতিহ্যগত সম্পর্ক নাই। তথাপি যদি ইহারা কাব্যে বিপ্লবের হাবিলদার সাজিবার জন্য বাংলাদেশের কাব্যবেদীতে ইলিয়টের প্রতিষ্ঠা করেন, তবে তাঁহাদের প্রবঞ্চকই বলিব। এই নজীর প্রদর্শনের মধ্যে মমত্ববোধ ও একত্ববোধ যে পুরামাত্রায় রহিয়াছে তাহা যে কোনো পাঠকের চোখে পড়িবে। কর্নফোর্ড, কডওয়েল ও হেণ্ডারসনের লেখায় কোথায় ইলিয়টকে বিপ্লবীকাব্যের পুরোধা বলা হইয়াছে, জানাইলে সুখী হইব। কডওয়েলের 'Illusion and Reality' যদি সাম্যবাদী সমালোচনার স্ট্যাণ্ডার্ড হয়, তবে অডেন, স্পেণ্ডার ও ডে-লুইসকে সাম্যবাদী লেখক বলা চলে না, অতএব উঁহাদের রচনা বিতর্কের মধ্যে না আনাই ভালো। ইংল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক কাব্যের সমালোচনায় কর্নফোর্ডের কথাটি আবার স্মরণ করি: "There is no middle position between Revolution and Reaction." এই মূলসূত্রই "united front" আন্দোলনের ভিত্তি।

উপসংহারে শ্রীযুত সেন বলিয়াছেন, "বাংলাদেশের আজ যা অবস্থা তাতে অগ্রগামী ব্লক রাতারাতি গুণ্ডাব্লকে পরিণত হলেও বাহবা পায়।" যে গালি-

'গালাজ, যে উগ্রপন্থা আজ সাম্যবাদের নামে সমালোচনা-সাহিত্যে আস্ফালনরত সেটা নানা কারণে অবশ্যম্ভাবী, সেটা পূর্বতন সন্ত্রাসবাদের দায়ভাগ।"

কথাটা সাম্যবাদীগণও বলেন, শ্রীযুত সেনও বলেন, আমিও বলি। কিন্তু কথাটির সত্যতা নির্ভর করিতেছে context-এর উপর। কঠোর বিরুদ্ধ সমালোচনাকারীকে কৌশলে সাম্যবাদ-বিরোধী দলভুক্ত বলিয়া প্রচার করিয়া শ্রীযুত সেন কি ভারতবর্ষের অফিসিয়াল সাম্যবাদের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করিতে চাহেন? কারণ এই অতিসত্য উক্তিটি এত অবান্তর, এত অসঙ্গত ও এত অপ্রত্যাশিত যে ইহাকে অপকৌশলী ডিমাগগী ছাড়া আর কোনো আখ্যা দান সম্ভব নহে।*

স: দ:

* অগ্রণী, দ্বিতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, মে ১৯৪০; পৃ ৩১১-৩১৭। প্রবন্ধ-লেখক সরোজ দত্ত প্রবন্ধের শেষে তাঁর নামের আদ্যক্ষর 'স: দ:' ব্যবহার করেছিলেন। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক

বাংলা সমালোচনা / বিনয় ঘোষ

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের পিছনে একশত বৎসরেরও বেশীদিনের ইতিহাস থাকলেও, সে-ইতিহাসের অনেকখানিই উল্লেখযোগ্য নয়। আমাদের দেশের প্রাচীন সংবাদপত্র "Friend of India" ও "সমাচার দর্পণ"-এ মধ্যে মধ্যে যে পুস্তক-পরিচয় প্রকাশিত হতো তাকে সাহিত্য-সমালোচনা বলে না। বাংলা দেশের লোকসাহিত্য ও বৈষ্ণবসাহিত্যের সম্ভার সমৃদ্ধ হলেও সেগুলির প্রকৃত সমালোচনা, সংস্কৃত রসশাস্ত্র বা অলঙ্কারশাস্ত্রের দিক দিয়েও খুব বেশীদিন আরম্ভ হয় নি। বাংলা উপন্যাস, বাংলা কবিতা, বাংলা ছোটগল্প তখনো জন্মলাভ করে নি, কারণ যে সামাজিক ভূমিতে সাহিত্যের এই তরুলতা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হতে পারে সে-ভূমি তখনো অনুর্বরই ছিল। বোধ হয় এইজন্যেই এক শত বৎসর পূর্বে প্রকৃত বাংলা সমালোচনার কোনো উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত মেলে না, এবং গ্রামে গ্রামে যে গ্রাম্যগীতি ধ্বনিত হতো বা রাধাকৃষ্ণের যে অমর্ত্য প্রেম-কাহিনী বৈষ্ণব কবিরা ভাববিহ্বল স্বরে ও ছন্দে রচনা করতেন তা শুধু ভাবতন্ময় রসিকের অজস্র অশ্রু ঝরানিতেই শেষ হয়ে যেত। অন্তরের ভাব বাষ্প হয়ে জমত চোখের কোণে, তারপর উবে যেত ঝর ঝর অশ্রুধারায়, ভাষার বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে সমালোচনারূপে কাগজে প্রকাশিত হতো না।

বাংলা সমালোচনার বীজ যখন উপ্ত হলো তখন সংস্কৃত নন্দনশাস্ত্রের রসেই সে পুষ্টিলাভ করতে লাগল। সংস্কৃতগ্রন্থে কাব্য ও সাহিত্যের বিষয় ও অঙ্গকে বিচার করা হলো পৃথক করে, কতকগুলো বাঁধাধরা সূত্র দিয়ে তাদের ভিন্ন ভিন্ন গারদে শৃঙ্খলিত করা হলো। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্ এবং প্রাচীনদের মতে এই রস হচ্ছে "ব্রহ্মানন্দ-সহোদরঃ"—সেই আনন্দ-রস উপভোগের ক্ষমতা বা অধিকার সকলের নেই। সংহিতাকারের মতে ব্রহ্মাবর্ত এবং আর্যাবর্ত বহির্ভূত সমগ্র ভারতবর্ষ যেমন ম্লেচ্ছদেশ, এবং ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ প্রভৃতি সংস্কৃত দেবতারা দেশীয় দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে এক গৃহকোণ ব্যতীত যেমন সর্বত্রই পরাজিত হয়েছিলেন, তেমনি সংস্কৃত রসশাস্ত্রজ্ঞ ও আলঙ্কারিকেরা কাব্য-

রসকে ব্রহ্মানন্দ-সহোদর বলে সে রস উপভোগের অধিকার নিজেদের "কুলের" মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলেন, এবং রসের এই সংজ্ঞা পালন করে যে কাব্য রসোত্তীর্ণ হতে অপারগ হলো তাকে ম্লেচ্ছকাব্য বলে বাতিল করে দিলেন। বিদেশী বিজেতা আর্যদের প্রভু-মনোভাব ও স্ব-শ্রেণীপ্রীতি, দাস-প্রভুর সামাজিক পটভূমিতে কৃষি-জীবনের সুশীতল মন্থর ছায়ায় দ্বন্দ্ব-বিরোধ-সংঘাতের মধ্য দিয়ে যখন দ্রাবিড়-মোঙ্গল মিশ্রিত বাংলাদেশে "আবর্তে আবর্তে" এসে পৌছল তখন সেই আবর্তারোপিত আর্যত্ব মন্ত্রমুগ্ধ করল কুলশ্রেষ্ঠদের। সংস্কৃত রসজ্ঞেরা রাজসিংহাসন দখল করলেন বাংলা সাহিত্যের বিচারসভায়। বৈষ্ণব পদাবলী, বৌদ্ধগান ও দোঁহা, শূন্য পুরাণ, রামপ্রসাদী সঙ্গীত, চণ্ডীর গান, মনসামঙ্গল পাঠকের ও সমালোচকের অন্তরে ধর্মভাব ও ভক্তিরসের উদ্রেক করে ভগবদ্ভাবে মনপ্রাণ উদ্বেলিত করল। অশ্রু, গদগদ কণ্ঠস্বর এবং তারই যোগ্য বাহন নাদুশনুদুশ, চ্যাব্‌ড়েবে ও স্যাঁত্‌সেতে ভাষায় এদিকে ওদিকে সমালোচনার আবির্ভাব হতে লাগল। উনবিংশ শতাব্দীতে পৌছে, ইংরেজী শিক্ষার ক্ষীণ আলোক যখন আমরা পেলাম, এবং প্রকৃত দেশের মাটি থেকে সাহিত্য সৃষ্টিও আরম্ভ হল, তখন সমালোচনা সাহিত্যেরও কিছু কিছু আভাস পাওয়া গেল। ঈশ্বর গুপ্ত, টেকচাঁদ ঠাকুর, কালিপ্রসন্ন সিংহ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এঁরা ধীরে ধীরে নিজ নিজ প্রতিভা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন, এবং 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাচার নক্সা', 'তিলোত্তমা কাব্য', 'মেঘনাদ বধ কাব্য' প্রভৃতির মধ্যে সমালোচকের জন্যে রসদ সঞ্চিত হলো। কিন্তু 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠার পর ক্যাপ্‌টেন রিচার্ডসন প্রমুখ ইংরেজী পণ্ডিতদের শিক্ষায় যে সব বাঙালী ছাত্র ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও সমালোচনার গতি-প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষায় তাকে প্রয়োগ করবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন, ঈশ্বর গুপ্তের "প্রভাকর" পত্রিকায় তাঁদের বিরোধিতা চলছিল। সেই সময়, প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৮৪৪ সালে) "ক্যালকাটা রিভ্যু" পত্রিকা প্রকাশিত হয়, এবং সেখানে ইংরেজী ভাষায় বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা ইংরেজ ও বাঙালী সমালোচকেরা লিখতে আরম্ভ করেন। "সোমপ্রকাশ ও রহস্য সন্দর্ভ" পত্রিকাতেও বাংলা সমালোচনা প্রকাশিত হতো। ১৮৬৫, ১৮৬৬ ও ১৮৬৯ সালে যথাক্রমে "দুর্গেশনন্দিনী", "কপালকুণ্ডলা" ও "মৃণালিনী" প্রকাশিত হল এবং ১৮৭১ সালে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে "ক্যালকাটা রিভ্যু" পত্রিকায় বেনামা একটি বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক

সমালোচনা ইংরেজীতে লিখলেন। ১৮৭২ সালে "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হবার পর বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য কিছু কিছু পরিবর্ধিত হলো এবং পরে "ভারতী" ও "সাধনা" পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ তাকে জীবন্ত ও সুন্দর করে তুললেন। বাংলা সমালোচনার প্রাণপ্রতিষ্ঠা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা হলেও, রবীন্দ্রনাথই রক্তমাংস দিয়ে তার মধ্যে লালিত্য আনলেন। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে ক্রমে একটি সমালোচকের চক্র গড়ে উঠল, এবং পরে "সবুজ পত্রের" মধ্যে তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের মতবাদ প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি। তা ছাড়া মোহিতলাল মজুমদার বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্র যথেষ্ট প্রসারিত করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এবং সংস্কৃত পণ্ডিতদের সুদীর্ঘ ছায়ার চৌহদ্দি তিনিও অতিক্রম করতে পারেন নি, বরং মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত সংকীর্ণভাবে সাহিত্যের সৌন্দর্য ও রসের ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, সুবোধ সেনগুপ্ত, প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখ অধ্যাপকবৃন্দও বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করেছেন, কিন্তু তাঁদের সমালোচনা অধ্যাপকীয় ও কলেজী হয়েছে, প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচনা হয় নি। তার মধ্যে পাণ্ডিত্য আছে, প্রাণ নেই, দৃষ্টির পরিচয় নেই। এখানে শুধু একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি হচ্ছেন দীনেশচন্দ্র সেন। দীনেশবাবু অক্লান্ত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বহু মূল্যবান গুপ্তরত্ন উদ্ধার করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ইতিহাসও বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করে গিয়েছেন। কিন্তু ঠিক ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সুবিন্যস্তভাবে সাহিত্যের বিশ্লেষণ করে যান নি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এই গবেষণামূলক সংকলন কার্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

ঠিকভাবে বিচার করে দেখতে গেলে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য এমন কিছু অগ্রসর হয় নি যাতে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে। প্রাচীনদের সেই বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং আজও বাংলার সমালোচকদের কানে ধ্বনিত হচ্ছে, এবং কাব্যরসের আজও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে "ব্রহ্মানন্দ-সহোদরঃ" বলে। আজও বাংলার সমালোচকেরা নিভৃতে ব্রহ্মানন্দ-সহোদরের সঙ্গে কূজন করতে চান, আমাদের মতো সর্বসাধারণের জন্যে সেই রসনীড়টির সামনে

উত্তরীয় পরিয়ে পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে খড়্গ হাতে দাঁড় করিয়ে রাখেন, এবং বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে আমরা, যারা সমাজ নিয়ে; রাজনীতি নিয়ে, বা জনসাধারণের মঙ্গল অমঙ্গল নিয়ে চিন্তা করি তারা কবি বা কাব্যরসিকের কাছে ম্লেচ্ছ। সমালোচনার রাজ্যে এঁদের মনোভাব আজও আর্যদের মতোই রয়েছে আর সাধারণ মানুষেরা রয়েছে অনার্য। তার কারণ বাংলাদেশের মাটি থেকে আজও মধ্যযুগ একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায় নি, এবং সাহিত্যকে যাঁরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নীরব যোগসাধনার মতো জ্ঞান করেন তাঁদের মনে এই মধ্য-যুগীয় মনোভাব বদ্ধমূল হয়ে আছে। বাংলা সাহিত্যে আজও তার প্রমাণ স্পষ্ট রয়েছে এবং সমালোচনা-সাহিত্যে সে-প্রমাণ স্পষ্টতর।

এখন সমালোচনার কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করব, কারণ তাতে বাংলা সমালোচনার বিকাশ কিভাবে কোন্ দিকে হয়েছে বোঝা সহজ হবে।

সমাচার দর্পণ

"নূতন পুস্তক। সম্প্রতি দুই তিন বৎসর হইল মোং কলিকাতার হিন্দুরদের শাস্ত্র-সিদ্ধ সহমরণের বিষয়ে কেহ কেহ প্রতিবাদী হইয়াছেন তন্নিমিত্ত কলিকাতার শ্রীযুক্ত বাবু কালাচান্দ বসুজা এক নূতন পুস্তক রচনা করিয়া ছাপাইয়াছেন। সে পুস্তকে সহমরণ নিষেধকর কথা ও স্বমতসিদ্ধ মুনিপ্রণীত বচন তাহার প্রত্যুত্তরস্বরূপ সহমরণ বিধায়কের বাক্য ও তাহারও স্বমতসিদ্ধ মুনিপ্রণীত বচনও আছে এবং বাঙ্গালা ভাষাতে তাহার তর্জ্জমা আছে এবং সেই বিষয়ের ইংরাজী ভাষাতে পৃথক এক কেতাব অতি সুন্দররূপে তর্জ্জমা। এই পুস্তক অত্যল্পদিন প্রকাশ হইয়াছে। (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮১৯।)

নূতন পুস্তক। শ্রীযুক্ত বাবু নীলরতন হালদার মহাশয় বহু-দর্শন নামে এক নূতন পুস্তক করিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন সে পুস্তক দ্বারা মূর্খ লোকও সভাসৎ হইতে পারিবেক। যেহেতু ইংরাজী ও বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এবং পারসি ও লাটিন প্রভৃতি নানা ভাষাতে নানা দৃষ্টান্ত একস্থানে সংগ্রহ করিয়াছেন। (২০শে আগষ্ট, ১৮২৫।)"

এই পুস্তক সমালোচনাগুলি পড়লেই বোঝা যায় যে সমালোচনা-সাহিত্য বাংলায় ভূমিষ্ঠ হলেও তার কথা তখনও ফোটে নি। 'ক্যালকাটা রিভ্যু' পত্রিকা প্রকাশিত হবার পর ইংরেজ পণ্ডিতদের প্রভাবে বাংলা সমালোচনা একটা নূতন

পথের সামনে এসে দাঁড়ায়, এবং সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমবাবু অবতীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা-সাহিত্যও নূতন জীবন লাভ করে। এই সময় শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। আমার মনে হয় বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে এই প্রবন্ধটির একটি বিশেষ স্থান আছে এইজন্য যে এই সমালোচনার মধ্যে আধুনিক বাংলা সমালোচনার বীজ দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৫২ সালে কলিকাতার বীটন সোসাইটি নামে এক সাহিত্য-সভার বৈঠকে কয়েকজন প্রবন্ধকারের বাংলা কবিতার অপকৃষ্টতা সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রতিবাদ-স্বরূপ রঙ্গলালবাবু "বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ" রচনা করে পাঠ করেন। প্রবন্ধের কিছু কিছু অংশ আমি উদ্ধৃত করছি :

"......বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল ব্যক্তি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, প্রায় কেহই তাহাতে স্ব স্ব সাময়িক দেশের অবস্থা অথবা দেশীয় লোকের নীতি রীতি প্রভৃতি প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিয়া যান নাই, ইহাও এক মহা ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবেক ; কিন্তু সেই ক্ষোভ কথঞ্চিদ্রূপে কবিকঙ্কণের চণ্ডীপাঠ করিলে নিবৃত্তি পায় ; অন্যূন দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে আমারদিগের দেশের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যাইতে পারে। কবিকঙ্কণ প্রকৃত কবির অনেক গুণে মণ্ডিত ছিলেন, বিশেষতঃ তদ্‌গ্রন্থে নানাপ্রকার অবস্থার মনুষ্যদিগের আন্তরিক ভাব এবং ভাষা অতিকৌশলে রক্ষিত তথা পরিপাটীরূপে বিভিন্নপ্রকার রস সকল বিকশিত হইয়াছে। আমরা গৌড়ীয় কবিতার প্রথমাবস্থার এইরূপ সংক্ষেপ বিবরণ সমাপন করিয়া তৎপরের অবস্থা বিষয়ে কিঞ্চিদ্বাহুল্য উল্লেখ করিতেছি, অতএব শ্রোতৃবর্গের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যে সময়ে বর্গির হাঙ্গামা, যে সময়ে ইংরাজের বিক্রম বৃদ্ধি এবং যে সময়ে মুসলমানের ছত্রভঙ্গ, সেই সময়ে ক্ষুদ্র এক তটিনীতীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র এক নগরীর ক্ষুদ্র এক রাজার সভা মনে করুন, সেই রাজা একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন না, একজন স্বাধীন রাজার ভৃত্যানুভৃত্য ; সেই রাজার ধীরতার চিহ্নের মধ্যে এইমাত্র ছিল যে, তিনি "কাব্য শাস্ত্রবিনোদন কালো গচ্ছতি ধীমতাং" এই প্রসিদ্ধ কথার মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন, অতএব স্বীয় সভাসৎ এবং আশ্রিত ভারতচন্দ্র রায়কে গুণাকর উপাধি পুরস্কার করিয়া কবিতা কলা কলনে অনুমতি প্রদান করাতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। ভারতচন্দ্র রায় স্বয়ং জনেক ভাগ্যধর ব্রাহ্মণের বংশধর ছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে সেই দেশে অত্যন্ত অরাজকতা বিধায়

স্বীয় সম্পদপরিচ্যুত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং এই জন্যই রায় গুণাকর কবিতার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের বিস্তর স্তুতি করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ স্তাবকতার কারণ দেদীপ্যমানই রহিয়াছে, যেখানে লাটীন কবি অবিড্ মাহাত্মা স্বীয় প্রভু কর্তৃক দ্বীপান্তরিত হইয়াও তোষামোদ করিতে ত্রুটি করেন নাই, সেখানে ভারতচন্দ্র "অন্নেন পুরুষো দাসঃ" ইতি নীতিবাক্যের মর্ম্মরক্ষা করিবেন, ইহাতে দোষ কি ?······সত্য বটে, ভারতচন্দ্র কোন মহাকবির ন্যায় উচ্চতর ভাব সকল প্রকাশ করিতে পারেন নাই, কিন্তু মহৎভাব প্রকটন করণের উপযোগিতা সকল আবশ্যক রাখে, যে জাতি পরাধীনতা শৃঙ্খলে চিরদিনের জন্য বদ্ধ, যে জাতি আহার বিহার ব্যতীত সভ্যতার উচ্চাভিপ্রেত সকল সিদ্ধিকরণে অজ্ঞাত, যে জাতি জন্মভূমিকে গরীয়সী মানিয়া কূপমণ্ডূকবৎ অবরুদ্ধ আছে, তাহারদিগের মনোমধ্যে উচ্চতর ভাবোদয় হওনের বিষয় কি ? ·····

·· কবিকঙ্কণের ন্যায় ভারতচন্দ্র রায় যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সময়ের প্রচলিত দেশাচার প্রভৃতি যথার্থরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কাব্য সকলের বয়ঃক্রম অদ্য একশত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তথাচ এই শতাব্দের মধ্যে অস্মদ্দেশের আচার ব্যবহার কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা মনে করিলে নয়ন পথে অশ্রুধারার শেষ হয় না। ভারতের শব্দসৌন্দর্য্য ভাবের মাধুর্য্য এবং রসের প্রাচুর্য্য ও প্রাখর্য্যের কথা অধিক কি বর্ণনা করিব, বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ সুমিষ্ট রচনা অদ্যাবধি আর দ্বিতীয় হয় নাই, ভারতের পদ্য পংক্তি পাঠকালীন বোধ হয়, যেন মধুকরনিকরের ঝঙ্কার হইতেছে—"

(বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ—১৮৫২ সনে প্রকাশিত)

সমালোচক উক্ত সমালোচনার মধ্যে শেক্সপীয়রের 'ভেনাস এণ্ড এডোনিস' এবং বাইরনের 'ডন জুয়ান' কাব্য থেকে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করে ভারতচন্দ্রের অশ্লীতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভাষাটাকে একটু আধুনিক রীতিতে সংশোধন করে নিলেই আমার মনে হয় রঙ্গলালবাবুর সমালোচনাকে যে কোনো আধুনিক বাংলা সমালোচনার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।*

* শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের সঙ্গে ১৮৫২ সনের জানুয়ারী সংখ্যার 'Calcutta Review'-এ প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দত্তের 'Bengali Poetry' নামক প্রবন্ধ পঠিতব্য। এই দু'টি প্রবন্ধ থেকে তৎকালীন বাংলা সমালোচনা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা হবে।

এরপরে ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশিত হলে "সংবাদ প্রভাকর", "রহস্য সন্দর্ভ" ও "সোমপ্রকাশ", পত্রিকায় যে সমালোচনা বেরোয় তার থেকে বাংলা সমালোচনার পরিচয় পাওয়া যাবে। সমালোচনা ক'টি আমি উদ্ধৃত কর্ছি :

সংবাদ প্রভাকর (১৪ই এপ্রিল, ১৮৬৫)

দুর্গেশনন্দিনী

"এখানি ইতিহাসমূলক উপাখ্যান। ...এক এক পৃষ্ঠা করিয়া পাঠ করিতে করিতে ক্রমে আমরা ইহার আদ্যোপান্ত সমাপ্ত করিয়াছি। পাঠকালে অন্তঃকরণে কিরূপ অপরিসীম আনন্দের উদয় হইয়াছিল, পাঠকগণ স্বয়ং পাঠ করিয়া না দেখিলে সে আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন না।...

বাঙ্গালা ভাষায় নূতন উপাখ্যান এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই, দুর্গেশনন্দিনী-গ্রন্থকার যদিও স্বপ্রণীত পুস্তক মধ্যে স্থানে স্থানে ইংরাজীভাব সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তথাপি যখন ইহা অনুবাদিত পুস্তক নহে, তখন ইহা অবশ্যই নূতন।

পাঠকগণ যেন এরূপ মনে না করেন যে, আমরা ইংরাজী উপাখ্যান সমুদয়ের সহিত দুর্গেশনন্দিনীর উৎকর্ষের তুলনা করিতেছি। ইংরাজীতে যেরূপ উত্তম উত্তম উপাখ্যান আছে, বাঙ্গালা ভাষায় সেরূপ নাই, এই নিমিত্ত আমরা এই উৎকৃষ্ট ও প্রথম বাঙ্গালা উপাখ্যানকে গৌরব স্থানীয় করিলাম।...যখন একটি ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষার গর্ভজাত সন্তানোৎপত্তির আবশ্যকতা রহিয়াছে; সে সন্তান কোথায়? পাঠকগণ স্মরণ করিয়া বলুন তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত কখানি মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন? বাস্তবিক বঙ্কিমবাবু এই পুস্তকে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালার প্রথম উপাখ্যানকার (first novelist) উপাধির অধিকারী হইয়াছেন। আমাদিগের দেশে যে সকল উপাখ্যান দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয়ই প্রায় অদ্ভুত ও অনৈসর্গিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। দুর্গেশনন্দিনী সর্ব্বাংশে সেই বিতৃষ্ণাকর দোষে পরিবর্জ্জিতা। বিশেষতঃ ইতিবৃত্তের সহিত ইহার সংস্রব থাকাতে আরো একটি মনোহর শোভা হইয়াছে।"

রহস্য-সন্দর্ভ (২য় পর্ব্ব, ২১শ খণ্ড)

"বঙ্গদেশে কল্পনাশক্তির তিরোভাব হইয়াছে বোধ হয়, যে কোন গ্রন্থ

নূতন হইতেছে তৎসমুদায়ই এক আদর্শের অনুকরণ সর্ব্বত্র প্রতীয়মান হয়। বাঙ্গালীতে যত গদ্যকাব্য হইয়াছে তৎসকলই প্রায় বিদ্যাসুন্দরের ছায়া স্বরূপ বোধ হয়; ··· এই প্রযুক্ত আমরা বঙ্গীয় সাময়িকপত্রের সম্পাদক হইয়াও বাঙ্গালী গদ্যকাব্য-পাঠে অত্যন্ত অনুরাগ বিহীন। পরন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করায় সে বিরাগের দূরীকরণ হইয়াছে। আমরা তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহার কল্পনা, গ্রন্থন, রচনা, সকলই নূতন প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং তাহাতে কাহাকেই চর্ব্বিত চর্ব্বণের ক্লেশ পাইতে হয় না। যাঁহারা ইংরাজী গদ্যকাব্য পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মনে দুর্গেশনন্দিনীর অনেকস্থানে ইংরাজী নবেলের প্রতিভা লক্ষ্য হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রতিভার কোন বিশেষ হানি হয় না। যাঁহারা নূতন সরস মনোমুগ্ধকর গল্পের অনুযায়ী, যাঁহারা বীর্য্যবৎ বাক্যের আদরকারী, যাঁহারা বিনানুপ্রাসে রচনার চাতুর্য্য হইতে পারে এমত জ্ঞান করেন, যাঁহারা মহদ্‌গুণে পরিতৃপ্ত হন, তাঁহারা দুর্গেশনন্দিনীতে আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন, কারণ ইহা তাঁহাদের সকল অভীষ্টের সম্যক প্রকারে পোষক, সন্দেহ নাই।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য গল্পটি সমস্ত অলীক নহে। ইহার মূল আখ্যায়িকাটি জাহাঁনাবাদে অদ্যাপি ইতিবৃত্ত বলিয়া প্রচলিত আছে, তাহারই সম্প্রসারণ করিয়া গ্রন্থকার আপন গল্পটি সম্পন্ন করিয়াছেন। এই গল্পের বিন্যাসে অনেক প্রকার অকস্মাৎ ঘটনার উল্লেখ হইয়াছে, তাহাতে পাঠকদিগের মনকে একান্ত বশীভূত করে। এবং গ্রন্থপাঠ-সমাপ্তি পর্য্যন্ত গ্রন্থত্যাগের মানসকে একালে দূরীভূত করে। গল্পের মুখ্য পদার্থ আদিরস হইলেও তাহার কুত্রাপি অসহনীয় বর্ণন হয় নাই, ও স্থানে স্থানে উপহাস বর্ণন দ্বারা চিত্ত বিস্ফারণের উপায় করা হইয়াছে।

গ্রন্থকারের বর্ণনা-শক্তি বিলক্ষণ বলবতী এবং যেকোন বিষয়ের আদর্শ শব্দে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাই মনোজ্ঞ বোধ হয়।···

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবু হাস্য-রসোদ্দীপনে বিলক্ষণ যত্নশীল কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এইক্ষণে বাঙ্গালী পুস্তক ভদ্রমহিলারা পাঠ করিয়া থাকেন ইহা তিনি সর্ব্বত্র স্মরণ রাখেন নাই, অথবা তাঁহার পুস্তক তাহাদিগের গ্রাহ্য করিবার সম্যক চেষ্টা পায়েন নাই। অনেক কথা আছে যাহা স্পষ্টাপেক্ষা পরোক্ষে ভদ্র হয়, ইহা বিস্মৃত হওয়া অনেক গ্রন্থকারের সহৃদয়তার হানিকর হইয়া থাকে।······

এ পর্যন্ত গ্রন্থের প্রশংসানামন্তর ইহা বক্তব্য হইয়াছে। যে গ্রন্থকার ইংরাজী গদ্যকাব্যের ভাবে আর্দ্র থাকায় কোন কোন স্থলে হিন্দু ও মোসলমান সম্বন্ধে ইংরাজী বা বিলাতী আচার ব্যবহারের আরোপ করিয়াছেন, তাহাতে স্বভাব বর্ণনার ব্যাঘাত হইয়াছে। ·· গ্রন্থের রচনা সম্বন্ধে বক্তব্য যে তাহা সাধারণতঃ শুদ্ধ ওজোগুণ বিশিষ্ট এবং স্বভাবসিদ্ধ হইলেও স্থানে স্থানে চ্যুত সংস্কৃতিত্বে আক্রিষ্ট আছে। কয়েক স্থানে গ্রন্থকার "লম্ফত্যাগ করিয়া" পদ লিখিয়াছেন, ইহা পরিশুদ্ধ গৌড়ীয় নহে। লোকে লম্ফ "প্রদান" করিয়া থাকে, কদাপি "ত্যাগ" করে না, কেবল পল্লীগ্রামবাসিরা "লাফছাড়িয়া" থাকে, বোধ হয় বঙ্কিমবাবু তাহারই অনুবাদ করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক তাঁহার গ্রন্থখানি যে রসব্যঞ্জক, ভাবদ্যোতক ও নূতন প্রণালীর আদর্শস্বরূপ হইয়াছে এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে সম্যক্ সাধুবাদ করিলাম।"

সোমপ্রকাশ (২৪ এপ্রিল, ১৮৬৫)

"দুর্গেশনন্দিনী।···পাঠকগণ গ্রন্থের নামটি দেখিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আমাদিগের মনেও প্রথমে কৌতুক জন্মিয়াছিল। নামটি শ্রুতিমধুর হয় নাই বটে কিন্তু বিলক্ষণ কৌতুকাবহ হইয়াছে। ··

যাঁহারা আরবোপন্যাস পড়িয়াছেন, আসিয়ার লোকের অদ্ভুত উপন্যাস রচনা শক্তি কেমন প্রবল, তাঁহারা তাহা জানিতে পারিয়াছেন। দুর্গেশনন্দিনী রচনাকর সেই শক্তিকে প্রতীচ্যদিগের প্রদর্শিত নৈসর্গিক রচনারীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রস্তাবিত উপন্যাসের সবিশেষ মনোহরতা সম্পাদন করিয়াছেন। মনোহর উপন্যাস পাঠ চিত্তকে যেরূপ আকর্ষণ করে দুর্গেশনন্দিনী আমাদিগের চিত্তকে সেইরূপ আকর্ষণ করিয়াছিল। আমরা ঔৎসুক্য সহকারে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি।

পাঠকালে অনেকস্থলে গ্রন্থকারের নায়ক নায়িকা প্রভৃতির রূপ বর্ণনাদি ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া আমাদিগের অন্তঃকরণ আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়াছে। যে স্থলে যে ব্যক্তি বা যে বস্তুর সদ্ভাব অথবা যেরূপ বর্ণনা আবশ্যক, গ্রন্থকার তত্তৎ স্থানে যথোচিত রূপে সে সকলের সন্নিবেশাদি করিয়াছেন।

শুক্ল কৃষ্ণ, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম, পরস্পর সন্নিহিত না হইলে পরস্পরের মহিমা ও শোভা বৃদ্ধি হয় না। আমরা অতঃপর দুর্গেশনন্দিনীর দোষগুলি পার্শ্বে

সন্নিবেশিত করিতে চলিলাম। এ দেশের লোকের এক বিষয় লইয়া অধিক বর্ণনা করিবার যে একটি রোগ আছে, গ্রন্থকার সম্পূর্ণরূপে তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কয়েকটি স্থানে অতিবর্ণন দোষে বিরস হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে পতৎপ্রকর্ষতা দোষ ঘটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা দোষেরও বিন্দুপাত হইয়াছে। ভাষাটিও ললিত ও সর্বজন হৃদয় গ্রাহিনী হয় নাই।…"

'সংবাদ প্রভাকর', 'সোমপ্রকাশ' ও 'রহস্য-সন্দর্ভে'র সমালোচনা পড়ে বোঝা যায় যে 'ভালো-লাগা-মন্দ-লাগার' স্তর অতিক্রম করে বাংলা সমালোচনা তখনো অগ্রসর হতে পারে নি। সমালোচনার ঠিক রূপটি দেবার চেষ্টা করেন বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" পত্রিকা প্রকাশিত হবার পূর্বে "ক্যালকাটা রিভ্যু" পত্রিকায় "Bengali Literature" নামক একটি প্রবন্ধের মধ্যে। এই প্রবন্ধের কিছু কিছু অংশ আমি বাংলায় অনুবাদ করে উদ্ধৃত করছি :

……প্রাচীন বাংলা সাহিত্যিকদের রচনা-তারিখ উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে কোনো বাংলা প্রাচীন পুস্তকের বয়স তিনশ' বছরের বেশী নয়। …প্রথমে গীতিকবিদের নাম করা উচিত। গীতিকবিদের মধ্যে বিদ্যাপতির নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা বৈষ্ণব ছিলেন এবং এদের সঙ্গীতও কৃষ্ণপ্রেম ও চৈতন্যদেবের লীলা নিয়ে রচিত। …পৌরাণিক স্কুলের কবিদের মধ্যে কাশীদাস ও কৃত্তিবাসের নাম করা যেতে পারে, এবং এঁরা যদিও বিখ্যাত ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারত ও রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন, তাহলেও অনেক ক্ষেত্রে মৌলিকত্বের পরিচয় তাঁদের আছে। ··মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বা কবিকঙ্কণ এই স্কুলেরই অন্তর্ভুক্ত, এবং কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের চাইতে কবি হিসাবে তাঁর স্থান আরও উঁচুতে। …এই কবিদের ভাষার মধ্যে হিন্দীর কোনো চিহ্ন নেই, কিন্তু আধুনিক বাংলা ভাষার সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। কাব্যশক্তির দিক দিয়ে বৈষ্ণব কবিদের তুলনায় পৌরাণিক কবিরা নিম্নস্তরের।

তৃতীয় লেখকের দল নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ভারতচন্দ্র রায়ের নাম পরিচিত। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' লিখে খ্যাত হয়েছেন। কোনো কাব্যগ্রন্থই কাব্যগুণের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য নয়, একমাত্র হীরার চরিত্র ভিন্ন চরিত্র-চিত্রণে ভারতচন্দ্রের শক্তির পরিচয় কোথাও নেই। তবে কাব্যের অন্যান্য মহৎ গুণ বা বৈশিষ্ট্য ভারতচন্দ্রের

মধ্যে নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না এবং তিনি বিশুদ্ধ কাব্যসৃষ্টিতে অনেক নিম্ন-স্তরের কবি।

বাংলা সাহিত্যের সর্বপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা নদীয়ার কবিদের পরেতেই আসে। ভারতচন্দ্রকে তবু পড়া যায়, কিন্তু এ যুগে পড়বার মতো কিছুই নেই। 'নব বাবুবিলাস' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকার' যুগ সাহিত্যের আবিলতার দিক দিয়ে অতুলনীয় বলা চলে। এ যুগের 'কবি'-গান বাংলাদেশের ধনিক হিন্দুরা অজস্র অর্থ ব্যয় করে গাওয়াতেন। 'কবি'-গান একটি গান নয়, অনেকগুলি গান একসঙ্গে গ্রথিত, দু'দলে মিলে গায়। পরস্পর পরস্পরকে অশ্রাব্য ভাষায় গাল দেওয়া ছাড়া এ গানের উৎকর্ষের দিকে উল্লেখযোগ্য আর কিছু নেই।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্বে আর একজন লেখকের নাম উল্লেখ করা উচিত, যিনি একাই একটি শ্রেণীবিশেষ। এই লেখকের নাম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। অতীত ও বর্তমানের সন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব, এবং তিনি সমসাময়িক সাহিত্যিক অবনতির যুগের প্রতীক। হাল্কা বিদ্রূপাত্মক কাব্যরচনায় তিনি দক্ষ ছিলেন, এবং কবি ও সম্পাদক হিসাবে তিনি সাফল্য অর্জনও করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ কবির কোনো গুণ তাঁর মধ্যে ছিল না, এবং তাঁর রচনা কর্কশ ও অশিক্ষিত। অনুপ্রাসের জন্যই তিনি লোকপ্রিয় ছিলেন। তার গদ্যে এসব ত্রুটি না থাকলেও, সেখানে শুধু ধর্ম ও নীতিকথাই তিনি প্রচার করেছেন।

আধুনিক বাংলা লেখকদের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে এঁদের মধ্যে দু'টি স্কুল আছে, একটি সংস্কৃতপন্থী, আর একটি ইংরেজীপন্থী। প্রথম স্কুল সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের গৌরব করেন, দ্বিতীয় স্কুল পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত। সংখ্যায় সংস্কৃতপন্থী লেখক বেশী হলেও, শক্তিমান লেখকেরা দ্বিতীয় স্কুলের অন্তর্ভুক্ত।

……সংস্কৃতপন্থী লেখকরা সংস্কৃত লেখকদের আদর্শ অনুসরণ করেন, এবং সেইজন্য তাঁদের মধ্যে মৌলিকত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়। মৌলিক রচনা এঁদের কিছুই নেই। মৌলিকত্বের চেষ্টা সত্ত্বেও পূর্বানুসৃত পথ ছেড়ে চলবার এঁদের ক্ষমতা হয় নি। …… যেমন 'প্রেম' বিষয় হলে এঁরা সঙ্গে সঙ্গে মদনকে তলপ করেন, এবং মদন পঞ্চ পুষ্পশর নিয়ে উপস্থিত হন, সঙ্গে থাকেন রাজা বসন্ত, আর মলয় ভ্রমর প্রভৃতি সেনাবাহিনী। …এদের রচনার মধ্যে

এমন একটিও সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যাবে না যে 'চন্দ্রবদনা' ও 'পদ্মলোচনা' নয়, যার কেশদাম মেঘ স্তবকের মতো নয়, এবং নাসিকা যার গরুড়ের চঞ্চুর মতো তীক্ষ্ণ নয়।······টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথম এই ভণ্ড পাণ্ডিত্যের লৌহ প্রাচীরে আঘাত করে চূর্ণবিচূর্ণ করেন। তিনি সংস্কৃত ছাত্রদের ধ্যান ধারণা ধূলিস্মাৎ করে দিয়ে প্রকৃতি ও জীবন থেকে তাঁর "আলালের ঘরের দুলাল" রচনার উপকরণ সংগ্রহ করলেন। টেকচাঁদের আদর্শ অনুসরণ করলেন ঔপন্যাসিক কালীপ্রসন্ন সিংহ, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র।

সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সকলের অপরিসীম শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতো তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতিও যুক্তিহীন। অন্য ভাষা থেকে সুন্দর অনুবাদ করতে পারলেই যদি রচয়িতা হবার অধিকার জন্মায় তাহলে অবশ্যই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লেখক বলে স্বীকার করতে হয়। যদি প্রাথমিক শিক্ষার গ্রন্থ প্রণয়নে সে-অধিকার আরও বেশী শক্তিশালী হয় তাহলে বিদ্যাসাগর শক্তিশালী লেখক সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা জানি যে অনুবাদ করলে বা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রাইমার রচনা করলে তাতে প্রতিভার পরিচয় বা প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং বিদ্যাসাগর তার বেশী কিছু করেন নি।···

······টেকচাঁদ থেকে হুতোম খুব সহজ পরিবর্তন। টেকচাঁদের রচনা-রীতি কালীপ্রসন্ন সিংহ গ্রহণ করে তাকে আরও সহজ ও সুন্দর করেছিলেন। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সার' মধ্যে শহুরে জীবনের নগ্ন আছে, ডিকেন্‌স্‌-এর Sketches by Boz-এর মতো, এবং শহরের সমস্ত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য ও জীবনযাত্রার প্রণালী অদ্ভুতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে 'চড়কপূজা', 'বারোয়ারী', 'বাবু পদ্মলোচন দত্ত' ও 'স্নানযাত্রা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

······মাইকেল মধুসূদন দত্ত ক্ষমতাশালী নাট্যকার ও কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যের মধ্যে 'মেঘনাদ বধ', 'তিলোত্তমা', 'বীরাঙ্গনা' ও 'ব্রজাঙ্গনা' সর্বজনপরিচিত, এবং প্রথম দু'টি মহাকাব্য বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম অমিতাক্ষর ছন্দে রচিত।······'মেঘনাদবধ কাব্য' মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ রচনা। বিষয়টি যদিও রামায়ণ থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন, তাহলেও সম্পূর্ণ কাব্য তিনি নিজের প্রতিভা বলেই সৃষ্টি করেছেন। বহু চিত্র, চরিত্র ও কাহিনী মধুসূদনের নিজের সৃষ্টি। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের মধ্যে তাঁর শিল্পীমনের এক অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়। হোমার,

মিল্টন ও বাল্মিকীর কাছে যদিও তিনি অনেক দিক থেকে ঋণী, তাহলেও তিনি সবকিছু উপলব্ধি করে একান্ত নিজের করে নিয়েছেন। তাঁর কল্পনাশক্তি ও বর্ণনা-শক্তি অতুলনীয়।··

'মধুসূদনের ত্রুটি যে নেই তা নয়। যখন মৃদু সমীরণেরও প্রয়োজন নেই তখন দেখা যায় পবন দৈত্যের মতো তাঁর কাব্যের মধ্যে গর্জন করছে। অনর্থক মেঘ জমা হয়ে ভীষণ বৃষ্টিপাত হচ্ছে অথচ বৃষ্টি না হলেও চলে। সাগর তখন ক্রোধে আস্ফালন করছে যখন পাঠকের সে-আস্ফালন সহ্য করবার মতো মনোভাব নেই। এইসব অতিরঞ্জনের গুরুতর দোষ মধুসূদনের মধ্যে আছে। এবং একই চিত্র বা শব্দ প্রয়োগ করে তিনি পাঠককে বিরক্তও করেন।

নাট্যকার হিসাবে মধুসূদন তেমন সার্থক হতে পারেন নি।······বাংলার নাট্যকারদের মধ্যে একমাত্র দীনবন্ধু মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধু পাঁচখানি নাটক লিখেছেন, তার মধ্যে দু'টি কৌতুকপূর্ণ। তাঁর "নীলদর্পণ" নাটকের খ্যাতি ইয়োরোপীয়দের মধ্যে বেশী। ···নীলকরদের দাঙ্গাহাঙ্গামার সঙ্গে এই নাটকের যোগাযোগ থাকার দরুন সাধারণের মধ্যে নাটকখানি তথাকথিত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। মিঃ লঙ-এর শাস্তির পর সাধারণের ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা যখন বৃদ্ধি পেল তখন "নীলদর্পণ"কে সকলে জঘন্য ও অপাংক্তেয় নাটক বলে নিন্দা করতে লাগল। অবশ্য এ-মতের সঙ্গে আমরা একমত নই। কিন্তু আর্টের দিক দিয়ে নীলদর্পণের স্থান যে অনেক নীচুতে তা স্বীকার করতেই হবে। নীলদর্পণের খ্যাতি রাজনৈতিক কারণে, সাহিত্যিক উৎকর্ষের জন্যে নয়, সেইজন্য 'নীলদর্পণ' সম্বন্ধে এখানে আর বেশী আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।···

(Calcutta Review, 1871—No 104, p. 294 p. 316)

এই সমালোচনা পড়লেই বোঝা যায় যে এর মধ্যে 'রস' বা 'বিশুদ্ধ' সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা বিশেষভাবে উল্লিখিত না হলেও, বঙ্কিমবাবু সেই দৃষ্টিতেই বাংলা সাহিত্যের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছেন। সমালোচনার মধ্যে নীতিবাগীশদের সুনীতি-জ্ঞানও তার সাহিত্যবিচারের পথে প্রতিবন্ধক হয়েছে। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর মতামত থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া উক্ত সমালোচনা থেকে আর একটি মতও তাঁর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সাহিত্যের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকার তিনি বিরোধী, এবং বিষয় হিসাবে সাহিত্যে সমাজ বা রাজনীতি কতকটা তাঁর কাছে অস্পৃশ্যই।

দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" নাটক সম্বন্ধে অবজ্ঞার সহিত তিনি যে মত প্রকাশ করেছেন তার মূলে রয়েছে তাঁর সমাজ-বিচ্ছিন্ন 'শিল্পীর' মনোভাব। দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ রচনা "নীলদর্পণ", এবং এই নাটকের মধ্যে দীনবন্ধু বাংলার চাষাচাষীদের চরিত্র যেরকম সুনিপুণভাবে এঁকেছেন, গ্রাম্যভাষায় এবং প্রত্যক্ষ সামাজিক দৃশ্যের মধ্যে তাদের যেভাবে মুখর ও জীবন্ত করেছেন, তাতে আজ হয়তো আমরা না স্বীকার করলেও, আজ থেকে বিশ কি ত্রিশ বছর পরে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ 'তোরাপ' ও 'ক্ষেত্রমণি' তাঁকে বস্তুতান্ত্রিক শিল্পীর সুযোগ্য সম্মানে বিভূষিত করবে। দীনবন্ধু কোনো রাজনৈতিক মতবাদকে প্রচার করেন নি, সে-যুগে সেরকম কোনো মতবাদ তাঁব প্রচার কববার ছিলও না, তিনি প্রত্যক্ষ সামাজিক সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি কবে, তাকে নিজের গভীর অনুভূতির রঙে রঞ্জিত করে ভাষায় প্রকাশ করেছেন, এবং তা সাহিত্যও হয়েছে। অনুভূতির গভীরতা ছিল বলেই সাহেবের বেত্রাঘাতে ক্ষেত্রমণিব চীৎকার ও প্রতিবাদ আজও আমাদের কানে ভেসে আসে: "মোরে অ্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলবো না; মোর বুকি একটা তেরোনালের খোঁচা মার স্বগ্‌গে চলে যাই,--ও গুখেগোর বেটা, আঁটকুড়ীর ছেলে, তোর বাড়ী যোড়া মড়া মরে না? মোর গায়ে যদি হাত দিবি তোর হাত মুই এঁচড়ে কেমড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করবো।" এই দৃঢ়তা ও কুসংস্কার-মিশ্রিত কৃষককন্যার চরিত্রের কাহিনী আজ প্রতিদিন বাংলার প্রত্যেক জেলা ও গ্রামে গ্রামে আমরা শুনতে পাই। কারণ এদেশের জীবনের স্পন্দন ঐখানে এবং সে-স্পন্দন দীনবন্ধু শুনেছিলেন ও অনুভব করেছিলেন।

সমালোচনার এই আদর্শকেই বঙ্কিমবাবু 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২-৭৬) পত্রিকায় রূপ দেন। সাহিত্য-সমালোচনাতে ঠিকভাবে মনোযোগ দিতে না পারলেও, এবং ক্রমে হিন্দুধর্মের পুঁথির দিকে আকৃষ্ট হলেও, সমালোচনার একটা ক্ষীণস্রোত তাঁরই প্রচেষ্টায় সে-সময় প্রবাহিত হয়েছিল। তার মধ্যে 'রস' ছিল, 'সৌন্দর্য' ছিল, 'নীতিজ্ঞান' ছিল, 'শাস্ত্র' ছিল. এবং তার সঙ্গে ছিল তাঁর সাহিত্যানুরাগ।

তারপর রবীন্দ্রনাথের যুগ। 'ভারতী', 'সাধনা' ও 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা সমালোচনাকে নূতন বেশভূষায় সুসজ্জিত করে পুরাতন রসশাস্ত্রের রাজসিংহাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার

স্পর্শে পুরাতন যেন আবার নূতন হয়ে উঠল। সাহিত্যকে সমাজের বা জীবনের প্রাত্যহিক কোলাহল থেকে বহুদূরে এক বৈরাগী, নীরব সাধকের তপোবনে তিনি স্থানান্তরিত করলেন, এবং যদিও প্রাচীন আলঙ্কারিকদের কাছ থেকে এই ব্রহ্মানন্দলাভের কাহিনী আমরা শুনে এসেছি, তবু আবার নূতন করে যাদুকরী কথার মোহে বিস্মৃত হয়ে পুরাতনের দিকেই হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার জয় হলো, এবং বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য প্রাচীন আলঙ্কারিকদের ভাণ্ডার থেকে মূল্যবান মণিমুক্তা আহরণ করে নিজের সম্ভার বৃদ্ধি করে ঐশ্বর্যবান হলো। এমনকি প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা যেখানে 'রস, ভাব, অনুভাব,' 'স্থায়ী, অস্থায়ী ও সঞ্চারী ভাবের' সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় কাব্য বা সাহিত্যকে বিরস করে তুলেছেন, রবীন্দ্রনাথ তার অনাবশ্যকীয় আবর্জনাকে অপসারিত করে সেখান থেকে শুধু তার মণিখচিত অংশটুকু নিয়ে তাকে পুনরায় দীপ্যমান করলেন। আমরা তাই তাঁর শব্দমাধুর্য ও প্রকাশ-মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হয়ে গেলাম। অবশ্য পরিবেষ্টন মধ্যে মধ্যে তাঁর অন্তরাত্মার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, বহুদূরের নির্জন দ্বীপ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে মাটির বুকে। কিন্তু তাও ক্ষণিকের জন্যে, সে-ক্ষণ অবজ্ঞা-মিশ্রিত, এবং মাটিতে দাঁড়িয়ে সে-দৃষ্টি আকাশ থেকে মাটির দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের "লোকসাহিত্য" পড়লেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বাংলা 'কবি'-সঙ্গীতকে সরাসরি 'literary filth' বলে বাতিল করে না দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"পূর্বকালের গানগুলি, হয় দেবতার সম্মুখে, নয় রাজার সম্মুখে গীত হইত—সুতরাং স্বতঃই কবির আদর্শ অত্যন্ত দুরূহ ছিল। সেই জন্য রচনার কোনো অংশেই অবহেলার লক্ষণ ছিল না, তার ভাষা ছন্দ রাগিণী, সকলেরই মধ্যে সৌন্দর্য এবং নৈপুণ্য ছিল। তখন, কবির রচনা করিবার এবং শ্রোতৃগণের শ্রবণ করিবার অব্যাহত অবসর ছিল—তখন গুণিসভায় গুণাকর কবির গুণপনা প্রকাশ সার্থক হইত।

কিন্তু ইংরেজের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।...তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক-

সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।

কবির দল তাহাদের সেই অভাব পূরণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইল। তাহারা পূর্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিশাইয়া, তাহাদের ছন্দোবদ্ধ সৌন্দর্য সমস্ত ভাঙিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া অত্যন্ত লঘু স্বরে উচ্চৈঃস্বরে চারিজোড়া ঢোল ও চারিখানি কাঁশি সহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সরস্বতীর বীণার তারেও ঝন্ ঝন্ শব্দে ঝংকার দিতে হইবে আবার বীণার কাষ্ঠদণ্ড লইয়াও ঠক্ ঠক্ শব্দে লাঠি খেলিতে হইবে। নূতন হঠাৎ-রাজার মনোরঞ্জনার্থে এই এক অপূর্ব নূতন ব্যাপারের সৃষ্টি হইল।"

(লোকসাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কবিগান বৈষ্ণব কাব্যের মতো গভীর নয়, অধ্যাত্মিকতায় ভরপূর নয়, শ্লীল নয়, ভাষার বা ছন্দের কারুকাজ নেই তার মধ্যে—কেবল সুলভ অনুপ্রাস, ঝুঁটা অলঙ্কারই তার বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ এই সব দোষের বিচার করেছেন, কিন্তু যথার্থই রাজসভার কবিরা প্রচুর অবসরের মধ্যে তাঁদের যে-কাব্যকে ভাষা ও ছন্দের জড়োয়া গহনায় সাজিয়ে জনসাধারণের মাঝখান থেকে দূরে রাজার গুণীজনের সভায় নিয়ে গিয়েছিলেন, ইংরেজ বিজয়ের প্রাথমিক যুগে এ-দেশের কবি-গায়কেরা সেই একই বিষয় ও ভাবকে জনগণের কাছে প্রকাশ করবার জন্য নিরাভরণ করেছিলেন। প্রকৃত গণসাহিত্য সৃষ্টির সেই ক্ষীণ ও অমার্জিত প্রচেষ্টা বিদেশী শাসনদণ্ড ও দেশী আত্মাভিমানের আঘাতে আজ লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু লুপ্ত কখনো তা হবে না, কারণ যার মধ্যে সহজ ও সুন্দরের সাবলীল প্রাণের স্ফূর্তি ছিল, আজ পারিপার্শ্বিকের চাপে তার শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হলেও অদূর ভবিষ্যতে একদিন সেই প্রাণের সারল্য তার লুপ্ত গৌরব ফিরে পাবে। একথা "গ্রাম্যসাহিত্য" সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন :

"গ্রাম্যসাহিত্যের মধ্যেও কল্পনার তান অধিক থাক আর না থাক সেই আনন্দের সুর আছে। গ্রামবাসীরা যে-জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে যে-কবি সেই জীবনকে ছন্দে তালে বাজাইয়া তোলে সে-কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে।…কল্পনার সংকীর্ণতা দ্বারাই সে আপন প্রতিবেশী-

বর্গকে ঘনিষ্ঠসূত্রে বাঁধিতে পারিয়াছে, এবং সেই কারণেই তাহার গানের মধ্যে —কল্পনাপ্রিয় একক কবির নহে—পরন্তু সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছ।" (লোকসাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

'সর্বসাধারণ নামক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তির' মনোরঞ্জনের জন্যে যে-কাব্য বা সঙ্গীত কবির অন্তর থেকেই স্বতঃই উৎসারিত হতো, তাকে প্রকৃত কাব্য বা সাহিত্যের 'রাজসভা' থেকে রবীন্দ্রনাথ দূরে সরিয়ে রেখেছেন এবং 'নিম্নসাহিত্য' বলে তাকে সার্বভৌমিকের সম্মান দিতে সম্মত হন নি। আমরা জানি না 'সার্বভৌমিক' কি, তবে এইটুকু জানি যে 'সার্বভৌমিক' যদি আন্তর্জাতিক কোনো কল্পনাবিলাসী বা সৌখীন শ্রেণী-সাহিত্য হয়, তাহলে গ্রাম্য-সাহিত্য সে-বিশেষণ বর্জনই করবে। কিন্তু মাটি ও মানুষ থেকেই তার জন্ম বলে, জীবনের স্বচ্ছ তরলরসে সে পরিপুষ্ট বলেই, নৃত্যে. গীতে, ছড়ায়, কথায় সে একদিন বিশ্বমানবের অন্তরের সুরের সঙ্গে সুর মিশিয়ে ছিল, দেশীয় সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হয়ে থাকে নি। দেশের মধ্যেই সে ছিল বিশ্বের রত্ন, এবং বিশ্বের বা পৃথিবীর বলেই সে ছিল একান্ত দেশের, জনগণের একান্ত আপনার।

গ্রাম্য-সাহিত্য বা 'নিম্ন সাহিত্য' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই করুণা-মিশ্রিত প্রশস্তির মধ্যে সাহিত্যের তাৎপর্যের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, পরে তাকে তিনি আরও সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তাতে পুরাতন ঋষি ও আলঙ্কারিকেরা যেমন স্তব্ধ হয়েছেন, আমরাও তেমনি বিমুগ্ধ হয়েছি। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করলেন:

"ভগবানের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত—মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎসৃষ্টির আনন্দগীতের ঝঙ্কার আমাদের হৃদয়বীণাতন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে—সেই যে মানস সঙ্গীত —ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ। বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কী রাগিণী বাজাইতেছে, সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে—তাহা দৈববাণী। বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার ভালোমন্দ, তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়া চিরদিন ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে—এই বাণীও তেমনি দেশে, ভাষায় ভাষায় আমাদের অন্তর হইতে বাহির হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।"

(সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের তাৎপর্য' নামক প্রবন্ধ)

সাহিত্যকে যে আলঙ্কারিকেরা "পরমব্রহ্মাস্বাদসচিবঃ", পরমব্রহ্মের আস্বাদের তুল্য আস্বাদ, বা "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ", ব্রহ্মের আস্বাদের সহোদর বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিতে তাদের শিষ্যবর্গের পক্ষে স্তব্ধ হওয়া আশ্চর্য নয়, এবং 'দশরূপের' ভাষায় আমাদের মতো "অল্পবুদ্ধি সাধুলোকদের" হতভম্ব হওয়াই স্বাভাবিক। "পরমব্রহ্মাস্বাদসচিবঃ" থেকে "সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে—তাহা দৈববাণী"—একেবারেই দূর যাত্রা নয়, যাত্রা ও ফল উভয়ই অভিন্ন। এখানে একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দার্শনিক হেগেলের শিল্প-দর্শনের সাদৃশ্য রয়েছে। দার্শনিক হেগেল বলেছেন যে শিল্প হচ্ছে 'Absolute' বা পরমব্রহ্মের ক্রমিক অভিব্যক্তি—এবং ভাব ও বস্তুর মধ্যে বস্তুর আধিপত্য থেকে, ভাব ও বস্তুর সম্যাবস্থার ভিতর দিয়ে, বস্তুকে অতিক্রম করে ভাবের ঊর্ধ্বযাত্রা হয়। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য বা শিল্পকে হেগেল বলেছেন * Oriental, দ্বিতীয় শ্রেণীকে বলেছেন Classical এবং তৃতীয় শ্রেণীকে Romantic বলেছেন। রোমান্টিক শিল্পভাবের চরম বিকাশ হয়, তারপর আর কিছু নেই, কারণ "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ"—পরম পুরুষের সাক্ষাৎ-কারের পর সীমার শেষ, গতির নিবৃত্তি। এই বস্তুর প্রাধান্যের জন্যই গ্রাম্য-সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ কাব্য বলেন নি, কারণ জনপদের স্থূল চিহ্ন সেখানে রয়েছে, ভাবের রেশমী বুনুনি নেই, এবং সাহিত্যকে রচয়িতার বা ব্যক্তিবিশেষের না বলে তিনি বলেছেন 'দৈববাণী'। এই দৈববাণীর প্রকাশককে বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ বললেন :

"আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে দুইটা অংশের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। একটা অংশ আমার নিজত্ব, আর একটা অংশ আমার মানবত্ব। আমার ঘরটা যদি সচেতন হইত, তবে সে নিজের ভিতরকার খণ্ডাকাশে ও তাহারই সহিত পরিব্যাপ্ত মহাকাশ, এই দুটাকে ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিত। আমাদের ভিতরকার নিজত্ব ও মানবত্ব সেই প্রকার। যদি দু'য়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য দেয়াল তোলা থাকে তবে আত্মা অন্ধকূপের মধ্যে বাস করে।

·····সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্তা। লেখকের নিজত্বকে সে

---

*হেগেল, বেনেডেটো ক্রোচে ও কার্ল মার্কস-এর শিল্প-দর্শন (Philosophy of Art) সম্বন্ধে তুলনামূলক ব্যাখ্যা আমার "শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ" নামক পুস্তকের "প্রথম খণ্ডের" দ্বিতীয় অধ্যায়ে করেছি।

আপনার করিয়া লয়, ক্ষণিককে সে অমর করিয়া তোলে, খণ্ডকে সে সম্পূর্ণতা দান করে।

"জগতের উপরে মনের কারখানা বসিয়াছে—এবং মনের উপরে বিশ্বমনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।"

(সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'সাহিত্যের বিচারক' নামক প্রবন্ধ)

জগতের উপর মনের কারখানা এবং তার উপর যে বিশ্বমনের কারখানা, আধুনিক বৈদ্যুতিক লিফট-এর সাহায্যে সেখানে আরোহণ করতে আমরা পারব না। সুতরাং এইটুকু বুঝে সন্তুষ্ট থাকাই ভালো যে এই 'বিশ্বমন' ও 'বিশ্ব-মানবিকতা', উপনিষদের 'ঈশ' এবং তার উপলব্ধি ভিন্ন কিছু নয়। তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উক্তি ও যুক্তিতে স্পষ্ট রয়েছে।

উপনিষদ ব্রহ্মস্বরূপের তিনটি ভাগ করেছেন—সত্যম্, জ্ঞানম্, এবং অনন্তম্। চিরন্তনের এই তিনটি রূপকে আশ্রয় করে মানবাত্মারও তিনটি রূপ আছে। তার একটি হলো 'আমি আছি, একটি 'আমি জানি', আর একটি 'আমি ব্যক্ত করি'। এই রূপকে রবীন্দ্রনাথ 'তাজমহল' দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন :

"এই যে তাজমহল—এমন তাজমহল, তার কারণ সাজাহানের হৃদয়ে তাঁর প্রেম, তাঁর বিরহ-বেদনার আনন্দ অনন্তকে স্পর্শ করেছিল ; তাঁর সিংহাসনকে তিনি যে কোঠাতেই রাখুন, তিনি তাঁর তাজমহলকে তাঁর আপন থেকে মুক্ত ক'রে দিয়ে গেছেন। তার আর আপন পর নেই, সে অনন্তের বেদী। সাজাহানের প্রতাপ যখন দস্যুবৃত্তি করে, তখন তার লুঠের মাল যতই প্রভূত হোক তাতে ক'রে তার নিজের থলিটারও পেট ভরে না, সুতরাং ক্ষুধার অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। আর যেখানে পরিপূর্ণতার উপলব্ধি তার চিত্তে আবির্ভূত হয় সেখানে সেই দৈববাণীটিকে নিজের কোষাগারে নিজের বিপুল রাজ্যে সাম্রাজ্যে কোথাও সে আর ধরে রেখে দিতে পারে না। সর্ব্বজনের ও নিত্যকালের হাতে তাকে সমর্পণ করা ছাড়া আর গতি নেই। একেই বলে প্রকাশ। আমাদের সমস্ত মঙ্গল-অনুষ্ঠানে গ্রহণ করবার মন্ত্র হচ্চে ওঁ—অর্থাৎ হাঁ। তাজমহল হচ্চে সেই নিত্য-উচ্চারিত ওঁ—নিখিলের সেই গ্রহণমন্ত্র মূর্ত্তিমান।"

(সাহিত্যের পথে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'সাহিত্য' নামক প্রবন্ধ)

'তথ্য ও সত্য' নামক প্রবন্ধের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ এই একই কথা বলেছেন :

"অসীম একের সেই আকুতি, যা ঋতুদের ডালায় ডালায় ফুলে ফুলে বারে

বারে পূর্ণ হয়েও নিঃশেষিত হোলো না, সেই সৃষ্টির আকৃতিই তো রূপদক্ষের কারুকলার মধ্যে আবির্ভূত হয়ে আমাদের চিত্তকে চিন্তার বাইরে উদাস ক'রে নিয়ে যায়। অসীম একের আকৃতিই তো সেই বেদনা, যা, বেদ বলেছেন, সমস্ত আকাশকে ব্যথিত ক'রে রয়েছে। সে "রোদসী" "ক্রন্দসী"—সে কাঁদছে। সৃষ্টির কান্না রূপে রূপে, আলোয় আলোয় আকাশে আকাশে নানা আবর্তনে আবর্তিত—সূর্যে চন্দ্রে গ্রহে নক্ষত্রে, অণুতে, সুখে দুঃখে, জন্মে মরণে। সমস্ত আকাশের সেই কান্না মানুষের অন্তরে এসে বেজেছে। সমস্ত আকাশের সেই কান্নাই একটি সুন্দর জলপাত্রের রেখায় রেখায় নিঃশব্দ হয়ে দেখা দেয়। এই পাত্র দিয়ে অসীম আকাশের অমৃতনির্ঝরের রসধারা ভরতে হবে ব'লেই শিল্পীর মনে ডাক পড়েছিল, অব্যক্তের গভীরতা থেকে অনির্বচনীয়ের রসধারা। এতে ক'রে যে রস মানুষের কাছে এসে পৌছবে সে তো শরীরের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে নয়। শরীরের পিপাসা মেটাবার যে জল তার জন্যে ভাঁড় হোক, গণ্ডুষ হোক কিছুতেই আসে যায় না। এমন অপরূপ পাত্রের প্রয়োজন কি?"

(সাহিত্যের পথে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এমন অপরূপ পাত্রের প্রয়োজন কি? অর্থাৎ যে শিল্পে অসীম আকাশের অমৃত নির্ঝরের রসধারা সঞ্চিত হবে এবং অব্যক্তের গভীরতায় যে-শিল্প অনির্বচনীয়, তাকে শরীরী তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে 'ভাবের' আভরণ খসিয়ে মাটির বুকে নামিয়ে আনবার প্রয়োজন কি? আমরা হয়তো বলতে পারি যে রূপদক্ষ তাঁর চিত্তকে এই যে একটি অমর্ত্যলোকের ঘটের উপর দেউলে হয়ে উজাড় করে দিলেন এর সমস্তই তো বাজে খরচ হলো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন: "সে কথা মানি, সৃষ্টির বাজে খরচের বিভাগেই অসীমের খাস তহবিল। ঐখানেই যত রঙের রঙ্গিমা, রূপের ভঙ্গী। যারা মুনফার হিসাব রাখে, তারা বলে এটা লোকসান, যারা সন্ন্যাসী, তারা বলে এটা অসংযম। বিশ্বকর্মা তাঁর হৃপর-হাতুড়ি নিয়ে ব্যস্ত, এর দিকে তাকান না, বিশ্বকবি এই বাজে খরচের বিভাগে তাঁর থলি ঝুলি কেবলই উজাড় ক'রে দিচ্ছেন, অথচ রসের ব্যাপার আজও দেউলে হলো না।" তবু আমরা বলব এই রঙ-বেরঙের ঝুঁটিওয়ালা কচি কচি মিষ্টি বুলবুলির ভাষার খোলসটি খসিয়ে ফেললে 'ভিতরে ঈশোপনিষদ'-ই বেরিয়ে পড়ে।

" উপনিষদ বলেছেন, পুত্রকে কামনা করি ব'লেই যে পুত্র আমাদের প্রিয়

তা নয়, আপনাকেই কামনা করি ব'লেই পুত্র আমাদের প্রিয়। পুত্রের মধ্যে পিতা নিজেকেই উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ। আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ. বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এক হয়ে যাওয়াতে যে আনন্দ।"

(সাহিত্যর পথে--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'সাহিত্যতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধ)

এই কথা বলে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে প্রতিদিনের ব্যবহারিক ব্যাপারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলহ-সংশয়-ভাগের মধ্যে আমাদের আত্মপ্রসারণকে অবরুদ্ধ করে, মনকে শৃঙ্খলিত করে রাখে বৈষয়িক কারাগারে, এবং ফলে মানুষ হয় 'কাঁচি-ছাটা' মানুষ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বললেন: "বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়; তার যে রস সে অহৈতুক।" আমরা অবাক হলাম না, কারণ সাহিত্য "দৈববাণী" থেকে বিশুদ্ধ সাহিত্য "অপ্রয়োজনীয়" পর্যন্ত পৌছতে মাঝখানে যে দু'একটা ধাপ পার হতে হয় তা আমাদের জানা আছে। বরং একই স্থানে ওদের বসবাস বললে অন্যায় হয় না। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ সমস্ত রকমের আধুনিকতার যেমন বিরোধী, তেমনি সাহিত্যে বাস্তবতার কথা উঠলে তিনি নিজের ভঙ্গীতে বিদ্রূপ করে বলেন: "রস জিনিসটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করতে পারে না। সংসারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশ-হিতৈষী, লোক-হিতৈষী প্রভৃতি নানাপ্রকারের ভালো ভালো লোক আছেন কিন্তু দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছেড়ে নলের গলায় মালা দিয়েছিলেন তেমনি রসভারতী স্বয়ম্বর সভায় আর সকলকেই বাদ দিয়ে কেবল রসিকের সন্ধান করে থাকেন।" সাহিত্যিক-'দময়ন্তী'রা নলকে অনুসন্ধান করুন, আমরা 'অরসিকের' দল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করি।

সাহিত্যের এই 'উপনিসদীয়' ব্যাখ্যাতে অনেকে আশ্চর্য হবেন, হয়তো ভাববেন, যে রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বকবি, যাঁর দৃষ্টি ও অনুভূতির গভীরতা অতল-স্পর্শ, যাঁর রূপদক্ষতা অতুলনীয়, তিনি এমনভাবে সমাজ ও বাস্তব জীবনের প্রতি আকাশস্পর্শী উদাসীনতা নিয়ে কেমনভাবে অনাবিল 'সৌন্দর্য' ও ব্রহ্মাস্বাদ-স্বরূপ 'রসের' মধ্যে নিমজ্জিত থাকতে পারলেন। রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হলে, রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই বলতে ইচ্ছা করে:

"...বিশ্বকবি বাজে খরচের বিভাগে তাঁর থলি ঝুলি কেবলই উজাড় ক'রে দিচ্চেন, অথচ রসের ব্যাপার আজও দেউলে হলো না"। রসের ব্যাপার হয়তো

দেউলে হবে না, আজ তো হবেই না, কারণ এ-দেশের মধ্যযুগীয় মাটিতে তার পরিপুষ্টির খোরাক এখনো প্রভূত রয়েছে। তবু একবার কৈফিয়ৎ দাবী করতে ইচ্ছা হয় রবীন্দ্রনাথের কাছে, মনে হয় বলি—এই শান্ত, সমাহিত, ধ্যাননিমীলিত যোগীর দৃষ্টির কারণ কি? আমাদের মতো সমাজ-সচেতন যাঁরা, তাঁদের আপাতত সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সুন্দর কৈফিয়ৎ দিয়েছেন।

…"আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি নি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না। বিস্ময়ের অন্ত পাই নি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদি কালের যে অনাহত বাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত তাকে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম। সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছোটো শ্যামলা পৃথিবীকে ঋতুর আকাশ দূতগুলি বিচিত্র রসের বর্ণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে যায়, এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ের অভিষেকবারি নিয়ে যোগ দিতে কোনোদিন আলস্য করি নি। প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্যে যে, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েছি যিনি সকল সত্তার আত্মীয়-সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব, যাঁর খুশিতেই নিরন্তর অসংখ্য রূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুশি হয়ে উঠেছে—বলে উঠেছে—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ; যাতে কোনো প্রয়োজন নেই তাও আনন্দের টানে টানবে, এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারের চরম অর্থ যাঁর মধ্যে, যিনি অন্তরে অন্তরে মানুষকে পরিপূর্ণ করে বিদ্যমান বলেই প্রাণপণ কঠোর আত্মত্যাগকে আমরা আত্মঘাতী পাগলের পাগলামি বলে হেসে উঠলুম না।

"ঈশোপনিষদের প্রথম যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন, সেই মন্ত্রটি বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বার নিজেকে বলেছি—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ; আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে, যা রয়েছে তোমার চারদিকে তারই মধ্যে চিরন্তন, লোভ ক'রো না। কাব্য সাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য।…অনেক দিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্বে নানা অবস্থায়। শুরু করেছি কাঁচা বয়সে—

তখনো নিজেকে বুঝি নি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এসমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদন।"

(রবীন্দ্র-রচনাবলী—প্রথম খণ্ড—অবতরণিকা)

এখানে স্পষ্টই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঈশোপনিষদের জয় হয়েছে, মানুষের বা মর-জগতের জয় হয় নি বলেই তাঁর 'এবার ফিরাও মোরে' আহ্বান দিক্‌ভ্রান্ত সরল শিশু-হৃদয়ের কাতরানি বলে মনে হয়, তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি' পড়বার পরে রুষ-ফিনিশ যুদ্ধে সোভিয়েটের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ, এবং পৃথিবীর 'শ্রেষ্ঠ শান্তিবাদী' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি রুজভেল্টের কাছে শান্তির জন্যে আবেদন পড়ে মনে হয় 'বিচিত্র,' আর তাঁর সাহিত্য-সমালোচনাতে প্রাচীন সংস্কৃত রসশাস্ত্রজ্ঞদের উক্তির ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি দেখেও ভাষা ও প্রকাশের ঐন্দ্রজালিক শক্তির দিকে বিমুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকি। আর বাদশাহ-রাজা-উজীরের আওতায় মধ্যযুগের নির্জন, নিরাপদ প্রকোষ্ঠে বসে তিনি যখন ধনতান্ত্রিক সমাজের রূপ নিরীক্ষণ করেন, তাঁর 'উপন্যাসে' বা 'সাহিত্য-সমালোচনায়,' তখন তার কদর্য আবর্জনার দিকটাই তাঁব চোখে পড়ে, অগ্রগামী বৈপ্লবিক শক্তিগুলি নির্বিবাদে অন্ধকারে তলিয়ে যায়। কারণ অবশ্য সেই মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি, এবং তার সঙ্গে হঠাৎ-প্রবিষ্ট ধনতান্ত্রিক আবেষ্টন,—এই দু'য়ের সংমিশ্রিত পরিবেষ্টনে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা পরিপুষ্ট। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সে-কথা স্বীকার করেছেন ঃ

"উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণত বাংলাদেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করে নি। পিতৃদেবের প্রবর্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত।

এই যেমন একদিকে তেমনি অন্যদিকে আমার গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়। তখন বাড়ির হাওয়া শেক্‌স্‌পিয়রের নাট্যরস-সম্ভোগে আন্দোলিত, সার ওঅল্‌টার স্কটের প্রভাবও প্রবল। দেশপ্রীতির

উন্মাদনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" আর তার পরে হেমচন্দ্রের "বিংশতি কোটি মানবের বাস" কবিতায় দেশমুক্তি-কামনার সুর ভোরের পাখির কাকলির মতো শোনা যায়। হিন্দু-মেলার পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ীর সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা "জয় ভারতের জয়". গণদাদার লেখা "লজ্জায় ভারত-যশ গাইব কি করে," বড়দাদার "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি"। জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন। একটি পোড়ো বাড়ীতে তার অধিবেশন, ঋগ্‌বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত ; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।

এই সকল আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ উদ্যোগ এর কিছুই ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে নয়। শান্ত অবকাশের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এর প্রভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছিল।

কলকাতা শহরের বক্ষ তখন পাথরে বাঁধানো হয় নি, অনেকখানি কাঁচা ছিল। তেল-কলের ধোঁয়ায় আকাশের মুখে তখনো কালি পড়ে নি। ইমারত অরণ্যের ফাঁকায় ফাঁকায় পুকুরের জলের উপর সূর্যের আলো ঝিকিয়ে যেত, বিকেল বেলায় অশ্বত্থ ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ত, হাওয়ায় দুলত নারকেল গাছের পত্র-ঝালর, বাঁধা নালা বেয়ে গঙ্গার জল ঝরনার মতো ঝরে পড়ত আমাদের দক্ষিণ বাগানের পুকুরে, মাঝে মাঝে গলি থেকে পালকি-বেহারার হাঁইহুঁই শব্দ আসত কানে, আর বড়ো রাস্তা থেকে সহিসের হেঁইও হাঁক। সন্ধ্যাবেলায় জ্বলত তেলের প্রদীপ, তারই ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ি দাসীর কাছে শুনতুম রূপকথা। এই নিস্তব্ধপ্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ, লাজুক, নীরব, নিশ্চঞ্চল।"

(রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড—অবতরণিকা)

এইবার নিশ্চয়ই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনে কেন উপনিষদের জয় হয়েছে, কেন তিনি বর্তমান অরাজকতায় অস্থির হয়ে সামন্ততন্ত্রের সমাহিত প্রতিবেশের মধ্যে, প্রাক্-পৌরাণিক যুগের মন্ত্র, ত্যাগ ও মুক্তির মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছেন, কেন তিনি বিশ্বমানবতার জয়গান গেয়েও সেই সংখ্যালঘিষ্ঠ রাজা-মহারাজা ও ধনিকগোষ্ঠীর, পরোক্ষে ও অজ্ঞানে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং কেন

তাঁর বিমূর্ত কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্ট মানবপ্রেম পরোক্ষে স্বশ্রেণী-প্রীতির মহাকীর্তন করেছে। বিংশ শতাব্দীতেও যে-প্রতিভা মানুষকে এমন কৌশলে, এমনভাবে প্রলুব্ধ করে প্রাক্‌-পৌরাণিক যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রেতপুরীতে নিয়ে গিয়ে ভুলিয়ে রাখতে পারে, সে-প্রতিভা সহস্রবার নমস্য, যুগের বিচার যাই হোক্‌ না কেন।

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যকে উপনিষদ-এর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে রবীন্দ্রনাথ এমন স্বরে তার জয়বার্তা ঘোষণা করলেন, 'কাদম্বরী' থেকে আরম্ভ করে 'সাহিত্যতত্ত্ব' ও 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' পার হয়ে 'আধুনিক কাব্য' আলোচনাব আসরে পর্যন্ত সেই উপনিষদ, সেই সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের তিনি এমনভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে গেলেন, যে তাঁর পরবর্তী সমালোচকেরাও তার জৌলুসে, তার অপূর্ব জ্যোতিতে ধাঁধিয়ে রইলেন, যাদুমুগ্ধ হয়ে এক পাও অগ্রসর হবার ক্ষমতা তাঁদের রইল না। রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় তাঁদের আবির্ভাব আলোকদান তো করলই না, উপরন্তু তাঁরা সমভাবে বহনের দায়িত্ব নিয়ে নিজেদের শক্তির স্বল্পতার জন্যে হাস্যকর হলেন। তবু তাঁদের আমরা অভ্যর্থনা করব, কারণ তাঁদের আবির্ভাব অহেতুক নয়, অবশ্যম্ভাবী। রাবীন্দ্রিক প্রতিভার বিশাল শীতল ছায়ায় একে একে সমালোচনা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী, নলিনীকান্ত গুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার। আর অজিতকুমাব চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের কাছে নীরব অর্ঘ্যদানের সমালোচনায় দীক্ষিত হয়ে, মুগ্ধের মতো রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনায় স্তব করলেন সৌন্দর্যবাদের, এবং দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'রবি-দীপিতা'য় শুকনো কাঠের মতো ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন উপনিষদ কি এবং সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র কত সমৃদ্ধ। অতুলবাবু অবশ্য স্বীকার করলেন যে প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা এমন অনেক বিষয় আলোচনা করেছেন যাতে আমাদের কোনো কৌতূহল নেই, কারণ, তিনি বললেন, কালভেদে কেবল মীমাংসার পরিবর্তন ঘটে না, প্রশ্নেরও বদল হয়। অতি সুন্দর কথা। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি কাব্য-বস্তু এক মেনে নিয়ে, আলঙ্কারিকদের বিশ্লেষণের নিপুণতায় ও অন্তঃদৃষ্টির গভীরতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর "কাব্য-জিজ্ঞাসা" পুস্তকের মধ্যে তাঁদের পরিচয় দিয়েছেন। একে আমরা বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ভাণ্ডার-বৃদ্ধি বলতে পারি, কারণ ভবিষ্যতে আমরাই হয়তো দশরূপ, অভিনব গুপ্ত, বামন প্রভৃতি আলঙ্কারিকদের মূল গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করব, কিন্তু

রবীন্দ্র-পরবর্তী সমালোচনা-সাহিত্যে নূতন অবদান বলে একে নিশ্চয়ই স্বীকার করব না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সীমানা অতিক্রম করে অতুলবাবু যেতে পারেন নি, যদিও সে-দিকে প্রয়াসের চিহ্ন তাঁর 'কাব্য-জিজ্ঞাসা'র শেষ অধ্যায়ে কিছু কিছু আছে। তিনি আলঙ্কারিকদের অস্তিত্বহীন অমৃতরসের আস্বাদে বিভোর হয়ে তাঁদেরই গণ্ডীর মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছেন। তিনি বলেছেন :

"আজকের দিনের মানুষের কাছে সমাজ-বন্ধন ও সমাজ-ব্যবস্থা খুব বড় হয়ে উঠেছে। এত বড়, যেন মনে হয়, মানুষের সমস্ত চেষ্টা ও সৃষ্টির ঐ হচ্ছে চরম লক্ষ্য। যে সৃষ্টি ঐ বন্ধন ও ব্যবস্থার প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনও কাজে লাগে না, তার যে কোনও মূল্য আছে, সে কথা ভাবা অনেকের পক্ষে কঠিন হয়েছে। এ মনোভাব খুব প্রাচীন নয়। গত শ' দেড়েক বছর হ'ল পশ্চিমে ইউরোপের লোকেরা কতকগুলি কলকৌশলকে আয়ত্ত ক'রে মানুষের নিত্য ঘরকন্না ও সমাজ-ব্যবস্থার যে দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে—তাতেই এ মনোভাবের জন্ম। এর আশ্চর্য্য সফলতায় সমাজ ও জীবনযাত্রার কাম্য থেকে কাম্যতর পরিবর্ত্তনের এক অবাধ ও সীমাহীন আদর্শের ছবি মানুষের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। লোকের ভরসা হয়েছে এই পরিবর্ত্তনশীল সমাজব্যবস্থা একদিন, এবং সেদিন খুব দূর নয়, সমস্ত মানুষকে দুঃখলেশহীন সকল রকম সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী ক'রে দেবে এবং সংসার ও সমাজ থেকে মানুষের প্রাপ্তির আশা যত বেড়েছে, মানুষের 'তন্ মন্ ধন্'-এর উপর এদের দাবীও তত বেড়েছে।...

"প্রাচীন আলঙ্কারিকদের সামনে আশার এই মরীচিকা ছিল না। তখনকার জ্ঞানীলোকেরা জন্মজরামৃত্যুগ্রস্ত সংসারকে মোটের উপর দুঃখময় বলেই জানতেন। একে মন্থন ক'রে, যে দু-এক পাত্র অমৃত উঠেছে, তার অমৃতত্ব যে আবার ঐ সংসারের 'মঙ্গল সাধনে—একথা তারা মানতে চান নি। কাব্যের রসকে তাঁরা সংসার বিষ-বৃক্ষের অমৃত ফল বলেই জানতেন। আজ যদি আমরা সংসারকে দুঃখময় বলতে মনে দুঃখ পাই, তবুও একথা কি করে, অস্বীকার করা যায় যে গাছের ফলের কাজ তার মূলকে পরিপুষ্ট করা নয়। কাব্য যে মানুষের সভ্যতা-বৃক্ষের ফল, তার মূল মাটি থেকে রস টানে বলেই ও গাছ অবশ্য বেঁচে থাকে। এবং মূল যদি রস টানা বন্ধ করে, তবে ফল ধরাও নিশ্চয়ই বন্ধ হবে। কিন্তু নিতান্ত বুদ্ধি-বিপর্য্যয় না ঘটলে মূলের কাজে ফলের কতটা সহায়তা তা দিয়ে

তার দাম যাচাই-এর কথা কেউ মনে ভাবে না। সেই ফলই কেবল গাছের পুষ্টি-সাধন করে যা মুকুলে ঝরে যায়।

(কাব্য-জিজ্ঞাসা—অতুলচন্দ্র গুপ্ত—'ফল' শীর্ষক অধ্যায়)

অতুলবাবুর এই অভিমতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত উক্তির বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই :

"আমাদের শাস্ত্র বলেন "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।" "সেই বেদনীয় পুরুষকে জানো যাতে মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দেয়।" বেদনা অর্থাৎ হৃদয়বোধ দিয়েই যাঁকে জানা যায় জানো সেই পুরুষকে অর্থাৎ পার্সোন্যালিটিকে। আমার ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবহিত অনুভূতি দিয়ে জানে অসীম পুরুষকে, জানে হৃদা মণীষা মনসা তখন তাঁর মধ্যে নিঃসংশয়রূপে জানে আপনাকেও। তখন কী হয়? মৃত্যু অর্থাৎ শূন্যতার ব্যথা চলে যায়, কেন-না বেদনীয় পুরুষের বোধ পূর্ণতার বোধ, শূন্যতার বোধের বিরুদ্ধ। এই আধ্যাত্মিক সাধনার কথাটাকেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনা চলে।······

(সাহিত্যের পথে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কাব্য বা সাহিত্যকে সংসার বিষবৃক্ষের অমৃতফল বলে তারই রসাস্বাদনের লোভে অতুলবাবু তাকে সংসার বা সমাজের মঙ্গলসাধনে নিয়োজিত করতে রাজী নন, কারণ ফল দিয়ে মূলের৷ পরিপুষ্টি সম্ভব নয়, এবং সেই ফলই গাছের পুষ্টিসাধন করে যা মুকুলে ঝরে যায়। রবীন্দ্রনাথ যা শাস্ত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন অতুলবাবু আলঙ্কারিকদের মত উদ্ধৃত করে তাই প্রমাণ করেছেন। সমাজ ও সভ্যতার কথা যা সেখানে আছে তা শুধু থাকার খাতিরে আছে, এবং সমাজ বা সভ্যতার মাটি থেকে রসপান করে যে ফল বা ফুল গাছে ধরল, রস শুকিয়ে গেলে তার আর মাটির কথা স্মরণ করবার অধিকার রইল না, উপরের আকাশের দিকে দেবতার কাছে বারিদানের বর প্রার্থনার দাবী জন্মাল। কাব্যকে এই ধরনের 'ফল' বলার কি যুক্তি, এবং পরে এইভাবে মাটিহারা হবারই বা কি কারণ তা অতুলবাবু সরল করে প্রকাশ করলেন না, আলঙ্কারিকদের শ্লোকে শ্লোকে ফাঁক ভরাট করে দিলেন।

প্রমথ চৌধুরী ও মোহিতলাল মজুমদারও রবীন্দ্রনাথ, সংস্কৃত আলঙ্কারিক ও উপনিষদ্-নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যেই দৌড়ঝাঁপ করেছেন, তাকে লঙ্ঘন করতে পারেন নি। মোহিতবাবু শেষ পর্যন্ত হয়রান হয়ে যাবতীয় 'প্রগতির' বিরুদ্ধে

খড়্গ ধারণ করেছেন এবং সাহিত্যে প্রগতির বিরুদ্ধে 'শনিবারের চিঠি'তে মধ্যে মধ্যে তিনি নিজের রণমূর্তি প্রকাশ করে থাকেন, দুঃখের বিষয় অসংযত ও রুচি-বিরুদ্ধ ভাষায়। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে তাঁর দান অবশ্য যথেষ্ট এবং 'দীনবন্ধু', 'শ্রীমধুসূদন', 'রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি সম্বন্ধে সমালোচনার মধ্যে তিনি নিজের মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়েও যথেষ্ট শক্তি ও তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর আর একটি দানও উল্লেখযোগ্য। তিনি ইয়োরোপের ফিউড্যাল ও বুর্জোয়া সমালোচকদের সঙ্গে বাংলার পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, এবং নিজের মধ্যযুগীয় মনোভাব তার সঙ্গে মিশ্রিত করে বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের (বেশী উনবিংশ শতাব্দীর) সমালোচনা করেছেন। কিন্তু প্রমথ বাবু বা মোহিতবাবু কেউ সেই অবাস্তব 'রস' যা ব্রহ্মাস্বাদের সচিব, তার গণ্ডী পার হতে পারেন নি। প্রমথবাবু 'সবুজপত্র'-এর প্রথম সংখ্যার মুখপত্রেতেই বললেন :

"আমরা যে দেশের মনকে ঈষৎ জাগিয়ে তুলতে পারব, এত বড় স্পর্দ্ধার কথা আমি বলতে পারিনে, কেন না, যে সাহিত্যের দ্বারা তা সিদ্ধ হয়, সে সাহিত্য গড়বার জন্য নিজের সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়,—তার মূলে ভগবানের ইচ্ছা থাকা চাই, অর্থাৎ নৈসর্গিকী প্রতিভা থাকা চাই। অথচ ও ঐশ্বর্য্য ভিক্ষা ক'রে পাবার জিনিস নয়। তবে বাঙ্গলার মন যাতে আর বেশী ঘুমিয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা আমাদের আয়ত্তাধীন।"

(সবুজ পত্র—১ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)

ইয়োরোপের গতিশীলতায় চঞ্চল হয়ে 'সবুজ পত্র' বাংলাদেশকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছিল সত্য, কিন্তু প্রারম্ভেই যে ঔষধসেবনের ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে মর্ফিয়া-ইন্‌জেকশনের কাজ হয়েছে, অর্থাৎ ইয়োরোপীয় জীবনের আদর্শকে চোখের সামনে তুলে ধরেও বলা হয়েছে সামন্ততন্ত্রের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় প্রাণভরে অকাতরে ঘুমোও। সেই ঘুমের উপর প্রশান্তির প্রলেপ টেনেছে 'শনিবারের চিঠি', প্রাক্তনকে গৌরবান্বিত করে আধুনিকতার বৈরিতা করেছেন শনি-মণ্ডলী। সাহিত্য-বিচারে তারা একপাও অগ্রসর হতে পারেন নি। মোহিতবাবু তাঁর "সাহিত্যের স্বরাজ" নামক প্রবন্ধের মধ্যে বলেছেন :

"যে শক্তির দ্বারা মানুষ নিজের সত্তাকে একটি আশ্চর্য্য উপায়ে সৃষ্টি-রহস্যের সহিত যুক্ত করিয়া সেই রহস্যকে একটি গভীর রসসত্যরূপে উপলব্ধি করে, এবং

সঙ্গে সঙ্গে সকল সংশয়ের সমাধান নয়—নিরাকরণ করে, তাহাই কবির দৈবীশক্তি' বা প্রতিভা। যে কবির প্রতিভায় এই প্রজ্ঞানের যতটা বিকাশ হইয়াছে তিনি সেই পরিমাণে এই সৃষ্টিরূপী রস-স্বরূপ ব্রহ্মের স্রষ্টা।"

(সাহিত্য-কথা—মোহিতলাল মজুমদার)

এই উক্তির সঙ্গে উপনিষদ, সংস্কৃত আলঙ্কারিক বা রবীন্দ্রনাথের উক্তির পার্থক্য কোথায়? তাছাড়া 'বাস্তব' সম্বন্ধে মোহিতবাবুর অদ্ভুত ধারণার মধ্যে তাঁর এই মধ্যযুগীয় মনোভাবের আরও স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, এবং তিনি যে যাবতীয় প্রগতি-বিরোধী তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। "সাহিত্যে সমস্যা" নামক প্রবন্ধের মধ্যে মোহিতবাবু লিখেছেন:

"প্রত্যক্ষ জগৎ ও জীবনের উপর কবি-কল্পনার প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া অর্থাৎ কবি-কল্পনা জগৎ ও জীবনকে গভীর ভাবে আশ্রয় করিয়া, যেমন অভাবনীয় সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তেমনই অবশেষে বাস্তবেরই উপাসনায় আজিকার সাহিত্যে তাহার যে দুর্গতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাহা তর্ক বিচারের বিষয় নয় —রসপিপাসুর পিপাসানিবৃত্তির পক্ষে সাহিত্য যে জলের পরিবর্ত্তে পাকা বেল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রমাণ সকল সহৃদয় ব্যক্তি হৃদয়ের মধ্যেই পাইতেছেন। যদি তাহা সত্য না হয়, রসের ধারণাই যদি এমনভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে কাব্য জগতে একটা মহামন্বন্তর ঘটিয়াছে ;···"

(সাহিত্য-কথা—মোহিতলাল মজুমদার)

তারপরেই মোহিতবাবু 'সাহিত্যের আসরে' বক্তৃতা দেন:

"সাহিত্য মুখ্যভাবে আলোচনার জিনিস নয়, উপভোগের জিনিস—একথা মনে রাখিলে সাহিত্যকে লইয়া দল বাঁধা, অথবা বারোয়ারী যাত্রার মতো যখন তখন যেখানে সেখানে আসর বসাইবার জন্য মণ্ডপ তুলিবার উৎসাহ হইবে না। কারণ, সাহিত্য উপভোগ করিবার মত সংস্কার ও সংস্কৃতি সকলের নাই—সামাজিক ও রাজনৈতিক বচসা যেমন সকলেই করিতে পারে, সাহিত্যকে লইয়া তাহা করিতে পারিলে সাহিত্যই উবিয়া যায়। অতএব, সাহিত্যের আসরে বসিয়া সর্ব্বাগ্রে এই কথাটি বলিতে হইল বলিয়া কেহ যেন ক্ষুব্ধ না হন। এই সঙ্গে ইহাও স্মরণ করিয়া সকলকে আশ্বস্ত হইতে বলি যে, সাহিত্য-রসিক হইতে না পারাটা যতই লজ্জার বিষয় হউক মানুষের আত্মগৌরব বৃদ্ধি করার জন্য আরও কত বস্তু রহিয়াছে—সেখানে সিদ্ধিলাভ যে শক্তির দ্বারা সম্ভব তাহা মাত্রাভেদে অনেকেরই

আছে। সাহিত্য-রসবোধের যে সাক্ষাৎ জ্ঞাতিশত্রু, তাহার নাম পাণ্ডিত্য…”

(শনিবারের চিঠি—ভাদ্র ১৩৪৭)

রবীন্দ্রনাথ নল-দময়ন্তীর কাহিনী উল্লেখ করে কাব্যরসিকের যে বর্ণনা করেছিলেন, মোহিতবাবু অসাহিত্যিক ভাষায় এখানে তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। আর ১৮১৯ সালের ‘সমাচার দর্পণ’-এর সময় থেকে ১৯৪০ সালে মোহিতলাল মজুমদার পর্যন্ত একশ ত্রিশ বছরের মধ্যে আমাদের বাংলা সমালোচনা “পুস্তক দ্বারা মূর্খ লোকও সভাসৎ হইতে পারিবেক” থেকে “সাহিত্য আলোচনার জিনিস নয়—সাহিত্য-রসবোধের সাক্ষাৎ জ্ঞাতিশত্রু পাণ্ডিত্য” পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। অবশ্য মোহিতবাবু যখন বলেন যে জাতিগত বিশিষ্ট চেতনাই সাহিত্যের স্বধর্ম ও উৎস, কারণ সেখান থেকেই সর্বজনীন মনুষ্যত্বের অপূর্ব রস উৎসারিত হয়, তখন. তিনি যে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত তা স্বীকার করতেই হবে, এবং সেই স্বধর্ম উপাসনাকেই যখন তিনি কল্যাণকর মনে করেন, তখন আমাদেরও বলতে হবে যে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিপরীত দিকে অগ্রসর হয়েছেন, প্রতিক্রিয়াশীলতার ইন্ধন জুগিয়েছেন বেশী। এই প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত গুপ্ত-এর “আধুনিকী”-ও উল্লেখযোগ্য। নলিনীবাবু প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের বিচার করে বলেছেন যে পুরাতন সাহিত্য মানুষের দেবত্ব-ব্যঞ্জক, আর আধুনিক সাহিত্য পাশবিকতার বীভৎস সাধনায় বদ্ধপরিকর। তিনি ‘নিরিন্দ্রিয়’ সঙ্গম, ‘অতীন্দ্রিয়’ প্রেম, ‘অন্তর্জ্ঞান’ প্রভৃতির যে অবতারণা করেছেন, সাহিত্যে তাদের সমর্থন করেছেন লাতিন-লেখক, কালিদাস, বৈষ্ণব কবি—এদের দৃষ্টান্ত দিয়ে। এই রকম অদ্ভুত সিদ্ধান্ত ও বিশ্লেষণ বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে অভিনব ও চমকপ্রদ। তাঁর বিচার শুধু অদ্ভুত নয়, মারাত্মক ভুল, কারণ যাকে তিনি নিরিন্দ্রিয় বা অতীন্দ্রিয় বলেছেন তা দৈহিক, যেমন কালিদাসের ‘শকুন্তলা’র প্রেম এবং যাকে তিনি ইণ্টুইশন্ বলেছেন, যেমন লাতিন-লেখকদের, তা ইণ্টেলেকচুয়াল। নলিনীবাবুর সাহিত্য-সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী পণ্ডিচেরীর আশ্রম-উদ্ভূত, এবং তাকে নির্বিঘ্নে বলা যেতে পারে Supra-co nscious super-soul-এর Super-neurotic অভিব্যক্তি, অতএব সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

এছাড়া শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ সেনগুপ্ত. প্রিয়রঞ্জন সেন, সুকুমার সেন, শশাঙ্কমোহন সেন, বিশ্বপতি চৌধুরী প্রভৃতি অধ্যাপকবৃন্দের নাম বাংলা সমালোচনার আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, কিন্তু তাঁদের বিশ্লেষণ

করার আদৌ প্রয়োজন হয় না, কারণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো সুদূর আভাসও তাঁদের সমালোচনার মধ্যে দুর্লভ। শ্রীকুমারবাবুর অধুনা-প্রকাশিত "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা," শশাঙ্কমোহন সেন-এর "বঙ্গবাণী"ও "বাণীমন্দির," বিশ্বপতি চৌধুরীর "কাব্যে রবীন্দ্রনাথ" প্রভৃতি পুস্তকে বিশুদ্ধ রসবিচারের সঙ্গে পাণ্ডিত্যপূর্ণ তত্ত্ববিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি রাখা হয়েছে যাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সেগুলি ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অনুমোদিত হয়। ফলে সত্যকার সমালোচকের পথ হারিয়ে তাঁরা কর্তব্যজ্ঞান-সচেতন 'শিক্ষক' হয়েছেন। শ্রীকুমারবাবু বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই বেশী আলোচনা করেছেন, এবং রসবিচারেই তাঁর সমস্ত যুক্তি ও সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়েছে। বিশ্বপতিবাবু 'রূপজগৎ', 'অরূপের পথে', 'অরূপ,' এই তিন স্তরের মধ্যে রবীন্দ্রকাব্যের বিচার করেছেন। সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা দূরে থাক, এই ধরনের ধাপ ভাগ করে আলোচনা শুধু বিপজ্জনক নয়, অন্যায়। কারণ কাব্যকে সমগ্র ও ব্যাপকভাবে বুঝতে হলে তার স্বাভাবিক ক্রমপরিণতির ধারাকে আশ্রয় করে আলোচনা করাই শ্রেয়। আমরা অবশ্য এই স্বাভাবিক ক্রমপরিণতির কারণ, অর্থাৎ পরিবেষ্টনের সঙ্গে কবি-মনের ঘাত-প্রতিঘাতের ক্রমাভিব্যক্তিও অনুসন্ধান করব। দুঃখের বিষয় এইসব অধ্যাপক-সমালোচকদের রচনার মধ্যে সে-প্রয়াসের চিহ্ন তো নেই-ই, এমন কি রসবিচার করতে গিয়ে তাঁরা কেউ রসসৃষ্টি পর্যন্ত করতে পারেন নি। তাঁদের তত্ত্ব-ক্লিষ্ট স্থবির ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিশ্রমী কেতাব-কীটদের গলদ্‌ঘর্ম করবার উপযোগী, সাহিত্যানুরাগীর মনোরঞ্জনের মতো তাতে কিছু নেই।

প্রাচীনের মোহমুক্ত হয়ে বাংলা সমালোচনাকে নূতন রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সুধীন্দ্রবাবু সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে শিল্পের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্বীকার করেছেন এবং সাহিত্যকে দৈবপ্রতিভার কবল থেকে মুক্ত করে পার্থিব আসনেই উপবেশন করিয়েছেন। "মনুষ্যধর্ম" শীর্ষক প্রবন্ধের* মধ্যে সুধীনবাবু বলেছেন:

"শুনেছি, সাধনার এমন মার্গ আছে, যাতে চললে মানুষ মর্ত্যসীমা অতিক্রম ক'রে অমৃতলোকে পৌঁছয়। এ-কথা সত্য কিনা জানবার সৌভাগ্য, সুযোগ

* শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-এর কতকগুলি প্রবন্ধ তাঁর "স্বগত" নামক পুস্তকের মধ্যে সংকলিত হয়েছে।

বা সামর্থ্য কোনোদিন না-ঘটলেও, আমি কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করি যোগীদের এই দাবিতে আমার আস্থা যেন নিত্যকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু এই অন্ধবিশ্বাস সত্ত্বেও আমি কিছুতে বুঝতে পারি না, উক্ত সাধনার সঙ্গে কাব্য-চর্চ্চার সম্পর্ক কোথায়? প্রচ্ছন্ন প্রেরণাকে প্রকাশ্য ব্যঞ্জনায় পরিণত করাই যদি কাব্যের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সাধারণ বুদ্ধি, সাধারণ সংস্কার,সাধারণ অনুভূতির সীমা মানা ছাড়া কবির গত্যন্তর দেখি না। রাক্ষস-শব্দের দ্বারা কোনো রমণীর দেবীত্ব জ্ঞাপন করতে চাওয়া যেমন উপহাস্য, মর্ত্ত্যের ভাষায় স্বর্গেব বার্ত্তা ব্যক্ত করাব চেষ্টা তার চেয়ে কিছু কম ব্যর্থ নয়।"

এর পরেই তিনি যে আধুনিক সাহিত্যেব ও কাব্যেব বিশ্লেষণ কবেছেন তা সত্যই প্রণিধানযোগ্য :

"গত দেড়শ বছর ধ'রে আমরা সাহিত্যের সার্ব্বিক আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে সমস্ত প্রয়াস প্রয়োগ করেছি কাব্যকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেব বাহক ক'রে তুলতে। ফলে কবি আজকে উৎকেন্দ্রিক, কাব্য মুমূর্ষু, সাহিত্য স্বীকারোক্তিতে পরিণত।"

(ত্রৈমাসিক 'পরিচয়'—বৈশাখ ১৩৩৯)

দুঃখের বিষয় এই তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি ও বলিষ্ঠ পৌরুষপূর্ণ ভাষাকে সুধীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিবাদের নির্জন গোরস্থানেই কবরিত করেছেন। সমাজের নিষ্ঠুর পরিবেষ্টনে তাঁর মতো 'দুর্বলের' উচ্ছেদ অনিবার্য জেনে তিনি ব্যক্তিপূজায় তনুমন উৎসর্গ করেছেন, ভবিষ্যৎকে ভুল করেছেন 'ভবিতব্য' বলে, এবং তাঁর এই নির্বিকার আত্মরতিতে পাছে আচড লাগে সেই ভয়ে তিনি শশকবৃত্তি অবলম্বন করাই শ্রেয় মনে করেছেন।

সমালোচক হিসাবে তাই তিনি সম্পূর্ণরূপে মার্কস্‌পন্থী হতে পাবেন নি, কারণ মার্কস্‌ও তাঁর বিবেচনায় 'যথেষ্ট জড়বাদী' নন। তাই শ্রেণী-বিরোধ অস্বীকার করতে না পেরেও, এবং অস্বাভাবিক অধিকার ভেদে সৌসাদৃশ্যের স্ফূর্তি অসম্ভব জেনেও, তিনি সাম্যবাদী নন স্বীকার করেছেন, এবং নিজেকে বলেছেন 'একেবারে বুর্জোয়া'। তাঁর সমালোচনার ভাষাও তাই সরল তেজস্বিতা বর্জন করে জটিল দুর্বিষহ দুর্বোধ্যতাকে কেন্দ্র করে শুধু প্রাণহীন প্রজ্ঞাপ্রেমিকের স্বগতোক্তিতে পরিণত হয়েছে। এই আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি থেকে তাঁর মুক্তি সম্ভব কিনা ভবিষ্যতেই প্রমাণিত হবে, কিন্তু আজ আমাদের তাঁর কাছে নূতন

সমালোচনার ভাষা ও ভাবের জন্যে ঋণ স্বীকার করতেও আপত্তি থাকা উচিত নয়।

তারপর "চতুরঙ্গ" ও "কবিতা" পত্রিকার সমালোচক-গোষ্ঠী। এ দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বুদ্ধদেব বসু। যেহেতু দৈবশক্তিতে এঁরাও আস্থাবন নন, সেইজন্য এঁদের সমালোচনাও সমাজ ও সভ্যতার মুখাপেক্ষী। কিন্তু বহু চোখ-ঝল্‌সানো আলোর রেখায় দিশাহারা হয়ে এঁরা কখন ঘুরেছেন 'শিল্প শিল্পীর জন্যে' এই মতবাদের চারিদিকে, কখন সমাজ জরাগ্রস্ত বলে, তার জরা, কদর্যতা ও বীভৎসতাকেই 'বাস্তব' বলে প্রতিপন্ন করেছেন, এবং তারস্বরে তাকেই ঘোষণা করে বর্তমানে প্রগতিশীলদের নেতৃত্ব দাবী করেছেন। ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির বর্তমান ধারা এবং সঙ্গে সঙ্গে রুষিয়ার সাম্যবাদী আদর্শ 'হঠাৎ-আলোর ঝলকানির' মতো এঁদের ঝলসিয়ে দিয়ে কেবল অনর্গল বিকৃত মনের অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে। তাই সাংস্কৃতিক আভিজাত্য, বুর্জোয়া ভণ্ডামী ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ত্রি-সঙ্কটে পড়ে এই উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণীর সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সমালোচকেরা পরস্পরের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, পরস্পরের পিঠে হাত বুলান, আর বাইরের পাঠকের কাছে পঙ্গু সমাজের সভ্য বলে আত্ম-পরিচয় দিয়ে নিজেদের পাণ্ডুর, বিবর্ণ সাহিত্যকে বাস্তবের মুকুর, সুতরাং প্রগতিশীল বলে যুক্তির পর যুক্তি দিতে থাকেন। বাংলা সমালোচনা আজ এই স্বার্থপর গোষ্ঠী-নিন্দা ও গোষ্ঠী-পৃষ্ঠপোষকতা পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছে।

১৮১৯ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এই অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য নয় কি ?

এতে হতবাক হবার কিছু নেই। বাংলাদেশ আজও পুরোপুরি মধ্যযুগের সংকীর্ণতা অতিক্রম করতে পারে নি। ইংরেজী-সভ্যতার চাপে বাণিজ্য-প্রসারণের মধ্যে যে ধনতান্ত্রিক সভ্যতা জন্মলাভ করেছে, তার আশ্রয় হয়েছে প্রধানত শহর ও অর্ধ শহরগুলি। তার বাইরে যে বিস্তৃত ভূখণ্ড সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে আজও ছোট ছোট গ্রামগুলি, জমিদার আর পত্তনিদারেরা সেখানকার অভিভাবক, মূর্খ অপগণ্ড ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মৌলবী সেই গ্রাম্য সমাজ-জীবনের মালিক, আর মন্দিরে মন্দিরে, মস্‌জিদে মস্‌জিদে ভগবান-আল্লা তাদের ভাগ্য-নিয়ন্তা। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক আজও অশিক্ষিত ও অমানুষ। ধনিক-সভ্যতার চাপে পড়ে, গ্রাম ছেড়ে শহরে যারা এসেছে তাদের জীবনযাত্রারও কোনো বৈচিত্র্য নেই, কারণ এ-দেশের ধনিকগোষ্ঠী ধনবৃদ্ধির লোভে ও উত্তেজনায়

যেমন বিদেশীর পদলেহন করেছে, তেমনি অকালে ও অসময়ে, যুগের দ্রুত পরিবর্তনের চাপে পরিপক্কও হয়েছে বেশী। আর মুষ্টিমেয় ধনিকগোষ্ঠীর পিঠ-চুলকানি ও প্রলোভনে যারা মধ্যবিত্তশ্রেণীর পদে উন্নীত হয়েছেন তাঁরা যেমন প্রভুর সঙ্গে সুর মিশিয়ে স্বদেশের কাল্পনিক 'দেবীমূর্তি' ধ্যান করে 'মা, মা,' বলে চীৎকার করেছেন, তেমনি হঠাৎ-সৌভাগ্যের দীপ্তিতে না পেরেছেন নীচে নামতে, না পেরেছেন উপরে উঠতে। শুধু যাঁরা দৈনন্দিন জীবনের নিষ্ঠুর ঘাত-প্রতিঘাতে ধনিকগোষ্ঠীর প্রলোভনকে মরীচিকা বলে চিনলেন এবং ক্রমেই নিম্ন থেকে নিম্নতর স্তরে অবরোহণ করতে লাগলেন, তাঁরাই আদর্শের দিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে সত্যটিকে চিনে নিজেদের জীবনকে মিলিয়ে দেখলেন কৃষক-শ্রমিকদের সঙ্গে। তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বাকি যারা রইলেন, ধনিকগোষ্ঠীর প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হয়েও যারা নীচে নেমে আসতে রাজী হলেন না, তাঁরা আত্মাভিমান আর আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে, দেশ, মানুষ, সমাজ ও সভ্যতা সবকিছুকে দুর্বাসার মতো অভিশাপ দিতে লাগলেন। প্রশ্ন করলে তাঁরা জবাব দেন: "কি করব, সমাজ-বিবর্ত্তন যতদিন না ঘটছে ততদিন এই জাহাঁবাজ গ্রাম্য-বৃদ্ধার মতো গালি আর অভিশাপ দেওয়া ভিন্ন আমাদের নান্য পন্থা।" অর্থাৎ সমাজের বিবর্তন ঘটিয়ে প্রচলিত "দিল্লীর লাড্ডুর" মতো তাদের হাতে সুন্দর সমাজ উপহার দিতে হবে, তবেই তাঁরা আশার বাণী শুনিয়ে আমাদের কৃতার্থ করবেন। বলা বাহুল্য, 'কবিতা' ও 'পরিচয়'-গোষ্ঠীর সাহিত্যিক ও সমালোচকেরা এই "দিল্লীর লাড্ডু" প্রাপ্তির আশা করেন, এবং সমাজের অস্তমান দিকটিকে, বীভৎস ও বিকৃত ছবিগুলিকে বিকৃততর ভঙ্গীতে প্রকাশ করে 'প্রগতিশীল' হতে চান। বাংলাদেশের উপনিষদীয় ও সাংস্কৃতিক সাহিত্য-বিশ্লেষণের কারণও যেমন বাংলাদেশের মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে আজও রয়েছে, তেমনি বাংলাদেশের ফ্যাশানেবল প্রগতিবাদীদের উল্লম্ফন ও অহম্-গর্বিত জৃম্ভনের কারণও হঠাৎ-বর্ধিত ধনিক সভ্যতার অকাল-পক্কতা ও সাম্যবাদের গণ-নেতৃত্বের পুরোপুরি অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে, ঐতিহাসিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদ যখন দেশব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করে জনগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, তখন দেখা যাবে এই "দিল্লীর লাড্ডুর" বরপ্রার্থীরা বৃন্তচ্যুত ফলের মতো টুপ্ টাপ্ করে খসে পড়েছেন, আত্মহত্যা করেছেন, আর না হয় স্বদেশ-পলাতক হয়ে কুৎসাপ্রচারে

মনোনিবেশ করেছেন। সোভিয়েট রুষিয়ায় বিপ্লবোত্তর যুগের এই মধ্যবিত্ত-মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাসেই এ-সত্যের জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে। বর্তমান যুদ্ধে ইয়োরোপীয় বুদ্ধিজীবীরাও তার প্রমাণ দিচ্ছেন।

নূতন সমালোচনার পদ্ধতি পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। নূতন বাংলা সমালোচনা এই পদ্ধতি মেনে অগ্রসর হবে। তাই নূতন সমালোচনা, অর্থাৎ সাম্যবাদী বাংলা সমালোচনার দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। প্রথমত সাম্যবাদী সমালোচনার প্রথমাবস্থায় তাব স্বরূপটি ঠিকভাবে চিনিয়ে দিতে হবে সমগ্র পৃথিবী থেকে তার যথার্থ উপকরণ সংগ্রহ করে, বাংলা ভাষায় আপনার করে প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ত সাবধান হয়ে ধীর শান্তভাবে সত্যকার সাম্যবাদী সাহিত্য-সমালোচনা করতে হবে, কারণ সামাজিক ব্যবস্থায় যেটুকু পরিবর্তন এসেছে, সাহিত্য বা সমালোচনাতে ঠিক ততখানি এখনো আসে নি, আসতে পারেও না। সাহিত্য ও সাহিত্য-সমালোচনা এখনো মধ্যযুগের যোগাসনে সমাসীন রয়েছে, হঠাৎ তাকে ধ্যান ভঙ্গ করে সমাজ ও প্রত্যক্ষ জীবনের প্রস্তর ভিটের উপর দাঁড় করালে সাময়িক কলকোলাহল ও আর্তনাদে পরিপার্শ্ব মুখরিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে থমকে থাকলে চলবে না, কারণ ঐতিহাসিক সত্যের আলোকবর্তিকা বহন করে এগিয়ে যাওয়ায় ভার যাদের উপর পড়েছে, সাময়িক দুর্যোগ বা ঘূর্ণিবাত্যায় তারা যেমন বিপথগামী হবেন না, তেমনি ভয়-সঙ্কুচিত হৃদয়ে হতবাকৃও হবেন না। ফলাফল ইতিহাস প্রমাণ করবে। আর ঐতিহাসিক ঘটনাস্রোতের দুর্নিবার বেগে বাংলাদেশের মধ্যযুগের শিথিল স্তম্ভগুলিই শুধু যে ভাঙনের শব্দ করছে তা নয়, অকালবৃদ্ধ ধনিকশ্রেণীও শ্রেণী-মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন দেখছেন, এবং বর্ধিষ্ণু সাম্যবাদ তার অনিরুদ্ধ ঐতিহাসিক গতিতে শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে অগ্রসর হচ্ছে। সাম্যবাদের বিরোধী যারা তাঁরাই এ-কথা স্বীকার করেছেন।

প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা বলেন রস এক ঘন আনন্দস্বরূপ চেতনা, কোনো বিষয়ান্তরের স্পর্শে তার প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয় না। যে রজঃ মানুষের কামনা ও কর্মপ্রবৃত্তির মূল, যে তমঃ তার চিত্তকে লোভে ও মোহে আচ্ছন্ন করে রাখে, তাদের সম্পূর্ণ অভিভূত করে সত্ত্বরূপে এর প্রকাশ হয়। সুতরাং রসের আস্বাদ ব্রহ্মের আস্বাদের সহোদর। প্রাক্-পৌরাণিক যুগের এই বাণী ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলার সাহিত্যিক ও সমালোচকেরা নানা ভঙ্গীতে প্রকাশ

করেছেন, এবং বাংলার সমাজ-ব্যবস্থাই তাঁদের সে প্রকাশের প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু আজ বাংলার শহরের আকাশ-বাতাস কল-কারখানার ধোঁয়ায় ম্লান, আজ আর সূর্যের কিরণ ইমারতের ফাঁকায় ফাঁকায় ঝিকিয়ে বা ঝলমলিয়ে যায় না, ধূলিধূসর বস্তিতে এসে লজ্জায় স্বস্থানে ফিরে যায়, আজ আর পালকি বেহারার হাঁইহুঁই বা সহিসের হেঁইও হাঁক অলিগলি বা বড় রাস্তা থেকে শোনা যায় না, বড় বড় অফিসের আর অট্টালিকার ভিৎ-গঠনের "ঠ্যালো রে জোয়ান হেঁইও" শব্দ জনতায় ভেসে আসে, আজ আর সন্ধ্যাবেলায় বুড়ি দাসীর কাছে বসে প্রদীপ জ্বেলে রূপকথা শোনা যায় না, দিনের খররৌদ্রে হাজার হাজার মানুষের 'ইনক্লাব' ধ্বনির মধ্যে ইতিহাস-গুরুর কাছে এক নূতন 'রূপকথা' শুনি, যার রাজকন্যা আর রাজকুমার ঐ মিছিলের প্রত্যেকেই, আর 'স্বপনপুরী' যারা এই মাটির বুকেই গড়বে নিজের হাতে। আজ তাই নিস্তব্ধপ্রায় জগতে আর কোণের মানুষ, লাজুক বা নীরব হয়ে থাকা চলে না, কারণ যে জীবন-উপনিষদের শ্লোক বাল্যকাল থেকে আমরা আবৃত্তি করছি তার মধ্যে 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ' বাণী নেই, আছে এর ঠিক বিপরীত কর্কশ বাণীটি। আজ তাই নূতন সাহিত্যকেও যেমন লজ্জা ভেঙে নীরব ঘরের কোণটি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে জনতার মধ্যে, তেমনি নূতন সমালোচনাও প্রত্যক্ষ সামাজিক প্রতিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে সামনে ও পিছনে ইতিহাসের সুদূর প্রসারিত পরিপ্রেক্ষিতে, বাস্তবের সমগ্রতাকে উপলব্ধি করে প্রচার করবে, খণ্ড ও বিকৃত 'বাস্তব' নিয়ে মাতলামি করবে না। সেই পরিপূর্ণ বাস্তব মানবেতিহাসের অন্তরোৎসারিত জীবনের মন্ত্র, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে পরাজিত করবার মন্ত্র, যা আজ মানুষের ইতিহাসেই 'সাম্যবাদের' সুন্দর শ্রেণীহীন সমাজের মধ্যেই ধ্বনিত করেছে। নূতন সমালোচনা তাই সাহিত্যে জীবনের মালিন্যের অভিব্যক্তিকে গ্রহণ করবে সমাজ ও সভ্যতার নিষ্ঠুর এবং অবশ্যম্ভাবী অবদান বা অভিশাপ বলে, কিন্তু তাকে 'সত্য' বলে প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না, এবং যে-সাহিত্য তাকে 'সত্য' বলে ঘোষণা করবে, নূতন সমালোচক বা সাম্যবাদী সমালোচক তাকে 'বিরাট মিথ্যা' ও ব্যাধিগ্রস্ত রুগীর প্রলাপ বলে প্রচার করবে। নূতন বাংলা সমালোচনার এই হবে পথ, এবং সে-পথ কুসুমাস্তৃত না হয়ে কণ্টকাকীর্ণ হবে বলে নূতন সমালোচকের বিলাপ করা চলবে না।*

---

*নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা, নতুন সাহিত্য ভবন, ৫৯/২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৪০, পৃ. ৭২-৯৮। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

কেরানী রবীন্দ্রনাথ / অমল হোম

"আপনারা আমার আজকের অভিভাষণের আখ্যা শুনে চমকে বা হেসে উঠবেন না। "কেরানী রবীন্দ্রনাথ" মানে এ নয় যে, রবীন্দ্রনাথ কেরানীরূপে কোনোদিন কলিকাতার কোনো সওদাগরী হৌসে চাকরী করেছেন। তা-যে তিনি করেন নি সে তো আপনারা সকলেই জানেন। কিন্তু এটাও জেনে রাখা ভালো যে, ধরুন যদি তিনি এই কর্পোরেশনেই কাজ করতেন, তবে সে-কাজ তিনি ভালো করে, নিখুঁত করেই করতেন, আমাদের রামিয়া সাহেবের* মতো কুড়ি টাকায় চাকরীতে ঢুকে, হাজার টাকা মাইনের সেক্রেটারীগিরি তিনি অনায়াসেই করে যেতে পারতেন—চাই কি, হয়তো আমাদের 'বড় সাহেব'-এর** চেয়ারেও বসতেন। অনেক বছর আগে, চিত্তরঞ্জন দাশমশাই একদিন আমাকে বলেছিলেন —"ভাগ্যিস্, তোমাদের গুরুদেব বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন নি, তা হলে আর আমাদের ব্যবসা জমাতে হতো না।" কথাটা দাশ-সাহেব,—তখন তিনি ব্যারিস্টারি করেন—পরিহাসছলেই বলেছিলেন বটে, কিন্তু কথাটা সত্যি—কেন-না বিধাতা ললাটে রাজটীকা দিয়েই রবীন্দ্রনাথকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন; যেখানে যে-ক্ষেত্রেই তিনি যেতেন, সেখানেই বসতেন তক্ততাউসে, এতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু যাক সে-কথা। আমার অভিভাষণের আখ্যা "কেরানী রবীন্দ্রনাথ" কি-অর্থে দিয়েছি সেই কথাটা বলি। "কেরানী রবীন্দ্রনাথ" মানে আমি এই করেছি যে—রবীন্দ্রনাথ কেরানীকে কি চোখে দেখেছেন, কি রূপে এঁকেছেন—তাঁর সৃষ্টিতে কেরানীর ছবি ফুটেছে কি রকম। আমরা এখানে প্রায় সবাই কেরানী, অর্থাৎ কি-না কলম পিষে খাই; মাস গেলে মাইনে গুনে, অবশ্য 'কাট্' বাদ দিয়ে—বুক-পকেটে পিন এঁটে নোট ক'খানি সন্তর্পণে বাড়ি নিয়ে যাই; সমর্পণ করি সর্বংসহা গৃহিণীর করকমলে;—সকাল হতে না হতেই আসে বিল হাতে বাড়ী-ওয়ালার দারোয়ান, খেরো-বাঁধা খাতা হাতে মুদী, ফর্দ নিয়ে গোয়ালা;

* বি. ভি. রামিয়া। ** জে. সি. মুখার্জি।

তারপর মাসের বাকী দিনগুলো কাটাই মাসকাবারের মুখ চেয়ে। আমিও আপনাদেরই একজন, নামে শুধু 'এডিটর'—কাজেই আমার মুখে শোনাবে ভালো, কেরানীর কথা রবীন্দ্রনাথ কেমন বলেছেন; আপনাদেরও নিশ্চয় ভালো লাগবে সে-কথা শুনতে।

প্রথমেই একটা কথা বলি। কিছুদিন থেকে শোনা যাচ্ছে প্রগতিবাদীদের মুখে—"রবীন্দ্রনাথ বড়লোকের কবি; তিনি শুধু এঁকেছেন তাঁর কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে বড়লোকদের ছবি; দুঃখ-দারিদ্র্য অভাব-অনটন কি তা তিনি জানেন না, গরীব লোকের খবর তিনি রাখেন না!" বারবার একটা কথা বললে কথাটা অবশ্যই সত্যি হয় না, কিন্তু হয়ে দাঁড়ায় সেটা 'ধর্তাই বুলি'—যাকে বলে ইংরেজীতে catchword! হয়েছেও তাই। সেই যে কবে বিপিন পাল-মশাই "বঙ্গদর্শন"-এ লিখেছিলেন—'রবীন্দ্রনাথের কাব্য বস্তুতন্ত্রহীন', সেই থেকে সুর ধরলেন এক দল—বাংলায় গীতি-কবিতার সত্য রূপটি ফোটেনি তাঁর কাব্যে, দেশের নাড়ীর সঙ্গে নেই নাকি তার যোগ। টিঁকলো না কিন্তু এই সব টিপ্পনী, দেশ নেয় নি ওসব সমালোচনা। কিন্তু সূর্যের চেয়ে বালির তাপ বরাবরই বেশি; তাই বড় বড় মহারথীদের নারায়ণীসেনা যখন গেল ভেসে, বৈষ্ণবরসতত্ত্ব আর উজ্জ্বল-নীলমণি, রাইকিশোরী আর বাংলার রূপ গেল মুছে, তখন এই সব সমালোচকেরা মার্ক্সিস্ট বুলি আউড়িয়ে, কডওয়েল কপচিয়ে Illusion আর Reality-তে গুলিয়ে ফেলে চেঁচামেচি শুরু করেছেন,—রবীন্দ্রনাথ "আন্তর্জাতিক কল্পনাবিলাসী, সৌখীন সাহিত্যের স্রষ্টা"; তাঁর "রং-বেরঙের ঝুঁটিওয়ালা কচিকচি মিষ্টি বুলবুলি ভাষা"; রবীন্দ্রনাথ নাকি "সমস্ত রকমের আধুনিকতার বিরোধী" শুধু "সমাজ ও বাস্তবজীবনের প্রতি আকাশস্পর্শী উদাসীনতা নিয়ে তিনি অনাবিল সৌন্দর্য ও ব্রহ্মাস্বাদস্বরূপ 'রসের' মধ্যে নিমজ্জিত!" এ-সব তাঁদেরই একজনের কথা, আমি উদ্ধার করছি মাত্র! এইসব মার্ক্সিস্ট মৌলানারা ফতোয়া জারী করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ 'বুর্জোয়া', অতএব তিনি 'ব্যাক নাম্বার'! নূতন সাহিত্য ও সমালোচনার নামে এই সব খিনয়ীরা বুঝোতে চাচ্ছেন আমাদের—আমি আবার তাঁদের ভাষা উদ্ধার করছি যে—রবীন্দ্রনাথের কাছে "মানুষ বা মরজগতের জয় হয় নি";"তাঁর 'এবার ফিরাও মোরে' আহ্বান দিগভ্রান্ত সরল শিশু-হৃদয়ের কাতরানি"; তিনি "বাদশাহ-রাজা-উজীরের আওতায় মধ্যযুগের নির্জন নিরাপদ প্রকোষ্ঠে বসে" আছেন; তিনি "সামন্ততন্ত্রের সমাহিত প্রতিবেশের মধ্যে···মুক্তির আশ্রয়

খুঁজছেন" ; তিনি "সংখ্যালঘিষ্ঠ রাজা-মহারাজা ও ধনিকগোষ্ঠীর···পৃষ্ঠপোষকতা৷ করছেন এবং তাঁর বিমূর্ত কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্ট মানবপ্রেম পরোক্ষে স্বশ্রেণী-প্রীতির মহিমা কীর্তন করছে।" এই 'সাম্যবাদী' সমালোচকেরা জানাতে চান যে, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ চোখে ডায়ালেকটিক্‌সের ঠুলি এঁটে সাহিত্যের ঘানি টানেন না, সেইহেতু তাঁর সাহিত্য সেই তেল যোগাতে পারছে না, যার অভাবে আজকের দিনে মানুষের ঘরে নাকি আলো আর জলবে না!

বলা হচ্ছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই বিচার নাকি 'সাম্যবাদী' এবং 'সাম্প্রতিক' সাহিত্য ও সাহিত্যিক সমালোচনা-সম্মত! আমি বলি, এই বিচার, এই সমালোচনা 'সাম্যবাদী' নয়, সত্যবাদী তো নয়ই! কিন্তু যাঁরা এই বিধান দিয়েছেন, সেই নতুন গোঁসাইয়ের দল, আর কিছু না জানুন, দল-ভারী করবার বিদ্যেটা আয়ত্ত করেছেন যথেষ্ট! দুঃখ এই যে, আমাদের খবরের কাগজের ঢাকীরা আছেন সব সময়েই তৈরী ঢাকের কাঠি নিয়ে এঁদের ঢাক পেটাবার জন্য। নির্বিচারে, নির্বিকারে এঁরা ছাপিয়ে দিচ্ছেন এই সব মূঢ় আলোচনা, আর ভাবছেন কী গূঢ়ই না হলো মার্কসিস্ট-দর্শনের অপব্যাখ্যার প্রলাপ—সাহিত্যের এই নবতত্ত্ব! একদিন ছিলাম আমরা ইংরেজ গুরুর পাঠশালার ছাত্র—গুরুমশাইয়ের সব কথাই ছিল আমাদের কাছে বেদবাক্য; আজ সেই আসনে বসিয়েছি মার্কসিস্ট মাস্টারমশাইদের; মাস্টার বদলেছে বটে, কিন্তু মন বদলায় নি—সে দাসত্ব করছে চিরদিন!

আরো দুঃখ এই যে, খবরের কাগজ শুধু নয়, ত্রৈমাসিক আছেন, 'অভিজাত' মাসিক আছেন—যাঁদের কেউ কেউ নৈবেদ্যের চূড়ার উপর সন্দেশের মতো রবীন্দ্রনাথেরই লেখা ছাপিয়ে, সেই কথামালার শৃগাল ও শিকারীদের গল্পের মতো ইঙ্গিতে দেন দেখিয়ে, ভঙ্গীতে দেন জানিয়ে যে—রবীন্দ্রনাথ পিছিয়ে পড়েছেন এবং তিনি নাকি হাঁপিয়ে উঠেছেন নব্যদের তালে পা ফেলতে গিয়ে! "আহা বুড়ো মানুষ, খেটেছেন সারাজীবন যথেষ্ট, পারবেন কেন?" এই সব পত্রিকার পঙক্তিতে মিশিয়ে থাকে কেমন যেন এই রকম একটা অনুকম্পার সুর, একটু দরদের রেশ। এঁরা একটা নতুন কথা তৈরী করেছেন—একটা নতুন সাহিত্য আবিষ্কার করেছেন, তার নাম "রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য"। আপনারা ভুল বুঝবেন না। "রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য" মানে রবীন্দ্র-পরবর্তী সাহিত্য নয়,—রবীন্দ্র-অতিক্রান্ত সাহিত্য, অর্থাৎ কিনা যে-সাহিত্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে অতিক্রম করে

গেছে। এঁরা দল বেঁধে, মহোৎসাহে পরস্পরের পৃষ্ঠকণ্ডূয়ন করেন, নিজেদের কাগজে নিজেদের বন্ধুদের দিয়ে নিজেদেরই গল্প-কবিতার সুদীর্ঘ আলোচনা ছাপিয়ে জাহির করেন যে, "আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্রগতি সত্যিই বিস্ময়কর," এবং "বাংলা কবিতার এ-উন্নতির জন্য অনেকখানি দায়ী" নাকি এঁদেরই পরিচালিত একখানি ত্রৈমাসিকী! এঁরা প্রমাণ করতে ব্যস্ত এবং নিজেদের কাছে ও নিজেদের কাগজে নিঃসন্দেহেই প্রমাণ করেছেন যে, "রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত নতুন বাংলা সাহিত্য"—গল্প কাব্য সবকিছু—এঁরা সৃষ্টি করেছেন; অতএব রবীন্দ্রযুগ অবসান—Q.E.D.!

কিন্তু যাক এ-সব "সত্যম্ অপ্রিয়ম্"। শাস্ত্রের "মা ব্রুয়াৎ" আদেশ শিরোধার্য করে আমার আসল বক্তব্যে এসে পড়া যাক। বক্তব্যটা আমার এই—রবীন্দ্র-সাহিত্য, তাঁর গল্পে-উপন্যাসে তিনি রাজারাজড়া নিয়ে কারবার করেন নি; আপনার আমার মতো সাধারণ লোক, যারা খেটে খায়, আপিসে চাকরী করে, তাদের কথাই বলেছেন; তার চাইতে একটুও কম বলেন নি, দুঃখে পীড়িত, অভাবে ক্লিষ্ট, পরমসহিষ্ণু বাংলার পল্লীবাসীদের কথা। তাদেরই তিনি রূপে রসে মূর্তি দিয়েছেন অপরূপ। সে-মূর্তি মানুষের চিরন্তন মূর্তি, দেশ ও কালের পাত্র ছাপিয়ে আসন নিয়েছে তা' সকল কালের, সকল মানবের মর্মস্থলে।

আর একটি কথা এখানে বলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। সে কথাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্যপ্রকাশিত "রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা" গ্রন্থখানিতে খুব ভালো করে বলা হয়েছে। সেটি এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বহু উপন্যাসের উপাদান খুঁজেছেন আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বাইরে; রবীন্দ্রনাথই বাংলা-সাহিত্যে সর্বপ্রথম বাঙলার ও বাঙালীর বাস্তব জীবনের ছবি আঁকলেন তাঁর ছোট গল্পে। রোমান্স নয়, রাজা-রাজড়ার লড়াই নয়, বাঙলার পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখের ছবি—ঘনিষ্ঠ নিবিড় যোগে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ-দেখা।

"পোস্টমাস্টার" নিশ্চয়ই পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের আদ্যযুগের সৃষ্টি—পঞ্চাশ বছর আগে লেখেন 'হিতবাদী' কাগজে। গল্পটা কাকে নিয়ে? গণ্ডগ্রামের গরীব 'ডাকবাবু'—অখ্যাত, অজ্ঞাত—কেরানীরই সামিল; গৃহছাড়া, সঙ্গীহীন—সে শুধু রতনের মনিব। রতন কে? সামান্য গ্রাম্য বালিকা; পোস্টমাস্টারের দুটি ভাত সিদ্ধ করে দু'খানি রুটি গড়ে দেয়, আর তার বিচ্ছেদ-কাতর দিনগুলিকে পূর্ণ করে তোলে। শেষে একদিন এল বিদায়ের পালা,

অশ্রুসজল রতনকে রেখে মাস্টারমশাই "নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল·········"

এই "পোস্টমাস্টার" গল্পটিতে যে সুরের আভাস, তার পূর্ণ পরিণতি দেখি "সমাপ্তি"-তে। কেরানীর একমাত্র কন্যা—পোষ-না-মানা বন্যহরিণীর মতো চঞ্চলা মৃন্ময়ী। বাপ চাকরী করে বিদেশে; স্টীমার ঘাটের মাল ওজন, মাশুল আদায় হলো তার কাজ; মেয়ের বিয়েতে আসবার ছুটি হলো না তার মঞ্জুর।

"······মৃন্ময়ীর বাপ ঈশান মজুমদারকে যথাকালে সংবাদ দেওয়া হইল। সে কোনো একটি স্টীমার কোম্পানির কেরানীরূপে দূরে নদীতীরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র স্টেশনে একটি ছোটো টিনের ছাদবিশিষ্ট কুটিরে মাল ওঠানো নাবানো এবং টিকিট-বিক্রয়-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

তাহার মৃন্ময়ীয় বিবাহপ্রস্তাবে তুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতখানি তুঃখ এবং কতখানি আনন্দ ছিল পরিমাণ করিয়া বলিবার কোনো উপায় নাই।

কন্যার বিবাহ-উপলক্ষে ঈশান হেড্ অফিসের সাহেবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিল। সাহেব উপলক্ষটা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। তখন, পূজার সময় এক সপ্তাহ ছুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া সে পর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশে চিঠি লিখিয়া দিল, কিন্তু অপূর্ব্বর মা কহিল, এই মাসে দিন ভাল আছে আর বিলম্ব করিতে পারিব না।

উভয়তই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে পর ব্যথিত হৃদয়ে ঈশান আর কোনো আপত্তি না করিয়া পূর্ব্বমতো মাল ওজন এবং টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিল।

[সমাপ্তি : গল্পগুচ্ছ]

সেই গরীবের ঘরে হলো একদিন সহসা মেয়ে জামাইয়ের আবির্ভাব—অপূর্ব আর মৃন্ময়ী। কী বেদনার রসে আনন্দ-উচ্ছল সেই মিলনের দৃশ্য!

"···টিনের ঘরে একখানি ময়লা চৌকা-কাঁচের লণ্ঠনে তেলের বাতি জ্বালাইয়া ছোটো ডেস্কের উপর একখানি চামড়ায় বাঁধা মস্ত খাতা রাখিয়া গা-খোলা ঈশানচন্দ্র টুলের উপর বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। এমন সময় নবদম্পতী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃন্ময়ী ডাকিল, "বাবা!" সে ঘরে এমন কণ্ঠধ্বনি এমন করিয়া কখনো ধ্বনিত হয় নাই। ঈশানের চোখ দিয়া দরদর করিয়া অশ্রু পড়িতে

লাগিল । সে কী বলিবে, কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মেয়ে এবং জামাই যেন সাম্রাজ্যের যুবরাজ এবং যুবরাজমহিষী ; এই সমস্ত পাটের বস্তার মধ্যে তাহাদের উপযুক্ত সিংহাসন কেমন করিয়া নির্ম্মিত হইতে পারে ইহাই যেন তাহার দিশাহারা বুদ্ধি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না ।

তাহার পর আহারের ব্যাপার—সেও এক চিন্তা। দরিদ্র কেরানী নিজহস্তে ডাল-ভাতে ভাত পাক করিয়া খায়—আজ এই এমন আনন্দের দিনে সে কী করিবে, কী খাওয়াইবে। মৃন্ময়ী কহিল, "বাবা, আজ আমরা সকলে মিলিয়া রাঁধিব।" অপূর্ব্ব এই প্রস্তাবে অতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিল।

ঘরের মধ্যে স্থানাভাব, লোকাভাব, অন্নাভাব, কিন্তু ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে ফোয়ারা যেমন চতুর্গুণ বেগে উত্থিত হয় তেমনি দারিদ্র্যের সঙ্কীর্ণ মুখ হইতে আনন্দ পরিপূর্ণ ধারায় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

এমনি করিয়া তিন দিন কাটিল। দুই বেলা নিয়মিত স্টীমার আসিয়া লাগে, কত লোক, কত কোলাহল ; সন্ধ্যাবেলায় নদীতীর একেবারে নির্জ্জন হইয়া যায়, তখন কী অবাধ স্বাধীনতা! এবং তিন জনে মিলিয়া নানা প্রকার জোগাড় করিয়া, ভুল করিয়া, এক করিতে আরেক করিয়া তুলিল রাঁধাবাড়া। তাহার পর মৃন্ময়ীর বলয়ঝঙ্কৃত স্নেহহস্তের পরিবেষণে শ্বশুর জামাতার একত্রে আহার, এবং গৃহিণীপনার সহস্র ত্রুটি প্রদর্শনপূর্বক মৃন্ময়ীকে পরিহাস ও তাহা লইয়া বালিকার আনন্দকলহ এবং মৌখিক অভিমান। অবশেষে অপূর্ব্ব জানাইল আর অধিক দিন থাকা উচিত হয় না। মৃন্ময়ী করুণস্বরে আরো কিছুদিন সময় প্রার্থনা করিল। ঈশান কহিল, "কাজ নাই।"

বিদায়ের দিন কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুগদগদ কণ্ঠে ঈশান কহিল, "মা, তুমি শ্বশুরঘর উজ্জ্বল করিয়া লক্ষ্মী হইয়া থাকিয়ো। কেহ যেন আমার মীনুর কোনো দোষ না ধরিতে পারে।

মৃন্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সহিত বিদায় হইল। এবং ঈশান সে দ্বিগুণ নিরানন্দ সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে লাগিল।" [সমাপ্তি : গল্পগুচ্ছ]

দারিদ্র্যের অভাব-অনটনের এই ছবিটির উপর কবি তাঁর যাদুকাঠি বুলিয়ে, অনির্বচনীয় রসের সঞ্চারে আমাদের হৃদয়মন অভিষিক্ত করে দিলেন—কেরানী জীবনের কালি নিমেষেই সোনা হয়ে গেল। দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে ; অভাব-

অনটন তো নিত্য সহচর, কিন্তু সে-সমস্ত ছাপিয়ে গেল গরীব কেরানী বাপের সেই তিন দিনের আনন্দ। মানব-হৃদয়ের এই অপূর্ব পরিচয়ে নিবিড়, স্নেহ-সুকোমল, প্রশান্তি-গভীর এই অন্তর্দৃষ্টি কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতো রবীন্দ্রনাথের সহজাত। কোনো বিশেষ অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, কোনো রাজনৈতিক মতবাদ থেকে এর জন্ম নয়। অশেষ বিধিনিষেধ বাধাবন্ধনের মধ্যে যেখানে মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির নানা বিচিত্র প্রকাশ আহত ও সঙ্কুচিত, সেখানে কবি তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, একান্ত আত্মীয়তাবোধের সাহায্যে, গল্পের উৎসের সন্ধান পেয়েছেন এবং সুদুর্লভ মনোবিশ্লেষণশক্তিতে হৃদয়লীলার যথার্থ রূপটি আমাদের চোখের সামনে ধ'রে দিয়েছেন! তাঁর কল্পনার ছোঁয়া লেগে সকল বস্তু এক অখণ্ড রসপরিণামের মধ্যে সমাপ্তি লাভ করে; তা' ব্যক্তিবিশেষের দুঃখকে, কোনো বিশেষ ঘটনার বেদনাকে, সকলের বেদনার ভিতরে পরিব্যাপ্ত করে দেয়। অথচ তিনি তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে যথার্থ বস্তুনিষ্ঠ। বস্তুকে নিয়েই তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টির সূত্রপাত, কিন্তু তাঁর অপূর্ব কল্পনা বাস্তবকে ছাড়িয়ে, রসের ঊর্ধলোকে উঠে, সেই সৃষ্টিকে অপরূপ ঐশ্বর্যমহিমায় মণ্ডিত করে দেয়।

এই রসসৃষ্টির জন্য 'ফিউডল্', কি 'মিডিভল্', 'বুর্জোয়া' বা 'প্রোলিটেরিয়েট্' কোনো সমাজতন্ত্রের বিশেষ পরিবেশ বা পরিমণ্ডলের প্রয়োজন হয় নি রবীন্দ্রনাথের —সমাজের সর্বশ্রেণীর মধ্যে তাঁর রসানুভূতি সমান। "এক রাত্রি" গল্পের 'বিপুল বিরতি', অপূর্ব কারুসংযম গরীব স্কুলমাস্টারকে আশ্রয় করেই ফুটে উঠেছে। "মহাপ্রলয়ের তীরে" সুরবালার পাশে দাঁড়িয়ে "অনন্ত আনন্দের আস্বাদ" হলো সেই "ভাঙা স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টারের কাছে তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা"। "মধ্যবর্তিনী" গল্পের অপরিসীম আবেগ তিনটি মানুষের জীবনকে আলোড়িত ও বিধ্বস্ত করে গহনগোপনচারী মানবমনের যে বিচিত্র সূক্ষ্ম পরিচয় দিল, তা "ম্যাকমোরান কোম্পানীর অপিসের হেডবাবু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র"-কে নিয়ে। পরাধীন দেশের সমস্ত গ্লানি, বেদনা, নিষ্ফলতা, অন্যায়, অত্যাচার, অপমান পুঞ্জীভূত হ'য়ে রইল "মেঘ ও রৌদ্র" আখ্যানে—"ক্ষীণদৃষ্টি মক্কেলহীন গ্রাম্য উকিল" শশিভূষণের ব্যর্থ জীবনে; শুধু বুলিয়ে দিলে তার হৃদয়ক্ষতে স্নেহপ্রলেপ তার শৈশব-ছাত্রী "নিরাভরণা, শুভ্রবসনা, বিধবাবেশধারিণী গিরিবালা।"

"গল্পগুচ্ছ" পড়ুন—দেখবেন, কবির সৃষ্টিতে কেউ বাদ যায় নি। "অতিথি" গল্পে সেই জন্ম-'ভ্যাগাবণ্ড' তারাপদ ছোক্‌রাকে মনে পড়ে? সেই "আসক্তি-

বিহীন উদাসীন ব্রাহ্মণ বালক," যার 'পথ চলাতেই আনন্দ,' যাকে কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিবাবু, তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণা বা তাঁদের মেয়ে চারু কেউ ধ'রে রাখতে পারলে না—যে একদিন বর্ষার মেঘঅন্ধকার রাত্রে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার সেই পালানোর দৃশ্যটা মনে আছে ?

"দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব দিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল—পূবে-বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল—নদীতীরবর্ত্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল ;—সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে ;—মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে ; দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর এক তীরে এক পার্শ্বে কাঁঠালিয়া গ্রাম আপন কুটীরদ্বারে বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল। [অতিথি ঃ গল্পগুচ্ছ]

'সমাজ-সচেতন' মনের কথা আজকাল খুব শোনা যাচ্ছে। এই social consciousness রবীন্দ্রনাথের গল্পের মধ্যে দেখবেন ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে। পণ্যা-নারী নিয়ে তিনি কোনো দিনই মাতামাতি করেন নি—তাঁর গল্প বা উপন্যাসে ; কিন্তু যে সামাজিক আবেষ্টনে ও অবিচারে পতিতার সৃষ্টি, যে একদেশদর্শিতায় তার চরম গ্লানি ও নির্যাতন, তা' তাঁর মনকে কি-ভাবে নাড়া দিয়েছে, তা' পাবেন তাঁর "বিচারক" গল্পে। মনে রাখবেন, এ-গল্প Tolstoy-এর "Resurrection" উপন্যাসের আগে লেখা এবং বাংলা কথা-সাহিত্যে পাইকারী হিসাবে পতিতা আমদানী হবার বহু পূর্বেই রচিত। আমি তো মনে করি এই একটি গল্পে এ-সমস্যা সম্বন্ধে যে-ইঙ্গিত রয়েছে, তা' আধুনিক বা অতি-আধুনিক অনেক গল্পেই খুঁজে পাওয়া শক্ত।

নারী-জাগরণ, নারী-বিদ্রোহের বাণী থেকে থেকে খবরের কাগজে, বক্তৃতা-মঞ্চে অস্ফুঘোষণা করছে কিছুকাল হ'তে এদেশে। সে-স্বাতন্ত্র্যের পরিপূর্ণ মহীয়সী বাণী পাবেন "স্ত্রীর পত্র"-এ, "পলাতকা"-র 'মুক্তি' কবিতায়—বিদুর

বাইশ বছরের জীবনের ব্যর্থতায়। জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাসকে নিয়ে যে "চতুরঙ্গ", তাতে পাবেন নরনারীর আদিম সম্বন্ধের উপর রস-সমুদ্রের যে-ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়ল, হৃদয়ের হাপরে যে-আগুন দ্বিগুণ হয়ে উঠল, সেই বিষয়ে এমন গভীর অন্তর্দৃষ্টি, এমন সূক্ষ্ম বিচার, যা পড়বার পর মনে হবে, যৌনসমস্যা নিয়ে লেখা রাশি রাশি দেশী-বিদেশী কাহিনী পশ্চিম সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশি মাত্র।

'ছোটলোক' যাদের বলা হয় তাদের গল্প চান? ছিদাম চন্দরার কথা পড়ুন "শাস্তি"-তে—সেই ছিদাম আর তার ভাই দুঃখী। দু'জনে জমিদারের কাছারীতে সারাদিন না খেয়ে বেগার খেটে এসেছে। বৌয়ের কাছে ভাত চেয়ে না পেয়ে দুঃখী খুন করে বসল তাকে। তারপর ভাইকে বাঁচাবার জন্য ছিদাম খুনের দায় চাপালে তার বৌ চন্দরার কাঁধে।···চন্দরা 'হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল' 'একখানি নূতন তৈরী নৌকার মত সুডোল' দেহ তার। মনে পড়ে, ফাঁসীর আগে 'দয়ালু সিভিল সার্জন' যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে তার স্বামীকে দেখতে চায় কি না তখন সে কি বলেছিল? এমন বস্তুনিষ্ঠ অথচ এমন রস-সার্থক গল্প বেশি পাবেন কি কোথাও?

কিন্তু আমি বোধ হয় "কেরানী রবীন্দ্রনাথ" থেকে একটু দূরে এসে পড়েছি। সুতরাং ফিরে যাওয়া যাক আবার কেরানী-জীবনের কথায়। কেরানী-জীবনে রোমান্স খোঁজেন যদি পাবেন তা' "ক্ষুধিত পাষাণ"-এ। গল্পের নায়ক, বরীচের বাজারে তুলার মাশুল-আদায়কারী শুস্তার শুষ্ক বালুতীরবর্তী শা-মামুদের পরিত্যক্ত প্রাসাদবাসী সেই বাঙালী ভদ্রলোকটি—কেরানীই। সারা দিন কলম চালিয়ে এসে যখন সে সূর্যাস্তের পর, নিষ্ফল কামনার অতিশাপে অভিশপ্ত সেই প্রাসাদে প্রবেশ করে, তখন সে হয়ে ওঠে শত শত বৎসরের পূর্বেকার কোনো এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর একটি ব্যক্তি; জড়িয়ে পড়ে সে একটা নেশার জালের মধ্যে, তাকে ঘিরে সেই বিজন প্রাসাদের বিস্তীর্ণ কক্ষ-গুলিতে বিস্তৃত হয় এক রহস্যময় ইন্দ্রজাল। তখন অর্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠে বসে সে শুনতে পায়—

"···কে যেন গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে—যেন আমার খাটের নীচে মেঝের নীচে এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলবর্ত্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, তুমি আমাকে উদ্ধার

করিয়া লইয়া যাও—কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া, তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্য্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও! আমাকে উদ্ধার কর

আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণ্যমান পরিবর্ত্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্যে হইতে কোন্ মজ্জমান কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্যরূপিনী। তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জ্জুর-কুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে? তোমাকে কোন্ বেদুইন দস্যু বনলতা হইতে পুষ্প-কোরকের মত মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপর চড়াইয়া জলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দামী হাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন্ বাদশাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবন-শোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া প্রভুগৃহে অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল! সেখানে সে কি ইতিহাস! সেই সারঙ্গীর সঙ্গীত, নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজের স্বুবর্ণ মদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত! কি অসীম, কি ঐশ্বর্য্য, কি অনন্ত কারাগার! দুই দিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে; শাহেন শা বাদ্‌শা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে;—বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মত হাবশী, দেবদূতের মত সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসঙ্কুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে?

এমন সময় হঠাৎ সেই পাগলা মেহের আলি চীৎকার করিয়া উঠিল—"তফাৎ যাও, তফাৎ যাও! সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়!" চাহিয়া দেখিলাম, সকাল হইয়াছে······

[ক্ষুধিত পাষাণ : গল্পগুচ্ছ]

কেরানী-জীবনের ঝুঁটা রোমান্স এমনি করেই ভাঙ্গে বটে—রূঢ় আলোকে!

"চোখের বালি"-তে দেখি বিহারী যখন বিনোদিনীর কাছ থেকে পালিয়ে

এসে "নিভৃত গঙ্গাতীরে বিশ্বসঙ্গীতের মাঝখানে তাহার মানসী প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনার হৃদয়কে ধূপের মত দগ্ধ করিতেছে," তখন "কলিকাতার দরিদ্র কেরানীদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার সে গ্রহণ করিয়াছে।" কবি লিখছেন —"গ্রীষ্মকালের ডোবার মাছ যেমন অল্পজল পাঁকের মধ্যে কোনোমতে শীর্ণ হইয়া খাবি খাইয়া থাকে, গলিনিবাসী অল্পাশী পরিবারভারগ্রস্ত কেরানীর বঞ্চিত জীবন সেইরূপ ; সেই বিবর্ণ কৃশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভদ্রমণ্ডলীকে বিহারী বনের ছায়াটুকু ও গঙ্গার খোলা হাওয়া দান করিবার সংকল্প করিল।"

শুধু কেরানী-জীবনের দুঃখকষ্টই যে রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছে তা নয় ; তার অন্য দিকটা,—যেখানে শত দুঃখের মধ্যেও হাসি উঁকি মারছে, সে-দিকটারও পরিচয় তিনি দিয়েছেন। মনে পড়ে কি "গোরা"-তে মহিমের আপিসের ডালকুত্তার মতো নতুন বড় সাহেবের কথা—খবরের কাগজে যার নামে চিঠি বেরিয়েছে বলে মহিমকেই তার লেখক বলে সন্দেহ করেছে? পড়ে শোনাই আপনাদের সেখানটা। গোরা আর বিনয় গোরাদের বাড়িতে বসে, ভারতবর্ষের প্রতি 'সঙ্কোচহীন, সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা" কেমন ভাবে দেশের অবিশ্বাসীদের মনে সঞ্চার করে দেওয়া যায় সেই আলোচনা করছিলেন—

"এমন সময় হাতে একটা হুঁকা লইয়া মৃদুমন্দ অলস ভাবে মহিম আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। আপিস হইতে ফিরিয়া জলযোগ সারিয়া, একটা পান মুখে দিয়া এবং গোটা ছয়েক পান বাটায় লইয়া রাস্তার ধারে বসিয়া মহিমের এই তামাক টানিবার সময়। আর কিছুক্ষণ পরেই একটি একটি করিয়া পাড়ার বন্ধুরা জুটিবে, তখন সদর দরজার পাশের ঘরটাতে প্রমারা খেলিবার সভা বসিবে।

মহিম ঘরে ঢুকিতেই গোরা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল! মহিম হুঁকায় টান দিতে দিতে কহিল, "ভারতউদ্ধারে ব্যস্ত আছো, আপাততঃ ভাইকে উদ্ধার করো তো!

গোরা মহিমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মহিম কহিলেন—"আমাদের আপিসের নতুন যে বড়ো সাহেব হয়েছে—ডালকুত্তার মতো চেহারা—সে বেটা ভারি পাজি।

সে বাবুদের বলে বেবুন—কারো মা মরে গেলে ছুটি দিতে চায় না, বলে মিথ্যে কথা—কোনো মাসেই কোনো বাঙালী আমলারগোটা মাইনে পাবার জো নেই, জরিমানায় জরিমানায় একেবারে শতছিদ্র করে ফেলে। কাগজে তার

নামে একটি চিঠি বেরিয়েছিলো—সে বেটা ঠাউরেচে আমারই কর্ম্ম। নেহাৎ মিথ্যে ঠাওরায় নি। কাজেই এখন আবার স্বনামে তার একটা কড়া প্রতিবাদ না লিখলে টিঁকতে দেবে না। তোমরা তো য়ুনিভারসিটির জলধি মন্থন করে তুই রত্ন উঠেছো—এই চিঠিখানা একটু ভালো করে লিখে দিতে হবে। ওর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে **even-handed justice, never-failing generosity, kind courteousness** ইত্যাদি ইত্যাদি!"

গোরা চুপ করিয়া রহিল। বিনয় হাসিয়া কহিল, "দাদা, অতগুলো মিথ্যে কথা একনিশ্বাসে চালাবেন?"

মহিম—শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। অনেক দিন ওদের সংসর্গ করেচি, আমার কাছে কিছুই অবিদিত নেই। ওরা যা মিথ্যা কথা জমাতে পারে সে তারিফ করতে হয়। দরকার হলে ওদের কিছুই বাধে না; একজন যদি মিছে বলে তো শেয়ালের মতো আর সব কটাই সেই সুরে হুক্কাহুয়া ক'রে ওঠে, আমাদের মতো একজন আর একজনকে ধরিয়ে দিয়ে বাহবা নিতে চায় না। এটা নিশ্চয় জেনো ওদের ঠকালে পাপ নেই যদি না পড়ি ধরা।

বলিয়া হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া মহিম টানিয়া, টানিয়া হাসিতে, লাগিলেন, বিনয়ও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।" [গোরা]

আর নয়; এবার শেষ করা যাক; তা না হলে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার আশঙ্কা আছে। রবীন্দ্রনাথের চোখে কেরানীর পরিচয় আপনাদের একটু দিতে পেরেছি আশা করি। কিন্তু ভুল করবেন না; এ-পরিচয় তাঁর কথাসাহিত্যের অত্যন্ত আংশিক পরিচয়মাত্র; আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্যই আমি তাঁর গল্প উপন্যাস থেকে কয়েকটি উদাহরণ সংগ্রহ করে দিয়েছি মাত্র।

আর একবার আমার এই অসম্পূর্ণ অভিভাষণের গোড়ার কথায়, আপনাদের অনুমতি পেলে, ফিরে যাই। আপনাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে—ধর্তাই বুলির জালে বাঁধা পড়বেন না, তথাকথিত 'বামমার্গী' সাহিত্যিকদের সমালোচনায় বিভ্রান্ত হবেন না। রবীন্দ্রনাথ মানুষের—সম্পূর্ণ মানুষের—কবি, মতবাদের কবি নন; মানুষের যা-কিছু ভালো বা মন্দ, দ্বন্দ্ব-সন্দেহ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সার্থকতা-ব্যর্থতা সব রূপ নিয়েছে তার রচনায়—তাঁর কবিতায়, গল্পে, গানে।

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার
যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে, সাড়া তার
জাগিবে তখনি।"

মন তাঁর চিরচঞ্চল, 'সুদূরের পিয়াসী'; সে চিরদিনই বলেছে 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'। স্থিতিতে তাঁর বাসা নয়, স্থাণুতে তাঁর আস্থা নেই। তাই আজ একাশী বৎসর বয়সে জরা যখন এসে আক্রমণ করেছে দেহ— তখনও অনন্ত প্রাণবেগবান কবি নূতন ধরিত্রীর আগমন-প্রত্যাশায় অধীর। শুনুন তিনি কি বলেছেন—

"এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ যুগের অন্ত হবে,—
মানব তপস্বী-বেশে
চিতা-ভস্ম-শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে;
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।"

সেই সৃষ্টির আহ্বানে আসবে কারা? যারা শুধু ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলায়, তারা নয়। কারা? কে?

কৃষাণের জীবনের শারিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি—"

কবি তার, তাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। কাদের জন্য? না, যারা—

"চিরকাল—
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে······

ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে
পাঞ্জাবে বম্বাই গুজরাটে
গুরু গুরু গর্জন গুন্ গুন্ স্বর
দিনরাত্রি গাঁথা পড়ি' দিনযাত্রা করিছে মুখর
দুঃখ-সুখ দিবস রজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের
ভগ্ন শেষ 'পরে
ওরা কাজ করে!"

এর পরেও কি মার্ক্সবাদী বলবেন—"দেখলুম না তো তাঁর রচনায় সে-মানুষের স্বীকৃতি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে এ-জগৎ সৃষ্টি করবে?"*

*পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ, তৃতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৬৮, পৃ. ৩১-৫৩ বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি / সুশোভন সরকার

প্রগতি কথাটা অনির্দিষ্ট, তাব সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। বিপুল পরি-বর্তনেব দিকে এগিয়ে যাওয়াই বোধ হয় প্রগতিব সবচেয়ে নিবপেক্ষ ও নির্বিশেষ প্রতিশব্দ। কিন্তু ঘটনাচক্রে সাবা জগতে আজ এব একটা বিশিষ্ট আধুনিক রূপ ফুটে বেবিয়েছে। আজকেব দিনে অগ্রগতিব যথার্থ বাস্তব রূপ হচ্ছে সাম্যবাদেব আকর্ষণ, সাম্যতন্ত্রেব প্রস্তুতি। শ্রেণীবর্জিত নূতন সমাজগঠন আমাদেব দেশেও বহু নবনাবীব কাম্য হযে উঠেছে। তাই পবিবর্তনেব প্রকৃতি সম্বন্ধে পুরনো ধাবণাগুলি অনেকাংশে ম্লান হযে আসতে বাধ্য। এটা ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণেব কথা, এখানে বিভিন্ন সংজ্ঞাব মূল্য বিচাবেব প্রশ্ন ওঠে না। আমাদেব দেশে প্রগতিব উপব ববীন্দ্রনাথেব প্রভাব নির্ণয় কবতে হলে তাই আজ এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গিব সঙ্গে পবিচয থাকা অত্যাবশ্যক। ভুল বোঝাব সম্ভাবনা যাতে কমে আসে সেইজন্য প্রথমেই এইভাবে অগ্রগতিব সংজ্ঞা নির্দেশ কবা লেখকেব প্রযো-জনীয মনে হয়েছে। ববীন্দ্রনাথেব শিল্পসৃষ্টিব উৎকর্ষ এখানে প্রধান আলোচ্য নয়, দেখতে হবে দেশে গত অর্ধশতাব্দীব পরিবর্তনধাবা এবং আগামীকালেব উপব তাঁব প্রভাব কতখানি, এবং আমাব বিশ্বাস সেই দেখাতে সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গিব সাহায্য নেওযা অনিবায। শুধু ববীন্দ্র-প্রতিভাব বিশ্লেষণ এখানে উদ্দেশ্য নয়, কাবণ একথা বোঝা সহজ যে বিবাট প্রতিভাও যুগধর্মেব বিবোধী হতে পাবে।

আমাব সাম্যভাবাপন্ন বন্ধুদেব মধ্যে ববীন্দ্রনাথেব প্রভাব সম্বন্ধে মতভেদ দেখতে পাই। এতে আশ্চর্য হবাব কিছু নেই, কেন না সাম্যবাদেব প্রতিষ্ঠাতা ও প্রামাণিক আচার্যদেব লেখায় সাহিত্য বা শিল্পের বিচাবপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। দর্শন, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র এবং বাষ্ট্রনীতিই তাঁদের প্রধান আলোচ্যবস্তু ছিল। আজ তাই একদিকে শুনি রবীন্দ্রনাথ বঞ্চিতেব কবি ছিলেন, জনসাধারণ এমন কি প্রলেটেরিয়াটের সঙ্গে তাঁব নিগূঢ় যোগ ছিল। অন্যদিকে এ কথাও শুনেছি যে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়াধর্মী আভিজাত্যের প্রতীক, এমন কি শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রতিক্রিয়াপন্থী বললেও বিশেষ অন্যায় হয় না।

উপরোক্ত উভয় মতের মধ্যেই কিছু সত্য রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। সুতরাং সমস্যা এই যে আংশিক সত্যগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে শেষ সিদ্ধান্ত কি দাঁড়ায়। ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই লক্ষ্য করবেন যে এই পদ্ধতিই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের স্বরূপ। সাম্প্রতিক সাম্যভাবের প্রাণবস্তু যে মার্কসবাদ, বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত সে সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। এমন কি রাশিয়া-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও বিস্ময় অবধি তাঁকে সেদিকে টানতে পারে নি। কিন্তু এই সর্বস্বীকৃত সত্যটি আমাদের প্রশ্নের উত্তর নয়। সামাজিক যে স্তর থেকে মার্কসপন্থার উদ্ভব তার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত না হলেও কোনো চিন্তা বা কর্মধারা যে পরিবর্তন অথবা প্রগতির সহায় হতে পারে, এমন দৃষ্টান্ত আধুনিক ইতিহাসে বিরল নয়। মার্কস-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এটা একটা খুব বড় কথা। অতীতে প্রগতির রূপ নির্দেশের সময় এই সূত্রটি বিশেষ কার্যকরী হতে বাধ্য ; আর মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের অনেকখানিই সাম্প্রতিক ইতিবৃত্তের চাইতে অতীত কাহিনীরই পর্যায়ে পড়ে। সমসাময়িক ইতিহাসেও অবশ্য তাঁর স্থান রয়েছে, কিন্তু এখানে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অর্থাৎ সমগ্রদেশের রাষ্ট্র ও সমাজ-চিন্তা কোন স্তরে পৌছেছে তা স্মরণ রাখতে হবে। লেনিনের ভাষায় ডায়া-লেকটিক্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বহুমুখী বিচার। এর অভাবে অগ্রগতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা একদেশদর্শী হয়ে পড়বে। আলোচ্য প্রশ্নের এক কথায় কাটা-ছাঁটা উত্তর তাই অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে।

আমি নিজে মনে করি যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে প্রগতিবিরোধী ধারণার অসদ্ভাব নেই, কিন্তু ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে তাঁকে অগ্রগতির সহায়ক রূপেই স্বীকার করে নিতে হবে। কিছুদিন আগে যখন ভারতীয় সাম্যবাদীদল তাঁর উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিল তখন তার পিছনে সাময়িক উচ্ছ্বাস বা ভ্রান্ত যুক্তি ছিল বলে মনে হয় না। যে বিশ্লেষণের উপর আমার এই ব্যক্তিগত বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত, তার কিছু পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়াই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমেই মনে পড়ে যে প্রগতিবাদী মহলে রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচলিত হয়েছে। তাঁর মধ্যে Progressive মনোভাব আবিষ্কার করতে গিয়ে অনেকে বিশেষ কয়েকটি রচনার উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বহুকাল আগেকার 'এবার ফিরাও মোরে' ও অতি

আধুনিক 'আরোগ্যে'র দশ নম্বর কবিতার উল্লেখ চলে। প্রথম কবিতাটির গোড়ায় মূঢ় ম্লান জনগণের মুখে ভাষা দেবার সংকল্প আছে, কিন্তু তার পরিণতিতে যে বিশ্বাসের ছবি দেখতে পাই তার মধ্যে প্রধান কথা হচ্ছে অজানা বিশ্বপ্রিয়ায় প্রেমে ক্ষুদ্রতাকে বলিদান দেওয়া। তেমনি 'আরোগ্যে'র কবিতাটির সারমর্মও এক অতি পুরাতন সত্য—শত শত সাম্রাজ্য ওঠে, আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কিন্তু যারা কাজ করে সেই জনসাধারণ চিরকালের। মনে রাখতে হবে যে এই জাতীয় সমস্ত লেখা বাদ দিলেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মহত্ত্ব খর্ব হয় না, এমন কি তাঁর শ্রেষ্ঠ ও সার্থক রচনার মধ্যে গণ্য নাও হতে পারে। সকল মহা-কবির মতন রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও নানা কল্পনা মূর্তি পেয়েছে, তার মধ্যে বিশেষ কোনো একটি mood-এর দিকে অতি মনোযোগ সঙ্গত নয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গল্পে সাধারণ মানুষের প্রতি দরদের কথাও আসে। এখানেও আমরা শিল্পীর ঈপ্সিত অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাই মাত্র, প্রগতি বা যুগান্তরের কোনো কথা এখানে ওঠে না।* নিছক সামাজিক অত্যাচারে ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা রবীন্দ্রনাথের অনেক সাহিত্যরচনায় পাওয়া যায় বটে কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে এই প্রবন্ধে প্রগতির সাম্প্রতিক নির্দিষ্ট সংজ্ঞাটুকুই শুধু গ্রহণ করা হয়েছে। তাই আধুনিক অগ্রগতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো লেখার নিবিড় যোগ দাবি করা চলে না।

মুখ্যত কবি হয়েও অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কখনও নিজেকে সাহিত্য-রচনায় আবদ্ধ রাখেন নি। স্বদেশী যুগে, এবং তার আগে বা পরেও দেশের নানা আন্দোলন থেকে তিনি আপনাকে আর্টের খাতিরে বিচ্ছিন্ন রাখবার সাধনায় মগ্ন হতে পারেন নি। তাঁর মতন মহাকবির পক্ষে কর্মী হিসাবে নিজের মনের পূর্ণতা-সন্ধান নিশ্চয়ই বিস্ময়জনক। স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও

* শ্রীযুক্ত বসুধা চক্রবর্তী 'পরিচয়ে' লিখেছেন যে, তিনি রবীন্দ্ররচনায় শ্রমিকের স্বীকৃতি দেখতে পান নি। 'স্বীকৃতি' কথাটি এখানে নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ সমাজ-গঠনে শ্রমিকের দাবি স্বীকার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 'কেরানী রবীন্দ্রনাথ' পুস্তিকায় কিন্তু শ্রীযুক্ত অমল হোম বসুধাবাবুর লেখার তীব্র প্রতিবাদ করে দেখাতে চেয়েছেন যে রবীন্দ্রসাহিত্য সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের চিত্রে পরিপূর্ণ। পরবর্তী লাইনেই বসুধাবাবু লিখেছেন—'দেখলুম শুধু উদার অনুকম্পা।' এই সহানুভূতি ও স্বীকৃতির মধ্যে পার্থক্যটুকু অমলবাবু বুঝতে চান নি।

সমাজচিন্তা একটা বিশেষস্থান অধিকার করে রয়েছে। তাঁর তখনকার লেখা রাষ্ট্রিক প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলির দৃপ্ত তেজ ও সরল ভঙ্গি বরাবরই পাঠকের মন মুগ্ধ করবে। কিন্তু দেশবাসীর হৃদয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তা বিশেষ ছাপ রেখে যায় নি, কাজেই বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও ঐতিহাসিক সার্থকতা লাভের দাবি এক্ষেত্রে বোধ হয় অসঙ্গত। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় মতামতের অনেকখানি প্রগতিবাদীদের তৃপ্তি দিতে পারে না, এ কথা স্বীকার করাও নিশ্চয় দোষের নয়।

……রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রিক চিন্তা ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ থাকে নি, সারা জগতের সমস্যা তাঁকে পীড়া দেওয়ায় এক বিশিষ্ট বিশ্বদর্শন তাঁর নানা লেখায় মূর্তি গ্রহণ করেছিল। পশ্চিমের ভাষায় উদার হিউম্যানিস্ট হিসাবে তাঁর পরিচয় সর্বজনবিদিত। কিন্তু আজকের দিনের প্রগতিবাদে হিউম্যানিজম মূল্যবান হলেও যথেষ্ট নয়। পাশ্চাত্য ন্যাশানালিজমকে দেশাত্মবোধ থেকে পৃথক গণ্য করে রবীন্দ্রনাথ তার তীব্র নিন্দা করেছিলেন, সেই উগ্র জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষে সঞ্চারিত হওয়া তাঁর বাঞ্ছনীয় মনে হয় নি। কিন্তু ন্যাশানালিজমকে বিকৃতি বা ব্যাধি আখ্যা দিলেই সমস্যা সমাধান হয় না, কেননা যুগ বা অবস্থাবিশেষে এই জাতীয়তাবোধ লোকের কাছে স্বাভাবিক বলেই গণ্য হয়, আমাদের দেশেও গত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। ন্যাশানালিজমের পরিণতি ইম্পিরিয়ালিজমে, সেই সাম্রাজ্যবাদের বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ তার মূলে খুঁজেছেন লোভের মধ্যে। কিন্তু মানুষের এক সনাতনী প্রবৃত্তি হঠাৎ এ যুগে এত প্রবল হয়ে উঠল কেন, এ প্রশ্নকে তিনি আমল দেন নি। সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিস্থলে তিনি আর্থিক এ সামাজিক ব্যবস্থার অভিব্যক্তিকে গ্রাহ্য না করে রিপুর তাড়নার উপর জোর দিয়েছিলেন—প্রতিকারের আলোচনায় তাই তাঁকে চিত্তশুদ্ধির উপদেশ দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মনুষ্যধর্মে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের কোনো কর্মপ্রণালী, প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাযন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঠিকই লিখেছিলেন যে কল্পনান্তের বিক্ষোভ পর্যন্ত তাঁকে সংস্কারমুক্তির যথেষ্ট প্রেরণা যোগায় নি। জীবনের উপান্তে এসেও তাই "কালান্তর," "সভ্যতার সংকট" প্রভৃতি বিখ্যাত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর স্বভাবজাত মানবধর্মে বিশ্বাসেরই পরিচয় দিয়েছেন। এই বিশ্বাস প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক পৃথক। পূর্বদিগন্তে পরিত্রাণকর্তা মহামানবের সম্ভাবনাকে অবশ্য কবির আন্তরিক আবেগ হিসাবেই গণ্য করা উচিত। কিন্তু বাস্তব জীবনে রুশদেশে

নূতন সমাজের জন্মকে যখন তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তখনও, কেন এই পরিবর্তন সম্ভব হল, এর মূল প্রেরণা কোথায়, সে সমস্যাকে তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক বিশ্বাসকেও প্রগতির অনুকূল বলা চলে না। এখানে শুধু মেটিরিয়ালিজম্‌-বিরোধী আদর্শবাদই বড় কথা নয়, পার্সোনালিটিই রবীন্দ্র-দর্শনের মূলবস্তু। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ সাধনা শুধু কবির জীবনাদর্শ ছিল না, religion of man-রূপে এই সাধনাকে তিনি ধর্মের উৎস ভাবে দেখেছিলেন। ব্যক্তিত্বের বিকাশ সভ্যতার মর্মকথা, আধুনিক যান্ত্রিকতা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, অথচ সেই যন্ত্রবিলাসিতার আড়ালে রয়েছে পুঞ্জীভূত অবসাদ আর গ্লানি—"রক্তকরবী" রূপকের বিষয়টি স্তবত এই। কবি পার্সোনালিটির অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির বন্দনা করেছেন, কিন্তু সে ব্যক্তিত্বের সাধনা এখন অল্পলোকের পক্ষেই সম্ভব, কাজেই তাতে সমাজের সমস্যা মিটতে পারে কিনা সন্দেহ থেকে যায়। সমষ্টির পক্ষে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ আনতে হলে প্রথমে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে; সেক্ষেত্রে কাজেই আবার সেই মূল ভাবনা সামনে এসে উপস্থিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেকগুলি মতামতের সঙ্গে প্রগতিবাদীদের পার্থক্য উপরে একটু ব্যাপকভাবেই আলোচিত হল। কিন্তু তবুও আমাদের অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস যে দেশের অগ্রগতির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ ছিল এবং ভবিষ্যতের উপর তাঁর প্রভাব অসামান্য বলেই গণ্য হবে। বিশিষ্ট কতকগুলি মতের চাইতে রবীন্দ্রনাথ অনেক বড় ছিলেন। মহাকবি এবং মহৎ শিল্পী তাঁর প্রকৃত পরিচয় বলেই তাঁর স্বকীয় রাষ্ট্রিক, সামাজিক বা দার্শনিক বিশ্বাসের মধ্যে তাঁকে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। বাংলার জীবনে তাই মনে হয় তিনি মুক্তির সহায়ক রূপেই স্মরণীয় থাকবেন। তাঁর কয়েকটি বিশ্বাসের সম্বন্ধে মনে যে সংশয় ও তর্কের উৎপত্তি হয়, শেষ পর্যন্ত তার প্রয়োগ চলে সেই ভক্তদের বিরুদ্ধেই যারা রবীন্দ্রনাথের এই মতামত আঁকড়ে ধরে থাকবেন।

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মত সমষ্টির কতগুলি অপরের মধ্যে কতখানি সঞ্চারিত হয়েছে, সে বিষয়ে প্রবল সন্দেহ অযৌক্তিক নয়। পক্ষান্তরে অন্য অনেকদিকে তাঁর প্রভাব অবিসংবাদী সত্য। সেই প্রভাবই ভবিষ্যতে অধিকতর কার্যকরী হবার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে তার শুধু আংশিক পরিচয় দিলেই যথেষ্ট হবে।

প্রথমেই তাঁর সাহিত্য ও শিল্প-সাধনার কথা মনে আসে। ভাষা, আঙ্গিক ও সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের কীর্তি সম্বন্ধে আজ মতভেদ অসম্ভব। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান উৎস তিনি—পৃথিবীতে অনুরূপ অন্য কোনো সাহিত্যে একজনের সৃষ্টি এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, তাঁর সৃজন-প্রতিভা সর্বতোমুখী। প্রাক-রাবীন্দ্রিক বাংলা সাহিত্য তাই আজ আর বাঙালীকে তৃপ্তি দেয় না, ভবিষ্যতেও দিতে পারবে না। আগামী কালে বাঙালীর আশা-ভরসা প্রকাশ পাবে যে ভাষাতে, সে ভাষাই তো তাঁর হাতের গড়া। আঙ্গিকের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের সাফল্য অতুলনীয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাঁর লেখায় বাঙলা ছন্দের রাজ্যে বিপ্লব-সাধনের উল্লেখ অপরিহার্য। ইন্দিরা দেবী লিখেছিলেন যে, তিনি যোগ্য কথার সঙ্গে সুরের মিলন ঘটিয়ে একটি বিশেষ আনন্দরসের সৃষ্টি করেছেন; নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টির রাজ্যে রবীন্দ্রনাথের এই দানও অবিস্মরণীয়। বিশেষজ্ঞদের মতে তাঁর সাম্প্রতিক চিত্রকলাও ভারতশিল্পের একদিককার দৈন্য ঘোচাতে সহায় হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করলে আজকের দিনের বাংলা সংস্কৃতির শুধু অঙ্গহানি হয় না, প্রাণ পর্যন্ত বাদ পড়ে।

অবশ্য এসব তো সর্বস্বীকৃত, কিন্তু বাংলা কাল্‌চারের সঙ্গে প্রগতির সংস্রব কতটুকু? অনেকের বিশ্বাস ভবিষ্যতের সংস্কৃতি পুরনোকে একেবারে বাদ দিয়ে গড়ে উঠবে। এ বিশ্বাস ডায়ালেকটিকাল্ অগ্রগতির রূপের সঙ্গে খাপ খায় না। ডায়ালেকটিকসে ক্রমবিকাশ সরলরেখা ধরে অগ্রসরণ হিসাবে কল্পিত হয় না বটে, কিন্তু ক্রমোন্নতির পথে পূর্বগামী লাইনের সম্পূর্ণ লুপ্তিও এখানে স্বীকৃত হয় নি। পুরাতন সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটবে, তাকে নতুনভাবে দেখবার চোখ খুলে যাবে, অনেক প্রাচীন আর্বজনা লোপ পেতে পারে, আর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সাহিত্য ও শিল্প-সৃষ্টির নতুন সম্ভাবনা পথ খুঁজে পাবে। কিন্তু শ্রেণীবিহীন সমাজের সংস্কৃতিতে বুর্জোয়া কালচারের সমস্ত কীর্তির উচ্ছেদ হবে, এ বিশ্বাসের ডায়ালেক্‌টিকাল্ সমর্থন কোথায়? সোভিয়েট রাশিয়ার অভিজ্ঞতাও উক্ত বিশ্বাসের ঠিক বিপরীত। সেখানে একদিকে প্রাক্-বুর্জোয়া লোকসংস্কৃতির, অন্যদিকে শেকস্‌পীয়ার থেকে রুশ সাহিত্যস্রষ্টাদের সকলেরই, অর্থাৎ কাল্‌চারের প্রধান প্রতিনিধিদের, যোগ্য সমাদরের অভাব হয় নি।*

---

* 'আশার কথা' নিবন্ধিকায় শ্রীযুক্ত লীলাময় রায় উদ্বিগ্ন হয়েছেন এই ভেবে যে টল্‌স্টয়ের ধর্মপ্রবণ রচনাগুলির প্রচার সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হল কি করে।

বুর্জোয়া-সংস্কৃতির আলোচনায় দুটি বড় কথা আছে। প্রথমত, যুগান্তরের মুখে এর মধ্যে একটা স্বভাবজাত ভয় ফুটে বের হয় ভবিষ্যতদের সম্বন্ধে। ফলে স্থবিরত্ব এর উৎস রুদ্ধ করে ফেলে, সমস্ত সংস্কৃতি হয়ে পড়ে পঙ্গু ও বিপন্ন। বুর্জোয়া প্রতিবেশ রবীন্দ্রপ্রতিভাকে খর্ব করেছিল কি না এ-আলোচনা আমার পক্ষে অনধিকার-চর্চা। কিন্তু আমাদের অনেকের বিশ্বাস যে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাচীন নানা সংস্কার তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকলেও পরিবর্তন সম্বন্ধে তিনি নির্ভীক ছিলেন। 'রাশিয়ার চিঠি'-র তৃতীয় সংখ্যায় সেই বিখ্যাত 'ভয় কিসের' তাঁর অন্তরের কথা, এবং সে বাণী তাঁর দেশবাসীর কানে বাজা উচিত। দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়া-সংস্কৃতি স্বভাবতই ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ম্যাক্সিম গোর্কির শ্রাদ্ধবাসরে আঁদ্রে জীদ বলেছিলেন যে আজকের দিনের সংস্কৃতি ছোট উদ্যানের মতন, সেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। শ্রেণীবিহীন সমাজ গড়ে উঠলে সে প্রাচীর অবশ্য ভেঙে যাবে। আমাদের দেশে তখন রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্যাদা নিশ্চয় বাড়বে বই কমবে না। কারণ ভাষা, আঙ্গিক ও সৌন্দর্যবোধের রাজ্যে তাঁর কীর্তি অনবদ্য। ভবিষ্যতের বাঙলা কালচার তাঁকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠতে পারে। ভবিষ্যৎ সমাজে পুরাতন সংস্কৃতি পুরনো বলেই পরিত্যক্ত হবে না, তাকে নতুন করে উপলব্ধি করবার চেষ্টায় সমৃদ্ধি বাড়বারই সম্ভাবনা। অথচ বলা চলে না যে সকল রচনাই কালোত্তীর্ণ হয়। তা হলে এস্‌থেটিক্স বা নন্দনতত্বই কি শেষ পর্যন্ত ঠিক করবে কোনটা টিকবে আর কতখানি লোপ পাবে ? কতকটা তাই বটে, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে এসথেটিক্স বা সাহিত্যের মূল্যবিচার কোনো স্থির যান্ত্রিক অচলাবিদ্যা নয়। তারও বিবর্তন আছে, এবং যুগে যুগে নূতন standard-এর উদ্ভাবন হয়; অর্থাৎ দেখবার ভঙ্গিটাই নির্ভর করে অনেকখানি সামাজিক পারিপার্শ্বিকের উপর। সুতরাং

প্রাচীন লেখকদের নিয়তি, সমাজধর্ম ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা বিশ্বাস আগেকার পাঠকদের মন নিশ্চয় অভিভূত করত; স্বতন্ত্র পরিবেশে বাস করি বলে আমাদের আর সে সব ধারণা সেভাবে স্পর্শ করে না, অথচ প্রাচীন সাহিত্যের সৌন্দর্যরসে আমরা বঞ্চিত নই। রুশদেশে বিশাল পরিবর্তনের পর টল্‌স্টয়ের বিশিষ্ট...... মতামতে বিশ্বাসী না হয়েও পাঠকদের পক্ষে তাঁর সাহিত্যসম্ভোগ (?) হবে বোঝা শক্ত।...লীলাময়বাবুর বোধ হয় পারিপার্শ্বিকে পরিবর্তনের ফলে বিন্দুমাত্র আস্থা নেই।

বুর্জোয়া-সংস্কৃতির ঠিক কতখানি ভবিষ্যতে গ্রাহ্য হবে, একথা কেউ জোর করে বলতে পারে না। কিন্তু ভাষা, আঙ্গিক ও সৌন্দর্যবোধে রবীন্দ্রনাথের মহত্ব এত বেশি যে যতদূর পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি যায় তাতে মনে হয় না যে তাঁকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যৎ বাঙলার পরিশীলন-সম্পদ গড়ে উঠতে পারবে।

Others abide our question. Thou art free.

অগ্রগতির উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব শুধু সাহিত্য ও শিল্পকলাতে আবদ্ধ নয়। কথাটা আশ্চর্য শোনালেও মনে হয় রবীন্দ্রনাথের ধর্মের মধ্যেও সে গতির সমর্থন পাওয়া যাবে। আধুনিক ইতিহাসে ধর্মব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় সেই সংঘবদ্ধ ধর্মাচার (Organised religion) নিশ্চয়ই প্রগতির বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনায় ধর্মবিশ্বাস অনেকখানি কবিত্বময় আবেগে রূপান্তরিত হওয়ায় সে বিরোধ বড় হয়ে ওঠে নি। সমাজের দিক থেকে দেখতে গেলে তাই মনে হয় যে ধর্মের প্রচলিত ঐতিহাসিক রূপের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের মনোভাব অনেকখানি অগ্রগমনের পরিচায়ক, যদিও দার্শনিক আইডিয়ালিজম, আত্মার অস্তিত্ব ও ভগবানের ব্যক্তিত্বে একটা মজ্জাগত বিশ্বাস নিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল। প্রগতিবাদীর চোখে এসব সত্ত্বেও তার অগ্রসরণ মহত্বের এক বিশিষ্ট নিদর্শন। ধর্মের যে সংগঠিত রূপ সামাজিক রক্ষণশীলতার অঙ্গ, তাতে তিনি বরাবর পীড়া অনুভব করেছিলেন। ধর্মপ্রতিষ্ঠানে তাঁর বিশ্বাস ছিল না, সম্প্রদায় তাঁকে টানতে পারে নি, সুনির্দিষ্ট মতবাদ অর্থাৎ ক্রীডকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন না, এমন কি আচারবিধির প্রতিও তাঁর বিশেষ আস্থা দেখা যায় নি ; অথচ ধর্ম-মাত্রেই এর কোনো না কোনোটিকে আশ্রয় করে। ইতিহাসে পুরাতন ধর্ম-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবশ্য বার বার বিদ্রোহ দেখা গেছে, কিন্তু স্বভাবতই সে বিদ্রোহ নতুন কোনো ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সে পর্যায়ে পড়ে না—তার প্রকৃতি প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে ধর্মের পুনর্গঠনের অভিযান নয়। রামমোহন রায় হয়ত পৃথক সম্প্রদায় স্থাপন করতে চান নি, তবুও ব্রাহ্মসমাজ তাঁর আন্দোলনের স্বাভাবিক পরিণতি। রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে পুরাতন প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায়, মতবাদ ও আচারবিধির গণ্ডি ছাড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কোনো নূতন ধর্মের উৎসরূপে কল্পনা করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে মিস্টিসিজম-এর একটা ধারা নিশ্চয়ই ছিল, মিস্টিকের চাইতে হিউম্যানিটিই কি তাঁর সত্যতর পরিচয় নয়? ইতিহাসে দেখি হিউম্যানিজম্ পুরনো ধর্মের

অবসান স্থচনা করেও সাধারণত ধর্মের পুনরুত্থানের প্রেরণা যোগায় না। সংগঠিত ধর্মের ক্ষয়প্রাপ্তি, তার withering away অগ্রগতির কাম্য বলে, পরিবর্তনধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এদিক দিয়েও একটা নিগূঢ় যোগ আছে মনে হয়। অনেকে বলবেন রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ব্যক্তিগত, কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়; আসলে শিল্পীর আন্তরিক আবেগ ও সৌন্দর্য উপলব্ধিই তাঁর প্রাণ ছিল। সমাজসংশ্লিষ্ট ধর্মবোধ আর চরম সত্যে আশ্রয়ের চাইতে রূপকার ও কবি-মানসের অনুভূতিই এখানে অনেক বড় হয়ে উঠেছে। উপনিষদ তাঁকে বরাবর তৃপ্তি দিয়েছে, কিন্তু উপনিষদের অসাধারণ সৌন্দর্য তো সর্বজনবিদিত; তার দার্শনিক বিশ্বাস ও মূল তত্ত্বকথার চাইতে এ দিকটাই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করত। সকলে কখনোই এখানে একমত হবেন না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধর্মের মূল প্রকৃতি ভেবে দেখার কথা। ধর্ম-সঙ্গীত ও ধর্ম-সংক্রান্ত সব রচনায় তিনি বার বার যে মূল স্থর ধ্বনিত করেছেন, আমি মনে করি যে organised religion এমন কি সাধারণ personal religion থেকে তা স্বতন্ত্র। সেইজন্য সম্প্রতি কেউ কেউ যে তাঁর মধ্যে secular ভাবের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেছেন, সেটা সম্পূর্ণ বোধগম্য। এই বন্ধনমুক্তি ও ধর্মভাবের রূপান্তরকে অগ্রগতির সহায়করূপে মানা উচিত।

স্থদীর্ঘ কর্মজীবনেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসীকে এমন অনেক কিছু শেখাতে চেয়েছিলেন যার স্মৃতি সহজে ম্লান হবে না, সে সব দিকেও তাঁর শক্তি জাতীয় জীবনে বিশাল পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করেছে। রাষ্ট্রিক আন্দোলনে প্রথম থেকে ভিক্ষাবৃত্তির তিনি তীব্র সমালোচনা করেছিলেন; যে-আত্মশক্তির উদ্বোধন তাঁর অবিচল লক্ষ্য ছিল, পলিটিক্সে তার মূল্য অসীম। সে কালের পলিটিক্যাল প্রচেষ্টার প্রধান দুর্বলতা তিনি ধরতে পেরেছিলেন—জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যথার্থ সংযোগের অভাব তাঁকে ক্রমাগত পীড়া দিত। বয়কটের উন্মাদনার মধ্যেও তাই তিনি 'সদুপায়' প্রবন্ধে লিখেছেন যে, স্বদেশী কর্মীরা সাধারণলোকের সঙ্গে আত্মীয়তা না করেও আত্মীয়তার দাবী আনছে। চাষীদের অর্থকষ্ট যে দেশের এক গুরুতর সমস্যা, একথা তিনি কখনও ভোলেন নি; গ্রাম-সংস্কারের উত্তম তাই তাঁকে টেনেছিল প্রথম থেকেই। বাঙলাদেশে মেলার মধ্য দিয়ে সহজে কিভাবে জনসাধারণের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়, 'স্বদেশী সমাজ'-এ কর্মীদের প্রতি তাঁর সেই উপদেশে বুঝতে পারি যে প্রাকৃটিক্যাল ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের

একটি অন্তর্দৃষ্টি ছিল। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কিছু যে শিক্ষার প্রকৃত বাহন হতে পারে না, পঞ্চাশ বছর আগে তিনি একথা সজোরে প্রচার করে গেছেন। একদিকে হিন্দুর সর্বাঙ্গীণ শ্রেষ্ঠত্ববাদকে তিনি বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছিলেন, অন্যদিকে পশ্চিমের গুণমুগ্ধ হয়েও তিনি তার রাষ্ট্রসর্বস্ব চিত্তবৃত্তির তীব্র নিন্দা করেছিলেন ; সেই ঝোঁকই অবশ্য পরবর্তী ফ্যাশিজমের অন্যতম উপাদান।

রবীন্দ্রনাথে প্রগতির সমর্থক অন্য একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেই প্রবন্ধ শেষ করব। তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তি তাঁর রচনায় বারবার গতির বন্দনারূপে প্রকাশ পেয়েছে। মনে হাওয়া অসঙ্গত নয় যে পরিবর্তনের প্রবহমান স্রোতে তাঁর অন্তর সর্বদাই একটা সাড়া দিত। ভবিষ্যৎ সমাজের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি তাঁর মধ্যে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাঁর মন ছিল গতিশীল, আর পথের সীমানির্দেশ ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। মনের অসাধারণ সৌকুমার্য আর শিক্ষায় প্রাচীন সংস্কারের বোঝা নিয়েও রাশিয়ার প্রচণ্ড ভাঙ্গাগড়ার আবর্তের মধ্যে গিয়ে পড়ে মুগ্ধ হবার মতন মনের বলিষ্ঠতা ও ঔদার্য তিনি দেখিয়েছিলেন। ভয়শূন্য চিত্তের আদর্শ সহজে ভোলবার নয় ; বলা যেতে পারে যে শুধু লেখায় নয়, কাজেও তিনি সে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি। গণজাগরণের বিরোধীরূপে তাঁকে কল্পনা করা শক্ত। সেদিকে ভারতের রাষ্ট্রনেতা মহাত্মা গান্ধীর চাইতে তাঁকে অনেক অগ্রসর মনে হয়। বার্ধক্যের ছায়ায় এসে পশ্চাদ্‌গমন সাধারণ নিয়মের সামিল— রবীন্দ্রনাথের বেলায় দেখি তার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। অগ্রগতির টান শেষের দিকে প্রবলতর হয়ে উঠছিলই বলে মনে হয়। যে সভ্যতাকে তিনি মন থেকে বিশ্বাস করেছিলেন জীবনের প্রান্তে এসে 'সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল'-- এই স্বীকারোক্তি অবিস্মরণীয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের শেষপর্যায়ের সাহিত্যিক মূল্য হয়ত বেশি না, কিন্তু তার মধ্যে একটা অতৃপ্তি ও সংযোগের আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, অন্তত তাই নিয়ে তাঁর মনে দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের উদয় হয়েছিল। জগৎজোড়া দুঃখীর মিলন সম্বন্ধে কোরীয় যুবকের আস্থার যে কথা তিনি একদিন শুনেছিলেন, তার ঝঙ্কারও তিনি ভুলতে পারলেন না।

মিউনিসিপ্যাল গেজেটে ভ্যানগার্ডের লেখা প্রবন্ধে পড়লাম এক বামপন্থী স্পানিশ যোদ্ধা প্রশ্ন করছেন, টেগোর কি সেই জাতীয় লোক যাঁরা সাক্ষাৎভাবে নূতন সমাজ গড়ে তোলবার দায়িত্ব নিতে না পারলেও আগামীকালকে বুঝবার ও অভিনন্দন করবার মতো মনের জোর ও স্বাধীনতা রাখেন? নাৎসি

অভ্যুত্থানের পর রলাঁ যেমন লিখেছিলেন—"Working men, here, are our hands We are yours. Humanity is in danger"—জানি না রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তেমন কথা বলা সম্ভব ছিল কিনা। কিন্তু অশেষ সংস্কারের বেড়াজালের মধ্যে থেকেও চিরজীবন যিনি নতুন নতুন পথে এগিয়ে চলবার তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন, মনে হয় তাঁকে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক হিসাবে ভাববার যথেষ্ট হেতু আছে।*

*পরিচয়, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮। প্রবন্ধটি ১৩৬৩ সালে 'পরিচয়'-এর জয়ন্তী সংকলনে পুনর্মুদ্রিত হয়। উক্ত জয়ন্তী সংকলনের মুদ্রিত পাঠ (পৃ, ২৩৯-৪৯দ্রষ্টব্য) এখানে প্রকাশ করা হল। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক

বাঙলা নাট্যকলার নূতন সূচনা / রঙ্গীন হালদার

বাঙলা নাট্যকলার উপর আমাদের অনেকের দরদ আছে। কিন্তু তা নিয়ে গৌরব করবার মতো নিদর্শন আমাদের বেশি নেই। এর কারণ অনেক, তা আমরা বুঝি। যে-সব সামাজিক-রাষ্ট্রিক কারণে নাট্যকলা স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে, আমাদের ভাগ্যে সে-সব কারণ জোটে নি। আবার, এককালে আমাদের দেশে নাট্যকলার যে বিশেষ রূপটি প্রকাশলাভ করেছিল তার ঐতিহ্য বেঁচে নেই। বাঙলা "যাত্রা"ও মরতে বসেছে, থিয়েটারী ঢং গ্রহণ করে তা কোনো রকমে তবু টিকে থাকতে চায়। অথচ বাঙলা থিয়েটারও খুব শক্তিশালী জিনিস নয়—যদিও সমস্ত ভারতবর্ষে নাকি আমাদের 'সাধারণ রঙ্গমঞ্চই' প্রধান সাধারণ রঙ্গমঞ্চ।

বাঙলা রঙ্গমঞ্চ বা বাঙলার নাট্যকলার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবার দরকার এখানে নেই। বাঙলার নূতন সাহিত্যের মতো বাঙলার নাট্যকলারও নূতন প্রেরণা আসে পাশ্চাত্য সাহিত্যের ও জীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ে। শেক্‌স্‌পীয়র পড়ে যে বাঙালী মেতে যায়, তারা নাট্যকলা সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে থাকলেই, আশ্চর্য হবার কথা হতো। কাজেই নাট্যকলা সৃষ্টির প্রয়াসও প্রথম থেকেই আমরা করেছি। কিন্তু নাট্যকলা বড় বেশি রকম সামাজিক শিল্প—সাহিত্যের মতো তা ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, নাট্যকলা সম্মিলিত সৃষ্টি। তাকে এজন্য সমন্বিত শিল্প বলা যায়। নাট্যসাহিত্য, অভিনয়কলা ও প্রযোজন-শিল্প, অন্তত এই তিন কলার সমন্বয় তাতে চাই। আর চাই সঙ্গে সঙ্গে দর্শকেরও সহযোগিতা। এ যুগে বাজারের 'ভাও' বুঝে এসব কলাকেও কাটতে ছাঁটতে হয়। দর্শক-সমাজের রুচির উপর তাই নাট্যকলারও রূপ নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে আর্থিক কারণেও তাই নাট্যকলা আবার জড়িত। মোটের উপর, এত বেশি পরিমাণে 'সামাজিক জিনিস' বলেই আমাদের পক্ষে নাট্যকলা সৃষ্টি সহজ হয় নি। আর তা না হলে নাট্যসাহিত্যও ঠিক লেখা হয় না—প্রত্যেক কলাই তো অন্য কলার সঙ্গে জড়িত। তথাপি, বাঙলাদেশে 'সাধারণ

রঙ্গমঞ্চ' চলছে; তার বাইরেও সৌখীন নাট্য-পরিষদ অনেক রয়েছে। আর দু'ক্ষেত্রেই গুণীর অভাব হয় নি। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বাইরেও বহু স্মরণীয় নাম রয়েছে। বাঙলার নাট্যকলা জন্মেছিল তাঁদেরই চেষ্টায় বেলগাছিয়ার বাগানে; ঠাকুরবাড়ি আর শেষ দিকে শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী তাতে নূতন প্রেরণা জুগিয়েছে; আর শত শত ছোট বড় সৌখীন অভিনয় ক্ষেত্রে, পাড়ার বখাটে ছোকরারা, গ্রামের বাবুরা, কলেজের ছাত্ররা তাকে পরিপুষ্ট করেছে।

আমাদেরই জীবনে আমরা বাঙলা নাট্যকলার তবু তিনটা যুগ দেখেছি, আজ তা স্মরণ করতে পারি। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তখনো গিরীশবাবুর শেষ যুগ, অমৃতলাল বসু, দানীবাবুর যুগ চলেছে। যে স্তরের অভিনেতা, অভিনেত্রী নিয়ে তাঁরা কাজ চালাতেন, তাঁদের দর্শকসমাজও ছিল যে-স্তরের, তাতে তাঁদের শক্তিকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। রঙ্গালয়ে রঙ্গলোভী, আমোদপ্রিয় 'দর্শকেরা তখনকার অভিনয় দেখত, শিক্ষিত রুচি প্রায়ই তাতে তৃপ্ত হতো না। কিন্তু বাঙলা নাট্যকলার ইতিহাসে এক নূতন ঘটনা 'ফাল্গুনী'র প্রথম অভিনয়, 'ডাকঘরে'র অভিনয়। তার নাট্যকথা, তার অভিনয়কলা, বিশেষত তার মঞ্চসজ্জা—সূক্ষ্ম সৌন্দর্য পিপাসাকে তখন পরিতৃপ্ত করেছিল। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ততো সূক্ষ্ম জিনিস গ্রহণও করতে পারত না, পরিবেশনও করতে পারত না। রবীন্দ্র-অনুপ্রাণিত নাট্যকলা সাধারণের জিনিস হলো না। তবে অসাধারণের রসবোধকে তা জাগ্রত করে; আর তাতেই আবার শিক্ষিত সাধারণের রসবোধকে উন্নত করে। সেই শিক্ষিত সাধারণের স্তরে—খাঁটি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মধ্যে—তৃতীয় যুগে নেমে এসে দাঁড়ালেন শিশিরকুমার আর তাঁর সুযোগ্য সহকর্মীরা। তিনি এই মধ্যস্তরে সূচনা করলেন নাট্যকলায় মধ্যবিত্তের যুগ। সেদিন মনে হয়েছিল বাঙলায় সত্যিই বুঝি নাট্যকলায় নবজন্ম হবে—বাঙলা নাট্যকলার এবার সত্যকারের আবির্ভাব দেখতে পাব।

তা হলো না। কারণ অনেক ছিল। ছোট বড় কারণ হিসাব করে লাভ নেই। মূলের কারণটিই আজ স্পষ্ট। বাঙলার মধ্যবিত্ত কাল্‌চারের সঙ্কটকাল তখন এসে গেছে। বরাবরই তার গোড়ায় মাটি ছিল কম। তার প্রেরণা বেশিটাই আমাদের মনোভূমি থেকে নেওয়া;—আর সে মনোভূমি তৈরী হয়েছিল পাশ্চাত্য জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কে, সঙ্ঘাতে। বাঙলায় সেই প্রেরণাতে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সাহিত্য মোটামুটি একজনেই সৃষ্টি করে,

শিক্ষিত লোকেরা পড়ে। নাট্যকলা কিন্তু দশজনের জিনিস, তার সৃষ্টি হয় কলা-সমন্বয়ে; আর তার সার্থকতা আবার এক বড় দর্শক-সমাজের গ্রহণ শক্তির উপর নির্ভর করে। এই কারণেই বরাবর আমাদের নাট্যকলা দুর্বল ছিল। শুধু মধ্যবিত্তের আসরও নাট্যকলা-সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত আসর নয়। তাতেও আবার শিশিরকুমার যখন এলেন তখন সেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে ভাঙন ধরেছে—বাঙলার মধ্যবিত্তদের তখন নিজের শক্তিতেও আস্থা নেই। আর ইয়োরোপের যে জীবন ও সৃষ্টিক্ষেত্র থেকে তারা প্রেরণা আহরণ করত, ইয়োরোপের সেই জীবন ও সৃষ্টিক্ষেত্রেও তখন ভাঙন ধরছে। শিশিরকুমারের 'মধ্যবিত্ত' বাঙলা নাট্যকলা সৃষ্টির চেষ্টা—শিক্ষিত ভদ্র বাঙালীর জন্য সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা—খানিকটার বেশি তাই সার্থক হতে পারল না। কারণ, নাট্যকলা অমন একটা সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে সবল ও স্বাভাবিক শ্রী লাভ করতে পারে না—বিশেষত যখন তার আসল সামাজিক পরিবেশ আগেকার মতোই রয়েছে প্রতিকূল, তার সঙ্কীর্ণ আসরেও ভাঙন ধরেছে, অন্যদিকে নূতন কালের সবাকচিত্র এসে তাকে সকল ক্ষেত্রেই কোণঠাসা করছে।

এই তিন যুগের পরে বাঙলা নাট্যকলা দেখে একটা কথায় আমরা বুঝেছিলাম—বাঙলা নাট্যকলা সাধারণ বাঙালীর সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না। অনেক দেশেই নাট্যকলার এ দশা ঘটছে। কারণ, অনেক দেশেই কলাবিদের সঙ্গে দেশের জনসাধারণের যোগাযোগ কমে আসছিল। বাঙলাদেশে এই বাঙলা নাট্যকলার ও বাঙালীর যোগাযোগ বরাবরই ছিল সামান্যতম। তাই দু'একটি নাটক ও দু'একটি অভিনয় ছাড়া সর্বত্রই ছিল একটা রোমান্টিক আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা। এমন কি, আমাদের সামাজিক নাট্য ও অভিনয়ও বাস্তব জীবনকে বড় স্বীকার করতে চাইত না।

কিন্তু একটা কথা, জনগণ এই নাট্যকলা চায় না—একথা বলাও হবে ভুল। গ্রামে-নগরে যারা সৌখীন দলের অভিনয় দেখেছেন, তাঁরাই জানেন জনগণ এসব নাটকের অভিনয় দেখতেও কত উৎসাহ পায়। হয়ত সাজ-পোশাক আলো-চমক, এসবই তাদের সরল মনে ভালো লাগে। কিন্তু তারা শুধু 'যাত্রা'ই চায়, 'ভাসান গান'ই বোঝে, 'কীর্তনে'ই আনন্দ পায়, একথা বললে ভুল করব। দেখছি সেসব পরিচিত বিষয়বস্তু ও পরিচিত শিল্পপদ্ধতি যতই পরিচিত হোক আজ তাদের সম্পূর্ণ তৃপ্ত করতে পারে না। কাল বদলেছে, তাদের রুচি ও

দৃষ্টিও জানা-না-জানায় বদলেছে ;—সিনেমা, গ্রামোফন কোম্পানি তা বুঝেই ব্যবসা করছে। কিন্তু জনগণেরও রস-পিপাসা আছে. সে রস-পিপাসা নতুন কিছু চায়। সেই জিনিসই আমরা দিতে পারছি না—এমন কিছু যার বিষয়বস্তু (content) তাদের কাছে নিতান্ত "পরের জিনিস" বলে মনে হবে না, এবং যার শিল্পপদ্ধতিও (form) অতিরিক্ত সূক্ষ্ম বলে তাদের কাছে ঠেকবে না।

"ভদ্র"-নাট্যের এই বানচাল অবস্থা থেকেই বোধ হয় গণনাট্যের প্রয়োজন আমরা সকলেই উপলব্ধি করেছিলাম। সেই গণনাট্য আন্দোলনের পুঁথি-পড়া বিদ্যা নিয়ে অপেক্ষাও করেছি। কৌতূহল ছিল, কৌতুকও বোধ করেছি, একটু বিদ্রূপের ভাবও মনে মনে পোষণ না করতাম তা নয়। তবু বাঙলা নাট্যকলার প্রতি দরদ ছিল। হঠাৎ এবার কলকাতায় বাঙলার 'গণনাট্য সঙ্ঘের' অভিনয় দেখে আমরা কেউ কেউ আশান্বিত হয়ে উঠেছি। মনে হলো, বাঙলা নাট্যকলার অন্তত একটা চতুর্থ যুগের সূচনা দেখছি।

এই সঙ্ঘ আর তার অভিনয়কলার নাম শুনেছিলাম। জানতাম এর আরম্ভ বড় এক বাস্তব রাজনৈতিক সঙ্কটের টানে। শুনেছিলাম এর প্রকাশ ঘটছে কঠিনতর এক বাস্তব সামাজিক সঙ্কটের টানে। পড়েছিলাম অনেক রসিক ও গুণীর এঁদের অভিনয়াদি সম্পর্কেও প্রশংসার কথা।

এদেশে গণনাট্য সঙ্ঘের উৎপত্তির ইতিহাস জানতাম। যাঁরা এর প্রথম প্রবর্তক তাঁরা জেনে-না-জেনে দুটা জিনিস বুঝেছিলেন—প্রথমত, নাট্যকলা কলা হিসাবেও জনমুখাপেক্ষী, জন-সংযোগ ছাড়া তার স্ফুরণ সম্ভব নয়; দ্বিতীয়ত, অন্যান্য কলার অপেক্ষাও নাট্যকলার সামাজিক প্রভাব বেশি—শুধু মাত্র 'বিশুদ্ধ' রসোপভোগের জিনিস তা নয়। কলকাতায় ১৯১০ সালে ইয়ুথ কালচারাল ইন্স্টিটিউট্ এই উপলব্ধি থেকে জন্মে। বোম্বাই-এ ১৯৪২ সালে পণ্ডিত জওহরলালের আশীর্বাদ নিয়ে জন্মে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। দু'এরই পিছনে ছিল রাজনৈতিক প্রেরণা, সামাজিক দায়িত্ববোধ আর শিল্পের প্রতি অনুরাগ। কিন্তু বাঙলার শিল্পীদের দৃষ্টি ছিল শিল্প সৃষ্টির দিকে, বাঙলার প্রগতিকামী মধ্যবিত্ত সমাজে তাঁদের একটা আসর ছিল তৈরী। বোম্বাই-এর শিল্পীরা বিলাতের Unity Theatre-এর কায়দায় শ্রমিকশ্রেণীর দিকে দৃষ্টি রাখেন, বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণী ছিল তাঁদের লক্ষ্যবস্তু। দুই প্রয়াস পরে সংগঠনের দিক থেকে একত্র হয় এবং ক্রমে শিল্পকলার দিক থেকেও তাদের

সংযোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙলার শিল্পীরা পল্লীগীতি, জনসংগীত, প্রভৃতিকে উদ্বোধন করতে অগ্রসর হয়। আর মন্বন্তর এলে তার সত্যকে আশ্রয় করে অভিনয়, নৃত্য প্রভৃতি পরিবেশন করে। সাহায্যের জন্য তাদের ডাক পড়ে পাঞ্জাবে, নূতন দর্শক-সমাজের জন্য নূতন-শেখা হিন্দুস্তানীতে তাঁরা অভিনয় করেন, আর, বাঙলার জন্য সাহায্য নিয়ে আসেন প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা। কিন্তু বড় কথা, তাঁদের অভিজ্ঞতার পরিধি এসূত্রে বাড়ে। সে পরিধি আরও বাড়ল যখন জামসেদপুর ছাড়িয়ে তাদের অভিনয়ের জন্য ডাক পড়ল বোম্বাই উপকূলে। নূতন করে তাঁদের শিল্পজ্ঞানকে পুষ্ট করতে হল, যাতে একই কালে সেখানকার গুণীসমাজ তৃপ্ত হয়, আবার শ্রমিকসমাজ অনুপ্রাণিত হয়। তাঁরা বাঙলার দুস্থদের জন্য সাহায্য পান দেড় লক্ষ টাকা। বোম্বাই-এর শিল্প-সমালোচকেরাও বুঝলেন গণনাট্য শিল্প হিসাবেও দাঁড়িয়েছে।

কলকাতায় অভিনয় দেখে আমাদের যা মনে হলো তা এই—বাঙলা নাট্যকলার একটা নূতন আরম্ভ দেখলাম। 'ফাল্গুনী' 'ডাকঘরে' যে সূক্ষ্ম শিল্প পরিবেশনের চেষ্টা হয়েছিল, তা নাট্যকলার মূল সত্যকেই যেন ভুলে যেতে চেয়েছিল। জনসমাজ সে রস গ্রহণ করতে পারে না। 'ফাল্গুনী'তে তাদের চেনা বাউলের মুখে তারা আধ-চেনা সুরের গান শুনছিল! কিন্তু তার কথাবস্তু ও তার অতি হেঁয়ালি কথাবার্তা তারা এক বর্ণও বুঝতে পারে না। বাউল আর সংগীতের কাঠামোতে রবীন্দ্রনাথ তার নাটককে জনতার চেনা 'যাত্রা'র রূপ খানিকটা দিচ্ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাউলও রবীন্দ্রনাথই। অসামান্য সে, অতি সূক্ষ্ম রসের রসিক। বুঝলাম, সে সূক্ষ্মতা সাধারণের জন্য নয়। সে সূক্ষ্ম মঞ্চসজ্জা—যা দেখে তখন বিমুগ্ধ হয়েছিলাম—বুঝলাম, তাও বড় বেশি অসাধারণ। সে নাট্যকলা জনগণকে দূরে সরিয়ে রাখে। এবার বুঝলাম, বাঙলা নাট্যকলা—সেই শিক্ষিত বাঙালীর নাট্যকলা 'শিশির-যুগও'—জনসমাজের পাশ কাটিয়ে যায়। শিশিরকুমারের 'মধুসূদন' দেখে সেদিনও বিমুগ্ধ হয়ে ফিরেছি। গণনাট্য সঙ্ঘের অভিনয় দেখে বুঝছি—কোথায় ছিল মধুসূদনের, শিশিরকুমারের ট্রাজিডি—বাঙালার সমস্ত "ভদ্র" নাট্যকলার ট্রাজিডি। ইয়োরোপীয় ধনিকতন্ত্রের যুগের নাট্যসাহিত্যও তার অভিনয়-কলা, তার প্রযোজন-বিদ্যাকেই সর্বস্ব করে আমরা এদেশে তখন গ্রহণ করেছিলাম। এদেশে মধুসূদন, শিশিরকুমার বা আমরা কেউ বাস্তবক্ষেত্রে

সেই ধনিকতন্ত্রের সুস্থ প্রকাশ দেখি নি। চারদিকে দেখলাম তার সাম্রাজ্যবাদী রূপ দৌরাত্ম্য, ঔপনিবেশিক উপদ্রব। পেলাম না বুর্জোয়ার সেই সমাজ, সেই নাট্য সাহিত্য, সেই নাট্যকলা, সেই প্রযোজনদক্ষতা। তাই মধুসূদনের প্রতিভা তার প্রকাণ্ড প্রকাশ সত্বেও ট্রাজিডি হয়, শিশিরকুমার তাঁর আশ্চর্য শক্তি ও একক সার্থকতা সত্ত্বেও ট্রাজিডি থাকেন। আমরা পথ পাই না-প্রকাশের, না-সার্থকতার। 'ভদ্র'নাট্যকলা তাই হয়ে ওঠে বিদ্রূপের বস্তু।

'গণনাট্য সঙ্ঘের' অভিনয়ে দেখলাম ত্রুটি অনেক, একটা সমন্বিত শিল্প এখনো গড়ে ওঠে নি। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে—সমস্ত জুড়ে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। একজন নায়ক বা একজন অভিনেতাকে কেন্দ্র করে আর নাটক ও নাট্যকলা আবর্তিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ থেকে শিশিরকুমার পর্যন্ত অতিরিক্ত রকমের ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Individualistic) অভিনয়কলার পরিচয় রেখে গেছেন। এবার এই প্রথম দেখলাম অভিনয়ে, সংগীতে, সমস্ত জুড়ে একটি ঐকরীতির প্রয়োগ। একজনই শুধু অভিনয় করেন আর সকলে হয় পার্শ্বচর ; এ যেন আমাদের দেখা অভ্যাস হয়ে উঠছিল। অথচ সমস্ত নাট্যকলার মূল সূত্রই তার বিরোধী। সে সূত্র দাবী করে সমন্বয়—সমগ্রের সম-বিকাশ। এবার গণনাট্য সঙ্ঘের অভিনয়ে এই নূতন নীতিরই প্রতিষ্ঠা দেখলাম। প্রযোজন-বিন্যাসেও টেকনিকের খুঁটিনাটি অপেক্ষা চেষ্টা দেখলাম সমস্তকে পরিপুষ্ট করবার। 'মহামারী নৃত্যে' নেপথ্যে সংগীত আর ক্রন্দন আর মঞ্চে আলো-আঁধারের সন্নিবেশ তার সুন্দর নিদর্শন। আর সঙ্গে সঙ্গে কি নাট্যকলায়, কি অভিনয়ে, কি মঞ্চসজ্জায় দেখলাম এক বাস্তবতা, জীবনমুখিতা। ফলে সমস্ত অভিনয়ে একটা অদ্ভুত সরলতার সঞ্চার হয়েছে—আগেকার যুগের চমক, চটক ও রোমান্সের স্থানে এসেছে সহজ বলিষ্ঠ জীবন। তার সেই অতিসূক্ষ্মতারই যেন একটা প্রতিবাদ জনতার বলিষ্ঠতা; স্বাভাবিকতার যেন একটা ইঙ্গিত তাদের এই সামগ্রিক ও বাস্তব অভিনয়কলার মধ্য দিয়ে দর্শককেও সচকিত ও সচেতন করে তোলে—বুঝি, বাঙলা নাট্যকলা বাঙালী-জীবনের কাছে এগিয়ে আসতে চাইছে।

তারই একটা প্রমাণ রয়েছে এই নাট্যকলার সমস্ত পরিকল্পনায়। ঘরে বসেই আমরা অভিনয় দেখছিলাম। তার অর্থ বাইরে থেকে নিজেদের একটু স্বতন্ত্র করে নিয়ে দেখছিলাম অভিনয়। জীবনযাত্রার থেকে, বাস্তবের থেকে একটু

আড়াল রচনা করে দেয় এরূপ ঘরের দেয়াল। তাতে সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে। খাঁটি জননাট্য এ আড়াল চায় না, তা মুক্ত প্রান্তরে মানুষের চোখের সামনে ফুটতে পারলে তবেই মনে করে, সার্থক হলাম। বাঙলা 'যাত্রা' আমাদের জনতার এ কারণেই বেশি নিজের জিনিস হতে পারত। এ কালের 'মুক্ত প্রান্তরে অভিনয়' "Open Air Theatre", সেই গ্রীক অভিনয় পদ্ধতি, Passion Play ও আমাদের 'যাত্রা' 'রামলীলা' প্রভৃতির সেই মূল সত্যটিকে আবার উর্ধ্বতর স্তরে স্বীকার করে নিতে চায়, দর্শকের সঙ্গে অভিনেতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করে। ঘরে বসে গণনাট্য সঙ্ঘের অভিনয় দেখতে দেখতে বুঝছিলাম, এ অভিনয়ও মুক্ত প্রান্তরের উপযোগী। শুনেছিলাম, সত্যই মুক্ত প্রান্তরে অভিনয় করতে পারলে শুধু এদের অভিনয়ের উদ্দেশ্য যে বেশি সিদ্ধ হয় তা নয়, এদের অভিনয়কলাও নাকি স্ফূর্ত হয় বেশি। নাট্যকলার এই অবরোধ-মুক্তি বাঙলা নাট্যকলার ইতিহাসে তাই আর এক শুভ সূচনা।

ঠিক এসব ধারণা, নীতি ও রীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যে নূতন নাট্য-সাহিত্য রচিত হবে, তা না উল্লেখ করলেও চলে। কারণ, নইলে নাট্যকলার মতো সমন্বিত শিল্প রূপ লাভই করত না। এই নূতন নাট্যসাহিত্য সৃষ্টির যে সূচনা দেখলাম তাও তাই লক্ষ্য করতে হয়। দেখলাম—যে নাটক এরা অভিনয় করছেন তা সাধারণ মানুষের সাধারণ কথা। উদ্দেশ্য তার স্পষ্ট। তাতে ছলনার চেষ্টা নেই। এই উদ্দেশ্য স্বীকার করতে লেখক ও শিল্পীরা কেউ কুণ্ঠিত নয়। তারা বলতে চায় না, 'না, না, আমাদের উদ্দেশ্য নেই। আমরা শুধু শিল্পের জন্য শিল্প সৃষ্টি করি।' বরং এইটাই বলতে চায়, 'আমরা শিল্প সৃষ্টি করি; কারণ, আমাদের উদ্দেশ্য আছে, লক্ষ্য আছে, আদর্শ আছে।' এই অকুণ্ঠ সত্যের বলেই তারা সাধারণকে তৃপ্ত করে, আর দৃষ্টিবান সমালোচকের মধ্যেও স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। এরূপ সমালোচকেরা বোঝেন—আমাদের 'বিশুদ্ধ শিল্প' পরিবেশনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি, তারপর প্রতারিত করা হয় নি প্রচার-দৃশ্য দিয়ে। তাঁরা জানেন, 'এরা দিতে চায় বাস্তব শিল্প; আমরা দেখব ঠিকমত প্রকাশ হলো কিনা জীবন।'

এদের নাট্যসাহিত্যে কোথাও তাই ছলনা নেই। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'জবানবন্দী'তে তাই নাটকীয় হবার চেষ্টা নেই—গান নেই, হাসি নেই, স্মার্ট

কথাবার্তা নেই, আছে একেবারে সহজ, সুস্পষ্ট ঘটনা। গৃহ ছেড়ে একটি কৃষক পরিবার এল শহরে অন্নের খোঁজে, অনাহারে তাদের মধ্যে স্নেহ-প্রেমের বন্ধন দুদিনে ছিঁড়ে যেতে লাগল, ছোট ছেলেটি মরল, কৃষকবধূ দেহ বিক্রয় করলে, আর পরিবারের বৃদ্ধ কর্তা মারা গেল চোখে নিয়ে তার ক্ষেতভরা ফসলের স্বপ্ন। চার দৃশ্যে এক অঙ্কে এক ঘণ্টার মধ্যে এই নাটকের অভিনয় হয়। এ নাটক নাট্যসাহিত্য হিসাবে যে সার্থক তা দর্শকদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। নাট্যসাহিত্যের প্রধান মানদণ্ড তা। এ নাটকের শক্তির উৎস হলো তার সত্যনিষ্ঠা, ঘটনা আর বলিষ্ঠ সংলাপ। এর ত্রুটি সম্ভবত এই যে, তাতে নিঃশ্বাস ফেলবার কোনো অবকাশ নেই—হাসি নেই, গান নেই, ট্রাজিক রিলিফ কোথাও মেলে না। হয়ত নাট্যকার দিতেও চান না।

তবু 'জবানবন্দী' পুরো নাটক নয়, একে চিত্র বা নক্সা বললেই ঠিক বলা হবে। লেখক নতুন নাটক রচনা করছেন 'নবান্ন'। তা চার অঙ্কের নাটক, তাতে অনেক দৃশ্য, অনেক ঘটনা। 'অরণি'তে তা ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছে। তার বিষয়বস্তুও এই মন্বন্তর ; মন্বন্তরের ক্রমিক প্রকাশ, প্রসার ও পরিণতি তিনি এই নাটকে তুলে ধরেছেন। নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে লেখক যেরূপ দৃষ্টিশক্তির ও সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, 'নবান্নে' তার স্ফুরণ দেখছি। এবার তা নিশ্চয়রূপে সার্থক হবে অভিনয়ে।

কারণ, আশার কথা আছে। বাঙলার লেখকদের মতোই অভিনয়-শিল্পীরাও অনেকেই 'গণনাট্য সঙ্ঘের' সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছেন। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রথম থেকেই ছিলেন এঁদের সভাপতি। গণনাট্যের মধ্যে তাঁরাও একটা নূতন সম্ভাবনা দেখছেন। সাহিত্যিক ও রঙ্গমঞ্চের কর্ণধারদের এই শুভ সম্মেলন ঘটলে বাঙলার নাট্যকলার এই চতুর্থ যুগের সূচনা ব্যর্থ হবে না। আমরাও দেখব—এবার বাঙলা নাট্যকলা বাঙালীর নাট্যকলা হয়ে উঠল।*

* পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৫১। এই রচনাটি গোপাল হালদার-এর 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়। দ্র. 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ, প্রথম সংস্করণ, মে ১৯৪৭, পৃ ১৭৭-৮৫। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক

জবানবন্দী / সুশীল জানা

"নীল দর্পণ" -এর অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। শুনেছি, ক্রুদ্ধ বিদ্যাসাগর নীলকর সাহেববেশী অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন। এ অনেকদিনের—অনেক মুখের গল্প। সেদিনকার অত্যাচারক্লিষ্ট নীল-চাষীর জীবন আর মর্মবেদনা নাগরিক নাট্যশালায় এসে স্ফুলিঙ্গের মতো হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল শুধু। মৃত্তিকার ঘ্রাণ আর জাতীয় জীবনের মর্মান্তিক অভিব্যক্তি, অসহায় মৃত্যু আর গ্রামপ্রান্তের গভীর আর্তনাদ, নগরীর নাট্যশালা এবং নাট্যকারের কাছ থেকে তারপর একেবারে যেন বিদায় নিয়েছিল। তারপর হঠাৎ চমক ভাঙল বাংলার দুর্ভিক্ষের হাহাকারে। ইতিহাসখ্যাত এই মহামন্বন্তরের পটভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী'র জন্ম, সচেতন জনজীবনের—গণনাট্যের জন্ম। শ্রীরঙ্গমে ভারতীয় গণনাট্যের বাংলা শাখার উদ্যোগে 'জবানবন্দী'র অভিনয় দেখে শুধু মনে হচ্ছে আজ, জনজীবনের জাগ্রত এই সাহিত্যিক-চেতনা, এই বলিষ্ঠ কলাভঙ্গীর জন্য আমাদের মূল্য দিতে হয়েছে—আর সেই মূল্য কতখানি মর্মান্তিক। দুর্বার জীবনবেগের আলোড়নে যার জন্ম—তার নির্বাণ নেই, সমাপ্তি নেই। জাতীয় সাহিত্যের এই প্রভাতীচেতনার উদ্দেশে আমাদের অভিবাদন জানাই।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখার উদ্যোগে সংঘের কর্মীগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষুধিত বাংলার আর্তনাদকে, বিধ্বস্ত সমাজ-জীবনের মর্মচিত্রকে উদঘাটিত করেছেন। এই উপলক্ষ্যে বোম্বাইতে আজ পর্যন্ত এক লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে এবং পাঞ্জাবে হয়েছিল লক্ষাধিক টাকা। এ সমস্তই দুর্গতদের জন্য ব্যয়িত হয়েছে এবং হচ্ছে। কোনো পেশাদার নট-নটী নিয়ে এই দল রচিত হয় নি। নাটকের চারিত্রিক অভিব্যক্তি দিয়েছেন যাঁরা—তাঁরা পেশাদারদের চেয়ে কোনো অংশ খাটো নন; বরং তাঁদের জাগ্রত জাতীয় চেতনা নির্মম বাস্তবের মাঝখান দিয়ে জাতীয় সাহিত্য ও কলাকে রূপ দিল এই প্রথম এবং সগৌরবে। শুধু এই দুর্ভিক্ষে নয়, যাদের তরঙ্গিত জীবনপ্রবাহ সভ্যতার

কেন্দ্রগুলি থেকে দূরে অন্ধকারে, বছরের পর বছর ধরে অসহায় মৃত্যুর মাঝখানে বিলীন হয়ে গিয়েছে—ভারতের সেই বৃহত্তর অংশের মর্মবেদনার অভিব্যক্তি—জাতীয় অভিব্যক্তি, সাহিত্যকলার মেরুদণ্ড। তার প্রকাশের মধ্যে জাতীয়তা-বোধের প্রাচুর্যটাই থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু নাট্যকলা হিসেবে 'জবানবন্দী'র সাফল্য বাংলা নাট্যশালায় যুগান্তরের সূচনা করেছে।

তারপর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের গীতিনাট্য 'নবজীবনের গান' ও 'মধুবংশীর গলি'।

একদিকে 'জবানবন্দী'তে পীড়িত মৃত্তিকার গন্ধ আর অন্যদিকে 'মধুবংশীর গলি'তে অবরুদ্ধ মধ্যবিত্ত জীবন। কবিতার বলিষ্ঠ রূপ আর তার নাট্যরূপ অভিনব। অবশ্য সেদিক নিয়ে 'নবজীবনের গান'-এর পরিকল্পনা আর নাট্যরূপ অধিকতর সাফল্যলাভ করেছে। তার কারণ বোধ করি, 'নবজীবনের গান' সঙ্গীতধর্মী ; স্থূল ও স্পষ্ট। তার নাট্যরূপ জমাট বেঁধেছে দুর্ভিক্ষতাড়িত ক্ষুধিত গ্রামবাহিনীর পরিকল্পনায় এবং সুর-সংলাপে। সেদিক দিয়ে সেই স্থূল সার্থকতার সুযোগ নেই 'মধুবংশীর গলি'তে। 'মধুবংশীর গলি'র বলিষ্ঠ মানস এযুগের অতি পরিচিত, অতি সাধারণ মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন বিদ্রোহ—কবির কাব্যে আজ যে জিনিস একঘেঁয়েমির দিকে ঝুঁকে আছে। তাই 'মধুবংশীর গলি'কে গীতিনাট্য বললে যেন ভুল বলা হবে—কারণ, গান ওতে নেই। বরং নাট্যকাব্য বলা ভালো—আমাদের যুগের, আমাদের যৌবনের একটা কাব্য আছে, আর আছে তার গভীর অন্ধকারে একটা সংঘাতসঙ্কুল নাট্যরূপ। পৃথিবীর ইতিহাস-খ্যাত দুঃসময়ের আর জর্জরিত যৌবনের নাট্যকাব্য 'মধুবংশীর গলি'। এর অভিনয়ের জন্য রূপসজ্জার প্রয়োজন নেই। পটভূমি রচনা হাস্যকর বলে মনে হয়। জনগণ আর পথ এর পটভূমি, রূপসজ্জা এর হাফ-হাতাছেঁড়া শার্ট। মঞ্চশিল্পের দিক থেকে এই জাতীয় নাট্যকাব্যের প্রযোজনা ও সাফল্য এই প্রথম।

'নীল দর্পণে'র সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নাট্যশালা থেকে গণনাট্য-চেতনা বিদায় নিয়েছিল। কারণ, বাংলা নাট্যশালার সেই কৈশোরে তার বেঁচে থাকার মতো আবহাওয়া ছিল না। ক্ষেত্রও ছিল না। আজ সঙ্ঘবদ্ধ গণচেতনার দিনে তার সে সুযোগ আছে। বিশ্বজোড়া এক সমরানলের মাঝখানে, দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর মাঝখানে, বহুদিন পূর্বে গ্রামে ফেরা নীলচাষীদের আবার শহরমুখো পদধ্বনি

শুনেছেন যাঁরা—তাঁদের অভিনন্দন জানাই। দুর্যোগ আর দুর্দিনেই আসে জাতির আত্মচেতনা—ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় কলাশিল্পের পরিচয়, বিকাশ ও সাফল্য দেখে গভীরভাবে উপলব্ধি করছি কথাগুলি।

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের এই সাময়িক অনুষ্ঠান নিরবচ্ছিন্নভাবে উদযাপিত হোক, সঙ্ঘের নাট্যমঞ্চ স্থাপিত হোক। বাংলার যে অন্তর্বেদনার মাঝখানে তার জন্ম—তা ভাবীকালে তার জাগ্রত জাতীয় চেতনার আলোকে আমাদের সমগ্র জীবনকে আলোকিত করে তুলবে। জাতীয় সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণার জন্যও এর যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। *

* অরণি, ২৩শে জুন, ১৯৪৪। সাহিত্যিক সুশীল জানা 'সুজা' ছদ্মনামের আড়ালে এই রচনাটি লিখেছিলেন। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক

নবান্ন / সুশীল জানা

শ্রীরঙ্গমে 'নবান্ন'-র অভিনয় দেখলাম।

এর আখ্যানভাগ শুরু হয়েছে ১৯৪২ সালের উচ্ছৃঙ্খল রাজনীতির পটভূমিকায়। শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রাচীন পাশব-নীতি প্রজামণ্ডলের মাঝখানে ধনপ্রাণের বিনিময়ে একটা তথাকথিত শৃঙ্খলা নিয়ে এলো—এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম-বাঙলার বাসিন্দা যারা—যারা কৃষাণ, কৃষি-মজুর, যারা শুধু এতদিন পরিচয় পেয়ে এসেছিল তাদের নিকটতম প্রভু জমিদার-মহাজনের, তাদের সুমুখে আর একটা নির্মম পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হলো।

এই এর শুরু।

তারপর এলো ঝড়—এলো প্লাবন, চারিদিক জুড়ে নামল দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর কালো ছায়া। ১৯৪৩-৪৪ সাল জুড়ে চললো এক নিরবচ্ছিন্ন নিরুপায় অবস্থার ধারা। ধান নেই, চাল নেই, ওষুধ নেই, সহায় নেই. গ্রাম-বাঙলা ছারখার হতে চললো। জীবনের বলিষ্ঠ সংগ্রামকে যারা রূপ দিয়ে নিজের করে নিতে পারে—তারাই বাঁচে, বাঁচার চেতনায় জর্জরিত হয়, আর দুর্জয় হয়ে ওঠে। যারা পারে না—তারা মরে। এমনি করে মরে গিয়েছে অনেকে। তবু নিঃশব্দ এই শ্মশানভূমি থেকে জীবনের ঝঙ্কার ওঠে। এই ঝঙ্কারই 'নবান্ন'-র কাহিনী। রাজনীতি, মহাজনী-নীতি আর ধনতন্ত্রের কুটিল অর্থনীতি—এই তিন নীতির ঘূর্ণিতে পড়ে গ্রাম-বাঙলার জনগণ চললো ভেসে, আর দুর্যোগের অন্ধকারে চরম অসহায়তার মাঝখানে পরিচয় লাভ করল একটা সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধমূলক অমর জীবনের—বিরাট সংগ্রামশীল জীবনের। এই হলো 'নবান্ন' নাটকের আবহাওয়া।

প্রচলিত নাট্যকাহিনীগুলির মতো এর গল্পাংশ কোনো নায়ক-নায়িকাকে কেন্দ্র করে, ক্রমোন্নত একটা চরম আবহাওয়ায় এসে শেষ হয় নি। এবং কাহিনী গোটা আমিনপুর নিয়ে—বাঙলার সমস্ত গ্রামকে নিয়ে। দুর্দিনতাড়িত প্রধান সমাদ্দারের পরিবারের আশেপাশে অসংখ্য পরিবার এসে মিশেছে পথের প্রান্তে।

নায়ক-নায়িকার বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করে সবগুলি চরিত্রই তাদের জীবনের নির্মম বক্তব্যকে ভাষা দিয়ে গিয়েছে। আগাগোড়া একটা জীবনের বাস্তববোধকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠতে শোনা যায় প্রত্যেকটি চরিত্রে—সেখানে কেউ কারুর চেয়ে খাটো নয়, কেউ কারুর চেয়ে বড় নয়। একজনের দুঃখ নাটকের পরিণতির খাতিরে আর সকলের মর্মবেদনাকে ম্লান করে দেয় নি। জীবনের এই বাস্তববোধ আর সামঞ্জস্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা দুর্লভ গুণ। নাটকের গতির সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস মনে আঘাত করে। মনে হয় এর প্রত্যেকটি দৃশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রত্যেকটি দৃশ্য শেষ হচ্ছে একটা চরম আবহাওয়ায় এসে। তাতে নাট্যকাহিনীর ক্রমপরিণতি ব্যাহত হচ্ছে। ১৯৪২ সাল থেকে ৪৪ সাল পর্যন্ত যে বিভিন্ন বিপর্যয় নেমে এসেছে গ্রাম-বাঙলার গণজীবনে—তার প্রত্যেক-টিকে দেখানো হয়েছে যেন বিচ্ছিন্ন করে করে। গণজীবনের বিরাট এক গোষ্ঠী নিয়ে এর পরিকল্পনা, তাতে কিন্তু এইটে আসাই স্বাভাবিক। এবং গত তিন বছরের বিভিন্ন বিপর্যয়—তারা কেউ কারুর চেয়ে খাটো নয়। প্রত্যেকটি নাট্যস্রষ্টার গভীর অন্তর্দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। যার ফলে বিভিন্ন বিপর্যয়-সমন্বিত দৃশ্যগুলি সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এর সবচেয়ে বড় কথা, নতুন এক জীবনদর্শনের অভিব্যক্তি। যার অভাব আজ পর্যন্ত বাঙলার নাট্যসাহিত্যে হয়তো কারুর চোখে পড়ে নি, ঘা দেয় নি মনে। 'নবান্ন' মঞ্চস্থ হওয়ার পর, গত তিন বছরের নির্মম বিপর্যয়ের পর ভাবী নাট্যস্রষ্টাদের অবহিত হওয়ার সময় এসেছে। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণে'র পর জাতীয় জীবনকে অবলম্বন করে, ঔপনিবেশিক জীবনধারার বাস্তব অবস্থাকে মূলধন করে কোনো নাটকই সৃষ্টি হয় নি। গ্রাম-বাঙলার গণজীবন—অর্থাৎ জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড—তার কথা 'নীলদর্পণ' ছাড়া আর কোনো নাটকেই রূপ পায় নি। 'নীলদর্পণে' বিদেশী উপরওয়ালাদের অকথ্য অত্যাচার এবং অসহায় কৃষাণগোষ্ঠীর এক সকরুণ অধ্যায়ের আর্তনাদ ছাড়া সেখানে বলিষ্ঠ জীবনদর্শনের কোনো অভিব্যক্তি নেই। তাই সেদিনের 'নীলদর্পণ' বিভ্রান্ত করেছিল, বিচলিত করেছিল—এবং তার পরে আর সৃষ্টির পথ খুঁজে পায় নি। তার পরেও যত নাটক সৃষ্টি হয়েছে—তাদের মধ্যে শুদ্ধ প্রেমকাহিনী ছাড়া দেশী-বিদেশী উপরওয়ালাদের অন্যায় অত্যাচার সার্থকভাবে হয়তো কোথাও রূপ পেয়েছে এবং সেন্টিমেন্টে—ন্যায়-অন্যায় জ্ঞানসম্পন্ন মনের দুর্বল

স্থানে—একটা আবেগে ঘা দিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে। গভীর জনসমুদ্রে যে একটা আলোড়ন অত্যন্ত নিঃশব্দে পুঞ্জিত হচ্ছে—তার কোনো সন্ধান ছিল না সেগুলিতে। তার কারণ তখনো গণজীবনের বলিষ্ঠ একটা জীবনদর্শন গড়ে ওঠবার অবকাশ পায় নি। এবং তার সময়ও হয় নি। বাঙলার দর্শক আর পাঠক হয়তো সেদিন কেঁদেছে, হেসেছে—আর ভুলে গিয়েছে। কিন্তু আজ 'নবান্ন'কে ভোলা যায় না। এই তিন বছরের আবহাওয়া দেশী-বিদেশী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বহু কারণে যেমন নারকীয় হয়ে উঠেছে—তেমনি একটা বিরাট ও অমর জীবনদর্শনেব পরিচয় হয়েছে—যা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না, আমাদের জাতীয় জীবন—আমাদের গণজীবন বাঁচতে পারে না : সে হচ্ছে সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ, বলিষ্ঠ সংগ্রামশীল জীবনের আত্মচেতনা। এই আত্মচেতনা এসেছে ধীরে ধীরে—আমাদের গণজীবন অর্জন করেছে একে বীর্য দিয়ে, মূল্য শোধ করেছে নির্মমভাবে। গোটা নাটকটি জুড়ে এই চেতনা ধীরে ধীরে পরিবর্ধিত হয়েছে। নানান বিপর্যয়ের মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে আমিনপুরের সমাদ্দার-পরিবার আর আশেপাশের বহু পরিরার পরিচয় পেয়েছে তার চারপাশের। পথের জীবনে পরিচয় পেয়েছে পথের। এইরকম একটা সমগ্রতার সঙ্গে পরিচয়ের পরই একটা বলিষ্ঠ জীবনদর্শন গড়ে উঠতে পারে। তাই নাট্যকাহিনীর ক্রমপরিণতির যে ত্রুটিটা বিচ্ছিন্ন দৃশ্য বলে মনে হয়—সেই ত্রুটির অন্তরালে গত তিন বছরের আবহাওয়ার একটা ক্রমপরিণতির ধারা নাট্যসংঘাতের চড়াই-উৎরাই ভেঙে সুষ্ঠুভাবে এগিয়েছে। খোলা মনে শিথিল দেহে নাটক দেখতে গিয়ে ফিরে আসতে হবে প্রতিজ্ঞা-কঠোর' মন নিয়ে, দৃঢ় মুষ্টিতে বলিষ্ঠ এই প্রাণশক্তির উদ্বোধন 'নবান্ন'-র প্রাণবস্তু। সমাদ্দার-পরিবারের পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ—গ্রাম-বাঙলার পিতৃপুরুষ প্রধান সমাদ্দার উন্মাদ নয়, সে একটা প্রাণপ্রাচুর্যের দুর্জয় উন্মাদনা। বাঙলার গণজীবনের এই প্রাণস্পন্দন কোথাও দেখি নি, 'নীলদর্পণে'ও না। এতদিন শুধু দেখেছি নিরুপায় মর্মান্তিক মৃত্যু, আর সকাতর আর্তনাদ। সেইটেই শুধু সত্য নয়—তারও আড়ালে জীবনের একটা সুগভীর আর্তনাদ আছে, যেটা সাহিত্যকে বিরাটত্ব দান করে—সার্থক সৃষ্টির পথে এগিয়ে দেয়। সাহিত্যের সেইটেই বড় বাস্তব—বড় সত্য। সেই সাফল্যের পথযাত্রী রূপে আমরা 'নবান্ন'র রচয়িতা শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্যকে অভিনন্দন জানাই।

তারপর 'নবান্ন'র অভিনয়নৈপুণ্য। প্রত্যেকটি চরিত্রের পেছনে সমসাময়িক আবহাওয়ার এমন একটা মর্মান্তিক প্রেরণা আছে, যার ফলে তারা কমবেশী নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে সার্থক ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন বৃদ্ধ ভিখিরির চরিত্রে অধ্যাপক গোপাল হালদার, পঞ্চাননীর ভূমিকায় শ্রীযুক্তা মণিকুন্তলা সেন প্রভৃতি। বড় চরিত্রগুলির তো কথাই নেই। এই নৈপুণ্যের মস্ত বড় একটা প্রেরণা যেমন অভিনেতাদের গণজীবনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগের ফলে, তেমনি ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের কর্মীদের বিরাট আশাবাদী অবিচলিত দেশপ্রেমের জন্যও বটে। বাঙলার নাট্যশালাগুলি মাকড়সার মতো জাল বুনে চলছিল ঘরের কোণের অন্ধকারে—হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার সহস্র কাহিনীকে অবলম্বন করে। দর্শকসাধারণ এই নিয়েই ছিল অন্ধ। কোনো রাজনৈতিক দলে না ভিড়ে বৃহত্তর জাতীয় জীবনের সঙ্গে কোনো পরিচয় ছিল না নগরবাসীদের তথা জাতীয় জীবনের শিক্ষিত অংশের। নানা বিরোধী ভাবধারার মধ্যে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, বিচলিত হয়েছে। এবং মাঝখানে জাতীয় সংস্কৃতির উদযাপনকল্পে একদল তরুণ-তরুণীর আবির্ভাব ও গণনাট্য সঙ্ঘের সৃষ্টি বাঙলার নাট্যসাহিত্য ও মঞ্চশিল্পকে এক নতুন সৃষ্টির পথে অগ্রসর করে দিয়েছে। সুমুখে বিপদ আছে অনেক তবু আমরা আশা করব—বাংলা নাট্যসাহিত্যের, জাতীয় সংস্কৃতির, গণজীবনের সম্ভাবনাময় বিরাট সংগঠনের। গত তিন বছর নিশ্চয়ই নিঃশেষে হারিয়ে যাবে না। জাতীয় জীবনকে যে নির্মম মূল্য দিতে হয়েছে তা ব্যর্থ হবে না। বাস্তবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই মানুষকে বাঁচবার প্রেরণা জোগায়, তাকে মহান করে—বিরাট করে, তাকে পথ দেখায়।

'নবান্ন'র মঞ্চ-ব্যবস্থাপনায় শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র ও শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্য যে সাফল্য ও কলানৈপুণ্য দেখিয়েছেন—তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। মাঝে মাঝে কোনো কোনো দৃশ্যে মঞ্চের আলোকাধিক্য নাটকের আবহাওয়াকে হালকা করে দিয়েছে। যে গভীর নির্মম আবহাওয়ায় নাট্যকাহিনী পরিকল্পিত—তাতে আলোক-নিয়ন্ত্রণটা যত বেশি হবে—মনে হয়, ততই সার্থকতার সম্ভাবনা। *

* অরণি, ২৭শে অক্টোবর, ১৯৪৪। সাহিত্যিক সুশীল জানা 'সুজা' ছদ্মনামের আড়ালে এই রচনাটি লেখেন। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক

নবান্ন / মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটক অভিনয় করে গণনাট্য সঙ্ঘ এক নতুন চমক লাগিয়েছিলেন। 'নবান্ন' বিজনেরই পরবর্তী নাটক, বিষয়বস্তু প্রায় একই। সুতরাং যাঁরা 'জবানবন্দী' দেখেছেন, তাঁরা 'নবান্ন' থেকে নূতনত্বের চমক পাবেন না। কিন্তু পাবেন আর এক ধরনের চমক। বিস্তৃতি ও বলিষ্ঠতায় গণনাট্য সঙ্ঘের দ্রুত উন্নতি সত্যই চমকপ্রদ।

'নবান্ন' পড়ে মনেই হয় না এর মঞ্চোপযোগিতা থাকতে পারে। এ নাটককে রূপ দেবার সাহস ও সফলতা গণনাট্য সঙ্ঘের পক্ষেই সম্ভব। কারণ, এমন আদর্শবাদী রূপতপস্বী সমবায় কোনো ব্যবসাদারী থিয়েটারের পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ছোট বড় বহু সংখ্যক ভূমিকা সমানভাবে প্রাণ দিয়ে অভিনয় করতে পারেন তাঁরাই, যাঁরা জানেন মাত্র জনসেবাই এর লক্ষ্য—নিজেদের প্রতিষ্ঠা নয়।

বাংলার বিগত দুর্যোগ 'নবান্নে'র পটভূমিকা। দুর্যোগ এখনো কাটে নি, কিন্তু আমাদের ক্লান্ত মন ভুলে যাবার সুযোগ খুঁজছে। 'নবান্ন' চায়, বাংলা যেন না ভোলে, ক্লান্তি যেন না আসে। তার বাংলার চোখের সামনে 'নবান্ন' বার বার ধরে দেখাবে বিগত দুর্যোগকে। দুর্যোগের কারণ অনেক, কতক বাইরের, কতক ভেতরের। যার ওপর আমাদের হাত নেই, তার কথা এখন ছেড়ে দিয়ে—আমাদের নিজেদের কতখানি দোষ ছিল, তার হিসাব করতে ভাবনা এনে দেয় 'নবান্ন'। দুর্যোগ অবার আসবে কিনা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এলেও আমরা যেন গতবারের মতোই একেবারে অপ্রস্তুত না থাকি, এই হল 'নবান্নে'র আসল বলবার কথা।

'জবানবন্দী', 'নবান্ন' এদের নাটকত্বের বিচার অন্য নাটকের সূত্রে চলবে না। এরা এক নতুন সৃষ্টি। এদের কানুন তৈরী হবে পরে। এদের পাঠক-দর্শক-সমালোচক কারো মুখাপেক্ষী হয়ে চলতে হয় না। গোড়া থেকেই বাঙালী এদের নিজের বলে চিনে নিয়েছে। সেইখানেই তো গণনাট্য সঙ্ঘের সাহস ও

শক্তি, আর নতুন নিয়ে পরীক্ষা করবার সুযোগ। গণনাট্য সঙ্ঘের দায়িত্বও সেইখানে। 'জবানবন্দী'র পরে 'নবান্নে' সে দায়িত্ববোধের পরিচয় দর্শক যথেষ্ট পেয়েছেন।

রসপরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজমনকে সাময়িক সমস্যার প্রতি মনোযোগী করে তোলবার শিক্ষা পরিবেশন গণনাট্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। নিকটতম উদ্দেশ্য পিপলস রিলিফ কমিটির প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ। বাংলায় অনাহার মৃত্যু চোখের ওপর ঘটছে না বলে বন্ধ হয় নি। এখন আবার মহামারীর পালা। রিলিফের কাজ বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হবার সময় এখনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতে। গণনাট্য সঙ্ঘের অভিনয় এখনো তাই ক্ষুধার্ত পীড়াগ্রস্ত বাংলার আর্তনাদ। সঙ্ঘ দেশবাসীর কাছ থেকে কামনা করেন, ধনীর কাছ থেকে ধন, শিল্পীর কাছ থেকে শিল্পজ্ঞান, সমালোচকের কাছ থেকে উপদেশ। আশার কথা, সাধারণভাবে সঙ্ঘ তা পাচ্ছেন।

বিজন ভট্টাচার্য নাট্যকার-অভিমানে নাটক লেখেন নি। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নমুনা নিয়ে এক একটি চরিত্রের মুখে তাদের কথা সহজভাবে বলিয়েছেন। প্রতিকূল সমাজব্যবস্থার অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ভয়ে কারো মনে স্বস্তি নেই, যে যার কোলে ঝোল টানবার জন্যে ব্যস্ত। মূলধনীর ধনবৃদ্ধির লোভ, মধ্যবর্তী দালালের আত্মরক্ষায় হিতাহিত জ্ঞানলোপ, নিম্নমধ্যবিত্তের অসহায় অবস্থার ফলে হৃদয়হীনতা, আর সকলের চাপে নিষ্পেষিত ভূমিজ চাষী। এই অব্যবস্থিত সমাজ বাইরের সামান্য আঘাতে টালমাটাল তো হবেই।

কিন্তু, ধ্বংস যত বড়ই হোক, প্রাণের অঙ্কুর তার ফাটলের মাঝখান দিয়ে আবার গজিয়ে ওঠে। মানুষের আত্মপ্রত্যয় আর দাম্পত্যজীবনের মাধুর্য সহস্র ঘা খেয়েও মরে যায় না. 'নবান্ন' শেষ পর্যন্ত এই আশার বাণী শুনিয়ে যায়। সমাজের কাঠামোকে শক্ত করতে গেলে জ্ঞাতসারে সমবেত চেষ্টার যে প্রয়োজন, নিরক্ষর চাষীর কাছেও তা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, চাষীরা "গাঁতায় খাটতে" লেগে যায়।

অভিনয়শক্তি সকলের সমান থাকে না, শিক্ষার সুযোগও সকলের সমান হয় নি, কাজেই ব্যক্তি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা এঁদের করব না। সকলেই সমান আন্তরিকতার সঙ্গে, উদ্দেশ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে যে অভিনয় করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। একটি অনাড়ম্বর অথচ সুষ্ঠু পৃষ্ঠপটের সম্মুখে অভিনয় এঁদের তাই এত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এতগুলি ছোট বড় ভূমিকাকে এরূপ নিপুণভাবে একসূত্রে গেঁথে তোলা উচ্চশ্রেণীর পরিচালনাশক্তির পরিচয় দেয়, এবং আবহধ্বনি ও সুর তার অঙ্গ।*

---

* জনযুদ্ধ, নভেম্বর-দিবস বিশেষ সংখ্যা, ৮ই নভেম্বর, ১৯৪৪। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক

নাট্যকলা : নবান্ন / হিরণকুমার সান্যাল

সম্প্রতি ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের বাংলা শাখা কর্তৃক কলকাতার 'শ্রীরঙ্গম' রঙ্গালয়ে শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটি একাধিকবার অভিনীত হয়েছে। এ নাটকখানা ও গণনাট্য সঙ্ঘের এ সার্থক অভিনয় বিশেষ আলোচনার যোগ্য। বারান্তরে আমরা তা করব আশা করি।

নাটক হিসাবে 'নবান্ন'কে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলে না। এতে গল্পের সংখণ্ডতার চেয়ে ঘটনার ব্যাপ্তি এবং নাটকীয় আবেগের একাগ্রতার চেয়ে বৈচিত্র্যই বেশি লক্ষণীয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট বিশৃঙ্খলার পর থেকে বাংলার চাষী ও গ্রাম্যজীবনের আওতায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী থেকে শুরু করে যতগুলি মর্মান্তিক বিপ্লব ঘটে গেছে, সেগুলি, আর সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত-জীবনের সংবাদ-পত্রীয় মন্বন্তরবিলাস, ব্যবসাদারী চাল ও নারী রপ্তানির হৃদয়হীনতা, কিংবা সরকারী চিকিৎসা, রিলিফের অক্ষম প্রহসন—এতগুলি ব্যাপার এই একটি নাটকে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনা-পরম্পরার এই প্রকাণ্ড তালিকা, যাকে গত দু'বছরের বাংলাদেশের ইতিহাস ও সমালোচনা বলা যায়, একে সুদৃঢ় গল্পের ভিত্তিতে নাট্য-রসাশ্রিত করে তোলা যুগান্তকারী প্রতিভার অপেক্ষা রাখে। সেই প্রতিভার পরিচয় আজও পাওয়া যায় নি। তবে, বিজনবাবু নতুন ধরনের নাটক রচনার চেষ্টা করে বাংলা সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন, এ কথা স্বীকার করতে হবে।

'নবান্ন' নাটকের গুরুতর ত্রুটিগুলি অভিনয়ের গুণে অধিকাংশ ঢাকা পড়েছে। এই অভিনয়ের বিশেষত্ব এই যে, এর সার্থকতার মূলে রয়েছে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিভা নয়, সমগ্র মণ্ডলীর উৎসাহিত উদ্যম। বাংলাদেশের অনেক লেখক ও শিল্পীদের মধ্যে আজ যে নতুন প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়, গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে আজই সেই প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছে বাংলা রঙ্গমঞ্চে—তাই সাহিত্যের মতো সেখানেও অনেক বেশি মূল্যবান বর্তমানের সামান্য সার্থকতার চেয়ে ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনার আশাপ্রদ ইঙ্গিত।

গণনাট্য সঙ্ঘ ছাড়াও কলকাতার রঙ্গমঞ্চে কয়েকটি সৌখীন দল নানা নাটকের অভিনয় করেছেন। তাঁদের সকলের অভিনয় দেখবার সুযোগ আমাদের হয় নি। কিন্তু এই সৌখীন দলগুলির অভিনয় অবজ্ঞেয় নয়। বাংলা দেশে যাঁরা অভিনয় উৎকর্ষ দেখিয়েছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা এরূপ সৌখীন দলেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। পরে অনেক কৃতী অভিনেতা আবার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেন। অভিনয়কলা ও 'রঙ্গমঞ্চ' দুইই এভাবে সৌখীন দলের চেষ্টায় বারে বারে সুপুষ্ট হয়েছে। নতুন শক্তি ও প্রতিভার প্রয়োজন কখনো কমে নি। এখন তো তা আরও বেড়েছে। কারণ, যাঁরা আজ বাঙলা রঙ্গমঞ্চের নেতৃত্বস্থানীয় তাঁরা সকলেই প্রায় শ্রেয়ত্বের পারে গিয়ে ঠেকছেন। এজন্য আমরা সৌখীন দলের নাট্যাভিনয়ে উপস্থিত না থাকতে পারলে দুঃখিতই হই। উল্লেখযোগ্য এই যে, এসব নানা দল এখন প্রায়ই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটক অভিনয় করে না, নিজেদের জন্য অন্যরূপ নাটক বেছে নেয়। সব সময় তাতে যে ভালো হয় তা নয়। কিন্তু এতে নাটক ও নাট্যকলার, মোটের উপর উন্নতির সুযোগ বেশি দেখা দেয়।*

---

*পরিচয়, কার্তিক, ১৩৫১। 'পরিচয়'-এর 'সংস্কৃতি-সংবাদ' বিভাগে এই লেখাটি অস্বাক্ষরিত ভাবে প্রকাশিত হয়। এটির লেখক ছিলেন হিরণকুমার সান্যাল। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক।

নবান্ন প্রসঙ্গে / স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

'পরিচয়' সম্পাদক সমীপেষু,

গেল মাসের 'পরিচয়ে' ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের 'নবান্ন' নাটক সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য পড়ে 'পরিচয়ে'র পাঠক ও 'নবান্ন'-র দর্শক হিসেবে একটু প্রতিবাদ জানাতে চাই।

'পরিচয়' সরাসরি রায় দিয়েছেন: "নাটক হিসেবে 'নবান্ন'-কে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলে না।" তবু ঐ নাটকের অভিনয় 'পরিচয়ে'র সম্পাদকেরও খুব ভালো লেগেছে। তার কারণ "'নবান্ন' নাটকের গুরুতর ত্রুটিগুলি অভিনয়ের গুণে অধিকাংশ ঢাকা পড়েছে।"

'মোটেই সক্ষম রচনা নয়' মানেই একেবারে অক্ষম বা অসার্থক রচনা। অভিনয়কলা যে একটা আর্ট বা সৃষ্টি তা জানি। সুন্দর অভিনয় মূল বস্তুকে ছাপিয়ে উঠে তদতিরিক্ত রসের পরিবেশন যে করতে পারে, তা-ও জানি। কিন্তু একখানা মোটেই সক্ষম নয় নাটককে আশ্রয় করে এতখানি ভালো অভিনয় হতে পারে বলে সহজ বুদ্ধি মানতে চায় না। অবশ্য মানতে পারি, যদি সমস্ত ব্যাপারটাকে আগাগোড়া একটা ভোজবাজি বলে বিশ্বাস করা যায়। অনেকটা সক্ষম, কিছু সক্ষম, আধা-সক্ষম, সিকি সক্ষম—এমন একটা বিশেষণও কি 'নবান্ন'র প্রাপ্য নয়? 'মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলে না' কি সম্পাদকের অনবধানতা-প্রসূত মন্তব্য?

এমন একখানি অক্ষম নাটকের লেখক, 'পরিচয়ে'রই অভিমতে কেবল বাংলা রঙ্গমঞ্চেই নয়, বাংলা সাহিত্যেও 'নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন'। বাংলার দর্শকমহলের কি এতই স্থূলদৃষ্টি এবং বাংলার পাঠকমহলেরও কি এতই অপক্ক মন? 'নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি' কি তবে এতই সহজ? একই কলম থেকে এমন স্ববিরোধী মতামত ব্যক্ত হওয়ায় আমরা ন্যায়তই প্রশ্ন করতে পারি: কোনটা 'পরিচয়ে'র আসল অভিমত? মোটেই সক্ষম রচনা নয় কথাই মিথ্যে, না নতুন আবহাওয়া সৃষ্টির কথাটা মিথ্যে? দুটো কখনো সত্যি হতে পারে না।

আমার মতে 'নবান্ন' রীতিমত সক্ষম রচনা, তার একাধিক দোষ ত্রুটি আছে। তা বড় কথা নয়। প্রথম কথা 'নবান্নে' কি পেলাম। এতদিন যাকে আমরা পাবার আশায় ছিলাম তার সবটা না পেলেও যদি তার অনেকটা বা কিছুটাও পেয়ে থাকি, সেই কি কম? 'নবান্নে' পেয়েছি এতকালের অনাদৃত বৃহত্তর বঙ্গ দেশকে। বাংলার চাষীর সুখ-দুঃখের দুর্ভোগ-দুর্দশার নৈরাশ্য-সঙ্কল্পের চমৎকার আলেখ্য 'নবান্ন'। কেবল বিষয়বস্তুর জোরেই 'নবান্ন' সার্থক নয়। এ বইয়ের সাহিত্যিক সাফল্যও যথেষ্ট। 'নীল দর্পণে'-র বহুকাল পরে বাংলার অপাংক্তেয় কৃষক বাংলা রঙ্গমঞ্চের নিষিদ্ধ রাজ্যে প্রবেশাধিকার আদায় করে নিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার নিজের কথা নিজের মতো করেই অনায়াসে বলেছে, কেঁদেছে, কোঁদল করেছে। হাসিয়েছে, নাড়া দিয়ে চলে গেছে। এক কথায় নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। এ কী অক্ষমতার পরিচয়? অনভ্যস্ত কলম মাঝে মাঝে কখনো আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে কিংবা দু-এক স্থানে একটু আধটু বাড়াবাড়ি হয়তো করে ফেলেছে। সেই কি একমাত্র বিচার্য বিষয়?

'নবান্ন'-র ত্রুটিগুলির অধিকাংশ তার Birth-marks, নতুন ভুঁইফোঁড় নয়। পুরাতনের জঠর থেকে আসে সে। যে দু-চারটে গতানুগতিক বা মঞ্চঘেঁষা ত্রুটি আছে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের পরবর্তী নাটকগুলিতে সে সব গৌণ বিষয় এক এক করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে আমরা আশা রাখি। 'নবান্ন' নবাঙ্কুর বলেই তার অবশিষ্ট ত্রুটিগুলিও আর এক অর্থে ত্রুটি নয়—সেগুলিকে প্রচলিত নাট্যকলা বিচারের অভ্যস্ত চশমা চোখে এঁটে বিচার করলে চলবে না। যেমন, কেউ কেউ বলেছেন, একখানি নাটকে এতটা ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের ভীড়ে ঠাস বুনটের গলদ রয়ে গেছে। এ অভিযোগ সত্যি হলেও তাকে অসাফল্য বলা চলে না। নতুন সর্বত্র বা প্রধানত পুরাতনের বিধিবিধান না মেনে নির্ভুল পথে পা বাড়িয়েছে কিনা সেই কথাই বিচার্য। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিমত উল্লেখযোগ্য মনে করি, "নবান্ন নতুন নাটক। এর কানুন রচিত হবে পরে।" 'পরিচয়' বলেছেন, 'ঘটনা-পম্পরার এই প্রকাণ্ড তালিকা যাকে গত দু বছরের বাংলাদেশের ইতিহাস ও সমালোচনা বলা যায় একে সুদৃঢ় গল্পের ভিত্তিতে নাট্যরসাশ্রিত করে তোলা যুগান্তকারী প্রতিভার অপেক্ষা রাখে'। যুগান্তকারী প্রতিভা কি স্বয়ম্ভূ? তা যদি না হয় তবে একদিন যুগান্তকারী প্রতিভা 'নবান্ন, প্রভৃতির কল্যাণে অনেকখানি তৈরী পথ পাবেন। সেই পথ পরিষ্কারের

কাজকে কি মোটেই সক্ষম রচনা নয় বলব? 'পরিচয়' সম্পাদকের অভিমতের ন্যায় আমার এই মতামতও চূড়ান্ত বলে গৃহীত হতে পারে না। সমঝদার মহলের কাছ থেকে সমালোচনা আমরা প্রত্যাশা করি। ছোট বড় ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি নিয়েও 'নবান্ন' এমন এক বহুপ্রত্যাশিত ফললাভ—যার সম্পর্কে এক কথায় রায় দেওয়া সম্ভবও নয়, সমীচীনও নয়। *

* পরিচয়, 'পাঠকগোষ্ঠী', অগ্রহায়ণ ১৩৫১। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক

নবান্ন / কালিদাস রায়

'নবান্নে'র অভিনয় এতই চমৎকার হইয়াছে যে, আমি যে নগরের রঙ্গালয়ে বসিয়া অভিনয় দেখিতেছি তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। হাবভাব, চালচলন, বাগ্‌বিন্যাস, উচ্চারণভঙ্গী এমন কি আকৃতি প্রকৃতিতে এমন যথাযথতা, কোনো অভিনয়ে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক। আমরা কাঙাল চাষীদেরই প্রতিবেশী। কাজেই যথাযথ হইল কি না বলিবার অধিকার আমাদেরই আছে—চিরনগরবাসীদের নাই।

এই অভিনয় দেখিতে গিয়া আব একটা কথা মনে হইয়াছে। নগরের শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা নাগবিক বেশ ত্যাগ করিয়া চাষা-চাষীদের বেশ ধারণ করিয়াছিল। মনে হয় নাই তাহারা চাষা-চাষাণীব ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে মনে হইয়াছে—গরীব, দুঃখী, চাষা-চাষাণী ও নগরেব যুবক-যুবতী একই জাতির লোক—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতি প্রকৃতিতে কোনো বৈষম্য নাই। কেবল জামা জুতা চশমা ঘড়ি চুরুট সিগারেট ইত্যাদিই পল্লী ও নগরের মধ্যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে—দর্জি ও ধোবা একই জাতির লোককে এতটা পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। এই পুরাতন সত্যকেই সেদিন হাবাধনের মতো যেন ফিরিয়া পাইলাম।

বহু কাব্য-উপন্যাসের মধ্য দিয়া বাংলাব দুঃস্থ দুর্গত পল্লীজীবনের চিত্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি; কিন্তু তাহাতে আমার তটস্থ উদসীন সাহিত্যিক মন বিচলিত হইয়া আমার নেত্রযুগলে বাষ্পের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। 'নবান্নে'র অভিনয় দেখিতে গিয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। এই অশ্রু অলস বাষ্প মাত্র নয়—সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে একটা অকপট কল্যাণ বুদ্ধির উন্মেষ হইয়াছে। মনে হইয়াছে এই দুঃস্থ দুর্গতগণের জন্য আমার যতটুকু করিবার ছিল তাহা করা হয় নাই। এজন্য অনুতাপ জন্মিয়াছে—নিজের আরাম বিলাসের হৃদয়হীন জীবন-যাত্রার প্রতি ধিক্কার জন্মিয়াছে—ভবিষ্যতে আমার যতটুকু সাধ্য ততটুকু করিবার জন্য সংকল্পও জাগিয়াছে। তাহাছাড়া দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ধর্ম, কৃষিশিল্প

ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে। মোটের উপর 'নবান্ন' আমার হৃদয় ও মস্তিষ্ককে আমূল আলোড়িত করিয়াছে। এই সমস্তই সাময়িক সন্দেহ নাই—কিন্তু মনের উপর একেবারে কোনো ছাপ রাখিয়া যায় নাই তাহা মনে হয় না। আজ একমাস অতীত হইল এখনো আমার মন হইতে 'নবান্নে'র ছায়া অপসারিত হয় নাই।

'নবান্ন' অভিনয় দেখিয়া সুখী হইয়াছি। 'নবান্ন'কে একটি পরিপূর্ণাঙ্গ নাটক না বলিয়া ইহাকে একখানি দৃশ্যকাব্য বলিতে চাই। ইহাতে গীতধর্ম অপেক্ষা চিত্রধর্মই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা কতগুলি জীবন্ত জ্বলন্ত প্রাণস্পর্শী দৃশ্যের একত্র গ্রন্থন, খাঁটি বাংলার জীবনসূত্রে, পঞ্চাশের মন্বন্তরের আবহাওয়ায়।

মাটির যাহারা খাঁটি মালিক—আসল বাংলাদেশ যাহাদের সুখদুঃখের মধ্যে অবিরাম স্পন্দিত হইতেছে তাহাদের উপেক্ষিত জীবনযাত্রা লইয়া রচিত নাটক বাংলা সাহিত্যে এই বোধহয় প্রথম। এই নাটক পূর্ববর্তী কোনো নাটকের অনুকৃতি নয়। ইহার বিষয়বস্তুতে মৌলিকতার দাবি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নবযুগে নাট্যসাহিত্যের ইহা অগ্রদূত।

আমরা নানা প্রবন্ধে, সংবাদপত্রে, কবিতায় ও উপন্যাসে দেশের মর্মস্থলের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু সে পরিচয় একটা কোনো না কোনো পর্দার মধ্য দিয়া। 'নবান্ন' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া আমাদের সম্মুখে দেশের মর্মস্থলকে প্রত্যক্ষভাবে উদঘাটিত করিয়াছে।*

* পরিচয়, পৌষ, ১৩৫১। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধনকরা হয়েছে। —সম্পাদক

নবান্ন / হিরণকুমার সান্যাল

'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্য-রচিত 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় বাংলা-দেশের একাধিক রসজ্ঞ সাহিত্যিকের মনকে কিরকম গভীরভাবে স্পর্শ করেছে তার প্রমাণ গত সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের ও এই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের চিঠি। এই দ্বিতীয় চিঠিটি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই কিন্তু স্বর্ণকমলবাবু তাঁর চিঠিতে গত কার্তিক সংখ্যায় সংস্কৃতি-সংবাদ প্রসঙ্গে 'নবান্ন' সম্পর্কিত যে সামান্য একটু মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল তাকে সম্পাদকীয় অভিমত গণ্য করে যে যে প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেছেন সেগুলির আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সর্বপ্রথম স্বর্ণকমলবাবুকে ও 'পরিচয়ে'র পাঠকগণকে এই কথা জানানো দরকার যে কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'নবান্ন' সম্বন্ধে মন্তব্য বিনা স্বাক্ষরে ছাপা হলেও প্রকৃতপক্ষে 'পরিচয়' কর্তৃপক্ষের সরকারী অভিমত নয়। এই অভিমতের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার একলার। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের আরও জানানো দরকার যে সাহিত্য বা সংস্কৃতি সংক্রান্ত ব্যাপারে 'পরিচয়ে'র সম্পাদকদ্বয় যে সব সময়ে একমত হবেন একথা ধরে নেওয়ার কোনো হেতু নাই; অনেক সময়ে হয়তো দুই সম্পাদকের মত এক হবে, কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের মত একেবারে ভিন্ন হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

তার কারণ এই যে যদিও মোটামুটি ভাবে 'পরিচয়' পত্রিকা একটি বিশেষ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দাবি রাখে, সাহিত্য ক্ষেত্রে এই মনোবৃত্তির পরিচায়ক এমন কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো আজ পর্যন্ত রচিত হয় নি যাতে ব্যক্তিগত মতামত পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। অবশ্য এই মতও সম্পূর্ণ আমার স্বকীয়। যদি কেউ এই জাতীয় নির্দিষ্ট কাঠামোর সন্ধান পেয়ে থাকেন, এই পত্রিকার পাতায় তার বিবরণ আমরা আগ্রহের সঙ্গে প্রচার করব। তবে আপাতত পাঠকদের জেনে রাখা ভালো 'পরিচয়' সঙ্ঘ বা 'পরিচয়ে'র পরিচালক বা সম্পাদকের সংস্কৃতি-সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গে সরকারী মতামত কিছু নাই—অবশ্য মোটামুটি একটা দৃষ্টিভঙ্গী আছে।

ইতি ভূমিকা। অতঃপর স্বর্ণকমলবাবু যে আলোচনা উত্থাপন করেছেন তাতে যোগদান করা যেতে পারে। স্বর্ণকমলবাবু ধরে নিয়েছেন আমি 'নবান্ন' একেবারেই অক্ষম নাটক সরাসরি এই রায় দিয়েছি। আসলে ঠিক এই ধরনের রায় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না, আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম নাটক হিসাবে 'নবান্ন' সক্ষম রচনা এই কথা একেবারেই বলা চলে না, অর্থাৎ 'একেবারেই' কথাটির জোর পড়েছে 'বলা চলে না'-র উপর 'সক্ষম নয়'-এর উপর নয়। অনিচ্ছায় ও অনিবার্য কারণে অত্যন্ত সংক্ষেপে ব্যক্ত করার ফলে আমার উক্ত মত যে অশোভনভাবে রূঢ় শোনায় তাতে সন্দেহ নাই। প্রথম আপত্তি ওঠে এখানে। স্বর্ণকমলবাবুর তরফ থেকে আপত্তির কারণ আরো আছে। এই অক্ষম রচনা কি করে আমার মতে নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করল, শুধু সাহিত্য জগতে নয়, রঙ্গমঞ্চেও? আমার এই পরস্পরবিরোধী উক্তিতে বিভ্রান্ত হয়ে স্বর্ণকমলবাবু জানতে চেয়েছেন 'পরিচয়' সম্পাদকের, অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমার প্রকৃত মত কি। অতএব, আমার প্রকৃত মত বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করছি। আশা করি তা পড়ে স্বর্ণকমলবাবু ও পাঠকবর্গ বুঝবেন যে উক্ত মন্তব্যের মধ্যে যে স্বতঃ-বিরোধিতা আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় তার কারণ 'নবান্ন' নাটকটির মধ্যেই এই বিরোধিতা থেকে গেছে। কেন, তা বুঝিয়ে বলছি।

'নবান্ন' নাটকের বহু ত্রুটি স্বর্ণকমলবাবু মেনে নিয়েছেন, কিন্তু এই ত্রুটিগুলি কাটিয়ে উঠে 'নবান্ন' নাটকীয় সার্থকতা অর্জন করেছে এই তাঁর অভিমত। এইখানে স্বর্ণকমলবাবুর সঙ্গে আমার প্রবল মতদ্বৈধ। 'নবান্ন' বই আমি পড়ি নি, কিন্তু অভিনয় দেখে যতদূর মনে হয় বহু উৎকর্ষ সত্ত্বেও নাটকীয় রচনা হিসাবে এর ত্রুটি এত গুরুতর যে 'নবান্ন' শেষ পর্যন্ত যথার্থ নাটকীয় সার্থকতা অর্জন করতে পারে নি।

অভিনয় দেখার এতদিন পরে এই নাটকটির সবগুলি ত্রুটির উল্লেখ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার সহজসাধ্য নয়। যে ত্রুটিগুলি বিশেষভাবে মনে পড়ে তারই উল্লেখ করছি। একেবারে প্রথম দৃশ্যে বিশেষ একটি গ্রামের ও সেই সঙ্গে সমগ্র দেশের যে অবস্থা উদ্‌ঘাটিত হয় পরবর্তী দৃশ্যগুলির সঙ্গে তার সংযোগের সূত্র অতি ক্ষীণ। এ ক্ষেত্রে ত্রুটি শুধু নাট্যকারের নয়, পরিচালকেরও। আচমকা কতকগুলো লোমহর্ষক ব্যাপার ঘটল, পরের ঘটনাপ্রবাহে থাকল তার অস্পষ্ট

রেশমাত্র। অর্থাৎ নাটকটির সূত্রপাতে এমন একটি রহস্য থেকে গেল যার সমাধান শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

কিন্তু তবু অভিনয় জমল, লেখকের মর্মস্পর্শী আলেখ্য অবলম্বন করে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নৈপুণ্য ও পরিচালক-প্রযোজকের শক্তিশালী পরিকল্পনার ফলে। মাঝে মাঝে স্খলন হয়েছে, যদিও গুরুতর নয়, যথা :

ছোট বৌর গায়ে হাত তোলার অপবাদ দিয়ে বড় ভাই নিরপরাধ ছোট ভাই-এর উপর যে-ভাবে গগনভেদী মারণ ও তাড়ন লীলা প্রকট করলেন তাতে বৌর মুখ বুঁজে থাকা ভাসুর-ভাদ্র বৌর সলজ্জ সম্পর্কের দোহাই দিয়েও অত্যন্ত অস্বাভাবিক, বিশেষত চাষীর ঘরে। 'তোরা যা, আমি যাব না।' বেসুরো গলায় এই সুরোৎপাদন প্রচেষ্টা খুব শোভন হয় নি ; ততোধিক অশোভন এই সঙ্গে নট ও নটীর তথা ভিক্ষুক ও ভিখারিণীর তালে তালে পা ফেলে নিষ্ক্রমণ। এই দৃশ্যে অশোভনতার চরম করুণ বংশী-বিলাপ। খেলো সিনেমা আঙ্গিকের এই অনুকরণ 'নবান্নে'র আসরে একেবারেই অপাংক্তেয়।

রিলিফ হাসপাতালের পরিবেশে ডাক্তারটির ছিমছাম পোশাক ও চাঁচাছোলা মুখস্থ-করা কেতাবী বয়েৎ সমান বেমানান। এক সত্যিকারের ডাক্তার নাকি এই ভূমিকায় নেমেছিলেন। একথা সত্য হলে, তাঁর পোশাক ও বুলি দুই-ই কিঞ্চিৎ অভিনয়দুরস্ত করে নেওয়া উচিত ছিল।

এই জাতীয় ত্রুটি হয়তো আরো দু-একটি আছে। এখন তার সঠিক বর্ণনা আমার অসাধ্য। যাই হোক, এগুলি গৌণ ত্রুটি—অত্যন্ত গৌণ। 'নবান্নে'র নাটকীয় সম্পূর্ণতাকে এরা অতি সামান্যই ক্ষুণ্ন করেছে। 'নবান্নে'র দুর্বলতম অংশ শেষ দৃশ্য। এই দৃশ্যে গ্রন্থকার যেভাবে তাঁর উদ্ভাবিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন তা শুধু রোমান্টিক ও অবাস্তব নয়, নাটকটির পূর্বাংশের সঙ্গে একেবারে সঙ্গতিহীন। মারী ও দুর্ভিক্ষে যে-গ্রাম ছারখার হয়েছে ও এই প্রচণ্ড দৈতবিভীষিকা যথেষ্ট নয় মনে করে গ্রন্থকার যে-গ্রামকে বন্যা দিয়ে বিধ্বস্ত না করে খুশী হন নি, ঠিক সেই গ্রামে সেই প্রধানের কুটির-প্রাঙ্গণে অক্ষত দেহে ফিরে এল একটির পর একটি গ্রামত্যাগী দুঃস্থ, যারা দু'দিন আগে শহরের পথের ডাস্টবিন্ হাতড়ে খুঁজেছে জীবনধারণের শেষ সম্বল। বৃদ্ধ প্রধান পর্যন্ত এই মিলনান্ত দৃশ্য থেকে বাদ পড়লেন না, তাঁর মাথা গেল বিগড়ে কিন্তু আশী বছরের প্রাচীন দেহ কায়কল্প চিকিৎসা না করেও শেষ পর্যন্ত রইল সক্ষম। মাঝখান

থেকে মারা গেল একটি অসহায় শিশু, তাও গ্রাম ত্যাগের আগেই। লেখকের এই শিশুহত্যার প্রবৃত্তি—পূর্ব নাটক 'জবানবন্দী' স্মরণীয়—তাঁর কলমের পক্ষে মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। এর ফলে সাময়িকভাবে যে করুণ রসের সৃষ্টি হয় নাটকের ঘটনা বিরচনে তা প্রায় অবান্তর।

কিন্তু নাটক হিসাবে 'নবান্নে'র এই গুরুতর ত্রুটি সত্ত্বেও অভিনয় ও পরিচালনায় অসাধারণ উৎকর্ষের ফলে 'নবান্ন' দেখে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারি নি, যেমন আরো বহু দর্শক হয়েছেন। এর ফলেই কথা উঠে—স্বর্ণকমলবাবু যার উল্লেখ করেছেন —একটি অক্ষম নাটককে অবলম্বন করে অভিনয় ও প্রযোজনার এতখানি কৃতিত্ব কি সম্ভব? এর উত্তরে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, তা যদি না সম্ভব হতো তাহলে বাংলাদেশে শিশির ভাদুড়ীর মতন অভিনেতার অভ্যুদয় হলো কি উপায়ে? 'সীতা' বা 'আলমগীর'কে যদি সক্ষম নাটক বলতে হয় তাহলে অক্ষম নাটক কাকে বলে জানি না। আরো দৃষ্টান্ত দিতে পারি, কিন্তু দরকার বোধ করছি না।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, 'নবান্ন' নাটক হিসাবে—'নাটক' কথাটির উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলছি—অক্ষম হলেও 'সীতা' বা 'আলমগীর'-এর মতন নিম্নশ্রেণীর রচনা নিশ্চয়ই নয়। 'নবান্ন' অক্ষম শুধু এই কারণে যে এর শেষ অংশ পূর্বর্তী অংশগুলি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, ঐ অংশগুলিতে ঘটনা-বিবর্তনের যে সূত্র পাওয়া যায় শেষ দৃশ্যে এসে তা একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে, ফলে নাটকটির স্বাভাবিক পরিণতি হয়েছে একেবারে পণ্ড। কিন্তু শেষ দৃশ্যটি বাদ দিলে যা বাকি থাকে তাকে যদিও সম্পূর্ণ নাটক বলা চলে না তবু একাধিক কারণে তা নিঃসন্দেহে অসাধারণ রচনা। কেন অসাধারণ সে কথা স্বর্ণকমলবাবু ও কালিদাসবাবু দুজনেই বলেছেন ও এবিষয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে একমত; তাঁদের সঙ্গে বিরোধ এই যে আমি 'নবান্ন' দেখেছি শুধু সমঝদারের দৃষ্টিতে নয়, সমালোচকেরও, তাই শেষ দৃশ্যের অসংগতি আমার চোখ এড়ায় নি।

কিন্তু এই শেষ দৃশ্যই আবার অন্যান্য পাঁচজনের মতন আমারও চোখে বোধ হয় সব চাইতে ভালো লেগেছে। এই দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে পুরো একটি জনতা। এতগুলি লোককে স্টেজে নামালে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, বহুক্ষেত্রে হয়েও থাকে তাই। এক্ষেত্রে কিন্তু এতগুলি লোককে যেভাবে বাগ মানানো হয়েছে তাতে এই দৃশ্যটির পরিচালনায় ও পরিকল্পনায়

অসাধারণ বাহাদুরির তারিফ না করে পারা যায় না। এই বাহাদুরির ভাগীদার হিসাবে অন্যতম পরিচালক বিজনবাবুকে তাঁর প্রাপ্য দিতে আমি একটুমাত্র কুণ্ঠিত হব না, যেমন হব না অভিনেতা হিসাবে তাঁর প্রশংসা করতে। জায়গায় জায়গায় মনে হয়েছে যে বিজনবাবুর অভিনয়ে একটু যেন আতিশয্য এসেছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার মনে যথেষ্ট দ্বিধা আছে।

মোটকথা এই যে, যদিও বিজনবাবু একটি সক্ষম নাটক লিখে উঠতে পারলেন না, অর্থাৎ যে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল নাটকটির প্রথম দিকে শেষ পর্যন্ত তা গেল ভেস্তে, তবু এমন একটি নাটক রচনার চেষ্টা তিনি করেছেন যা শুধু চেষ্টার গুণেই স্মরণীয়। অবশ্য গুণ শুধু চেষ্টার নয়। সংলাপে, বিষয়বস্তুতে, ঘটনা-সমাবেশে, বিজনবাবুর কলম ও কল্পনা এতদূর এগিয়েছে যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ও বাংলা সাহিত্যে তিনি নতুন হাওয়া এনেছেন, এই কথা না বললে তাঁর প্রতি অবিচার হবে। কিন্তু এই নতুন আবহাওয়ার স্রষ্টা একা বিজনবাবু নন, তাঁর সঙ্গে ও তাঁর পেছনে রয়েছে গণনাট্য সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের প্রেরণা ও উদ্যম ছাড়া বাংলার রঙ্গমঞ্চে 'নবান্নে'র অভ্যুদয় ছিল অসম্ভব। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় কুশলতার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কেন না তা অবিসংবাদিত।

আরো একটু তর্ক থেকে গেল। স্বর্ণকমলবাবু 'নবান্ন'কে নবাঙ্কুরের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন—এর 'ত্রুটিগুলি অধিকাংশ তার birth-marks, নতুন ভুঁইফোঁড় নয়'। নবাঙ্কুরের দোষত্রুটিকে birth-marks, অর্থাৎ অনিবার্য বলে উড়িয়ে দেওয়া বা অন্তত মেনে নেওয়া কি খুব সমীচীন? ইতিহাসের আমোঘ বিধানকে সাহিত্যিকের কলমের আগায় এইভাবে বিলম্বিত করে সমালোচকের ভাত মারার চেষ্টা কি একটু বাড়াবাড়ি নয়? সে যাই হোক এই কথা অবশ্যই স্বীকার করব 'নবান্ন' সত্যিকারের জননাট্যের পথ তৈরী করেছে। এইখানেই তার মহত্তম স্বার্থকতা।

আমার শেষ কথা এই যে, গণনাট্য সঙ্ঘ তাঁদের নামের সম্পূর্ণ উপযোগ্য নাটক আজ পর্যন্ত পেলেন না, কিন্তু তাতে তাঁদের অগ্রগতি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। নিখুঁৎ গণনাটক রচনার আশায় বসে না থেকে উপস্থিত যা পাওয়া যায় তাই নিয়েই আসরে নামার প্রায়াজন ছিল। গণনাট্য সঙ্ঘ সাহসের সঙ্গে আসরে নামলেন, বিজনবাবুও সাহসের সঙ্গে রচনা করলেন প্রথমে 'জবানবন্দী' ও পরে 'নবান্ন'। ঠিক গণনাটক বোধ হয় হল না, কিন্তু ভবিষ্যতে যাতে পুরোদস্তুর

গণনাটক হতে পারে তার অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এখন গণনাট্য সঙ্ঘকে এগোতে হবে পরীক্ষণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে। 'জবানবন্দী' বা 'নবান্ন' সার্থকতা অর্জন করল সাহিত্য হিসেবে নয়, গণনাট্য সঙ্ঘের এই পরীক্ষণ ও বর্জনের পথকে প্রশস্ত করার জন্যে।*

---

*পরিচয়, পৌষ ১৩৫১। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক।

মন্বন্তর ও সাহিত্য / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে নাটকের ক্ষেত্রে নূতন আবেগ এবং নূতন সুর যোজনা করেছেন বিজন ভট্টাচার্য। এই মন্বন্তরকে অবলম্বন করেই সে সুর, সে আবেগ পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক ব্যাকরণ অনুযায়ী হয়তো এখনও আদর্শ নাটক হয় নাই, কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যে যে প্রচণ্ড অবরুদ্ধ আবেগ সে সত্যই অতুলনীয়। এই সঙ্গে তার অদ্ভুত অভিনয়-প্রতিভার কথাও প্রসঙ্গক্রমে আমি উল্লেখ করছি। নাটকের ক্ষেত্রে বিজন ভট্টাচার্যের আগমন বিপুল প্রত্যাশার সঞ্চার করেছে।

এইখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই মন্বন্তরের জন্য দায়-দায়িত্ব ১৩৫০-এর অথবা তার পরবর্তীকালের রচনার বাংলার সাহিত্যিকেরা চিরাচরিত প্রথায় অন্ধের মতো অসহায়ভাবে বেচারা ভগবানের উপর চাপিয়ে দেন নাই। বাংলার সাহিত্যজীবনে এটি নব-ভাবোপলব্ধির একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত।*

---

* পরিচয়, চৈত্র, ১৩৫১। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক

ভারতের মর্মবাণী / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতির কোনো বিশিষ্ট রূপ ও ধারাকে সংস্কারের মতো রূপান্তরহীন করে রাখলে তার কোনো ভবিষ্যত থাকে না, তার মৃত্যু অনিবার্য। লোক-কলাকে বাঁচাবার ও লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে তাকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্য তখনই সফল হতে পারে, যদি জনগণের জীবনের বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা যায়, তাদেরই জীবন্ত আনন্দ-বেদনা আশা-নিরাশা সঙ্কট ও সমস্যা রূপায়িত হয়। গণনাট্য সঙ্ঘ এটা উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা তাই শুধু দেশের সামনে লোক-কলার কতগুলি নমুনা ধরে দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান নি— জাতির এই সম্পদকে রক্ষা করা চাই। জানালে সেটা অরণ্যে রোদন হতো মাত্র। নিজেরাই তাঁরা কাজটা আরম্ভ করেছেন—দেশের সামনে শুধু আদর্শটা নয়, উপায়টাও ধরে দিয়েছেন। সকলের মন তাই নাড়া খেয়েছে, সাড়া মিলেছে।

এই কার্যে ব্রতী তরুণ ও অ্যামেচার অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিয়ে গড়া এই বাহিনীটির বয়স এক বছরও পূর্ণ হয় নি। এঁদের এই অপূর্ব অভিনয় নৈপুণ্য কোথা থেকে এলো? কি এঁদের অভিনব সাফল্যের মর্মকথা? এর একটিমাত্র জবাব জানি—এঁরা শুধু শিল্পপ্রাণ নন, দেশপ্রাণও বটে। আর্টের জন্য আর্টের ধোঁয়ায় এঁদের চোখ কটকট করে না, শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধে এঁদের দ্বিধাও নেই, দুর্বলতাও নেই। এই প্রসঙ্গে গণনাট্য সঙ্ঘের বাংলা শাখার এমনি অল্পবয়সী অ্যামেচার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রদর্শিত 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'-র কথা স্মরণীয়। এ দুটি নাটক নাট্য-জগতে কি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে কারো তা অজানা নয়। 'নবান্ন' অভিনয়ের জন্য আজ চেষ্টা করেও স্টেজ ভাড়া পাওয়া যায় না। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কর্তারা ভয় পেয়ে গেলেন। অথচ এঁদের সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করার কোনো ইচ্ছাই গণনাট্য সঙ্ঘের নেই—এঁরা ব্যবসায়ী নন, লাভের টাকা শিল্পী বা পরিচালক কারো পকেটে যায় না। বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য বাংলা শাখা বোম্বাই ও পাঞ্জাবে সফর দিয়ে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করেছিল, 'নবান্ন' অভিনয়ের কয়েক হাজার টাকা বাংলার মহামারীর চিকিৎসায় লেগেছে।

রঙ্গালয়ের পরিচালকদের তবু এ আতঙ্ক কেন ? সোজাসুজি প্রতিযোগিতার ভয় এঁদের নেই—এঁদের ভয় দর্শক-সাধারণের রুচির পরিবর্তনে। কিন্তু সস্তা নাটক ও সস্তা অভিনয় দিয়ে দর্শককে ভুলাতে বাংলা রঙ্গমঞ্চের কর্তারাই বা চাইবেন কেন ? আর, তাঁরা যদিই বা মুনাফার লোভে তা চান, রঙ্গমঞ্চের শিল্পীরা কেন তাতে সায় দেবেন ? তাঁরা কি নূতনতর সৃষ্টিতে ও সৃষ্টির তাগিদে সাড়া দিতে পারবেন না—এতই জড়তা প্রাপ্ত হয়েছেন ?

এই আতঙ্ক ও প্রতিকূলতার প্রতিরোধের মধ্যেও গণনাট্য সঙ্ঘের আন্দোলনের ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেখতে পাই। দেশ এঁদের আন্দোলনকে সমর্থন ও গ্রহণ করেছে—সারা দেশে এঁদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে।

কথা-শিল্পী হিসাবে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের কাছে একটি ব্যক্তিগত ঋণের কথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা পাওয়াব ঋণ নয়, ওটা শুধু আমাকে নয় সকলকেই ওঁরা পরিবেশন করেছেন, সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবার প্রয়োজন ছিল। সাহিত্যিক হিসাবে আমার একটি ভীরুতা সম্বন্ধে এঁরা আমাকে সচেতন করেছেন। পাঠক-সাধারণকে একটু বেশীরকম ভোঁতা ও একগুঁয়ে মনে করার প্রতিক্রিয়া অনেক লেখকের রচনাতেই কতগুলি অনাবশ্যক সতর্কতা হয়ে দেখা দেয় নানা ভাবে, সমস্ত রচনাটিকে প্রভাবান্বিত করে। লেখকের ভীরুতাই এজন্য দায়ী। সঙ্ঘের অভিনব প্রচেষ্টাকে সাধারণ দর্শক যেরকম উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন তাতে আমি উপলব্ধি করেছি যে আমরাই, লেখক ও শিল্পীরাই, পাঠক ও দর্শক-সাধারণের ঘাড়ে অযথা দোষ চাপাই, তাঁদের কতগুলি সঙ্কীর্ণতা ও বিরোধিতা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই। আসলে তাঁরা আমাদের সব রকম সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে সর্বদাই প্রস্তুত, আমরাই তাঁদের এই উদারতা স্বীকার করতে ভয় পাই। আমি বিশ্বাস করি নিজের এই দুর্বলতা চেনার ফলে আমার লেখার উন্নতি হবে। *

* পরিচয়, চৈত্র, ১৩৫১। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

নবান্ন / চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

কিছুদিন পূর্বে 'নবান্ন' অভিনয় দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া অভিনয় দেখিয়া আসিতেছি, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে গত ও বর্তমান যুগের বহু অভিনেতার নটনৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছি; তাহার ফলে যতটুকু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে দৃঢ়তার সহিত একথা বলিতে পারি 'নবান্নে'র অভিনয়ে যে নৈপুণ্য লক্ষ্য করিয়াছি তাহার তুলনা, সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও সুলভ নহে।

'নবান্ন' দেখিতে যাইবার পূর্বে উহার সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা শুনিয়াছিলাম; কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, উহাতে প্রচ্ছন্নভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধ সমালোচনা আছে, দলীয় মতের প্রচার আছে, ইত্যাদি। কিন্তু আমি যাহা দেখিলাম তাহাতে এরূপ সমালোচনার অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয় না। দেশের দুর্গতির চিত্র প্রদর্শন হিসাবে এই অভিনয়ের আয়োজন কংগ্রেস বা হিন্দুসভাও করিতে পারিতেন, তাহাতে দোষের কিছু হইত বলিয়া মনে হয় না। ছোট ত্রুটিগুলির উল্লেখ করিলাম না।*

* পরিচয়, 'সংস্কৃতি-সংবাদ', বৈশাখ, ১৩৫২। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক

জবানবন্দী ও নবান্ন / হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

The conference concluded on January 17, with another cultural festival at Minerva Theatre, which was inaugurated by a leading dramatist, Sachin Sengupta. Apart from the items noticed before, the feature of the evening was Bijon Bhattacharyya's 'Jabanbandi', the most successful play on the food crisis which we have got so far. It tells of the trek of a peasant family to a town in search of food, of death and the slow, unwilling degeneration of some in the family, and of the toughness and the simple nobility of the worker on the land who decides on going back home. Written in an idiom which is racy, of the soil, 'Jabanbandi' is a play to cherish : Bijon Bhattacharyya excelled also as one of the main characters, Gangapada Bose gave a superb piece of acting, and Sudhi Pradhan's performance was hardly less creditable. No praise however, can be adequate for Tripty Bhaduri and Anoo Dasgupta, who in roles of peasant women would beat any professional hollow, for Reba Roy, and the two little kids who moved on the stage as to the manner born. We all thought of the director of the play, comrade Sambhu Mitra, who was kept away by an attack of malaria contracted at the Mymensingh Kisan School.*

....

The last three days were earmarked for performances—before at least 7,000 people—of Bijon Bhattacharyya's NAVANNA (the famous Bengali play, The Harvest) and the IPTA central squad's dances. Never before in calcutta had a play or a ballet been produced before such vast congre-

* People's war, February 13, 1944.

gations, which brings together perhaps the country's most talented dramatic team under the joint direction of Bijon Bhattacharyya and Sambhu Mitra, and the IPTA ballets directed by Shanti Bardhan, have become so popular that the Calcutta public keeps on coming to see them in increasing numbers every time. They provided a fitting finale to the celebrations during the Conference.*

* People's War, April 1, 1945
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'People's War'-এ তৎকালে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রায় নিয়মিতভাবেই প্রতিবেদন পাঠাতেন। সেই প্রতিবেদন থেকে 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' সংক্রান্ত অংশ দুটিই শুধু এখানে প্রকাশ করা হল। পূর্ণ প্রতিবেদন দুটির জন্য এই গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য।
—সম্পাদক

গণনাট্য সঙ্ঘের নৃত্যাভিনয় / গোপাল হালদার

মাঘ মাসের (১৩৫১) শেষ সপ্তাহ ও এই ফাল্গুনের প্রথমার্ধ জুড়ে যেসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এদেশে হয়েছে, তার মধ্যে কলকাতায় 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে'র নৃত্যোৎসবটিকেই প্রধান স্থান দিতে হবে। এই নৃত্যোৎসব দেখে আমরা সকলেই ভারতবর্ষের লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের একটা নূতন পরিচয় লাভ করেছি, সকলেই উপলব্ধি করেছি—ভারতের লোকজীবন কত সুন্দর সম্ভাবনাময়।

কথাটা যে কত সত্য, তা বুঝবার জন্য একদিনকার কথাই বলি। সে দিন দুজন খ্যাতনামা বন্ধুর পাশে বসে এই নৃত্যোৎসব দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল (১৩ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার)। তাঁদের একজন লেখক-সম্পাদক আর একজন এক প্রধান ঔপন্যাসিক।

অভিনয় আরম্ভের প্রথম দিকে আমরা বিলম্বে আগত দর্শনার্থীদের যাতায়াতে একটু বাধা পাচ্ছিলাম।……

নৃত্যোৎসব আরম্ভ হলো। দর্শনার্থীদের বাধা সত্ত্বেও উদ্বোধন-সংগীত বন্ধুদ্বয়ের ভালো লাগল। 'দামামার আহ্বান' দেখে সম্পাদক নিজ থেকে বললেন, 'সুন্দর'। তারপর বললেন, 'দামামা-বাদক আরও একটু পেশীবহুল হলে আরও ভালো হতো'। নিজের মতামত দিয়ে আমি তাঁদের উপভোগে বিন্দুমাত্র বাধা সৃষ্টি করতে চাই নি, তাঁদের স্বতঃউচ্ছ্বসিত মতামতই শুনতে লাগলাম। হায়দ্রাবাদের বেদে নাচ 'লাম্বাডি নৃত্য' দেখে দুইজন সাহিত্যিকই তন্ময় হয়ে গেলেন। সম্পাদক-বন্ধু তা শেষ হতে বার বার বললেন, 'অপূর্ব'। ঔপন্যাসিক-বন্ধু সানন্দে বললেন, 'চমৎকার'।

এল তারপর শচীন্দ্রশঙ্করের একক নৃত্য—'তার মৃত্যু হলো অনাহারে'। বন্ধুদ্বয়ের তা ভালো লাগল। এলো 'ধোবী নৃত্য'—বুঝলাম বন্ধুরা জমে গেছেন। তারপর হলো 'তাঁরা আবার মিলিত হোন্'। গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার নিয়ে এটি রচিত ; সেই সাময়িক কাহিনী পেয়েছে নৃত্যে-গানে রূপ। শেষ

হতে সম্পাদক-বন্ধুই সপ্রশংস চোখে বললেন, 'ভালো হয়েছে—তবে মতটা ভালো নয়'। ঔপন্যাসিক-বন্ধুও সায় দিলেন সস্মিত মুখে, 'হাঁ, তবে হয়েছে ভালো'। তারপর 'যৌথ কৃষির নৃত্য'। সম্পাদক ও ঔপন্যাসিক দুই বন্ধুই তখন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন, তাঁদের চোখে-মুখে আর আনন্দ ধরে না।

দশ মিনিট বিরামের পর হলো 'রামলীলা'। পশ্চিমের রামলীলার অভিজ্ঞতা আছে ঔপন্যাসিক বন্ধুর। যখন নৃত্যগীত রঙ্গমঞ্চে জমে উঠতে লাগল নিজ থেকেই তিনি বললেন—'এবার রামলীলার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে'। তারপর যখন শেষ হলো—হাসি মুখে বললেন, 'বেশ নিখুঁত হয়েছে'। শেষ নৃত্য 'ভারতের মর্মবাণী'। তা শেষ হলো যখন তখন সম্পাদক-বন্ধু যেন উন্মনা হয়ে গিয়েছেন, আর ঔপন্যাসিক-বন্ধু হয়েছেন উল্লসিত।

দাঁড়িয়ে উঠে বেরুতে বেরুতে ঔপন্যাসিক-বন্ধু সোৎসাহে বললেন, 'অদ্ভুত'। আমি জানতে চাইলাম—সমালোচক হিসাবে কি খুঁত দেখলেন তাঁরা। ঔপন্যাসিক-বন্ধু বললেন, 'গলা বাড়িয়ে দেওয়া (রামলীলায় ?) বোধ হয় লোকনৃত্যে দেখি নি—ঠিক জানি না। তা হলেও খুব ভালো লেগেছে'। সম্পাদক-বন্ধু বললেন, 'ভারতের মর্মবাণীর গান ও নৃত্য ভালো, কথা কিন্তু দুর্বল। আর সমস্ত জিনিসটা সংক্ষিপ্ত মনে হয়। তা ছাড়া, তাতে বাঙলা দেশই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু সব সত্ত্বেও অদ্ভুত'। ঔপন্যাসিক-বন্ধু কিন্তু ঐ ঐতিহাসিক পর্বকে দীর্ঘতর করবার পক্ষপাতী নন। বললেন, 'তাতে একঘেয়ে হয়ে উঠবে জিনিসটি'।

সম্পাদক-বন্ধু লেখকও। বললেন, 'ভারতের মর্মবাণীর মতো একটি দু'ঘণ্টার নাটক আমাদের 'সঙ্ঘ' পরিকল্পনা করেছে। আমি লিখেছি গান, আর একজন লিখেছে গদ্যাংশ'। সম্পাদক-বন্ধুর গৃহেই চলেছিলাম—তিনি নিজের লেখা নিয়ে এলেন, পড়ে শোনালেন। দুটি কবিতার অধ্যায়—একটিতে ইংরেজ আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষের পল্লীবাসী, তাঁতী, কুলনারী প্রভৃতিদের গীত—'দিল্লী অনেক দূর'। আরটি ইংরেজ আগমনের পরে তাঁদের গীত—অতিথিকে সম্বর্ধনা, অতিথি উত্তরে খুঁজছে মুনাফার ব্যবসা।* মোটামুটি বেশ কাব্যরস আছে কবিতাগুলোতে। পাঠ শেষ হলে ঔপন্যাসিক-বন্ধু বললেন, 'বেশ, এটা অভিনয় করো না'? সম্পাদক-বন্ধু বললেন, 'আমাদের লোক কই ?'

---

*কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের উদ্যোগে অভিনীত 'অভ্যুদয়ে' পরে এসব গানই স্থান লাভ করেছে।—লেখক

• আমি জানালাম—শৃঙ্খলানুবর্তী ও জনশক্তিতে বিশ্বাসী বলে ছ' মাসেই গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পীরা এ সব শিখেছে। অন্যেরাও নিশ্চয়ই তা পারবে।

রাত হয়েছে, বিদায় নিচ্ছিলাম। ঔপন্যাসিক-বন্ধু বললেন, 'এই তো নাটকের বিষয়বস্তু। আমরা রামায়ণের মহাভারতের কাহিনী নিয়ে কবিতা-নাটক লিখি। কেন লিখি? কারণ লোকের মনে সে জিনিস একটা ক্ষেত্র তৈরী করে রেখেছে। সমস্ত ভারতবাসীর মনে তেমনি তৈরী হয়ে আছে এই রসের ক্ষেত্র—ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় ও পরাধীনতার বেদনায় সে মন পরিপূর্ণ। এ নিয়েই নাটক লিখব আমি—কিন্তু লিখব কি? নাট্যশালার কর্তাদের জন্য লিখতে ইচ্ছা করে না'।

সেই সমস্যাও জানি। সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্তারা আজ 'নবান্ন' অভিনয় করবার জন্য রঙ্গশালা ভাড়া দিতেও চায় না। বলে—নবান্ন অভিনয়ে তাদের ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়। বললাম বন্ধুকে, 'আপনি নাটক লিখুন। গণনাট্য সঙ্ঘ অভিনয় করবে।'

বিদায় নিলাম। দেখলাম লোককলায় উদ্বুদ্ধ দুজন সাহিত্যিককে; একজন একটু উন্মনাও, আর একজন তেমনি উল্লসিত।

পরদিন গণনাট্য সঙ্ঘের দু'একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি বললেন সম্পাদক?' যা শুনেছি আগে তাই বললাম।

তাঁরা জানতে চাইলেন, 'কি লিখবেন সম্পাদক?' হাসলাম। অনুমান করতে পারি।

অনুমান যে মিথ্যা হয় নি তা দেখলাম 'শনিবারের চিঠি' ফাল্গুন সংখ্যায়। সেই সম্পাদক-লেখক ছিলেন সজনীকান্ত দাস, আর ঔপন্যাসিক-বন্ধু 'বনফুল'।*

[ফাল্গুন, ১৩৫১]

*গোপাল হালদার, 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ,' প্রথম সংস্করণ, ১৯৪৭, পৃ. ১৮:-৮৭; রচনাটি 'পরিচয়' পত্রিকার ১৩৫১ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক

কালচার ও কমিউনিস্ট দায়িত্ব / গোপাল হালদার

কালচার বলতেই আমাদের দেশের কোনো কোনো রাজনীতিক দলের মনে কিছুদিন পূর্বে একটা কৌতুকের বা সন্দেহের উদয় হতো। তারা কৌতুক বোধ করত এই ভেবে—'কালচার মানে তো কবিতা, সাহিত্য, নৃত্য, গান, চিত্র—এসব জিনিস, ওসব আমাদের মতো কাজের মানুষদের জন্য নয়'। সন্দেহ বোধ করত এই ভেবে যে, 'কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প এসবে মানুষ সাড়া না দিয়ে পারে না। আমরা কাজের লোকের হাজার 'কাজের কথা' লিখে ও চেঁচিয়ে যা করি, ও সব বাজে জিনিসের প্রভাবে তা অতি সহজে ধুয়ে মুছে যায়।' এসব বিপ্লববাদীরা কেউ তাই কালচার শুনলে রুখে দাঁড়াত, কেউ মুচকি হেসে তার পাশ কাটিয়ে যেত। আর কেউ বা গম্ভীরভাবে তত্ত্ব কথা শোনাত—"আমরা হলাম কাজের মানুষ, আমরা কি হাসতে পারি, নাচতে পারি ?"

রাজনৈতিক কর্মীদের মনে এ ভাবে একটা ধারণা জন্মেছিল যে কালচার বা সংস্কৃতি বুঝি তাদের ভাববার মতো ও বুঝবার মতো জিনিস নয়। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনৈতিক প্রয়াস আগেকার যুগে কালচারের সঙ্গে তেমন নিঃসম্পর্কিত ছিল না। তার কারণ সহজেই বুঝতে পারি। আমাদের দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন ঠিক ভাবে রূপ নিতে থাকে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে। তার আগেই কিন্তু আমাদের দেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ জন্মলাভ করতে শুরু করে। রামমোহন রায়ের পরে ধীরে ধীরে যে কালচারাল্ রিনেইসেন্স বা "সংস্কৃতির নবজন্ম" দেখা দেয়, এই দেশপ্রীতি ও স্বাজাতিকতা তাতেই আমাদের মনে রূপ লাভ করতে থাকে। একটা সংস্কৃতিমূলক নূতন চেতনা আমাদের মনে হিন্দু স্কুলের পর থেকে ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষায় জাগতে থাকে। তারই ফল মাইকেল মধুসূদন, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি, আর শেষে বঙ্কিম, দীনবন্ধু, হেম, নবীন প্রভৃতি সাহিত্যিকেরা। এই চেতনাই প্রথম দিকে ধর্মসংস্কারে (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজ, পরে শ্রীরামকৃষ্ণ) সমাজসংস্কারে (কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিবেকানন্দ) দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাব্যে (মধুসূদনে), গানে (প্রথম দিকের হিন্দুমেলার

স্বদেশী গান, কিংবা সেদিনের ধর্ম-সঙ্গীত, ব্রহ্ম-সংগীত প্রভৃতিতে) উপন্যাসে, নাটকে (বঙ্কিমে, দীনবন্ধুতে), নানা ঐতিহাসিক রচনায় প্রবন্ধসাহিত্যে (রাজনারায়ণ বসু, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ে) এই সংস্কৃতির চেতনা ফুটতে থাকে। এঁদের রীতি, লেখা, প্রেরণা থেকেই আমাদের দেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ ক্রমেই পরিষ্কার রূপ গ্রহণ করতে পারে।

এইরূপে সামাজিক ও সাহিত্যিক ক্ষেত্র থেকে নতুন শক্তি সংগ্রহ করে নিয়ে এই চেতনাই ক্রমে ১৮৮০-এর পর থেকে রাজনীতিক কর্মে দানা বেঁধে ওঠে। তাই, সেই প্রথম যুগ থেকেই দেখি আমাদের রাজনীতিক সভা-সমিতি আরম্ভ হতো গান দিয়ে ; তাতে কবিতা আবৃত্তি হতো ; পাঠ হতো। সেদিনে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সংস্কৃতি-কর্মীরা সে-সব সভার উদ্বোধনে সাহায্য করতেন। তারপরে এল স্বদেশী যুগ। তখন তো বাঙলাদেশে অন্তত রাজনীতি আর সংস্কৃতির প্রয়াস সমান তালে চলেছিল। কাব্যে, গানে নাটকে, চিত্রে সমস্ত দিক দিয়ে যেন বাঙালী সেদিন ফুটে উঠতে চেয়েছিল। সেদিনকার সে-সব কথা মনে রাখলে এদেশের রাজনৈতিক কর্মীদের পক্ষে 'কালচারকে' অন্তত দূরের জিনিস বলে ভাবা চলত না। কিন্তু সেই জোয়ারে একদিন ভাটা পড়ল। রাজনৈতিক কর্মীরা এমনকি বিপ্লবীরাও তারপর থেকে সংস্কৃতি-সেবকদের আর নিজেদেরই সহযোগী বলে ততো সহজে ভাবতে পারেন নি। একবার মাঝখানে নজরুলকে পেয়ে বাঙালী বিপ্লবীরা উৎসাহিত হন। এখনো সভা-সমিতির উদ্বোধনে গান হয়, স্বদেশী কবিতাও হয়ত আবৃত্তি হয়, কিন্তু তা যেন খানিকটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হয়ে গিয়েছে।

আমরা কমিউনিস্টরাও যে এ-মনোভাব একেবারে কাটিয়ে উঠেছিলাম, তা নয়। আমাদের পক্ষে এ-রকম ভুল করবার কারণ ছিল আরও বেশী। কারণ আমরা জানতাম, আমরা 'শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি, বিপ্লবী পার্টি।' অথচ আমরা দেখতাম আমাদের গল্পে, কাব্যে, সাহিত্যে, গানে, চিত্রে, কালচারের নানা কথায় যা চলছে তাতে সত্যই বিপ্লবের বড় কিছু নেই। গরম গরম কথা থাকতে পারে, কিন্তু আসলে বিপ্লবী চিন্তা নেই এসব গানে, কবিতায়, গল্পে, নাচে, নাটকে। শ্রমিকশ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তো নেই-ই, তাদের অস্তিত্বের কথাও প্রায় নেই। আছে মধ্যবিত্ত ও বড় লোকদের মন-ভাঙ্গাভাঙ্গি আর মান নিয়ে কান্না-

কাটির কথা। এসব কারণে আমরাও তখন (১৯৪০ পর্যন্ত) ভাবতাম কালচার একটা সৌখীন ব্যাপার।

তবু আমাদের কমিউনিস্টদের মধ্যে কালচার সম্বন্ধে ততটা বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা দেয় নি। আমাদের ঐতিহাসিক বোধ স্পষ্ট বলেই তা হয়েছে। কিন্তু কালচার বা সংস্কৃতির আসল মানে তাই বলে আমরা সকলে ঠিক মত বুঝেছি, এবং বুঝে তা গ্রহণ করেছি,—এ কথা এখনো বলা চলে না। পার্টির যাঁরা নেতা তাঁরা এসব দিকে খুব মনোযোগ দেওয়ায় কমিউনিস্টকর্মী ও মতবাদীদের কালচারের উপর শ্রদ্ধা বেড়েছে। তাছাড়াও কয়েকটা বড় বড় জিনিস থেকে সবাই আমরা বুঝেছি—কমিউনিস্টগণ তাদের সংস্কৃতি-বাহিনী ও কালচারমূলক প্রয়াসের দ্বারা এদেশেও কতকটা শক্তিশালী হয়েছে। যেমন, আমাদের সামান্য স্কোয়াড গানে, নাচে, অভিনয়ে, চিত্রে পাঞ্জাব থেকে হাজার হাজার টাকা বাঙলার দুর্ভিক্ষ সাহায্যে তুলে আনল। তাতে পিপলস্ রিলিফ কমিটির কাজের খুব সুবিধা হলো। দ্বিতীয়ত দেখছি—আমরা হাজার চেঁচিয়ে আর কাগজ ছড়িয়ে যা বুঝাতে চেষ্টা করি আমাদের সামান্য নাচ, গান, অভিনয়, ছবি তা সাধারণ মানুষকে কত সহজে বুঝিয়ে দেয়। পাঞ্জাবে তারও প্রমাণ পেয়েছি। বেজওয়ারা কৃষক-সম্মেলনে রাত্রি সাড়ে তিনটায় যখন কমরেড উষার 'ম্যায় ভুখা হুঁ' নৃত্য শেষ হলো তখন সেই ষাট-পঁচাত্তর হাজার নরনারীর দেখেছি বাঙলাকে বাঁচাবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা। তৃতীয়ত দেখছি, এইসব সংস্কৃতিমূলক চেষ্টার মধ্য দিয়ে জ্ঞানী এবং গুণীদেরও আমরা আমাদের পার্টি সম্বন্ধে খানিকটা শ্রদ্ধান্বিত করতে পেরেছি। বোম্বাই-এ আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্কৃতির (স্কোয়াড) গোষ্ঠীর অভিনয় দেখে সেখানকার শিল্পীরা আকৃষ্ট হন, সেখানকার বিত্তবানদের মধ্যেও শ্রদ্ধা জাগে, কংগ্রেস নেতারাও আমাদের সম্বন্ধে আশ্বস্ত বোধ করেন। কলকাতায় ও বাঙলার অন্যান্য জায়গায় যেখানে আমরা সত্যি আমাদের প্রয়াস ফুটাতে পেরেছি, সেখানেই দেখেছি জ্ঞানী ও গুণীরা আমাদের সমাদর করেছেন। তাই দেখেছি পার্টির সংস্কৃতিমূলক আন্দোলনে দুর্ভিক্ষে সাহায্য আসছে, সাধারণ লোকে আকৃষ্ট হচ্ছেন, জ্ঞানীগুণীরা আকৃষ্ট হচ্ছেন, গণস্বার্থের শত্রুরাও বধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, এবং এ সবের সূত্রে কমিউনিস্ট মতে আবার নূতন নূতন শিল্পীরাও আসছেন, আর সাধারণ মানুষও আসছেন।

এ হলো নগদ হিসাবের দিক কিন্তু আসলে লাভ আরও বড়। সে লাভ এই :

প্রথম কথা, আমাদের কৃতিত্ব দেখে সমাজের বুদ্ধিজীবীর দল বুঝতে পারছেন, তাই তো কমিউনিস্টরা যে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। তাতে করে এসব গুণী লোকদের শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব পুরানো ধারণা ছিল তা ভাঙতে শুরু করেছে। আবার কমিউনিজম্ সম্পর্কে ভুল ধারণা বদলে যাচ্ছে। অন্যদিকে ধনীদের সঙ্গে এই গুণী ও জ্ঞানীদের মানসিক তফাৎ বাড়ছে—গুণীজ্ঞানীরা ক্রমেই কমিউনিস্ট মতের নিকটবর্তী হচ্ছেন। দ্বিতীয় কথা ঃ আমাদের সংস্কৃতি-উৎসব দেখে শ্রমজীবী ও কৃষকেরা বুঝছে, তাইতো, আমাদের জনশিল্পের নিদর্শনগুলো তো বাজে নয়। আর, তার থেকেও সত্য কথা আমরা দেখছি আমাদের শ্রমিক-কৃষকেরও শিল্পশক্তি বাড়ছে, যদি তারা চর্চা করে তা ক্রমেই ফুটে উঠবে। অর্থাৎ culture for the people, of the people, by the people-এরও চেতনা আসছে।

এইটিই কমিউনিস্ট কর্মীদের পক্ষে আসল কথা। আমরা তো জানি সভ্যতা আজ বানচাল হয়ে পড়েছে। তার হাল ধরে রাখতে পারবে ধনিকদের এমন শক্তি নেই। সেই হাল তাই এ যুগের শক্তিধরদের হাতে তুলে দেওয়া দরকার। সেই শক্তিধর আজ কারা? আমরা তো জানি, সমাজে শক্তি তারাই—যারা উৎপাদক, স্রষ্টা। এ-যুগে এই উৎপাদনের শক্তি, সৃষ্টিশক্তি শ্রমিকদের হাতে, কারুবিদদের হাতে, শিল্পীদের হাতে। আর সেই সৃষ্টিশক্তিকেই মূলত চাপা দিতে চায় শাসকশ্রেণী ও শোষকশ্রেণী; কারণ তা নইলে তাদের কায়েমী স্বার্থ টিকে থাকবে না। যারা শাসক ও শোষক তারা এভাবে সভ্যতাকে বাধা দিতে চায়, নতুন সৃষ্টিশক্তিকে দাবিয়ে রাখতে চায়; আর শ্রমিক ও কৃষক নতুন উৎপাদন শক্তির ও সৃষ্টিশক্তির অধিকারী, তারা চায় সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, নতুন সৃষ্টিতে সভ্যতাকে বাড়িয়ে তুলতে। এ যুগের আসল স্রষ্টা তাই শ্রমিক ও কৃষক। সভ্যতাকে বাঁচাবার ভার আজ তাই ধনিকশ্রেণীর নয়; আজ তা শ্রমিকশ্রেণীর উপর। তার অর্থ এই, সমস্ত সভ্যতার উত্তরাধিকারও তার, দায়িত্ব তার। বাস্তবক্ষেত্রে এই দায়িত্ব সে গ্রহণ করছে,—সে ফসল ফলায়, সেই পণ্য উৎপাদন করে;—মুনাফার লোভে অন্য শ্রেণীরা তাতে বাধা জোগায়। মনের ক্ষেত্রেও এই দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণীর স্বীকার করতে হবে; কিন্তু সেখানে শোষক-শ্রেণী তাকে আরও বেশি বাধা দিতে চায়।

কারণ, যতই শোষকেরা দেখে বাস্তবক্ষেত্রে তারা হটে যাচ্ছে, ততই তারা

ভাবে মানসক্ষেত্রে, নানা ধোঁয়ার জাল সৃষ্টি করে, নিজেদের আসন সেখানে পাকা করা চাই। তা পাকা করে রাখতে হলে প্রথমত সেখান থেকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নামে শ্রমিকশ্রেণীকে আক্রমণ করা যাবে,—আর এই ধোঁয়ায় অচেতন শিল্পী ও লেখকদের ছলনা করা সহজ। আর জ্ঞানী-গুণীদের মারফৎ ধনিকতন্ত্রের এই আক্রমণ সভ্যতার ভবিষ্যতের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণ।

দ্বিতীয়ত, শোষকশ্রেণী চায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তারা যে শোষণ চালায় তা অব্যাহত রাখতে। কারণ, সংস্কৃতিও তাদের একটা মুনাফার পণ্য। তারা সংবাদপত্র, মুদ্রাযন্ত্র, নাট্যশালা, সিনেমা, চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সব শিল্পই মুনাফার বাজার হিসাবে চালায়। এইখানেই তাদের জোর। এই জোরে তারা টাকাকড়ি, মান-সম্ভ্রম, আরাম-আয়েস দিয়ে লেখক ও শিল্পীদের হাত করে।

কিন্তু আসলে এইখানেই তাদের আসল দুর্বলতাও। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধনিকেরা উৎপাদন করে না, তারা করে ব্যবসাদারি। বাস্তবক্ষেত্রে যেমন তারা উৎপাদকদের বঞ্চিত করে মুনাফা করে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তেমনি তারা শিল্পী ও লেখক প্রভৃতিদের বঞ্চিত করে মুনাফা তোলে। ধনিকরা হচ্ছে আসলে শিল্পী ও লেখকদেরও শ্রেণী-শত্রু। কাজেই মূলত শিল্পী ও লেখকদের সঙ্গে শ্রমিকদের ও কৃষকদের বন্ধুত্বই থাকা উচিত। আর এই বন্ধুত্ব এ-যুগে হচ্ছে স্বাভাবিক ও অনিবার্য। কারণ, কাল্চারের আসল উত্তরাধিকারী আজ শ্রমিক-কৃষক তা আমরা জেনেছি ; সভ্যতার ক্ষেত্রে তারাই স্রষ্টা। তাছাড়া, একটা বড় কথা হচ্ছে এই যে, সংস্কৃতি ধনিকদের মনোপলি হয়ে থাকার জন্য কৃষক, শ্রমিক ও জনসাধারণকে এতকাল ধরে মানব-সভ্যতার শিল্প-সংস্কৃতি থেকে তফাৎ করে রাখা হয়েছিল। ফলে জনগণের সৃজনীশক্তি অনেকাংশে চিরসুপ্তই থেকে গেছে। আজ বর্তমান যুগের শিল্পীদের সঙ্গে তা যোগ হলে সেই বিরাট সৃজনীশক্তি জাগরূক হতে মোটেই দেরী হবে না।

কিন্তু এই মূল সত্যটা, যারা সচেতন নয় তারা বুঝতে পারে না। আমরা কমিউনিস্টরা সর্বাধিক সচেতন কর্মী। আমরা এই মূল সত্য জানি—আমরা সকলকে প্রমাণ করাব তার সত্যতা।

কিন্তু এদিকেও আমাদের কয়েকটি কথা বুঝবার আছে। আমরা সচেতন হয়েছি বলেই আমরা শিল্পী হয়ে উঠেছি তা মনে করা হবে হাস্যকর। আমরা

তো দেখেছি শোষকশ্রেণীকে বিপ্লবের দ্বারা পরাজিত করলেও তখন তখনি কমিউনিজম গড়ে ফেলা যায় না। "অক্টোবর বিপ্লবের" পরেও সোশ্যালিজম গড়তে সোভিয়েট দেশে প্রায় সতের আঠার বছর লেগেছে; আসল কমিউনিজম তারা গড়ে তুলছে এখন। তাই রাতারাতি কোনো দেশ যেমন কমিউনিস্ট হতে পারে না, রাতারাতি কোনো দেশ তেমনি কমিউনিস্ট কালচার বা নতুন সভ্যতাও গড়ে ফেলতে পারে না। এজন্য পরীক্ষা আর প্রাণপণ প্রচেষ্টা করতে হয় দিনের পর দিন, কিন্তু সে প্রয়াস সচেতনভাবে আরম্ভ করতে হবে শ্রমিক-পার্টিকে এখনি। যেমন বিপ্লব গড়তে চেষ্টা করছি, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে বিপ্লবী সংস্কৃতি গড়তে। এই হবে প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা এই, বিপ্লব সার্থক হলেও যেমন আমরা কল-কারখানা ভেঙ্গে ফেলব না, মুনাফাবাদই শেষ করব, আর ধনিকতন্ত্রের উৎপাদন যন্ত্রগুলো আরও ভালো করে কাজে লাগাব, ঠিক সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও আমরা তেমনি এইরূপ নীতিতেই চলব। উন্নত এবং সার্থক অনেক "টেকনিক" শিল্পী ও লেখকেরা এখন যা আয়ত্ত করছেন আমরা তা নষ্ট করব না; বরং তার আরও সার্থক প্রয়োগ করব, তার কার্যকারিতা এই সব গুণী ও জ্ঞানীদের থেকে শিখে নেব, আরও বাড়িয়ে তুলব। যখন নতুন সংস্কৃতি গড়তে চাই তখন আমাদের কাজ হবে তাহলে এইরূপ :

শিল্পী ও লেখকদের পৃথিবীর বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হতে সাহায্য করা। সচেতন হলে সেই জীবনসত্য কিভাবে শিল্পে-সাহিত্যে রূপ দিতে হবে, তা তাঁরা নিজেরাই ভালো জানেন। আমরা শুধু শিল্পী ও লেখকদের জোগাব সত্য—তা হলেই হবে।

আবার আমাদের মধ্যে যেসব লোকের শিল্পশক্তি বা সৃষ্টিশক্তি আছে তাদের দরকার হবে এই অভিজ্ঞ শিল্পী ও লেখকদের কাছে শিক্ষানবিশী করা। শিল্পীদের ও লেখকদের থেকে সংস্কৃতি-পদ্ধতি আমাদের বুঝে নিতে হবে, তারপর তা আবার লাগাতে শিখতে হবে নতুন সৃষ্টিতে।

তাই কমিউনিস্ট-কর্মীর পক্ষে দরকার—(১) বর্তমান সভ্যতায় তার দায়িত্ব বুঝা ও স্বীকার করা; (২) নিজেকে নতুন সংস্কৃতি গড়বার অধিকারী জেনে নিজের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে সৃষ্টিকর্মে এগিয়ে চলা; (৩) আবার বর্তমান সভ্যতায় জ্ঞানী ও গুণীদের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থের 'একতা বুঝা; এবং

(৪) জ্ঞানী ও গুণীদের উপর শ্রদ্ধা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া—তাঁদের জানাতে বাস্তব সত্য, তাঁদের থেকে গ্রহণ করতে সংস্কৃতিকর্মে .তাঁদের শিক্ষা ও তাঁদের উপদেশ, তাঁদের সাহায্য।

এই হলো আমাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে মূল দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা কমিউনিস্টরা কালচারকে কি চোখে দেখব তার মূল কথা। তারপর বাস্তব কর্মী হিসাবে আমরা বাঙলাদেশের কমিউনিস্টরা বুঝে নেব আমাদের নিজেদের কালচারাল সঙ্কট বা সংস্কৃতি সঙ্কট কি: আমরা বাঙালীরা বাঙলায় দুটো পৃথক কালচারের দ্বন্দ্ব দেখছি। আমাদের শিক্ষিতদের একটা কালচার—রামমোহন রায়ের থেকে তা শুরু হয়, রবীন্দ্রনাথে যার চরম স্ফুরণ আমরা দেখি। আর একটা অশিক্ষিত জনসাধারণের কালচার—যা গ্রামে বরাবর চলেছিল, এখনো চলে,—তাদের ভাটিয়ালী, পল্লীগীতি, জারিগান, সারিগান, কীর্তন, ঘেটু, যাত্রা, কথকতা, ভাসান, পট, পাটা নানারকম আলপনা, ছবি আঁকা, ইত্যাদি। শিক্ষিত সংস্কৃতি—চাকরে কালচার বা বাবু কালচার, শহুরে কালচার। আর অশিক্ষিত সংস্কৃতি—জন-সংস্কৃতি বা লোক-সংস্কৃতি, তা চাষী-মাঝি প্রভৃতিদের জিনিস, গ্রাম তার প্রাণ। দুটোই কিন্তু এখন ক্ষীণ হয়ে পড়েছে ভদ্র-সংস্কৃতি বাড়তে পারছে না, তার প্রেরণা আসত বুর্জোয়া সৃষ্টি থেকে, কিন্তু আজ বুর্জোয়ার সে সৃষ্টিশক্তি কই? তাই ভদ্র-সংস্কৃতির দরকার এ-যুগের সৃষ্টিশালী শ্রমিক-মজুরের সঙ্গে প্রাণের মনের কর্মের যোগসাধন। অন্যদিকে আমাদের লোক-সংস্কৃতিও বাড়তে পারছে না—লোকে সেই জারিগানে আর ততো খুশি হয় না—ভিড় করে আসে থিয়েটারে, সিনেমায়। এই লোক-সংস্কৃতি বাঁচতে পারে যদি তা নতুন সভ্যতার সত্যকে গ্রহণ করতে পারে, আবার নতুন কালের উপযুক্ত রূপ আয়ত্ত করতে পারে, আর পূরনো পদ্ধতিকে আবার এ-কালের উপযোগী করে দিতে পারে।

এইটাই হল বাঙলার নিজ-কালচারাল সমস্যা—ভদ্র-সংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্ন না রেখে জনতার সঙ্গে যুক্ত করা, আর জন-সংস্কৃতিকে উন্নততর কালের সত্যে ও ভঙ্গিতে সমৃদ্ধ করা। ভদ্র-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে হবে লোক-সংস্কৃতির বিষয়বস্তু দিয়ে, আর তার প্রকাশকে করতে হবে সহজ ও লোকবোধ্য। আর জন-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে হবে নতুন বিষয়বস্তু দিয়ে আর তার প্রকাশকে করতে হবে আরো উন্নত বিকশিত। দুই সংস্কৃতিতে স্থাপন করতে হবে সমন্বয়।

এ-কাজ বড়দরের শিল্পীর কাজ। কিন্তু ছোটদরের শিল্পীরা তার জন্য পথ তৈয়ার না করলে সেই বড়দরের শিল্পী জন্মাবার পথও পাবেন না। তাই বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট কর্মীর কাজ হলো এই পথ তৈরী করা, কোদাল কুপানো মাটি কাটা, মাটি টানা,—বাঙলার জন-জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, গুণী-জীবনকে সচেতন করা। আর এজন্য চাই কমিউনিস্টকর্মীর তরফ থেকে কালচারাল স্কোয়াড এবং প্রত্যেকখানে সত্যিকারের উপযুক্ত কর্মীদের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে সে-কাজে নিযুক্ত করা।

এজন্যই বলতে হয় এই যে, কালচারের মানে কি, সেদিকে কমিউনিজমের কি ভূমিকা এবং কমিউনিষ্ট পার্টির দায়িত্ব কতটা ; বাঙলাদেশে কালচারাল সঙ্কটের স্বরূপ কি, তা কতটা জটিল, কতটা জরুরী—এসব কথা বুঝা দরকার। এসব কথা বুঝি না বলেই আমরা কর্মীরা নানাপ্রকাব ওজর আপত্তি তুলে কালচারাল ক্ষেত্রের কাজকে উপেক্ষা করি।

আর এসব কারণেই দেখি—আমাদের যেসব শিল্প বা সাহিত্য আমরা কমিউনিস্টরা সৃষ্টি করছি তা প্রায়ই নিষ্প্রাণ হয়। কমিউনিস্টরা সংস্কৃতিকে একটা বিশেষ শ্রেণীর শোষণ ও বন্ধন থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত করতে চায়। জনগণের স্বাভাবিক বাস্তব সৃজনীশক্তির বিশাল দুয়ার একেবারে খুলে দিতে হবে। আমাদের কাজ হলো—শিল্পী ও সাহিত্যিককে তথ্য জোগানো ; শিল্পী ও সাহিত্যিকই ভালো জানেন কি করে সে তথ্যকে শিল্পে রূপ দিতে হবে। তথ্যের তাগিদেই তাঁর মনে শিল্প রূপ গ্রহণ করবে শিল্পের নিয়মে।

তা করা হয় না বলেই আমরা মজুতদার নিয়ে, দুঃস্থ নিয়ে, পঞ্চমবাহিনী নিয়ে বা দেশপ্রেমিক নিয়ে যে শিল্প রচনা করি তা সবই একটা abstract বা গত-বাঁধা মজুতদার, গত-বাঁধা পঞ্চমবাহিনী ও গত-বাঁধা দেশপ্রেমিক হিসাবে আঁকি। তাদের কথাবার্তা, চাল-চলন, পোশাক, এমন কি আকৃতি পর্যন্ত যে বাঁধা-ধরা গতে চলে তাতে একজনকেও মানুষ বলে সত্য বলে চোখে ঠেকে না। কিন্তু শিল্প মানে কোনো নীতি বা আইডিয়া বা শ্লোগান আওড়ানো নয়। শিল্পীর কাজ হলো বাস্তব (concrete) নিয়ে—মানুষ নিয়ে। সে মানুষ নানাসূত্রে বাঁধা, তাঁর 'মনুষ্যত্ব' জটিল বিচিত্র, ভালোবাসায় দেশভক্তিতে লোভে ভয়ে সব জড়িয়ে সে এক একটি বিশেষ মানব—(individual)। তাই আমাদের শিল্পীরা এই পার্টি শ্লোগান বলবার ঝোঁকে শিল্পের উদ্দেশ্য ভুলে যান, মানে

রূপ-সৃষ্টি করতেই ভুলে যান। তাঁদের গান, ছবি, নাটক, কবিতা তাই অনেক সময় হয় নিষ্প্রাণ, হাস্যকর। অথচ কমিউনিজম-এ জ্ঞান থাকলে এ ভুল ঘটতেই পারে না। কমিউনিজম-এ জ্ঞান থাকলে শিল্পের মূল সত্য অনুধাবনে আরও অনেক বেশি সাহায্য হয়।

*বাঙালী সংস্কৃতির রূপ, প্রথম সংস্করণ, মে ১৯৪৭, পৃ. ১২১-২৯।
লেখক শ্রীগোপাল হালদার রচনাটি 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' গ্রন্থে সংকলিত করার সময় পাদটীকায় স্পষ্টভাবে লেখেন, "এ লেখাটি (অক্টোবর ১৯৪৪-এ) কমিউনিস্ট কর্মীদের উদ্দেশ্যে লিখিত। কিন্তু ১৯৪৭ সালেও 'কালচার ও কমিউনিজম' সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন শুনতে হয় বলে এখানে সন্নিবিষ্ট হল।"······বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

'কবিতা' ও বুদ্ধদেব বসু / হিরণকুমার সান্যাল

'কবিতা' কাগজটির বয়স দশ বছর। পত্রিকার পক্ষে এই বয়স বেশি নয়। বাংলা দেশের বেশির ভাগ খ্যাতনামা পত্রিকাই 'কবিতা'র তুলনায় প্রবীণ। কিন্তু দশ বছরের মধ্যে 'কবিতা' বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে নিজের একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে। এই সাফল্যের কারণ 'কবিতা'র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদকের সাহিত্যানুরাগ, অধ্যবসায় ও অবশ্য সাহস—কেননা এই জাতীয় অভিনব কাগজের পরিকল্পনা সাহস ছাড়া সম্ভব হতো না।

কিন্তু 'কবিতা' সুপ্রতিষ্ঠিত কাগজ হলেও উচ্চশ্রেণীর পত্রিকা কিনা তাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। তবে, এর দায়িত্ব সম্পাদকের নয়; কেননা 'কবিতা'র খোরাক যারা যোগান, উচ্চশ্রেণীর কবিতা তাঁরা যদি কদাচিৎ রচনা করেন বুদ্ধদেব বসুকে তার জন্যে দোষী করা সঙ্গত হবে না। বরঞ্চ, বহু অপ্রতিষ্ঠ অনভ্যস্ত অল্পবয়স্ক কবিকে তিনি পরিণতির পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছেন, শুধু তাদের রচনা প্রকাশ করে নয়, তাঁর কাজের আওতায় কাব্যের আবহাওয়াকে জাগিয়ে রেখে। কিন্তু বুদ্ধদেব বাবুর উৎসাহিত সমর্থন সত্ত্বেও সাম্প্রতিকী বাংলা কবিতা পরিণতির পথে কেন বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি তার আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

এই প্রসঙ্গে এই কথাও স্মরণীয় যে বুদ্ধদেব বাবু স্বয়ং এই সাম্প্রতিক কবিদের অন্যতম ও একদা তিনি প্রাণপণ প্রয়াস করেছিলেন সাম্প্রতিক সাহিত্যে বিশেষ একটি ধারা প্রবর্তন করতে। এই প্রয়াসের অত্যন্ত প্রকট ও সমারোহসহকারে ব্যক্ত উদ্দেশ্য ছিল রোম্যান্টিক রবীন্দ্রযুগ থেকে রিয়্যালিস্টিক রবীন্দ্রোত্তর যুগে উত্তীর্ণ হওয়া। দুঃখের বিষয়, অভীপ্সিত রিয়্যালিজম-এর সন্ধানে তখনকার 'অতি আধুনিক' নামে পরিচিত লেখকসম্প্রদায় সাহিত্যের রাজপথ ছেড়ে অলিতে গলিতে কিশোরসুলভ যৌনবোধের উগ্র প্রেরণায় এমনই দিশেহারা হয়ে পড়লেন যে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রকাশ্যে তাঁদের তীব্র তিরস্কার না করে পারেন নি। সুখের বিষয় বাংলা সাহিত্যে সেই যুগ বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। কিন্তু—

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একী, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

আজ 'কবিতা'র পাতার পর পাতায় ধ্বনিত হচ্ছে তরুণ প্রেমের বিদেহী বিলাপ। সুরুচি বা সুনীতির দিক থেকে এতে আপত্তিকর কিছু নাই, কিন্তু আমাদের কানের পক্ষে কাব্যের এই 'চিরন্তন' সুর একটু একঘেয়ে হয়ে পড়েছে।

বুদ্ধদেব বাবুর কথায় ফেরা যাক। সাহিত্যের অলিতেগলিতে অনির্দিষ্ট ভাগ্যান্বেষণের রোমাঞ্চকর চেষ্টা তিনি বহুদিন ছেড়ে দিয়েছেন--বাইরের চাপে না, সম্পূর্ণ নিজের তাগিদে। এই তাগিদেই তিনি আশ্রয় নিয়েছেন সাহিত্যের রাজপথে বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায়, অর্থাৎ যে-রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে একদিন তিনি স্ব-সমুখ শক্তিতে উদ্যত হয়েছিলেন সাহিত্যজগতে নব নবতর রাজ্যখণ্ড জয় করতে, সেই রবীন্দ্রনাথেরই কাব্যের আওতায়। এই নিরাপদ আশ্রয়ে তিনি আজ প্রায় স্থাণু হয়ে বসেছেন।

ইতিমধ্যে বাংলার সাহিত্যে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বুদ্ধদেব বাবু সযত্নে এই হাওয়া থেকে গা বাঁচিয়ে প্রচার করেছেন শিল্পসৃষ্টির অনাদি ও অকৃত্রিম চিরন্তনতা। কিন্তু তবু এই হাওয়ায় যারা আলোড়িত হয়ে নতুন ছাঁদের রচনায় উৎসাহিত হয়েছে তাদের তিনি অবহেলা করেন নি, বরঞ্চ উৎসাহই দিয়েছেন, এমন কি মাঝে মাঝে তাদের আঙ্গিক পর্যন্ত কিছু কিছু আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেছেন—চিরন্তনী ভাবধারার কাঠামোর মধ্যে যতটা সম্ভব। সময়ে সময়ে মনে হয় এই কাঠামোই হয়েছে বুদ্ধদেব বাবুর কফিন, তাঁর সাহিত্যিক সমাধি ঘটেছে এরই অতলস্পর্শ অন্ধকারে। কিন্তু অতটা বললে বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি হবে। বুদ্ধদেব বাবু সম্বন্ধে বরঞ্চ এই কথা বলা চলে যে উনি জনৈক অতি-সাবধানী ক্রিশ্চান পাদরির মতন পণ করেছেন: **I will tread the narrow path betwixt vice and virtue**. প্রগতিকে উনি খুব উৎসাহের সঙ্গে বরণ করতে পারেন নি, কিন্তু প্রতিক্রিয়াকেও উনি কখনো আমল দেন নি। এইজন্য বুদ্ধদেব বাবুর কাছে আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমাদের কৃতজ্ঞতার এমন কি শক্তি আছে যে বুদ্ধদেব বাবুকে বাংলা সাহিত্যে সম্মানের আসন দিতে পারে? ইতিহাসকে যারা উপেক্ষা করে ইতিহাস তাদের মনে রাখে না।

যাই হোক, বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বাবুর দান মহৎ না হলেও একেবারে নগণ্য নয় ও এই দানের পরিচয় পাওয়া যায় একাধিক ক্ষেত্রে। কিন্তু

'কবিতা' কাগজের সম্পাদনে বুদ্ধদেব বাবুর যে কৃতিত্বের প্রমাণ পাই, তাঁর স্বরচিত কবিতায় তা ক্রমশ ক্ষীণতর হচ্ছে। 'কবিতা'র চৈত্র (১৩৫১) সংখ্যায় বুদ্ধদেব বাবুর 'পশ্চিম' কবিতাটি পড়ে মনে হলা রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় অনুকরণ আরো বছর কুড়ি আগে হয়তো এতটা অসহ্য মনে হতো না। আরো মনে হলো, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথে বুদ্ধদেব বসুর স্বচ্ছন্দবিহার বোধ হয় আর বেশি দিন সম্ভব হবে না, তাঁর পদস্খলন আরম্ভ হয়েছে, অতঃপর বিশেষ সাবধান না হলে নিজেকে সামলানো দায় হবে। কেননা—

> হে পশ্চিম, তোমার সভ্যতা
> দু'চারি শতাব্দীমাত্র খেলা ক'রে কালের প্রাঙ্গণে
> হলো দেউলিয়া।

চিন্তাসম্পদে একেবারে দেউলে না হলে ভাবী যুগের প্রাক্কালে এই মত নির্বিবাদে ব্যক্ত করা তাঁর পক্ষে কখনই সম্ভব হতো না।

কিন্তু 'কবিতা' পত্রিকায় শুধু কবিতা ছাপা হয় না। কবিতার সমালোচনাও এই পত্রিকার বিশিষ্ট অঙ্গ ও এই অঙ্গের সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধির জন্য বুদ্ধদেব বাবু পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন। বুদ্ধদেব বাবুর সমালোচনার রীতি হয়তো মামুলি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সম্ভবত তিনি অর্জন করেন নি। কিন্তু তবু তাঁর মতামত মূল্যবান, কেননা কবিতার মূল্য নির্ধারণে পুরনো মাপকাঠি এখনো একেবারে বাতিল হয় নি। মতামতের সংকীর্ণতা সত্ত্বেও কবিতার বিচারে বুদ্ধদেব বাবুর নিরপেক্ষতা ও নতুন কবিতার সমাদরে তাঁর অসীম আগ্রহ সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয় বললে খুব মিথ্যা বলা হবে না। শুধু নতুন কবিদের না, রবীন্দ্ররচনা-বলীর সমালোচনায় বুদ্ধদেব বাবু 'কবিতা'র একাধিক সংখ্যায় যে বৈদগ্ধ্যের ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যি বিরল। বিস্তারিতভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা করে বর্তমান বাংলার অন্য কোনো লেখক বোধ হয় এতখানি সাফল্য অর্জন করেন নি। অন্তত সমালোচনা বিভাগের উৎকর্ষের জোরে 'কবিতা' কাব্যরসিকদের সমর্থন দাবি করতে পারে।*

---

* পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৫২, পৃ ৭৬-৭৮। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' সম্পর্কে এই আলোচনাটি 'পরিচয়'-এর 'পত্রিকা-প্রসঙ্গ' বিভাগে প্রকাশিত হয়। বর্তমান শিরোনামটি আমার দেওয়া। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক।

'কবিতা' ও বুদ্ধদেব বসু / অরুণকুমার সরকার

'পরিচয়' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

গত শ্রাবণ মাসের 'পরিচয়ে' শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যালের স্বাক্ষরিত একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। শিরোনামা দেখে মনে হয়েছিল সমালোচকের উদ্দেশ্য বুঝি 'কবিতা' পত্রিকাটির সাহিত্যিক-মূল্য যাচাই করা। কিন্তু সেদিক থেকে আমাদের একেবারেই হতাশ হতে হয়েছে। 'কবিতা'কে আল্‌তোভাবে ছুঁয়ে, ঠেলে সরিয়ে রেখে—শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুকেই তীব্র আক্রমণ করেছেন সান্যালমশাই এবং পরিশেষে হুঁশিয়ারী হিতোপদেশ দিতেও কার্পণ্য করেন নি।

সমালোচকের অভিযোগ এই যে, ১) বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আওতায় আশ্রয় নিয়েছেন; (২) ইতিহাসকে উপেক্ষা করেছেন এবং (৩) প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথে বিহার করছেন।

সমালোচকের লজিক থেকে স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই যে: রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আওতায় আশ্রয় নেওয়ার অর্থই হলো—ইতিহাসকে উপেক্ষা করা, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথে বিহার করা। সমালোচক হয়ত নিজেই জানেন না, পরোক্ষভাবে তিনি কী মারাত্মক ভ্রমাত্মক মতবাদ প্রকাশ করেছেন। নতুবা কার বুকের পাটা আছে এতবড় একটা অযৌক্তিক মিথ্যা কথা বলবার?

চার বছর হলো রবীন্দ্রনাথের শারীরিক মৃত্যু হয়েছে, তবুও অগ্রচারী ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের পৃথিবীতেও তাঁর প্রতিভা ভাস্বর অম্লান এবং জীবন্ত। কিন্তু সান্যালমশায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ 'অসহ্য' বলে মনে হয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হবার দিন আজ গত; রবীন্দ্রসাহিত্যে অনুকরণীয় আর কিছুই নেই। এ-কথা বলার অর্থ কি এই নয় যে, রবীন্দ্রসাহিত্য মৃত এবং প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে? রবীন্দ্রনাথকে এতবড় অপমান আজ পর্যন্ত অন্য কোনো সমালোচক করেছেন বলে জানি না। এ-কথা যদি সত্য হয় যে,

'রবীন্দ্রসাহিত্য মহৎ এবং জীবিত, তা হলে আজও সেই সাহিত্যের অনুকরণ হবে এবং সেই অনুকরণের দ্বারাই পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হবে যে, রবীন্দ্রনাথ আজও মহৎ, আজও জীবিত।

বুদ্ধদেব বসুর রচিত রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্ত কবিতার সংখ্যা অজস্র এবং সেগুলি স্বকীয় সার্থকতায় সমুজ্জ্বল। 'কঙ্কাবতী' ও 'দময়ন্তী'র কবি আপন বৈশিষ্ট্যের জোরেই বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, হিরণবাবুর 'কৃতজ্ঞতার' অপেক্ষা না রেখেই! (বুদ্ধদেবের প্রতিষ্ঠাকে উপেক্ষা করতে পারেন নি বলেই হিরণবাবু সমালোচনার অবতারণা করেছেন।) বুদ্ধদেবের দু'একটি সাম্প্রতিক কবিতায় যদি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এসে পড়ে, তা হলে বুঝতে হবে যে তিনি সজ্ঞানেই রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন। এই করাটা যে মোটেই দোষণীয় নয়, বরং রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন—সাহিত্যরসিক মাত্রেই তা স্বীকার করবেন।

বুদ্ধদেব বসু যে ইতিহাসকে উপেক্ষা করেন না, 'পশ্চিম' কবিতাটিই তার' জলজ্যান্ত প্রমাণ নয় কী? এর থেকেই কী প্রমাণিত হয় না যে, চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে যথেষ্টই সজাগ তিনি? (অবিশ্যি একজন কবির কাছ থেকে যতটুকু সচেতনতা আশা করা যায়।) হয়ত রাজনৈতিক অর্থে 'পশ্চিম' কবিতাটি প্রতিক্রিয়াশীল, হয়ত বা তা নয়। সাম্যবাদী রাজনীতির দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের অনেক অনেক কবিতাই তো স্পষ্টত প্রতিক্রিয়াশীল। পত্রপ্রেরক নিজেই এমন একশটি কবিতা উদ্ধৃত করতে পারেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'তে একটি কবিতা লিখেছেন—'ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হোল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।' রাশিয়ার পোল্যাণ্ড আক্রমণের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ হয়ত বুঝতে পারেন নি কিন্তু তাই বলে কেউ বলবে না, রবীন্দ্রনাথ চিন্তাসম্পদে দেউলে। যে বলবে সে তার ধৃষ্টতাই প্রকাশ করবে। কেন না, রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে বসেছেন মতবাদ প্রচার করতে নয়। 'পশ্চিম' কবিতাটি কবিতা হিসাবে সার্থক, এটি যদি রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ হয়ে থাকে তো সে হিসাবেও সার্থক। রাজনৈতিক মতবাদের দাঁড়িপাল্লায় কাব্যকে যাচাই করতে যাওয়া সবসময় সম্ভব নয়। যারা রাজনৈতিক কবিতা লিখে থাকেন, সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস করেন, দলবিশেষের হয়ে দালালি করেন—একমাত্র তাঁদের কবিতাকেই রাজনীতির কষ্টিপাথরে যাচাই করা যায়। আমি অন্তত এমন কয়েকজন শিক্ষিত কাব্যামোদী ভদ্রলোককে জানি

যাঁরা 'পশ্চিম' কবিতাটিতে যথার্থ রসের সন্ধান পেয়েছেন। বলা বাহুল্য আমিও তাঁদের মধ্যে একজন। বুদ্ধদেব ইতিহাসকে উপেক্ষা করেন নি বলেই তাঁর পাঠশালায় আজকালকার অনেক মুখর প্রগতিবাদী কবির হাতেখড়ি হয়েছে।

প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার রাজনৈতিক সংজ্ঞা দিনের পর দিন বদলে যায়। আজ যে-ব্যবস্থা প্রগতিশীল, আগামী কালই তা হয়ত প্রতিক্রিয়াপন্থী। যথার্থ কবিতা সাময়িক সাংবাদিকতা নয় বলেই তাকে প্রগতি ও প্রচলিত প্রতিক্রিয়ার সংজ্ঞা দিয়ে বিচার করা চলে না। ১৩৫১ সালের কার্তিক-পৌষ সংখ্যার 'কবিতা'য় বুদ্ধদেব বাবু যে সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছিলেন সবাই তার সঙ্গে একমত হবেন। বুদ্ধদেব লিখেছেন, "কোনো বই সম্বন্ধে এইটেই যখন একমাত্র উল্লেখযোগ্য কথা হয় যে এতে চলতি কালের ঘটনার বর্ণনা আছে কিম্বা নেই, এবং লেখক রাজনীতির দিক থেকে ঠিক রাস্তাই ধরেছেন কিম্বা ধরেন নি, তখন বুঝতে হয় যে সরস্বতীকে রাজমন্ত্রীর পরিচারিকারূপে ব্যবহার করিয়ে নেবার চেষ্টা চলেছে, এবং জাতলেখক সঙ্গে সঙ্গেই সতর্ক হয়ে পড়েন।"

হিরণবাবুর আর একটি অভিযোগ: যাঁরা নতুন ছাঁদের রচনায় উৎসাহিত হয়েছেন বুদ্ধদেববাবু তাঁদের আঙ্গিক পর্যন্ত কিছু কিছু আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেছেন। সমালোচকের কী উচিৎ ছিল না উদাহরণের দ্বারা বক্তব্যকে পরিষ্কার করে দেওয়া? নতুবা এরূপ মন্তব্য অশোভন ও অসঙ্গত নয় কী?

শুনতে পাই মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় 'পরিচয়ে'র আস্থা আছে! তাই আমার বিশ্বাস বর্তমান পত্রটি প্রকাশিত হবে এর যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া হবে।

এই পত্রের অনুলিপি শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর কাছে পাঠালাম।*

---

* পরিচয়, পৌষ ১৩৫২, পৃ. ৪২০-২২। 'পরিচয়'-এর 'পাঠক-গোষ্ঠী' বিভাগে সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ প্রতিবাদপত্রখানি প্রকাশিত হয়। সেই সম্পাদকীয় মন্তব্য এবং প্রতিবাদপত্রের শেষে 'বিনীত / অরুণ কুমার সরকার' অংশটুকু বাদ দেওয়া হলো। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

'কবিতা' ও বুদ্ধদেব বসু / পাঠকগোষ্ঠী

[গত সংখ্যা 'পরিচয়ে' প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অরুণকুমার সরকারের যে আলোচনা আহ্বান করেছিলাম এই সংখ্যায় নিচের চিঠিগুলি থেকে প্রমাণ হবে এই আহ্বানের বিষয়ে কি রকম উৎসাহিত সাড়া পাওয়া গিয়েছে। অরুণবাবু যে প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেছিলেন প্রত্যেক লেখকই সেগুলির জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। জবাব সদুত্তর কিনা তার বিচার করবেন পাঠকেরা। এ সম্বন্ধে হিরণবাবুর মন্তব্য আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।—'পরিচয়' সম্পাদক]

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে বাদানুবাদ আর না বাড়ালেই ভালো হতো। কেন না কবিত্বের বিচারে শেষ কথা হচ্ছে রুচি। তর্ক করে কার কবিতা ভালো এবং কার কবিতা ভালো নয় বোঝাতে যাওয়া, আমার মতে, বিড়ম্বনা। কবিতাকে যখন আমরা ভালো বলি এ তখন তার কবিত্বেরই—যা বিষয় এবং বিন্যাসের ঊর্ধ্বে—প্রশংসা করি। বুদ্ধদেববাবু হালে যে সাবেকী ছন্দ নিয়ে কবিতা লিখছেন সে সম্বন্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ থাকা উচিত নয়, যদি তাতে কবিত্বের আস্বাদ পাই। তেমনি তাঁর সাহিত্যিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষতার সম্বন্ধেও কোনো মত প্রকাশ করতে পারি না, তিনি রাজনীতিকে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু করছেন না বলে।

দ্বিতীয় কথা। রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত অথবা যুক্ত বলতে সুস্পষ্ট কিছুই বোঝায় না। রবীন্দ্রনাথ একটা যুগ। একটা যুগকে, বিশেষ করে ঠিক আগের যুগকে বর্জন করা কোনো লেখকের পক্ষেই সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সকল লেখকের ব্যাকগ্রাউণ্ড।

নমস্কারান্তে

অমল চট্টোপাধ্যায়

মাননীয় 'পরিচয়' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু
সবিনয় নিবেদন,

গত পৌষ সংখ্যা 'পরিচয়ে'র পাঠকগোষ্ঠী বিভাগে শ্রীযুক্ত অরুণকুমার সরকার 'কবিতা' পত্রিকার সমালোচনা-প্রসঙ্গে যে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন, তা আমরা পড়লাম। আপনারা পাঠকবর্গের কাছ থেকে মতামতের অপেক্ষায় হিরণবাবুর প্রত্যুত্তর বন্ধ রেখে আমাদের যে আলোচনার সুযোগ দিয়েছেন তার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

সম্প্রতি সাহিত্য ভবনের বিশেষ বৈঠকে বক্ষ্যমান বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে, সঙ্ঘ-সম্পাদক হিসেবে আমি সাহিত্য ভবনের পক্ষ থেকে আমাদের যুক্ত অভিমত এই পত্রে জানাচ্ছি। আলোচনায় যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাদের নাম যথাক্রমে: শ্রীযুক্ত সমীর ঘোষ, সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পত্রলেখক স্বয়ং। অরুণবাবুর অভিযোগ:

১. "শিরোনামা দেখে মনে হয়েছিল সমালোচকের উদ্দেশ্য বুঝি 'কবিতা' পত্রিকাটির সাহিত্যিক মূল্য যাচাই করা। কিন্তু সেদিক থেকে আমাদের একেবারেই হতাশ হতে হয়েছে। 'কবিতা কে আল্‌তোভাবে ছুঁয়ে ঠেলে সরিয়ে রেখে—শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুকেই তীব্র আক্রমণ করেছেন সান্যাল মশাই এবং পরিশেষে হুঁশিয়ারী হিতোপদেশ দিতেও কার্পণ্য করেন নি।"

২. বুদ্ধদেববাবু রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আওতায় আশ্রয় নিয়েছেন এবং ইতিহাসকে উপেক্ষা করেছেন এবং প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথে বিহার করছেন। হিরণবাবুর এই মতবাদ ভ্রমাত্মক।

৩. বুদ্ধদেব বসু নাকি আধুনিক কোনো কোনো লেখকের ভঙ্গী পর্যন্ত আত্মসাৎ করেছেন হিরণবাবু সেটা স-উদাহরণ দেখালেন না কেন?

৪ 'পশ্চিম' কবিতাটি বুদ্ধদেববাবুর একটি 'সার্থক কবিতা' এবং তিনি যে ইতিহাসকে উপেক্ষা করেন না এবং চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে 'যথেষ্ট সজাগ' সে বিষয়ে 'পশ্চিম' কবিতাটিই জলজ্যান্ত প্রমাণ ··।

এই মূল চারটি অভিযোগের উত্তরে আমরা কিছু বলতে চাই।

সত্যিই হিরণবাবু 'কবিতা' পত্রিকাটির সমালোচনা করতে গিয়ে তার সম্পাদকের কাব্য-প্রতিভা নিয়ে সমালোচনা করেছেন, এটা অংশত সমালোচনার নীতির দিক থেকে আমরা অতি সামান্য অন্যায় বলে মনে করি

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাঁর এই ত্রুটিতে সমস্ত 'মহাভারত' অশুদ্ধ হয়ে গেছে। এর একমাত্র কারণ হিসেবে বলা যায় যে, যেখানে পত্রিকাটির সম্পাদক নিজে কবি সেখানে তাঁর কাব্য-বিচারের মাপকাটিতেই কবিতাগুলির বিচার হয়ে থাকে—এককথায় তিনি একটা 'পাঠশালা' খুলেছেন এবং সেখানে ছেলেমেয়েরা পড়তে আসছে; তার মধ্যে যদি এমন হয় যে দেখা গেল গুরুমশায়েরই কিছু কিছু মারাত্মক ত্রুটি আছে তাহলে 'পড়ুয়া'দের হিতকাঙ্ক্ষী যাঁরা, তাঁরা 'পাঠশালা' কেমন চলছে সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পরিচালকের শক্তি সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করতেই পাবেন, আর সেটা অযৌক্তিকও হয় না এবং সেই দিক থেকেই সান্যাল মশাই-এর 'হুঁশিয়ারী হিতোপদেশ' দেওয়া সম্পূর্ণ সমীচীন হয়েছে। প্রসঙ্গত অরুণবাবুকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই 'কবিতা' পত্রিকাটির উপরেও হিরণবাবু যেটুকু আলোচনা করেছেন তাতে 'একেবারেই হতাশ হবার মতো' কিছু ঘটে নি—বরং আমাদের মতে তাকে আশাপ্রদই বলা যায়।

এবার দ্বিতীয় অভিযোগ। প্রথমত দয়া করে অরুণবাবু যদি আমাদের, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু রচিত এ পর্যন্ত তাঁর অসংখ্য কবিতার মধ্যে, দশটি নয় বারোটি নয়, মাত্র একটি কবিতা দেখাতে পারেন, যা রবীন্দ্রপ্রভাবে পুষ্ট নয়, তাহলে তাঁর কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব। পক্ষান্তরে, ইতিহাসকে উপেক্ষা করা সম্পর্কে আমাদের অভিমত এই যে, হিরণবাবুর এই অভিযোগ অবান্তর। তার কারণ কবিদের কোনো যুগ নেই, কোনো একটা বিশেষকালের মধ্যে নিজেকে গণ্ডীভূত করে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনে বেঁচে থাকা তাঁদের ধর্ম নয়; কিন্তু 'প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথে' যে বুদ্ধদেব 'বিহার করছেন' এ অভিযোগ আজ কোনো বুদ্ধিজীবী এবং সচেতন পাঠকের কাছে কি গোপন আছে?

অতঃপর তৃতীয় অভিযোগঃ সত্যিই হিরণবাবুর উচিত ছিল, বুদ্ধদেব বসু যেসব আধুনিক শক্তিশালী কবিদের ভঙ্গী আত্মসাৎ করেছেন তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া। আমাদের মনে হয়, জিনিসটি এতো স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল যে তিনি তার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেন নি কিংবা সেই তিক্ত প্রসঙ্গকে আরো প্রসারিত করতে তার রুচিতে বেধেছিল···

প্রসঙ্গত 'কঙ্কাবতী' সম্বন্ধে কবি অজিত দত্তের সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ

'নষ্টচাঁদ' আলোচনা করতে গিয়ে গত ৮ই পৌষ রবিবারের দৈনিক 'বসুমতী'তে সমালোচক যা লিখেছেন তাও আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি :

"...'কুসুমের মাসে'র প্রভাব সমসাময়িক বহু কবির মধ্যেই লক্ষ্য করেছি, বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী'র কয়েকটি কবিতার ছন্দ ও ধ্বনিবৈচিত্র্য বাদ দিলে অধিকাংশ কবিতায় 'কুসুমের মাসে'র স্পষ্ট প্রভাব সতর্ক পাঠক মাত্রেরই চোখে পড়েছে।"

অবশেষে অরুণবাবুর চতুর্থ অভিযোগ অনুযায়ী আমরা বিনীতভাবে জানাতে চাই যে, 'পশ্চিম' কবিতাটি আমরা পড়েছি এবং আমাদেরও মতে সত্যিই এরকম কবিতা আজ থেকে কুড়ি বছর আগে লিখলে শোভন হতো। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করা নিশ্চয়ই আমরা অন্যায় বলে মনে করি না, পরন্তু সেটা যে তাঁর বিরাট কাব্যপ্রতিভার উজ্জ্বলতম প্রভাবের প্রতীক তা আমরা নিঃসন্দেহে স্বীকার করব, কিন্তু এরকম অক্ষম অনুকৃতিকে যে কোনো মার্জিতরুচি ভদ্র কাব্যামোদী পাঠকের শোভন এবং সুন্দর বলে যদি না মনে হয় তাহলে তাঁকে আমরা কিছুতেই অভিযুক্ত করতে পারি না। 'পশ্চিম' কবিতাটিতে যাঁরা যথার্থ রসের সন্ধান পেয়েছেন তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না বলে দুঃখ বোধ করছি।

আপনি আমাদের যুক্ত অভিবাদন গ্রহণ করুন। ইতি —

পরিমল বসু
সম্পাদক, সাহিত্য ভবন"

'পরিচয়' সম্পাদক সমীপেষু

পৌষের 'পরিচয়ে' অরুণবাবুর সমালোচনা পড়লাম। পড়ে মনে হলো তিনি আর কিছু করুন আর না করুন বুদ্ধদেববাবুর হয়ে ওকালতিটা করেছেন বড় বেশি। একথা অবশ্য সকলেই মেনে নেবে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এখনও শেষ হয়ে যায় নি। তাঁর আত্মা এখনও আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রের আবহাওয়াকে প্রভাবান্বিত করছে এবং হয়ত আরও অনেকদিন করবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ বলতে এই বোঝায় তিনি যে সমস্ত কথা বলে গেছেন সেগুলি আত্মগত ক'রে নিজে কিছু দেওয়া, সেই সংস্কৃতির ধারাকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—তখন লেখকের লেখনীমুখে যা বেরিয়ে আসে সেটাকে অনুকরণ বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের নানা বিভাগে অনেক কিছুই দান

ক'রে গেছেন। সুতরাং রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের লেখকেরা যদি তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে ঐরূপ কোনো একটি বিশেষ ভঙ্গীর আশ্রয় নেন তাতে ক'রে কিছু এসে যায় না। বরং সাহিত্যের সুচারু প্রসারের জন্য সেটা দরকার। কিন্তু আমরা যদি রবীন্দ্রপ্রভাবের মধ্যে বসে লিখতে গিয়ে তাঁর ছন্দ, ভঙ্গী থেকে আরম্ভ ক'রে ভাষা ও ভাব পর্যন্ত অনুকরণ করি তবে সেটাকে অনুকরণ না বলে অন্য কিছু আখ্যা দেওয়া উচিত। প্রসঙ্গক্রমে আমি এবৎসর পূজা সংখ্যা 'কবিতা'য় বুদ্ধদেববাবুর কবিতাটি লক্ষ্য করতে বলি। অরুণবাবুর এটা বোঝা উচিত রবীন্দ্রনাথের ভাব ভাষাকে প্রকারান্তরে বলার কোনো অর্থ হয় না। এতে করে লেখকেরই চিন্তা-দৈন্যের রূপটি বেরিয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের শেষ কথা বলে যেতে পারেন নি এবং তা কারো পক্ষে বলাও সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করে গেছেন, জীবনের বিচিত্রতর অনেক রূপ তাঁর জীবনে প্রকাশ লাভে বঞ্চিত হয়েছে। রবীন্দ্রপ্রভাবের মধ্যে অবস্থান করে আমরা কি শুধুমাত্র বলা কথারই চর্বিতচর্বণ করব, না সে সমস্ত বিচিত্র পথে আমাদের নব নব কবি-প্রতিভা পরিচালনা করব? অরুণবাবুকে এ কথাটা ভেবে দেখতে বলি।

অরুণবাবু বলেছেন বুদ্ধদেববাবু গোড়ার জীবনে একেবারে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত স্বকীয় সার্থকতায় সমুজ্জ্বল কবিতা লিখেছেন। যদি তাই হয়ে থাকে তবে আমি প্রশ্ন করি মধ্যবর্তীকালে এমন কি ঘটনা ঘটলো যার জন্য বুদ্ধদেববাবুকে পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্র-ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে হলো?

বুদ্ধদেববাবুর ইতিহাসকে উপেক্ষা করার যে প্রশ্ন উঠেছে তার উত্তরে আমি একটি কথা বলব। প্রতি যুগেই মানুষের চিন্তাধারণার বিষয়বস্তু এক থাকে না। যুগ থেকে যুগে তার পরিবর্তন হয়ে আসছে, একথার স্বাক্ষর ইতিহাসেই পাওয়া যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে এক এক সময়ে এক এক ভাব নিয়ে পরীক্ষা হয়ে থাকে। এক যুগের পরীক্ষায় সন্তুষ্ট না থেকে আর এক যুগের মানুষ তাকে নূতন পথে চালনা করে; এভাবেই সাহিত্যে প্রগতির ধারা বয়ে আসছে। সাহিত্যক্ষেত্রে যখন কোনো নূতন ভাবের আবির্ভাব ঘটে তখন সকলেই যে তাকে গ্রহণ করে তা নয়। অনেকে সাহিত্যকে এপ্রকার অনিশ্চয়তার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য পুরাতন ভাবধারাকে পরিত্যাগ করতে সাহস করেন না এবং এজন্যই সাহিত্যে নূতন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব চলে আসছে। আজ যখন বাংলা কাব্যসাহিত্য তার প্রতিভাকে অভিজ্ঞতার নব নব পথে চালনা করতে চাইছে তখন

যদি বুদ্ধদেববাবুর কথা বিবেচনা করি তবে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না। সাহিত্যক্ষেত্রে এক এক কালে কোনো কোনো লোকোত্তর প্রতিভার ছাপ পড়লেও তাঁর প্রভাবে সাহিত্যক্ষেত্র একেবারে মুহ্যমান হয়ে থাকে না। তা ছাড়া সেই প্রতিভার সমসাময়িক, বিশেষ করে পরবর্তী যুগের, কবিসম্প্রদায় সেই প্রতিভার প্রভাব সম্পূর্ণ মাত্রায় কাটিয়ে ওঠার জন্য যে পরিশ্রম করেন তার মধ্য দিয়েই আগামী যুগের কবিতা অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। আজ যখন তাঁরা পূর্বপুরুষের প্রতিভাকে উত্তরাধিকার ক'রে নবপর্যায়ের আসরে নেমেছেন তখন বুদ্ধদেববাবুর পক্ষে রবীন্দ্র-ছায়ায় আটকে থাকা লজ্জার কথা। অরুণবাবু হয়তো বলবেন যে, পরীক্ষার সময় এখনও আসে নি, কারণ রবীন্দ্রপ্রভাব এখনও অতিমাত্রায় বর্তমান। একথা তর্কসাপেক্ষ কিন্তু অরুণবাবু সাম্প্রতিক সাহিত্যে তার প্রস্তুতিকেও অগ্রাহ্য করতে পারেন না। সর্বোপরি এই পরিস্থিতিতে বুদ্ধদেববাবুর পক্ষে নিজেকে রবীন্দ্র-ছায়ার মধ্যে সঙ্কুচিত করে নেওয়ার পক্ষে কি কোনো যুক্তি থাকতে পারে ?

বুদ্ধদেববাবু তাঁর চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে সত্য সত্যই যদি সচেতন হতেন তা হলে তাঁর সাম্প্রতিক কবিতাবলীতে ভাবের এরকম পুনরাবৃত্তি নিশ্চয় থাকত না। তাঁর সাম্প্রতিক কবিতা থেকে কি একথাটাই পরিস্ফুট হয়ে উঠছে না যে তাঁর কবিতায় আমরা নূতন কিছুরই সন্ধান পাচ্ছি না ?

সর্বশেষে অরুণববাবুকে একথাটাই বলতে ইচ্ছা করি যে, তিনি সাহিত্যে যা ঘটে গেছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন, না নূতনতর অভিজ্ঞতার পথে প্রতিভাকে চালনা করতে সচেষ্ট হবেন ? আশা করি অরুণবাবু কথাগুলি ভেবে দেখবেন। ইতি ১৫ই পৌষ, ১৩৫২

বিনীত

প্রভাতকুমার দত্ত

'পরিচয়' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

গত পৌষ মাসের 'পরিচয়ে' শ্রীযুক্ত অরুণকুমার সরকার হিরণবাবুর বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতার' সমালোচনার যে প্রতিবাদ করে কতকগুলি মামুলি অভিযোগ এনেছেন তা দেখলাম। মনে হলো সমালোচনায় আলংকারিকদের পথ তিনি

ধরেছেন। কিন্তু সে পথের যাত্রীদের যে পরিশ্রমটুকু স্বীকার করতে হয়, তিনি তাও করেন নি ;—ধরা পড়ে তাঁর অযৌক্তিক ভাসা ভাসা কথায়। অরুণবাবুর সমস্ত কথার সবিশেষ বিশ্লেষণ করবার মতো হয়তো স্থানাভাব, তাই মাত্র কতকগুলি ঐতিহাসিক নজির এনে উপস্থিত করব—কি সাহিত্যের, কি জীবনের।

প্রথমেই স্বীকার করে রাখি বুদ্ধদেববাবু বাংলা কাব্যলক্ষ্মীর যোগ্যপুত্র। তাঁর প্রতিভা কাব্যলক্ষ্মীকে সম্মুখপথে চলবার গতি জুগিয়েছে। কিন্তু এটাও স্বীকার্য যে সবকিছুরই গতির বাড়তি কমতি এবং শেষ আছে। তাই যে পথিক একদিন ঘরছাড়া হয়েছিল সেই পথিকই আবার ঘরের সন্ধান নিতে জানে। সতেজ ঐতিহাসিক উপলব্ধিতে যে বের হলো, সেই আবার ইতিহাসের ভিন্ন নজির টেনে ঘরের আশ্রয় নিল। একথা খুবই সত্যি যে বুদ্ধদেববাবু আপন প্রতিভায় রোমান্টিক রবীন্দ্রযুগ পেরিয়ে রিয়ালিস্টিক রবীন্দ্রোত্তর যুগে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিলেন। ব্যর্থ হয় নি তাঁর সেই প্রচেষ্টা। 'বন্দীর বন্দনা'র বিপ্লবী দৃষ্টি বাংলা কাব্যের পক্ষে প্রথম—তাই সে বিদ্রোহ তথাকথিত সামাজিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের মনে বিরক্তি আনলেও, সাহিত্যামোদী তরুণদের প্রাণে এনেছিল নতুন প্রেরণা—তীক্ষ্ণতর করেছিল তাদের ভাবনার ধারাকে। সেদিন তারা দেখেছিল, কি জীবন, কি প্রেম, কি নারী সব কিছুরই একটা নতুন দিক খুলে দিয়েছেন বুদ্ধদেববাবু। রবীন্দ্রনাথের নারীকে যেমন এই মাটির পৃথিবীর রক্ত-মাংস দিয়ে তৈরী, ভুল-ত্রুটি দিয়ে ঘেরা ভাবতে দ্বিধা হয়েছে, তেমনি বুদ্ধদেবের 'নারী'কে পেয়েছিলাম এই পৃথিবীর ভালোমন্দ দিয়ে তৈরী বাসিন্দা হিসাবে, যা স্বীকার করবার পথে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সাহায্য করেছিল। কোন্‌টা শ্রেয় সে বিচার করব না। মাত্র দেখাব বুদ্ধদেবের সেই সৃষ্টি নতুন ছিল বলেই এনেছিল আনন্দ। না হলে রবীন্দ্রদৃষ্টি দিয়ে সৃষ্টি করলে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে তাঁরটা পড়বার অবসর কোথায় থাকত? কিন্তু ক্রমে বুদ্ধদেববাবু যে পথ ধরলেন সেখানে নতুনের স্থান আর কোথায় রইল? যদি থাকত তবে 'বন্দীর বন্দনা'য় যে চঞ্চলতা সৃষ্টি হয়েছিল—তা হতো। তাঁর দৃষ্টি থমকে দাঁড়িয়েছে—চলছে না। ধরা যাক তাঁর 'পশ্চিম' কবিতাটি। পশ্চিম সম্বন্ধে তিনি নতুন কি আর বলতে পেরেছেন, যার জন্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে সেই তরুণদের মাঝে? রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সঙ্কট' যে একবার পড়েছে, 'পশ্চিম'' পড়ে কি কিছু নতুন উপলব্ধি তার হবে? পশ্চিমের

সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধিকে সজাগ কোন্‌টা বেশী করতে পারবে ? তবে একটা গদ্য সাহিত্য, অপরটা ছন্দের আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে। তাই শেষেরটায় আনন্দ বেশি পাবার কথা। কিন্তু 'সভ্যতার সঙ্কট' গদ্য সাহিত্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশ হয়েও যে কাব্য সৃষ্টি করেছে, 'পশ্চিম' ছন্দের আশ্রয়েও কি তা করতে পেরেছে ? আর 'সভ্যতার সঙ্কট' যে যুগে লেখা হয়েছিল ইয়োরোপ তখন ভাঙনের মুখে। মরণের উন্মাদনায় সেদিন তার আকাশ-বাতাস মথিত হয়ে উঠেছিল। কবি সেটুকুই দেখে গেছেন। কিন্তু আমরা কবির যে পরিচয় জানি তাতে মনে হয় আজ কবি থাকলে নিশ্চয়ই ভাঙনের ভিতর দিয়েও ইয়োরোপ যে নতুন জীবনের কামনায় আজ ফুটে উঠেছে তা তাঁর কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠত। কিন্তু 'পশ্চিম' যেদিন লেখা হয়েছে সে সময়ে ইয়োরোপ মরণের ভিতর থেকেও জীবনের স্বাদ পেয়েছে —জীবনকে ভালোবাসবার, সুখী করবার, সুন্দর করবার কত মত, কত পথ তারা বাতলাচ্ছে। কিন্তু সে সবের কিছুই 'পশ্চিমে' আমরা পাই নি। তাই বলা হয়েছে বুদ্ধদেববাবুর ইসিহাসে অনাস্থা।

ইতিহাসের সৌধ বিচিত্র স্তরে স্তরে গড়ে ওঠে। একরকম দুটি স্তরের স্থান নেই সেই সৌধে। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই ধরা যাক—"মানুষের ইতিহাসকে দেখলে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু সেটা আকস্মিকের মালা গাঁথা।" সেই আকস্মিক কি নব সাজে এসে হাজির হয় না ? কারো যদি প্রয়াস হয় পুনরাবর্তনের—তবে কি ব্যর্থ হয় নি তার সেই প্রয়াস ? অরুণবাবু হয়তো স্বীকার করবেন, আজ বাংলা সাহিত্যে যে সমস্ত উপন্যাস, 'বটতলা' বলে ভূষিত হয়েছে তার মধ্যেও অনেক উপন্যাস আছে যা বঙ্কিমবাবুর কোনো কোনো উপন্যাসের চেয়ে কম আনন্দ দেয় না। তবু কেন তাদের এ অবস্থা ? তাদের ভিতর নতুন করে পাবার কিছু ছিল না। কি চিন্তায়, কি ভাবনায় তাঁরা বঙ্কিমেরই পথ ধরেছিলেন। কোথাও বা বর্ণনা বেশি, কোথাও বা কম ; এর বেশি পাবার কিছু ছিল না তাতে। তাই সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রথিত হয়নি তারা।

প্রতিভাবান শিল্পীর প্রচার আপনা হতেই এসে যায় যুগের শিল্পে। এ অপরিহার্য। কিন্তু কোনো শিল্পী যদি জেদ করে বলেন, অনুকরণ করেও আমি সেই প্রতিভাকে ভাস্বর, অম্লান করে রাখব, তাহলে কি পরোক্ষে তাঁকে ম্লান করা হবে না ? সাথে সাথে তাঁর জাতিকেও ? কিন্তু অরুণবাবু বলেছেন, আজও সেই অনুকরণ হবে এবং তার মাঝেই রবীন্দ্রনাথ মহান। কিন্তু সত্যি কি তাই ?

রবীন্দ্রনাথের নিজের দৃষ্টি তো ছিল তার বিপরীত। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে তিনি জানিয়েছেন—অনুকরণ-পদ্ধতির দ্বারা জাতিকে বড় করা যায় না—যায় না তার শিল্পকে। অতীতের যা পাবো তা সংরক্ষণ করেই নতুন অভিযানে আমাদের বেরুতে হবে। তাই তো তিনি বলেছেন—'আমি চলে যাবো, নতুন পাখী আসবে।' সেই নতুন পাখীর গানটা কি নতুন হবে না? অরুণবাবুর মতে হয়তো তা নয়। পরিবর্তনের পথ বেয়ে চলে সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথও সেই পরিবর্তনের একটি প্রকাশ। তিনি যদি তাঁর প্রাক্তনদের পথে চলতেন তবে কি সার্থক হতে পারতেন? তাঁরও করতে হয়েছিল নতুন সৃষ্টি—তাই তিনি স্রষ্টা। তাঁর নিজেরই এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। বৈষ্ণব কবিরা একদিন তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তাই তাঁদের রীতি অনুসরণ করে তিনি পদরচনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু চিরন্তন সত্যটা তাঁর বুঝতে বেশি বিলম্ব হয় নি। সেইজন্য 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন—"কিন্তু তাঁহাদের (প্রাচীন পদকর্তাদের) ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলিতি টুংটাং মাত্র।" একথা জেনেও কি স্বীকার করব অনুকরণই জাতশিল্প? সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদেরই স্থান হয়েছে, যাঁরা সৃষ্টির পথে নতুন অভিযান করেছেন। মানুষ তাঁদেরই মনে রাখে যাঁরা স্রষ্টা। বুদ্ধদেববাবু সেই অভিযানে একদিন বেরিয়েছিলেন; কিন্তু আজ তিনি শুধু থমকেই দাঁড়ান নি—পিছনে হটেছেন। তাঁর পদক্ষেপ নতুন পথে নয় তা আগেই বলেছি। তবে এটাও বিশ্বাস করি, হয়তো তাঁর পদধ্বনি আগামী দিনে আবার নতুন পথে শোনা যাবে।

যাঁরা নতুন ছাঁদের রচনায় উৎসাহিত বুদ্ধদেববাবু তাঁদের আঙ্গিক পর্যন্ত কিছু কিছু আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেছেন। কথাটা শুনে অরুণবাবু বিশদভাবে না বলবার অভিযোগ জানিয়েছেন। হিরণবাবুর বক্তব্য এখানটায় খানিকটা ঝাপসা। তিনি কি চিন্তা করে বলেছেন জানি না। তবে আমার মনে হয় কথাটা বুঝবার পক্ষে খুব কঠিন নয়। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের কত পরিবর্তন আসে ব্যবহারিক জীবনে—তারই প্রতিক্রিয়া হয় মানস-জগতে। তারই আবার প্রকাশ হয় সমসাময়িক শিল্প সাহিত্যে। মানুষ চেতনায় উদ্ভূত বুদ্ধি দিয়ে হয়ত এই সাময়িক হাওয়াকে এড়াতে চেষ্টা করে, কিন্তু কোন অবসরে

এই হাওয়া তার মনের রংটা দেয় পাল্টে—সে তা বুঝতে পারে না। আপন স্বাভাবিকতায় তখন তার প্রকাশ হয় শিল্পে। পরে শিল্পী সেটা বুঝতে পারলেও অনন্যোপায়। তাছাড়া শিল্পীর যুগের হাওয়ায় টিকে থাকবার পথ এটা। এই কারণে আঙ্গিক আত্মসাতের কথা বলা হয়েছে—আর এই কারণেই বুদ্ধদেববাবুকে বলা হয়েছে প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী।

রাজনৈতিক মতবাদের দাঁড়িপাল্লায় হয়ত সাহিত্য যাচাই হয় না, কিন্তু যুগের জীবনবোধের উপরেই হয় তার যাচাই। শিল্প-সাহিত্য জীবনবোধের তাগিদেই বদলাতে থাকে যুগের পর যুগ। মানুষের জীবনের সেই অন্তর্নিহিত উপলব্ধি প্রথমে দু'একজন প্রকাশ করেন—চোখ রাঙিয়ে তাঁদের শান্ত করা যায় না। তাঁদের সেই প্রচেষ্টার জন্যেই একদিন নতুন মানুষ নতুন বাণী নিয়ে হাজির হয়। আরো একটা কথা। সেই সব সাহিত্যই সংস্কৃতির ইতিহাসে গ্রথিত, যা জীবনের fundamental জিনিসকে নাড়া দিতে পারে। এই fundamental জিনিসকে নাড়া দেবার রূপ যুগে যুগে ভিন্ন। কালিদাস, চণ্ডীদাস সেইসব fundamental জিনিসকে নাড়া দিয়েছেন, কিন্তু ভিন্ন রূপে। তাই তাঁদের প্রতিভা স্বীকৃত এবং আজও জীবন্ত। রবীন্দ্রনাথও ঐ একই কারণে মহৎ; সেই মহত্ত্ব চণ্ডীদাসের অনুকরণের আপেক্ষিক নয়, নিজস্ব নতুন পথের সৃষ্টিতে উদ্দাম গতিতে ছুটে। তাই যাঁরা এই নতুন সৃষ্টির পথ তৈরী করবেন আর এক মহৎকে আনবার জন্য—তাঁদের প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়। সেটা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রযুগে ফিরে গেলে হবে না। সেটা হবে সেই নতুন ছাঁদের রচনা নিয়ে নতুন অভিযানে বেরুলে। তাই অরুণবাবুকে একটা কথা জানাই। অন্ধের মতো কোনো জিনিসের রূপকে শাশ্বত এবং চিরন্তন বলে লাভ নেই। ইতিহাস সে কথায় সায় দেবে না। আজ যে রূপকে উজ্জ্বল, চিরন্তন ও শাশ্বত বলে মনে হচ্ছে আর একদিন দেখা যাবে তা ম্লান। মানুষের সৃষ্টির কর্মকুশলতা তো সেখানেই। এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের একটা কথা উদ্ধৃত করব। সাম্যবাদীর কথা ভেবে অরুণবাবু হয়ত ভ্রূ কোঁচকাবেন তবুও এটা ঐতিহাসিক সত্য: "The demand for final solution and eternal truth ceases once for all……one knows that the antithesis have only a relative validity; that which is recognised now as truth has also its latent false side which with later manifest itself just as that which is

now regarded as false has also its true side by virtue of which it could previously have been regarded as true." উক্তিটির সত্যতা প্রাচীন গ্রীক আর্ট থেকে আজ পর্যন্ত খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে। আরও পরিষ্কার করে বলি—কালিদাসের কবিতা সে যুগে যতটা আনন্দের ঢেউ তুলেছিল এবং তৎকালীন সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিল, আজ রবীন্দ্রযুগে কি ঠিক তা পারে? অবশ্য এতে কালিদাসের প্রতিভা ম্লান বা তাঁর সাহিত্য রসহীন হয় নি মোটেই। তবুও কালধর্মে সব জিনিসের এই পরিণতি ঘটে থাকে। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এই প্রসঙ্গে অরুণবাবুকেও বলি, বুদ্ধদেববাবুর মতকে একমাত্র সত্য এবং তাঁর বিপরীত মতাবলম্বীদের যেমন মিথ্যা মনে হচ্ছে, এর বিপরীত উপলব্ধি সাহিত্যামোদীদের আছে এবং আসতে পারে।

হিরণবাবুর কথাই আত্মস্থ করে বলব—অরুণবাবু প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ পথে পরিভ্রমণ করছেন।

বিনীত

অজিতকুমার রাহা

সবিনয় নিবেদন,

শ্রাবণ ও পৌষের 'পরিচয়ে' শ্রীযুত বুদ্ধদেব বসুকে কেন্দ্র করে শ্রীযুত হিরণ সান্যাল ও শ্রীযুত অরুণ সরকারের যে বিতর্ক চলছে 'পরিচয়ে'র পাঠক হিসাবে সেই সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে ইচ্ছা করি। আশা করি ছাপাবার উপযুক্ত মনে করবেন।

আমার আশঙ্কা হয় যে, শ্রীযুত অরুণ সরকারের পত্রের অনুলিপি প্রাপ্তিতে বুদ্ধদেব রীতিমত শঙ্কিত হয়েছেন। কারণ আজ ১৩৫২ সালে হিরণবাবুর অনুকরণ-বিদ্বেষভীত অরুণবাবুর না জানা থাকলেও বুদ্ধদেববাবুর বোধহয় জানা আছে যে ১৩৩৪ সালের পৌষ মাসে 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় 'আধুনিকতার ওকালতী'তে বলেছিলেন, "... ... একথা বলা বাহুল্য যে বাংলার কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যুগ আর নেই। বাংলা কবিতার ধারা রবীন্দ্রনাথের যুগ পেরিয়ে এসেছে, আমাদের সাহিত্যের উন্নতিকামীদের পক্ষে এটা আনন্দের কথাই তো হওয়া উচিত বলে মনে করি। বলা বাহুল্য হলেও একথা বলার আজ প্রয়োজন হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই বাংলা কাব্যসাহিত্যের সমস্ত Possibilities-

এর পরিণতি বা পরিসমাপ্তি হয় নি······এ যুগের কবি জীবনটাকে যেমন ক'রে দেখছেন তেমন ক'রে রবীন্দ্রনাথ বা পূর্ববর্তী আর কোনো কবি দেখেন নি।"

রবীন্দ্রনাথের যুগ যদি ১৩৩৪ সালের পৌষ মাসেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে তবে ১৩৫২ সালের শ্রাবণে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ অসহ্য হয়ে ওঠা কি খুবই অস্বাভাবিক?

কিন্তু রবীন্দ্র-অনুকরণ অসহ্য হওয়া ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অনুকরণীয় কিছু নেই একথা বলার মধ্যে একটি বড় পার্থক্য আছে, যাকে অরুণবাবু অবহেলায় এড়িয়ে গেছেন। এইজন্য এড়িয়ে গেছেন যে সাহিত্যে ঐতিহ্য ও ব্যক্তিপ্রতিভা এই দু'য়ের সম্বন্ধ তাঁর কাছে যথেষ্ট সুস্পষ্ট নয়। অনুকরণের দ্বারা যে ঐতিহ্যের সম্মান হয় না, ঐতিহ্যকে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দ্বারাই তার শ্রেষ্ঠ সম্মান করা হয়—এই কথাটা অরুণবাবুর পরিষ্কার করে নেওয়ার দরকার। আজকের নতুন সাহিত্য রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে উৎপাটিত করে 'নতুন' কিছু গড়ছে না, রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকেই নতুন কাল ও পরিবেশের ভাবধারা দ্বারা সমৃদ্ধ ক'রে প্রগতিশীল আধুনিক ঐতিহ্যকে সৃষ্টি ক'রে চলেছে। অনুকরণের দ্বারা যদি রবীন্দ্রনাথের মাহাত্ম্য প্রমাণের প্রয়োজন ঘটে তাহলে বুঝতে হবে রবীন্দ্র-সাহিত্য 'মৃত এবং প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে।' একমাত্র অনুকারকের কাছেই আজ রবীন্দ্র-সাহিত্য 'মৃত এবং প্রস্তরীভূত', প্রগতিশীলের কাছে নয়। এমন একটা গোড়ার কথা, সাদা কথা,—যা লেনিন (সাম্যবাদীর মতে প্রগতিশীল) এবং এলিয়ট (সাম্যবাদীর মতে প্রতিক্রিয়াশীল) উভয়েই সমানভাবে স্বীকার করেছেন—তার সম্বন্ধে অজ্ঞতা মোটেই ক্ষমার্হ নয়। এলিয়ট—"True originality is merely development (Italics mine), and if it is right development it may appear in the end so inevitable that we almost come to the point of view of denying all original virtue to the poet. He simply did the next thing." —Introduction to Pound's Selected Poems, Faber and Faber, P. 8.

লেনিন—"Without a clear understanding that only by an exact knowledge of the culture created by the entire

evolution of man, that only by an analysis of it can a proletarian culture be created—without such an understanding we shall never solve this problem Proletarian culture is not something that springs from nowhere, is not an invention of people who call themselves specialists in proletarian culture. This is complete nonsense. Proletarian culture must be a logical development (Italics mine) and those funds of knowledge which humanity has worked out under the yokes of capitalist society."—Lenin quoted in Lunacharsky's Lenin on Art and Literature, Oriential Publishing House, Benares, 1943, P-20.

'পশ্চিম' কবিতাটিই বুদ্ধদেবের ইতিহাস-বোধের পরিচয়, এই কথা অরুণবাবু আমাদের জানিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'ফিনল্যাণ্ড আক্রমণের অন্তর্নিহিত অর্থ' বুঝতে যদি না পেরে থাকেন তাতে সাম্যবাদী তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেন না, বুদ্ধদেব যদি আজকের পশ্চিমকে দেউলিয়া দেখেন তাতে সাম্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীলতা দেখতে পান। কারণ রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব একই যুগের মানুষ নন। রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সঙ্গমের মধ্যে—মহর্ষির উপনিষদবনস্পতির ছায়ায়, বেঁচেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর নতুন বাংলা তথা নতুন ভারতের মহাজাগরণের মধ্যে। এই bourgeois national আন্দোলনের পরবর্তী যুগের দিকেও যে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বহুদূর প্রাসারিত হয়েছিল সেইটেই আজকে আশ্চর্যের বিষয়। 'রাশিয়ার চিঠি'র জন্য, নোগুচি পত্রগুচ্ছের জন্য, 'হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্যে'র জন্য আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাব, কিন্তু 'ফিন্ল্যাণ্ড চূর্ণ হোলো'র আপত্তিতে উত্তেজিত হব না। কিন্তু রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের অহংকৃত স্বকীয়তাবিশিষ্ট কবির মধ্যে যদি দেখি 'প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের' রাবীন্দ্রিক নকলিয়ানা, সুস্পষ্ট ইতিহাস-অন্ধতা, তাতে ক্ষুণ্ণ হবার কারণ ঘটে। মানুষের জীবনকে নিয়েই মানুষের ইতিহাস। আজকের ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে কোনো কবি যদি 'চার পাশের জগত সম্বন্ধে সজাগ' হওয়ার সুলভ সীমা পেরিয়ে জীবন্তভাবে ইতিহাস-চেতন না হতে পারেন, তার কারণ এ নয় যে তিনি রাজনীতি ভুল বুঝেছেন; তার কারণ এই যে মূলত তিনি

জীবন সম্বন্ধে সচেতন নন। যে স্পর্শানুভূতি থাকলে জীবন্ত মানুষ জীবন্ত ইতিহাসের দিকে ধাবিত হয়, সেই স্পর্শানুভূতি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। ইতি—

বিনীত

চিদানন্দ দাশগুপ্ত *

---

* পরিচয়, মাঘ ১৩৫২, পৃ. ৪৯৭-৫০৬। 'পরিচয়'-এর 'পাঠক-গোষ্ঠী' বিভাগে এই পত্রগুচ্ছ প্রকাশিত হয়। উক্ত সংখ্যায় 'পরিচয়' সম্পাদকমণ্ডলী একটি 'ভ্রম সংশোধন' যুক্ত করে ইতিপূর্বে প্রকাশিত অরুণকুমার সরকারের পত্রখানির 'দুটি গুরুতর ভুল' সংশোধন করেন। এই 'ভ্রম সংশোধন' অনুসারে বর্তমান গ্রন্থের ২০৭ পৃষ্ঠার ২০ পংক্তিতে প্রকাশিত 'পোল্যাণ্ড'-এর স্থানে 'ফিনল্যাণ্ড' এবং ২০৮ পৃষ্ঠার ৬ পংক্তিতে প্রকাশিত 'প্রগতি ও প্রচলিত প্রতিক্রিয়ার সংজ্ঞা'-র স্থানে 'প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার প্রচলিত সংজ্ঞা' পড়ার জন্য আমরাও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এছাড়া ইংরেজী উদ্ধৃতির রেখাঙ্কিত অংশে লেখক 'ইটালিক্স' ব্যবহার করেছিলেন, এটাও উল্লেখ্য বলে মনে করি। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

'কবিতা' ও বুদ্ধদেব বসু / হিরণকুমার সান্যাল

গত শ্রাবণের 'পরিচয়ে' পত্রিকাপ্রসঙ্গে 'কবিতা' পত্রিকা ও শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু সম্বন্ধে আমার যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত অরুণকুমার সরকারের তীব্র প্রতিবাদের কল্যাণে ফাল্গুনের পত্রিকায় বিষয়টির জের টানতে হচ্ছে। অরুণবাবু তাঁর প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর চেয়েছিলেন, এই প্রত্যুত্তর মাঘের সংখ্যায় ভালো করেই তিনি পেয়েছেন। অত পর আমার আর কিছু বলবার নাই। শুধু সম্পাদকীয় প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যে অত্যন্ত সংক্ষেপে দু' একটি কথা বলে আমি নিরস্ত হতে চাই।

গত মাসে এই বিষয়ে যে চিঠিগুলি * বেরিয়েছে তার প্রথমটির লেখক আমাদের জানিয়েছেন, "শ্রীবুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে বাদানুবাদ আর না বাড়ালেই ভালো হতো। কেন না কবিত্বের বিচারে শেষ কথা হচ্ছে রুচি।" বাদানুবাদ বাড়ানোর বিরুদ্ধে আরো কেউ কেউ আপত্তি জানিয়েছেন। এর উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, প্রথমত, বাংলাদেশের সমসাময়িক সাহিত্যে বুদ্ধদেববাবুর যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে, সুতরাং তাঁর মূল্য যাচাই প্রসঙ্গে যদি কিঞ্চিৎ বাদানুবাদ হয় তাতে ক্ষতি কি? স্বীকার করি সমসাময়িক বাঙালী কেউই খুব বড় লেখক নন, কিন্তু তাই বলে আজকের দিনে কি সমসাময়িক সাহিত্যের আলোচনা বন্ধ রেখে শুধু রবীন্দ্রনাথ বা তাঁরও আগেকার মহারথীরাই আমাদের একমাত্র আলোচ্য বলে মেনে নিতে হবে?

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, এ ক্ষেত্রে বুদ্ধদেববাবু আমাদের লক্ষ্য নন, উপলক্ষ্য মাত্র। এই বাদানুবাদের প্রকৃত বিষয় কি যাঁরা অরুণবাবুর চিঠি ও তার উত্তরগুলি পড়েছেন তাঁরা আশা করি বুঝেছেন। অতঃপর আমি আর একটি কথা শুধু বলতে চাই। "অগ্রচারী ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে" (অরুণবাবুর ভাষায়)

* গত সংখ্যায় পত্রলেখকদের একজন, শ্রীপরিমল বসু জানাচ্ছেন যে তাঁর স্বাক্ষরের নিচে প্রকাশিত হয়েছিল, "সম্পাদক সাহিত্য-ভবন," কিন্তু আসলে হওয়া উচিত ছিল, "আমাদের সাহিত্য ভবন।"

যেহেতু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা "ভাস্বর, অম্লান এবং জীবন্ত," অতএব নাকি রবীন্দ্রনাথের অনুকরণের বিরুদ্ধে আপত্তি করা তাঁকে অপমানিত করা, কেন না রবীন্দ্রনাথ 'আজও মহৎ, আজও জীবিত' এই কথা তাঁর "অনুকরণের দ্বারাই পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হবে।" এই বিষয়ে বুদ্ধদেববাবু কি বলেন দেখা যাক। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বই-র সমালোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেববাবু লিখেছিলেন: "যে কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে প্রায় চেনাই যায় না, অথচ যা রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়, সে কবিতা লিখলেই বা কী, না লিখলেই বা কী?" (কবিতা, আষাঢ়, ১৩৫০)। এই মতে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে সায় দি'। শুধু দুঃখ হয় "পশ্চিম" কবিতাটি রচনার সময়ে বুদ্ধদেববাবু নিজেই এই মত বিস্মৃত হয়েছিলেন। তার কারণ কবি বুদ্ধদেব বসুর থেকে সমালোচক বুদ্ধদেব বসু অনেক বেশী সচেতন। শ্রাবণের পত্রিকাপ্রসঙ্গের শেষ অংশে আমি এই কথা বলেছিলাম, অরুণবাবুর বোধহয় তা স্মরণ আছে। ইতি*

* পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৫২, পৃ ৫৮০। হিরণকুমার সান্যাল-এর প্রত্যুত্তর 'পত্রিকা-প্রসঙ্গ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই রচনার অন্ত পাদটীকাটি 'পরিচয়' সম্পাদকের। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।
—সম্পাদক

কাব্যদৃষ্টি ও সমর সেনের 'তিন পুরুষ' / মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা কবিতার অনুরাগী পাঠক হিসেবে একটা প্রশ্ন বহুকাল ধরে আমাকে ভাবিয়েছে। প্রশ্নটি—কাব্যবস্তু সম্বন্ধে। একটা জিনিস আমরা সকলেই স্পষ্ট অনুভব করছি যে, আমাদের আধুনিক কবিদের, বিশেষ করে অত্যন্ত হালে যাঁরা কলম ধরেছেন—তাঁদের, জীবনদৃষ্টি যতই প্রগতিশীল হচ্ছে সত্যিকার সার্থক কবিতাও সেই অনুপাতে দেশে ক্রমশ দুর্লভ হয়ে উঠছে। এই স্ববিরোধী অবস্থার একটা সস্তা সমীকরণ অবশ্য বাজারে চলতি। এই দলের সমালোচকদের মতে, প্রগতিশীল জীবনদর্শনের আওতায় যখন মহৎ কবিতার জন্ম হচ্ছে না, তখন তার জন্যে দায়ী একমাত্র কাব্যসৃষ্টির অক্ষমতাই। ফলে, অত্যন্ত সহজেই এই পরিচিত সিদ্ধান্তে এসে এঁরা পৌঁছেছেন,—বাংলাদেশে ভালো গল্পলেখক, প্রাবন্ধিক ইত্যাদির অভাব নেই, অভাব শুধু মহৎ কবির।

অত্যন্ত দুরূহ কোনো সমস্যার এমন সুলভ সমাধানে মন ভুলালেও, সমস্যা শেষপর্যন্ত থেকেই যায়। সহজ ব'লেই এই রকম সমাধান মূল সমস্যাকে সব সময়ে এড়িয়ে চলে।

আসলে আমার মনে হয়েছে, এইসব সমালোচকের মূল দৃষ্টিভঙ্গিটাই গোলমেলে। নিসর্গ-সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ প্রত্যেক মানুষের স্বভাবের গভীরে, কিন্তু সব সময়ে সে আবেদন সমান কার্যকরী না হওয়াও আবার তেমনি স্বাভাবিক—মনের বিশেষ অবস্থার সঙ্গে প্রতিবেশের স্বাভাবিক সংযোগের উপরই এর নির্ভর। এখন কোনো কালাপাহাড়ী রসজ্ঞ যদি উপভোগের এই আপেক্ষিক রীতিকে অস্বীকার করে তার বিশুদ্ধতাকেই চিরন্তন বলে দাবী করেন এবং রসগ্রহণে অসমর্থ হতভাগ্যকে শেক্স্‌পীরীয় সংজ্ঞার চলতি অপব্যাখ্যা অনুযায়ী অপরাধ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বলে গণ্য করেন তাহলে অন্তত বাস্তবচেতনা যে মাঠে মারা পড়ে এ-বিষয়ে নিশ্চিত। এবং এ-মনোভাব যে বাস্তবতার বিরুদ্ধে উৎকট কালাপাহাড়ী দৃষ্টিভঙ্গির ফল তা শুধু এই কারণেই যে,

এই ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তিবিশেষের মন নির্জীব দর্পণ মাত্র, সক্রিয় কাব্যচেষ্টা সংজ্ঞাধীন যে নিষ্ক্রিয় মনের কাছে অকল্পনীয়!

সত্যিই, আজকের সমাজজীবনে কাব্যরচনার উপদান তো যথেষ্টই, অথচ তা সংহত সার্থক কাব্যবস্তুতে রূপান্তরিত হচ্ছে না কেন?—অনেক সময় মনে হয়েছে খাঁটি দার্শনিকতার সঙ্গে কবিতার মেজাজের একটি মৌল পার্থক্য থেকেই বোধ হয় এই সংকটের উদ্ভব। পারে আবার মনে হয়েছে, কিন্তু কোনো কবির মনে বিশুদ্ধ তত্ত্বকথা (রাজনীতির ভাষায়—শ্লোগান) যদি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার রসে জারিত হয়ে একেবারে জীবন্ত হয়ে ওঠে তবে খাঁটি কাব্যবস্তু হতেই বা তার বাধা কি?

অন্যপক্ষে বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ সাহিত্যিকরা সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। কাব্য ও দর্শনের মৌল বিরোধের সমীকরণ অর্থাৎ সমষ্টি ও ব্যক্তি-চেতনার একাত্মতাসাধন) তাঁদের মতে অসম্ভব, তাই এই উনিশশো পঁয়তাল্লিশেও তাঁরা সাহিত্যিক ছুৎমার্গে আশ্চর্যরকম আস্থা রাখেন এবং মনে করেন, যেকোনো রকম কবিতা ('একটু সুর একটু হৃৎস্পন্দনে'র কবিতাও হতে পারে) লিখেই তাঁরা গুরুতর সামাজিক দায় পালন করছেন। কিংবা অনেক সময় এই সমস্যার একটা কৃত্রিম সমীকরণের চেষ্টাও তাঁরা করেন, যখন সক্রিয় 'কর্মলোক' (দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্র)-কে সচেতনভাবে এড়িয়ে তাঁরা 'রাজনীতির যে প্রেরণা ভাবলোকের' সেই বিশুদ্ধ 'প্রেরণা'য় কবিতা লিখতে রাজি হন।

এক্ষেত্রে মুশকিল এই যে, রাজনীতির 'ভাবলোকের' বিশুদ্ধ 'প্রেরণা' কাব্যচেষ্টারও প্রেরণা মাত্র—কিন্তু তার বেশি আর কিছু নয়! এই বিশুদ্ধ প্রেরণার ভিত্তিতে যদি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বাস্তব ক্ষেত্রটি না থাকে বা ক্রমশ না গড়ে ওঠে, তবে একদিন সেই ছিন্নমূল প্রেরণা তার আকাশবাসরের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে গিয়েই অকালে প্রাণ হারাবে। এ-প্রসঙ্গে সমর সেনের ব্যক্তিগত সাহিত্যিক ইতিহাসও বিশেষভাবে স্মরণীয়। সমরবাবু একজন শক্তিমান আধুনিক কবি এবং তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ, ১৯৪০-এ প্রকাশিত 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা'র রচনাকাল থেকে 'রাজনীতি'র (মার্কসীয় রাজনীতির) ও 'ভাবলোকের' (মূল দার্শনিক মতবাদের এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বহুমুখী ব্যাখ্যার) 'প্রেরণা'য় আস্থাও তাঁর অকৃত্রিম, অথচ ১৯৪৪-এ প্রকাশিত তাঁর আধুনিকতম কবিতার বই

'তিন পুরুষ' পড়তে গিয়ে এই কথাটাই বারবার মনে হ'লো যে, 'রাজনীতির' 'ভাবলোকের' বিশুদ্ধ 'প্রেরণা' গত চার-পাঁচ বছরে কবির ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে সমষ্টিচেতনার সমীকরণের কাজে তাঁকে একতিলও অগ্রসর হতে সাহায্য করে নি।

ফলে 'তিন পুরুষ' পড়তে পড়তে আমার সেই মূল প্রশ্নের জবাব আমি নিজের মনেই খুঁজে পেলুম। মনে হলো দার্শনিক তত্ত্ব ও বিশুদ্ধ কাব্যবস্তুর মধ্যে বিচ্ছেদ প্রকাণ্ড কিন্তু সেই বিচ্ছেদে সেতু বাঁধার দুরূহ কাজটিই আবার আজকের সার্থক কবির। এবং এই কাব্যচেষ্টা 'রাজনীতির' 'ভাবলোকের' 'প্রেরণা'র আস্থায় মাত্র নয়, এটি একটি রাজনৈতিক কর্মসূচীর অনুসরণেই সক্রিয়।

আর বাংলা কবিতার আসল গলদ এইখানেই। ইংরেজ লেখক জ্যাক লিণ্ডসে তাঁর সংক্ষিপ্ত কিন্তু মূল্যবান কাব্য-আলোচনাগ্রন্থ 'Perspective for poetry'-তেও আধুনিক ইংরেজি কাব্যপ্রকৃতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তার এই মৌল নিষ্ক্রিয়তা-বোধ বা 'Flaw of Passivity'র উপর খুব বেশী জোর দিয়েছেন, দেখলুম। আমার ধারণা, সমরবাবু এবং আমাদের আধুনিক অন্যান্য কবির কাব্যচেতনার মূলে আসলে লিণ্ডসে-বর্ণিত এই 'Flaw of passivity' ই গভীরভাবে কাজ করছে।

এই শেষোক্ত লেখক তাঁর বইটিতে বারবার এমন একটি সক্রিয় কাব্যচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন—শ্রেণীসমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রয়োগক্ষেত্রে সমসাময়িক প্রগতিশীল শ্রেণীর সঙ্গে কবির ব্যক্তিস্বরূপের একাত্মতা উপলব্ধির পদ্ধতির যা অঙ্গাঙ্গী। কিন্তু এ-কথাও এ-প্রসঙ্গে স্বীকার্য যে, কবির ব্যক্তিস্বরূপের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সেই ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে শ্রেণীসমাজের অনবরত বিরোধ, একাত্মতা উপলব্ধির এই পদ্ধতিকে সর্বদাই সংকটসংকুল করে রাখে। সংকটের এই আবর্তে তাই কবির পক্ষে শেষ পর্যন্ত দুটি পথ খোলা: হয় তিনি এই সংঘাতের মধ্যেই নতুন সংহতির ভিত্ রচনা করে সামাজিক অগ্রগতিকে রক্তমাংসে সঞ্জীবিত করে তুলবেন, আর তা না হলে, অন্ধ ঘূর্ণিপাকের জটিলতায় তিনি তলিয়ে যাবেন এবং হয়তো শেষকালে পালিয়ে বাঁচাবেন কিংবা হার মেনে কবিতা লেখাই ছেড়ে দেবেন। এবং প্রায়ই দেখা যায় যে, ঠিক এই কারণেই—এই রাহুময় আত্মজিজ্ঞাসার হাত এড়াতেই—কবির হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ'-এর পলায়নী পদ্ধতি অনুযায়ী বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের নিরাপদ আশ্রয়ে নীড় বাঁধেন।

আধুনিক বাংলাদেশের কাব্যপ্রকৃতির নিষ্ক্রিয়তা-বোধের মূল উৎস এইখানে। এবং এই কারণেই সমর সেন ও অন্যান্য আধুনিক কবি থিয়োরির ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বাবুর সঙ্গে একমত না হলেও কার্যত এঁরা 'রাজনীতির' এই 'ভাবলোকের'ই ব্যাপারী। সমাজজীবনের উন্নততর পরিবর্তনে তাই বিশ্বাস রেখেও ব্যক্তিগত জীবনে সেই পরিবর্তনের সক্রিয় চেষ্টায় একাত্মতা-বোধের অভাবে এঁদের কাব্য-চেষ্টার করুণ পরিণতি অবশেষে অত্যন্ত ব্যক্তিগত, স্বল্পপ্রাণ 'আশা' 'ভরসা'র প্রতিচ্ছবিতে :

"একটি একেলা বট খাপছাড়া ছায়া দেয়,
প্রায় পত্রহীন সে প্রৌঢ় বট, বহুদিন মাখেনি সবুজ কলপ
কিন্তু তার শিকড়েরা ঊর্ধ্বমুখ, আকাশ সন্ধানে।"

[তিন পুরুষ : জোয়ার-ভাঁটা]

'তিন পুরুষ'-এর কবি এই ছিন্নমূল প্রাণের উৎকেন্দ্রে নিঃসঙ্গ, একক—গতশক্তি, আকাশসন্ধানী 'বট'ই দারুণ দুর্দিনে তাঁর কাছে জীবনের একমাত্র প্রতীক। তাই শেষপর্যন্ত মিলিত অগ্রগতিতে আস্থা রেখেও কার্যকালে স্বাতন্ত্র্যের দৃঢ়দুর্গ থেকে এই কবি বলছেন :

"আশা রাখি একদিন এ-কান্তার পার হয়ে পাবো
লোকের বসতি, হরিৎ প্রান্তরে শ্যামবর্ণ মানুষের
গ্রাম্যগানে গোধূলিতে মেঠো পথ ভরে···"

[২২ শে জুন, ১৯৪৪]

অর্থাৎ, সেই একাত্মতা-বোধের অভাব আর নিষ্ক্রিয়তা; নিষ্ক্রিয়তা আর উগ্রতর স্বাতন্ত্র্য! এবং আমাদের আলোচ্য বইটিতে কাব্যপ্রকৃতির এই মৌল নিষ্ক্রিয়তা-বোধ দু'দিকে দু'টি বিশেষ লক্ষণে পরিস্ফুট। একদিকে, যেখানে কবি ইতিহাসের ব্যাপক পটভূমিতে সমাজ-বিবর্তনের ধারাবাহিকতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন, জোড়া-দেওয়া খণ্ডচিত্রে সেখানে তা সিনারিয়ো ধর্মী হয়ে উঠেছে—জীবন হয়ে উঠেছে সেখানে জীবনের abstractian। এর প্রমাণ এ-বইটির 'কালের যাত্রা' কবিতাটি। এখানে তিনটি বিচ্ছিন্ন কালের পটভূমিতে তিনটি টাইপ চরিত্র-চিত্র এঁকে এবং সেই তিনটি চরিত্রের মধ্যে মোটামুটি একটা রক্তসম্বন্ধের যোগসূত্র টেনে তাঁর স্বকৃত জীবনচিত্রের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ক্রমিক ধারাবাহিকতা দেখাবার যে চেষ্টা সমরবাবু করেছেন তার কৃত্রিমতা অত্যন্ত প্রকট। কারণ, পরপর তিনটি

ঐতিহাসিক যুগের সম্বন্ধ পরস্পর বিচ্ছিন্নতায় নয়, পরস্পরনির্ভরে। বরং এই সম্বন্ধের সূত্র আরো গভীরে। সামন্তসমাজ শুধু ধনতন্ত্রের জন্মের অনুকূল অবস্থাই সৃষ্টি করে নি, সেই সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই বুর্জোয়া বণিকশ্রেণী নতুন সমাজগঠনের শক্তি অর্জন করেছে, ঠিক যেমন ধনতন্ত্রের বর্ধিষ্ণু উৎপাদন-শক্তি ও তার যন্ত্রশিল্পের প্রসার-সম্ভাবনা সমাজতন্ত্রের জন্মের উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে, আর তার অন্তর্বিরোধে—সংগঠিত শ্রমিক-কৃষকের চেতনায় সমাজতন্ত্রের জন্মরহস্য। তাই বিবর্তনশীল কালের পটভূমিতে কতকগুলি টাইপ চরিত্রকে বিশেষ বিশেষ কালের প্রতিভূ হিসেবে দেখাতে হলে শুধু তাদের মধ্যে সময়ের বিশেষ লক্ষণগুলি ফুটিয়ে তুললেই কবির কাজ শেষ হয় না—সেই লক্ষণগুলির বিরুদ্ধে তাদেব সচেতন কিংবা অবচেতন প্রতিরোধস্পৃহাও স্পষ্টভাবে দেখানো দরকার, তা না হলে জীবন্ত চরিত্রগুলোকে আসলে সময়ের নির্জীব প্রতিফলন বলে মনে হয়। এবং সমরবাবু তাঁর আলোচ্য কবিতাটিতে স্বভাবতই এ-বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক না হওয়ায় উল্লিখিত তিনটি বিভিন্ন সময়ের মধ্যেকার জীবন্ত যোগসূত্রটিও অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ছিঁড়ে গেছে।

আবার অন্যদিকে, নিষ্ক্রিয়তাবোধ থেকে উদ্ভূত এই খণ্ডিত কাব্যদৃষ্টিই সমরবাবুর কবিমনের রসবিচারের সম্মুখীন: সেখানে আত্মসমালোচনায় তিনি দুর্বার, কঠিন। কোনো কোনো কবিতায় (গৃহস্থবিলাপ, স্বাক্ষাই, ২২ শে জুন, ১৯৪৪ প্রভৃতি) তাঁর এই আত্মসমালোচনার প্রবৃত্তি স্পষ্ট রূপ নিয়েছে উগ্র বামপন্থী মনোবিকারে। এবং এই সমস্ত কবিতায় মৌল নিষ্ক্রিয়তাবোধ থেকে উদ্ভূত খণ্ডিত কাব্যদৃষ্টির সমালোচনা-প্রসঙ্গে উগ্র বামপন্থী ভাববাদের কুয়াশা সৃষ্টি ক'রে তিনি আরো বেশি প্রমাণ করলেন—এই নিষ্ক্রিয়তা তাঁর কাব্যসত্তায় কত দৃঢ়মূল!

প্রথমে 'গৃহস্থবিলাপ' কবিতাটি ধরা যাক। গত মন্বন্তরের উপর এটি সমরবাবুর অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবিতা। এখানে মন্বন্তরে ইতিহাসের যে-অভিব্যক্তি তিনি দেখেছেন তা অনেকটা গ্রীক ট্র্যাজেডীর মতো অমোঘ, অবশ্যম্ভাবী। তাই যদিও······'দেশের দুর্যোগে কী উপায়ে কাঁচা টাকা ভাঁড়, দত্ত করে' সে-সম্বন্ধে তিনি অবহিত তবু দুর্যোগের নৈর্ব্যক্তিক অবশ্যম্ভাব্যতা তাঁর রচনায় এত স্পষ্ট যে তাঁর ব্যঙ্গে বিদ্রূপে—

"যে যাদুতে কাগজ-হকার
গিয়েছে একদা লাটের মন্ত্রণাগার,
সে যাদুতে আমরা বঞ্চিত…"

—ইত্যাদি লাইনে একটা অস্পষ্ট আত্মকরুণার সুর কানকে ফাঁকি দিতে পারে না। তবু শেষপর্যন্ত যেহেতু 'বড়লোকে আস্থা নেই আর' তাই মন্বন্তরের পরবর্তী সময়ে তাঁর সিদ্ধান্ত এইরকম:

"অকাল মরণ শেষে এ-কাল সমরে!
তোমাকে জানাই বন্ধু:
পথে বাধা পর্বত আকার,
ঘুণধরা আমাদের হাড়,
শ্রেণীত্যাগে তবু কিছু
আশা আছে বাঁচবার।"

আশ্চর্য এই যে, মন্বন্তর যাঁর কাব্যে কালের আমোঘ প্রকোপ—অনেকটা দৈবদুর্বিপাকের মতো, সামাজিক ভাঙন যাঁর কাছে এক অপ্রতিরোধ্য বিভীষিকার সামিল, অবশেষে তিনও একেবারে 'শ্রেণীত্যাগে' বাঁচবার উপায় সন্ধানে ব্যস্ত! কিন্তু 'শ্রেণীত্যাগ' তো জীর্ণ কাপড় পরিত্যাগের মতো কোনো একটি বিশেষ কাজ নয়, সেটি একটি আয়াসসাধ্য কর্মপদ্ধতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। যুগসঞ্চিত শ্রেণীসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পেছনে দীর্ঘকালের যে সক্রিয় ইতিহাস আছে, সমসাময়িক কালের সঙ্গে ব্যক্তিচেতনার একাত্মতা উপলব্ধির পদ্ধতির যা অনুষঙ্গী, সমরবাবুর বর্ণিত এই মন্বন্তর ও মারীগ্রস্ত ভগ্নমন মধ্যবিত্ত-জীবনে তার স্বীকৃতি কোথায়? অথচ আসলে গত কয়েক বছরের বাংলাদেশে সে ইতিহাস দুর্লভ ছিল না। অব্যবস্থিত সাম্রাজ্যবাদের আওতায় অমোঘ আর্থিক বিপর্যয়কে মেনে নিয়েও উনিশশো বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশের বাংলাদেশের বিশেষ অবস্থায় যে জনসাধারণ আমলাতন্ত্রের অবাধ-বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছে, তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ-পয়তাল্লিশে আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি ও মজুতদারের চোরা-বাজারের বিরুদ্ধে সমস্বার্থে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণসংহতির ভিত্ যারা রচনা করেছে—মন্বন্তর একমাত্র তাদের কাছেই দৈবদুর্বিপাক নয়, সামাজিক ভাঙনও তাদের কাছে অপ্রতিরোধ্য নয়, অবসিত সমাজের পুনর্গঠনের দায় তাই তাদেরই দৈনন্দিন কর্মতালিকার অঙ্গ। প্রবল ধ্বংসশক্তির বিরুদ্ধে এই সক্রিয় সচেতন

প্রতিরোধবৃত্তি সংখ্যাশক্তিতে হয়তো অকিঞ্চিৎকর, তবু এই সক্রিয় সংঘর্ষই সমসাময়িক বাংলাদেশের একমাত্র ইতিহাস এবং এই ইতিহাসই আমাদের শ্রেণী-চেতনাকে তীব্রতর করতে সমর্থ। একে অস্বীকার ক'রে শ্রেণীচেতনার কথা চিন্তা করা খানিকটা কাব্যিক ইচ্ছাপূরণ মাত্র।

এবং সমরবাবুর এই উগ্র বিভ্রান্তির পরিণতি ঘটেছে অবশেষে আত্মগ্লানিতে—সাফাই, ২২শে জুন, ১৯৪৪ প্রভৃতি কবিতায়—যেখানে আত্মসমালোচনাচ্ছলে তিনি সমসাময়িক অন্যান্য তথাকথিত 'মার্ক্সিস্ট' কবিদেরও বিদ্রূপ করেছেন। বলা বাহুল্য, আমার আপত্তি তার বিদ্রূপে নয়; এ-উল্লেখ তার লক্ষ্যভ্রষ্টতার আর একটি দৃষ্টান্ত মাত্র:

> "কিন্তু জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আজ আমি
> দু-নৌকায় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি,
> বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর
> ভাগ্যবান এ-কবিকে বিপুলা যশোদা
> নিশ্চয় দেবেন ব'লে আমার বিশ্বাস"
>
> [সাফাই]

এখানে তাঁর বক্তব্য অবশ্য খুব স্পষ্ট হয় নি। তবু আমার মনে হয়েছে, হয়তো সমরবাবু 'মার্ক্সিস্ট' কবিদের সততার অভাবকেও বড়ো ক'রে দেখাতে প্রয়াস পেয়েছেন, শুধুমাত্র এইসব কবির মনে সক্রিয় শ্রেণীচেতনার অভাবের কথাটাই এখানে তাঁর বিশেষ বক্তব্য নয়। কিন্তু আমার অনুমান সত্যি হলে বলতে হয় এক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভুল হয় নি। কারণ, প্রথমত শ্রেণীচেতনা তো কারো জন্মগত অধিকার নয়, এটি একটি ঘনিষ্ঠ বাস্তব চেতনা অর্জনের বিলম্বিত পদ্ধতির পরিণতি। এবং এইসঙ্গে একথাও ভুললে চলবে না যে, এই শ্রেণীসমাজে কবিরা, এমন কি তথাকথিত 'মার্ক্সিস্ট' কবিরাও সাধারণত মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে আসেন। এবং এই নয়া মধ্যবিত্তশ্রেণীর সামাজিক অবস্থানটাও বেশ কিছুটা গোলমেলে: উৎপাদনরীতির বিশুদ্ধ আর্থিকক্ষেত্রে এর স্বার্থসঞ্জাত ঘনিষ্ঠতা ক্রমশই প্রোলেটারিয়েটের অভিমুখী অথচ শিক্ষাদীক্ষায় ও সামাজিক সংস্কারে এখনো এর আত্মিক যোগাযোগ বুর্জোয়ার সঙ্গেই। ফলে কোনো বিশিষ্ট শ্রেণীগত চারিত্র্য এর নেই; তাই এই শ্রেণী থেকে যে কবি আসেন— মার্ক্সীয় জীবনদর্শনে

চরম আস্থা কিংবা মন্বন্তর-মড়কের প্রত্যক্ষ বিভীষিকাই তাঁর মধ্যে রাতারাতি শ্রেণীচেতনার সঞ্চার করতে পারে না।

আসলে এই চেতনা অর্জনের জন্যে দীর্ঘদিনের সংগ্রামের অবকাশ আছে। ধ্বংসের মুখোমুখি জীবনসংগ্রামে কবির সক্রিয় সহযোগিতার সাফল্য এবং তার ফলে গণশক্তির ক্রমবর্ধিষ্ণু দৃঢ়মূল সংহতিই কালক্রমে এই চেতনাকে পুষ্ট করে তাই এ-প্রসঙ্গে কবির ব্যক্তিগত সততার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

বলা বাহুল্য, বাস্তব পরিবেবেশের প্রশ্রয়ী আপেক্ষিক এই শ্রেণীচেতনা মূলত নিশ্চয়ই কবির ব্যক্তিগত সক্রিয় চেষ্টার ফল; তা না হলে যে-কোনো কাব্যবিচারই অসম্ভব হতো। এখানে আমি শুধু শ্রেণীসমাজের বিশেষ অবস্থায় মধ্যবিত্তশ্রেণী-সম্ভূত লেখকের বিশেষ অসুবিধের কথাটাই উল্লেখ করেছি মাত্র। কিন্তু যদি কেউ এর ফলে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে সমরবাবুর কবিতা-আলোচনাকেও নিষ্প্রয়োজন মনে করেন তো তাঁকে আমি সক্রিয় কাব্যচেষ্টার দোহাই দিয়ে বলব যে, সার্থক কাব্যরচনা সমরবাবুর সাধ্য বলেই তাঁর কাছে এখনো আমাদের অনেক প্রত্যাশা। এবং যদিও দু'টি বিপরীত শক্তির সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে জীবনের অখণ্ড রূপটি তাঁর কাব্যসত্তায় রক্তমাংসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে নি তবু জীবনের অন্তরঙ্গী এই অন্তর্দ্বন্দ্ব কোনোদিনই সমরবাবুর চোখ এড়ায় নি। বিশেষ করে, এই শ্রেণীসমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের পাকচক্রে ব্যর্থ মধ্যবিত্ত ব্যক্তিমানসের হাস্যকর অসঙ্গতি আর তার ক্লান্তিকর আবহাওয়া যেখানে তাঁর সংস্কারধর্মী গ্রন্থরচনার সমজাত স্বধর্মী, সেখানে তাঁর জীবনদৃষ্টি আশ্চর্য রকম অভ্রান্ত। কিন্তু যেহেতু শুধুমাত্র সংঘর্ষই নয়, সংগ্রাম-পরবর্তী জীবনের উজ্জীবনও সমকালাশ্রিত বাস্তবের অঙ্গীভূত এবং যেহেতু সমরবাবু এই পরবর্তী জীবনের দিকে পিঠ না ফেরালেও মৌল নিষ্ক্রিয়তাবোধের অবশ্যম্ভাব্যতায় অন্তত সে ক্ষেত্রে তিনি নিছক ভাববাদী, শেষপর্যন্ত তাই আমরা 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা' থেকে 'তিন পুরুষ' পর্যন্ত সেই একই ত্রুটির পুনরাবর্তন লক্ষ্য করি, যে ত্রুটিতে কাব্যচেষ্টার আন্তরিকতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনদৃষ্টি শোচনীয়রকম খণ্ডিত।

'তিন পুরুষ'-এর রচনারীতিতেও কোথাও কোথাও এই খণ্ডিত জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন সুস্পষ্ট। অবশ্য এ বইটির অনেকগুলো কবিতায়, কোথাও

পুরোপুরি কোথাও বা অংশত, যেখানে তিনি পয়ারের পদের সঙ্গে একেবারে হাল আমলের অত্যন্ত দ্রুত শব্দ কিংবা বাক্যাংশকে মিশিয়েছেন :

"বছর পঁচিশ হল পৃথিবীতে বাসা ।
কেরানী-সন্তান আমি, চতুর মানুষ
কৈশোরে শুনেছি নানা মজাদার কথা,
কেরামৎ ! এরি মধ্যে করতলগত
কত ছলা ..... ।"

[অকাল]

এবং কোথাও বা যেখাতে গিয়ে ইচ্ছাকৃত নিয়মভঙ্গকে মাঝে মাঝে প্রশ্রয় দিয়েছেন, যেমন :

"ঘৃণ্য শূদ্র যত শত হস্ত দূরে রেখে
গৌরবে পড়েছি গীতা শ্রীমদ্ভাগবত,
দুর্দান্ত যবনকালে ধরেছি উপনিষদ ।
ভাগ্যক্রমে ইংরাজ এলো, স্বাগতম !"

[বাবু বৃত্তান্ত]

এমন কি যেখানে একটি কবিতায় (স্তোত্র) তিনি প্রবহমান পয়ারেরও পূর্ববর্তী যুগের আড়ষ্ট যৌগিক ছন্দকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন :

"আদিদেব একা সাজে পুরুষ প্রকৃতি ।
মহাজন চাষী তিনি সবাকার গতি ॥
কৃষ্ণকালো বড়ো মেঘ জুড়েছে আকাশ ।
তাম্রবর্ণ মূর্তি তার চাষীর আশ্বাস ।
ধান দেখে মহাজন বলেছে সাবাস ॥"

সেখানেও আমার মনে হয়েছে, এই পদ্ধতিতে বর্তমান জীবনের গ্লানি ও অসঙ্গতিকে রূপ দেবার চেষ্টা করে তিনি সফলও হয়েছেন এবং এই সাফল্য অর্জনে কয়েক জায়গায় রীতিমত শক্তিরও পরিচয় দিয়েছেন। এর কারণ অবশ্য এ-পর্যন্তও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবানুগ। আজকের সমাজে যান্ত্রিকতার দানবশক্তিকে উৎপাদনরীতির প্রাচীন কাঠামোয় বেঁধে রাখার ভয়ংকর অথচ অত্যন্ত স্থূল বাস্তব চেষ্টার ফলে যে সামাজিক সংঘর্ষের উৎপত্তি ও প্রসার, সমরবাবুর কবিতার এই সমস্ত অংশ সেই সংঘর্ষেরই অভিব্যক্তি

প্রতিচ্ছায়া। এইসব লাইন আমাদের হাসায় আবার চেতনাকেও উত্তেজিত করে।

এমন কি, এক এক সময় যখন তিনি প্রাচীন পয়ারের এই পঙ্‌ক্তিতে এমন সব বাক্যাংশ যোজনা করেন, যেগুলি হুবহু ইংরেজির তর্জমা বলে মনে হয়, যেমন:

"বিষণ্ণ বাড়ীতে, নিরানন্দ যে যুবক
দিন আনে দিন খায়, সহধর্মিনীকে,
কুড়িতে বুড়ী সে, তাই বাপান্ত করে,"
[কালের যাত্রা]

তখন তা-ও যেন সব সময়ে কানে লাগে না, আমাদের জীবনযাত্রার অসঙ্গতির সঙ্গে বলার ধরন যেন এখানে চমৎকার খাপ খেয়ে যায়।

কিন্তু ব্যক্তব্য আর এই প্রকাশরীতির অসঙ্গতি সেখানেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যেখানেই সমরবাবু অনাগত সামাজিক সম্ভাবনাকে তাঁর কাব্যবস্তুর মধ্যে পরিপাক করবার চেষ্টা করেছেন। ফলে, এখানে এসে তাঁর কাব্যদৃষ্টি জীবনদৃষ্টির বিশুদ্ধ abstraction-এই পর্যবসিত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভারতচন্দ্রের পয়ারের যৌগিক ছন্দের সঙ্গে চলতি বাকভঙ্গির বিচিত্র ধ্বনিবিন্যাসের সমন্বয় ঘটিয়ে জীবনের অসঙ্গতিকে রূপ দেবার চেষ্টা সমরবাবুর আগেও চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরা করেছেন এবং তাঁরাও এ-বিষয়ে কম-বেশি সফলও হয়েছেন এবং জীবন যেহেতু এখনো অসঙ্গতিতে পূর্ণ, আমাদের কবিতায় ছন্দের এই অভিনব প্রয়োগপদ্ধতির সম্ভাবনাও তাই এখনো নিঃশেষ হয় নি; কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ছন্দের বিবর্তনের স্বাভাবিক ইতিহাসটিকেও মনে রাখতে হবে এবং ভুললে চলবে না যে, বলিষ্ঠ ভাব-প্রকাশের বাহন আজকের উপযোগী যে বলিষ্ঠ ভাষা—বাংলা পয়ারের সুবিদিত আতিথেয়তাকে সুদন্ধ উশুল ক'রেও তার বাঁধাধরা চোদ্দমাত্রার এই সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ কাঠামোয় সে-ভাষার নাটকীয় বিকাশ ও বিস্তারের সম্ভাবনাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সমরবাবু নিজেই এর আগে বরাবর 'মানসী'র 'নিষ্ফল কামনা'র পরবর্তী যুগের ভাঙা-পঙ্‌ক্তির পয়ারের ছন্দকে (মুক্তক ছন্দকে) তাঁর রচনারীতির ভিত্তি হিসেবে মেনে নিয়েই তাঁর পয়ার রচনাকে সার্থক গদ্যরূপ দিয়েছেন। অতএব আমার বক্তব্যের সত্যতা ইতিপূর্বেই প্রমাণিত।

'তিন পুরুষ'-এ এই উপরোক্ত ত্রুটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'কালের যাত্রা' কবিতাটির কয়েকটি লাইনে, যেখানে সমরবাবু আগামীকালের অগ্রদূতের কাহিনী বর্ণনা করছেন :

"অন্ধযুবা, ছন্নমতি কালের সম্বল !
প্রায় পথের ভিখারী, চালচুলোহীন,
অতীত সঞ্চিত গ্লানি খর অসঙ্কোচে
সে মুছবে······"

এখানে 'প্রায় পথের ভিখিরী, চালচুলোহীন' বাক্যাংশটি পয়ারের প্রায়-অসীম সহিষ্ণুতার সীমাও যেন লঙ্ঘন করেছে ! বক্তব্যের Contrast-সৃষ্টিতে সাহায্য করতে গিয়ে এ-লাইনটি বরং সমস্ত স্তবকটির উপযোগী গাম্ভীর্যকেই নষ্ট ক'রে দিয়েছে। অথচ এটা বোঝা খুবই সহজ যে, আসলে এই একটি জোরালো বাক্যাংশ শুধুমাত্র নিয়মিত চোদ্দমাত্রার ছন্দের কবলিত হয়েই এখানে তার সমস্ত ব্যঞ্জনা হারিয়েছে।

অন্যত্র, যেখানে তিনি যথারীতি ভাঙা-পঙক্তির যৌগিকছন্দের স্মরণ নিয়েছেন সেখানে তাঁর বক্তব্য ও প্রকাশরীতির সমন্বয় কিন্তু সুস্পষ্ট :

"সরায় ময়লা, দুধ দেয় যে গয়লা,
তাদের মিতালি খুঁজি।"

[গৃহস্থবিলাপ]

কিংবা এই সমস্ত পঙ্‌ক্তিতেও :

"তবু তারা কালের সারথি,
তাদের দোস্তি, তাদের গতি
আমার পরমা যতি।"

[ঐ]

বলা বাহুল্য, বক্তব্যের অন্তর্দ্বন্দ্বের জীবন্ত প্রকাশ এবং শেষপর্যন্ত সেই দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্যবিধানেই কবিকর্মের সার্থকতার নির্ভর। আর এ-সমস্যা আজকের প্রত্যেক সক্ষম কবির। এবং সমরবাবুর সামনেও আজ এই মৌল প্রশ্ন : কাব্যবস্তুর অন্তর্বিরোধের গোলকধাঁধায় তিনি জীবনের এই ক্রমিক ধারাবাহিকতার যোগসূত্রটি খুঁজে পাবেন, না মাত্র কয়েকটি উজ্জ্বল expression-এর

কবিরূপেই তাঁর দুর্লভ কবিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে ?
আজকাল তিনি ক্রমশই কম লিখছেন দেখে আমরা রীতিমত শঙ্কিত।*

* পরিচয়, পৌষ ১৩৫২, পৃ. ৪০৪-১২। ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীটস্থ 'সংকেত ভবন' থেকে প্রকাশিত সমর সেন-এর কাব্যগ্রন্থ 'তিন পুরুষ'-এর সমালোচনা-প্রসঙ্গে এই রচনাটি 'পরিচয়'-এর 'পুস্তক-পরিচয়' বিভাগে বর্তমান শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত বিভাগে প্রকাশিত অন্য রচনাগুলিতে কোনো শিরোনাম ব্যবহার করা হয় নি। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

মার্কসবাদ ও স্বাধীনতা / সরোজ আচার্য

"I would urge you to study the theory further in its original sources, and not from second hand ones. It is really much easier. Marx has, in fact, written nothing in which some part of the theory can not be found"—Engels to Bloch, September 21, 1890.

মার্কসবাদ মরিয়াছে। কিন্তু "সমাজতন্ত্র" সকলেরই ঘাড়ে চাপিতেছে। উহা কেহই ছাড়িতে চাহেন না। স্বয়ং হিটলারও ছাড়িতে চাহেন নাই—তিনিও তাঁহার দলটির নাম রাখিয়াছিলেন, "জাতীয় সমাজতন্ত্রী"। আমাদের জাতীয়তাবাদী মহলেও এই বিজাতীয় জিনিসটির খুবই আদর কিন্তু জিনিসটাকে আরও একটু "ভদ্র" না করিলে চলে না। তাই কেহ "হিন্দু সোশ্যালিজম্," কেহ "ইসলামিক সোশ্যালিজম," কেহ বা "গান্ধী সোশ্যালিজম" চান—শুধু "হিন্দুত্ব," শুধু "ইসলাম," শুধু "গান্ধীবাদ" বলিলে যেন মাল কাটে না। "সোশ্যালিজম্"-এর মতোই এদেশে ইতিমধ্যে আরও দুই একটি জিনিসের বেশ বাজারসিদ্ধ নামডাক হইয়াছে—একটি "বিপ্লব" আর একটি "প্রগতি"। রাজনীতিক কর্মীরা প্রথমটি লইয়া মাতেন, তাঁহাদের সভাপণ্ডিতেরা দ্বিতিয়টিকে ছাড়িতে চাহেন না। তাই পণ্ডিত মহাশয়েরা "প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্রের" একটা জ্ঞান-কাণ্ড আবিষ্কার করিতেছেন। এই আবিষ্কারের "ঘোষণা" পাওয়া যাইতেছে অক্লান্ত গবেষক ডাঃ বটকৃষ্ণ ঘোষের মারফৎ।

রঙ্গমঞ্চে সকলে একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় না বটে কিন্তু সব অভিনেতারই লক্ষ্য থাকে যেন নাটকটি ভালোমতো অভিনীত হয়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রঙ্গশালায় আজ সাম্যবাদ ও সাম্যবাদীদের নিধনযজ্ঞের অভিনয় শুরু হইয়াছে। পদস্থ খ্যাতিমান রাজনৈতিক নেতাদের নানান উক্তি বা যুক্তি সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করাও নিরাপদ নয়। আগস্ট-সংগ্রামের সেনাপতি ডাক্তার পট্টভি লাঠি লইয়াছেন, আচার্য কৃপালনি মহাশয় রায় দিয়া ফেলিয়াছেন, ভারতবর্ষে

মার্কসবাদ মরিয়াছে, অন্য দেশেও মরণাপন্ন। কিন্তু শ্রাদ্ধের যেরকম ঘটা দেখিতেছি, মনে হয় মার্কসবাদের ভূত সম্বন্ধে কৃপালনি মহাশয়েরা এখনো তেমন স্বস্তি পাইতেছেন না।

এদিকে ডাক্তার বটকৃষ্ণ বিশ্বকোষ ঘাঁটিয়া প্রমাণ করিয়া ফেলিয়াছেন যে, মার্কসবাদীরা প্রকৃতির দাস, অতএব ইহারা কখনও স্বাধীনতা চাহিতেই পারে না। "দিব্যজ্ঞানী" বিশ্বপণ্ডিত অবশ্য যুক্তিতর্ক-প্রমাণের ধার দিয়াও যান না। উইলিয়ম জেম্‌স্‌ বলিয়াছিলেন, যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রাস অক্সাইড বাষ্প নিশ্বাসের সঙ্গে নিলেও "supralogical অনুভূতি" ("দিব্যানুভূতি?") সৃষ্ট হয়। অন্য কিছু টানিলেও রোহিণীকে বিড়াল মনে হয়। আমাদের supralogical (দিব্যজ্ঞানী) বিশ্বপণ্ডিত মহাশয় যেভাবে প্রমাণ করিয়া ফেলিয়াছেন যে মার্কস্‌বাদ ও মর্কটবাদ একই বস্তু তাহা একমাত্র তুরীয়াবস্থাতেই সম্ভব। দ্রব্যজ্ঞান থাকিতে এমন দিব্যজ্ঞান সুলভ হয় না। তবুও বিদ্যাবোঝাই ডিগ্রী-বীরের নাটকীয় অসারোক্তি সাময়িকভাবে জনপ্রিয় হইবে। কারণ, সত্য হউক মিথ্যা হউক, মার্কসবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চলিলেই হইল।

এই বিশ্বপণ্ডিতটির মূল বক্তব্য হইল ইহাই যে, "কোন মার্কস্‌বাদী যদি কখনও বলে যে, স্বাধীনতা তাহার ঈপ্সিত তখনই বুঝিতে হইবে যে, সে মিথ্যা কথা বলিতেছে।"১ বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ডাঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ এখানে একেবারে চূড়ান্তভাবেই মৌলিক—দুনিয়ার কোনো বিশ্বপণ্ডিত মার্কসবাদের বিরুদ্ধে এমন অপূর্ব অভিযোগ কস্মিন্‌কালে করিতে পারেন নাই। সার্থক হউক ডাঃ ঘোষের দিগ্বিজয়। কিন্তু মুশকিল এই যে, যুক্তিতর্ক-প্রমাণ প্রয়োগ সম্বন্ধে সাধুতা ও সংযমের কতকগুলি নীতি পণ্ডিতব্যক্তিরা মানিয়া চলেন। ঘোষ মহাশয় একে supralogical পণ্ডিত, তাহার উপর "প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্রী"। তাঁহার ঐ সকল কুসংস্কার থাকিবে কেন? কাজেই যুক্তি ও প্রমাণের অভাব পূরণ করিতে খট্টাঙ্গ সঞ্চালন ও দম্ভোক্তিই যথেষ্ট।

SUPRALOGICAL HOWLER

ডাঃ ঘোষ মার্কসবাদ সম্বন্ধে যে সব supralogical howler সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কতকগুলি নমুনা দেওয়া দরকার। ইহা হইতেই বোঝা যাইবে যে, এই

১. সাম্য ও স্বাধীনতা—বটকৃষ্ণ ঘোষ, শনিবারের চিঠি, কার্তিক, ১৩৫২।

সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম পণ্ডিত মহাশয়ের মার্কস্‌বাদ সম্বন্ধে জ্ঞান কি গভীর ! এই নিরেট অজ্ঞতা ও পণ্ডিতজনবিগর্হিত দম্ভ নিয়াই তিনি কৃপালনির উপরও টেক্কা দিয়া বলিতে পারিতেছেন যে, মার্কসবাদীরা স্বাধীনতা চাহিতেই পারে না।

১) "যে জড়বাদ আজ মার্কসের নামের সঙ্গে বিজড়িত, সেই জড়বাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক এঙ্গেলস্‌, মার্কস্‌ নহেন।" [মার্কসীয় জড়বাদ ও সমাজতন্ত্র—বটকৃষ্ণ ঘোষ, চতুরঙ্গ, সপ্তম বর্ষ, পৌষ সংখ্যা] এই অর্বাচীন উক্তি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা পূর্বেই অন্যত্র প্রমাণ করা হইয়াছে। (ক)

২) "বানর ও মানবের ঐকান্তিক অনন্যত্ব সম্বন্ধে Marx-এর মনে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই···মানবের বানরত্ব প্রতিপাদন Marxist-দের একটি মুখ্য প্রচেষ্টা।" [অভিব্যক্তি, প্রগতি ও বিপ্লব—বটকৃষ্ণ ঘোষ, শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ ১৩৫২] কিন্তু এইরূপ "প্রতিপাদন" মার্কস করিবেন কিরূপে ? মার্কস তো ঘোষ বা কৃপালনিদের দেখিবার সুযোগ পান নাই তাই মার্কস ও মার্কসবাদীদের মুখ্য প্রচেষ্টাই হইল—যে সমাজব্যবস্থা "দো দো রূপেয়ায়" বুদ্ধিজীবীকে বাঁদর-নাচ করিতে বাধ্য করে তাহার আমূল পরিবর্তন সাধন।

"বানর ও মানবের ঐকান্তিক অনন্যত্ব সম্বন্ধে" ঘোষ মহাশয়ের ব্যক্তিগত সন্দেহ না থাকিতে পারে। কিন্তু মার্কস্‌ বলেন, মানুষ "begin to differentiate themselves from animals as they begin to produce their means of subsistence"। (খ) মার্কস অনন্যত্বের কথা বলেন নাই, স্বাতন্ত্র্যের কথাই বলিতেছেন। আমাদের supralogical বিশ্বপণ্ডিত মহাশয়ের অজ্ঞতা বা অসত্যভাষণ-ক্ষমতা সত্যই অসীম।

৩) "মনে হয় যে মার্কস ছিলেন একজন Doctrinaire Communist যিনি নিজেও বিশ্বাস করিতেন না যে তাঁহার মতবাদ কেহ কখনও কার্য্যে পরিণত করার কথা মনেও আনিতে পারে।" [অভিব্যক্তি, প্রগতি ও বিপ্লব—বটকৃষ্ণ ঘোষ, শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ ১৩৫২] অর্থাৎ পণ্ডিত মহাশয়ের মতে মার্কস ছিলেন একটি বিদ্যাবোঝাই বিশ্বপণ্ডিত মাত্র, word-making খেলায় ওস্তাদ। ঘোষ মহাশয়ের কল্পিত এই doctrinaire communist-ই প্রথম দাবি করেন যে তত্ত্বজ্ঞানীর কেবল word-naking খেলিলেই চলিবে না, দুনিয়াকে

ক. মার্কস ও বস্তুবাদ—পূর্বাশা, আষাঢ় ১৩৫২।
খ. German Ideology.

উল্টাইতে হইবে ("The philosophers have only interpreted the world in various ways; the point however is to change it."—Marx, Theses on Feuerbach.) মার্কসের সংগ্রামশীল জীবনই তাঁহার চূড়ান্ত নিদর্শন। ১৮৪৮সনেরও পূর্ব হইতে মার্কস-এঙ্গেল্‌স্ ইয়োরোপের বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশ নিয়াছেন। ১৮৪২ হইতে ১৮৮৩ সন পর্যন্ত মার্কসের জীবনকাল সংগ্রাম ও সংঘশক্তি গঠনেই নিযুক্ত ছিল। দুইবার তিনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম তাঁহাকে নির্বাসিত করে। সর্বহারা শ্রেণীর প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন মার্কসেরই হাতে গড়া। মার্কসের মৃত্যুদিবসে এঙ্গেল্‌স্ অভিনন্দন করিলেন, "Before all else Marx was a revolutionist. Fighting was his natural element."

"Doctrinaire Communist" এবং ডাঃ ঘোষ ?

৪) "মার্কসবাদ সম্বন্ধে মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা শনিবারের চিঠির 'ছবিতা'র মতো এক পদার্থ, যাহার মূল ও ভাষ্যের মধ্যে কোনই সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মার্কসের প্রধান গ্রন্থ Das Capital-এ কোন দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা মাত্রও নাই।" (ক

মার্কসবাদ বেদ-বাইবেল নয়। মূল ও ভাষ্যের পণ্ডিতী গবেষণা মার্কসবাদীর কারবার নয়। মার্কসবাদ সক্রিয় জীবনদর্শন—মার্কসীয় পদ্ধতিতে প্রয়োগ ও প্রসারেই মার্কসবাদের সার্থকতা। মার্কসবাদের এই গতিশীলতাই পুঁথি-জীবীর আতঙ্কের কারণ। ডাঃ ঘোষ মুরুব্বিয়ানার সুরে বলিতেছেন, "অন্তত আমাদের দেশে যাহা মার্কসবাদ বলিয়া পরিচিত তাহা কোনদিনই মার্কসের মত ছিল না।" কি অলৌকিক পশ্চাৎদৃষ্টি (hindsight)। পণ্ডিত মহাশয়ের জানা দরকার যে মার্কসের হাস্যকর আক্ষরিক অনুকরণ আর মার্কসীয় চিন্তা-পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ব্যবহারে আকাশ-পাতাল তফাৎ। মার্কসের আক্ষরিক অনুকরণ—"transforms the living revolutionary propositions of Marxism into dead, meaningless formulas. It bases its activities not on experience, not on the results of

ক, অভিব্যক্তি, প্রগতি ও বিপ্লব—বটকৃষ্ণ ঘোষ, শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ ১৩৫২।

practical work, but on quotations from Marx". আর মার্কসীয় পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ব্যবহার—"relies not on quotations and aphorisms, but on practical experiences, testing every step it takes by experience, learning from its mistakes and teaching others to build a new life. (ক)

ডাঃ ঘোষের দ্বিতীয় আফসোসের কারণ তিনি মার্কসের Capital-এ মার্কসবাদের সন্ধানই পান নাই। সন্ধান তিনি অনেক কিছুরই পান নাই বা পাইতে চাহেন না। ডাঃ ঘোষের মতোই এক পণ্ডিত লেনিনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মার্কস-এঙ্গেলস ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ সম্বন্ধে কোন্ কেতাব লিখিয়া গিয়াছেন?" লেনিনের পাল্টা প্রশ্নই আমরা ডাঃ ঘোষকে উপহার দিতেছি—"What book did Marx or Engels write that was not on Dialectical Materialism ?"

৫) "সোভিয়েট রাষ্ট্র একটি Hegelian State, ইহা আদৌ Marxist State নহে। জড়বাদী সমাজতন্ত্র যে একটি সোনার পাথরবাটি—একথা বহুদিন পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়া রুশরা নীরবে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে।" (খ) আনকোরা নতুন খবর। রুশরা এতই নীরবে কাজটি করিয়াছে যে এক supralogical কর্ণেই তাহার সংবাদ পৌছিতে পারিয়াছে।

"ঘৃণ্য জড়বাদ"

বোঝা গেল supralogical ডাঃ ঘোষের যত রাগ "ঘৃণ্য জড়বাদের" উপর। তবে nothing succeeds like success সোভিয়েট রাশিয়ার সফলতাও অস্বীকার করা যায় না; "ঘৃণ্য জড়বাদ"কেও প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। অতএব প্রমাণ করিয়া ফেলা যাক যে, সোভিয়েট ঘৃণ্য জড়বাদকে পরিত্যাগ করিয়াছে।

কিন্তু জড়বাদ ঘৃণ্য কেন? সংস্কৃতির শাসনে জড়বাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া হয় যে, জড়বাদ হইল "দৈহিক ভোগলিপ্সা"। অতিভোগক্লিষ্ট মহাজনেরা এবং তাঁহাদের দো-দো রূপেয়ার উকিলেরা ভোগকে চিত্রিত করেন বিকৃত বীভৎস রূপে। আর উপবাসী বিদ্রোহোন্মুখ জনসাধারণকে ত্যাগের স্বর্গীয় সুখের

ক. Stalin—'Lenin.'
খ. অভিব্যক্তি, প্রগতি ও বিপ্লব—বটকৃষ্ণ ঘোষ, শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ ১৩৫২।

সন্ধান দেন। "প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্রী" বা 'শনিবারের চিঠি'র আধ্যাত্মিকদের ব্যক্তিগত জীবনের কৃচ্ছ্রসাধনা ও ভোগে অনাসক্তি অবশ্য খুবই প্রশংসনীয়; কিন্তু সাধারণে এতটা উচ্চাঙ্গের সাধনায় পারিয়া উঠে না। পণ্ডিতদের প্রভুদের মতো তাহাদের অগ্নিমান্দ্য জন্মে নাই। সেই প্রভুদের ইঙ্গিতেই খ্রীষ্টীয় পণ্ডিতেরা বলিতে বাধ্য হয়, মার্কসিস্টদের "ভোগলিপ্সা হইল রীতিমত দৈহিক ভোগলিপ্সা, এবং জড়শক্তি দ্বারা প্রবুদ্ধ সেই দৈহিক ভোগলিপ্সাই তাঁহাদের মতে একমাত্র শক্তি যাহা মানুষকে কর্মপথে প্রবর্তিত করিতেছে।" ক) পণ্ডিতদের কথা অবশ্য মিথ্যা কথা, কিন্তু কথাটায় পাণ্ডিত্যও নাই। মার্কসবাদ ভোগসর্বস্ববাদ নয়, ত্যাগসর্বস্ব পণ্ডিতদেরও এইটুকু জানা থাকিবার কথা। যান্ত্রিক জড়বাদের অনুসরণ করিয়া মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভাবনা-ধারণাকে মার্কস্‌বাদ জড়পদার্থে পরিণত করে না।

আসলে মার্কস্‌বাদ জড়বাদই নয়, বাস্তববাদ, আর বাস্তববাদ ও জড়বাদ যে এক জিনিস নয়—ইহা একালের পণ্ডিতেরা অন্তত জানেন।

মার্কসবাদ মানবীয় চৈতন্যের দেহাতীত অলৌকিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করে মাত্র। দেহমনের সমগ্রতাই মানুষের জীবন। এই জীবন অলৌকিক নয়। বস্তুজগতেই এই জীবনের উৎপত্তি স্থিতি গতি ও বিলয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল বক্তব্য হইল—জীবনধারণের বাস্তব প্রয়োজনের উপরে ভিত্তি করিয়াই মানুষের কর্ম-ব্যবহার ভাবনা-ধারণা নানা শাখা-প্রশাখায় ঊর্ধ্বে উঠিয়া থাকে। ভাবনা-ধারণা-কর্ম সবই দৈহিক ভোগলিপ্সার প্রতিচ্ছবি—এই অভিযোগ আর একটি খ্রীষ্টীয় howler মাত্র।

মার্কসবাদ supralogical অধ্যাত্মবাদ নয় বটে, কিন্তু 'ঘৃণ্য' হইবে কেন? পাদ্রী-পুরোহিত ও শোষকশ্রেণীর কাছে 'ঘৃণ্য' বটে কিন্তু ডাঃ ঘোষের দার্শনিক গুরুমহাশয়েরাও সকলে জড়বাদকে 'ঘৃণ্য' বলেন না।

Paulsen বলিতেছেন, "Ignorance alone can claim that the morality of Democritus or Epicurus has anything in common with a morality of licentiousness." ডাঃ ঘোষের মতো মার্কসবাদকে দৈহিক ভোগলিপ্সার মতলববাজী বলাও তেমনি Ignorance!

আমাদের "প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্রী" পণ্ডিতমহাশয় materialistic

ক. সাম্য ও স্বাধীনতা—বটকৃষ্ণ ঘোষ, শনিবারের চিঠি, কার্তিক ১৩৫২।

interpretation of history-র উপর বড়ই খাপ্পা। এখানে আর এক প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্রীর সঙ্গে ঘোষ মহাশয়ের মিল দেখা যাইতেছে। তিনি হইলেন মুসোলিনী। তিনিও বলিতেন, "Fascism denies the mterialist conception of happiness as a possibility." [Mussolini—The Political and Social Doctrine of Fascism.] মুসোলিনী সংরক্ষিতা প্রণয়িনীর সহিত পঞ্চত্বলাভ করিয়াছেন, ইতালির জনসাধারণের আধ্যাত্মিক সুখটা তাঁহার ত্যাগময় জীবন ও আধ্যাত্মিক শাসনের ফলে কিরূপ হইয়াছিল, হাজার হাজার নরনারীর সেই যুগলরূপের প্রতি শেষ আচরণ হইতেও খানিকটা বুঝিতে পারি।

মার্কসবাদী কিন্তু ডাঃ ঘোষ বা মুসোলিনীর মতো দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সুখকে সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে করে না। সমাজজীবনে সর্বসাধারণের সহযোগিতায় ব্যক্তিত্বের সুস্থ সর্বাঙ্গীণ বিকাশই মার্কসীয় কর্মপ্রচেষ্টার চরম লক্ষ্য। ঐতিহাসিক বস্তুবাদও তাই সন্ধান করে ইতিহাসের পর্বে পর্বে জীবনের অর্থনৈতিক বনিয়াদের সঙ্গে ভাবনা-ধারণার ঐক্য-সংঘর্ষ পরিবর্তনের গতিসূত্র। একমাত্র মার্কসীয় দর্শনই একদেশদর্শী (one-sided) নয়—মানব সমাজের বিবর্তন ও বৈচিত্র্য সকলই অন্ধজড়শক্তির ক্রিয়া, একথা বলে যান্ত্রিক বস্তুবাদ; আবার ঐসবই লোকোত্তর চৈতন্যের প্রকাশ, এই কথা নানাভাবে বলে অধ্যাত্মবাদী দর্শন। মার্কসবাদই এই দুই একদেশদর্শী দর্শনের অসঙ্গতি দূর করিয়া ডায়ালেকটিক-সমন্বয় সাধন করিয়াছে।

ব্যর্থ নকলনবিস

কিন্তু আমাদের supralogical বিশ্বপণ্ডিত এই dialectic-এর উপরও মহা খাপ্পা। তাঁহার মতে ঐটি একটি "magic word"! মতটি অবশ্য তাঁহার নিজের নয়—ট্রটস্কির খাস মুন্সী ভূতপূর্ব চৌকস বিপ্লবী ম্যাকস ঈস্টম্যানের নিকট হইতে ধার করা। গোলমাল সেই খানেই। চতুর্থ শ্রেণীর নিকৃষ্টতম ছাত্রও নকল করিতে এরূপ তালগোল পাকাইত কিনা সন্দেহ। ঈস্টম্যানের অভিযোগ, মার্কস্ আসলে বস্তুবাদীই নন—ছদ্ম (হেগেলীয়) অধ্যাত্মবাদী। (ক) আমাদের

ক. "Marx failed to escape···from idealistic philosophy"—Eastman, 'Marx, Lenin and Revolution.'

স্বদেশী বিশ্বপণ্ডিত মহাশয়ের অভিযোগ, মার্কসবাদীরা জড়শক্তিতে বিশ্বাসী অতএব animist. Animist শব্দ ঈস্টম্যানই বারবার ব্যবহার করিয়াছেন। (ক কিন্তু তাঁহার অভিযোগ সম্পূর্ণ উল্টা। ঈস্টম্যানের মতে মার্কসবাদীরা জড়বাদীই নয়, উহারা (ছদ্ম) অধ্যাত্মবাদী। কিন্তু আমাদের স্বদেশী অধ্যাত্মবাদী ঈস্টম্যানের নকল করিয়া মার্কসবাদের (তথাকথিত) animism-এর দোষ ধরেন কি করিয়া? ঈস্টম্যান যে যান্ত্রিক জড়বাদী তাহা বার্নার্ডশ-এর দৃষ্টি এড়ায় নাই। (খ) আমাদের supralogical পণ্ডিতের নজর এড়াইয়াছে। ব্যর্থ নকলনবিসির দুর্গতি এইখানে। কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে ডাঃ ঘোষ ঈস্টম্যানের নকল করেন নাই, মৌলিক গবেষণার ফলে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "Marxian materialism=(materialist animism)।" [সাম্য ও স্বাধীনতা—বটকৃষ্ণ ঘোষ] অক্ষম নকলনবিসির প্রমাণ দিতেছি। ডাঃ ঘোষ বলিতেছেন—"লেনিন যে গ্রন্থে জড়বাদ বিসর্জন দিয়া Bolsbevik পার্টির প্রোগ্রাম নির্ধারণ করেন সেই গ্রন্থে Dialectic কোনো magical sense-এ ব্যবহৃত হয় নাই।" হুবহু ঈস্টম্যানের প্রতিধ্বনি। (গ নকলনবিসি ঢাকিবার জন্য ডাঃ ঘোষ অগাধ-পাণ্ডিত্যের খট্টাঙ্গ সঞ্চালন করিয়া বলিতেছেন, "ইহাই সর্বসম্মতিক্রমে লেনিনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, নাম What To Do. বইটি নাকি আজকাল পাওয়া যায় না। বইটির ইংরেজী অনুবাদ হইয়াছে কিনা জানি না। আমার নিকট ফরাসী অনুবাদটি আছে।" [বটকৃষ্ণ ঘোষ]। বিশ্বপণ্ডিত মহাশয় "সর্বসম্মতিক্রমে" (!) ঠিক করিয়াছেন, What To Do লেনিনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—Imperialism বা State and Revolution নয়। ভালো কথা। পণ্ডিত মহাশয় জানিলে আশ্চর্য হইবেন যে বইটি পাওয়া যায়। ইংরেজীতে অনুবাদ (What is to be done) অন্তত ১৭।১৮ বছর পূর্বে হইয়াছে, ভারতবর্ষ হইতেও

ক. The dialectic philosophy ···was a bold maneouvre in the defence of animism against science."—Eastman, "Marxism—Is it a science?"

খ "Max Eastman's Cartesian materialism"—G.B S.

গ. "It is not easy to find a formula that will flatly and absolutely contradict an animistic construction as subtle as that invented by Hegel and stood on its head by Marx but in this book 'What to do".—Eastman.

একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে,—কয়েক বৎসর পূর্বে বাঙলা অনুবাদও হইয়াছিল, তবে বাঙলা বা ইংরেজি অপেক্ষা ঘোষ মহাশয়ের পক্ষে যদি ফরাসী বেশী পরিচিত ভাষা হয়—তাহাতেই পড়িবেন, কাহারও আপত্তি নাই। অবশ্যই এই সব অবান্তর কথা পণ্ডিত মহাশয়ের অবান্তর উক্তির জন্যই প্রাসঙ্গিক। যান্ত্রিক জড়বাদী মার্কিন ঈস্টম্যান ও 'স্বদেশী' অধ্যাত্মবাদী-শিষ্য ডাঃ ঘোষ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থে (What To Do) লেনিন "জড়বাদ বিসর্জন" দিয়াছেন! একজন ধাপ্পা দিয়াছেন এবং অপরজন ঈস্টম্যানের অন্ধ নকলনবিস কি সত্যই ফরাসী ভাষ্য (What To Do) পড়িয়াছেন? ইহা কি ফরাসী-ভাষ্যের গুণ, না, ঘোষ মহাশয়েরই ফরাসী-ভাষা-বোধের প্রমাণ, আমাদের পক্ষে তাহা বলা অসম্ভব। কিন্তু লেনিন এই গ্রন্থে কি বলেন দেখা যাক। বইখানা পড়া থাকিলে পণ্ডিত-মহাশয় জানিতে পারিতেন যে, এই গ্রন্থের অনেক বিতর্কই মার্কসীয় ডায়ালেকটিকের বিরোধী Bernstein ও তাঁহার রুশ সমর্থকগণের বিরুদ্ধে রচিত। Supralogical ঘোষ-পণ্ডিত বলিতেছেন, এই গ্রন্থে লেনিন জড়বাদ বিসর্জন দিয়াছেন। লেনিন এই গ্রন্থেই মার্কসবাদীদের নির্দেশ দিতেছেন, "Learn to apply practically the materialist analysis and the materialist estimate of all aspects of the life and activities of all classes, state and groups of the population." ইহার ফরাসী কি হইবে জানি না—হয়তো 'মার্কসবাদ বিসর্জন'। মার্কসবাদ-বিরোধী অন্য সব পণ্ডিতেরাও কিন্তু ডাঃ ঘোষের মতো এত চমৎকার করিয়া এই গ্রন্থের তথ্য বুঝিতে পারেন নাই—হয়তো তাঁহারা জানিতেন না বলিয়াই, কিংবা হয়তো সত্যই তাঁহারা বইখানি পড়িয়াছিলেন। জার্মান পণ্ডিত Rosenberg লিখিতেছেন, "Thus Lenin actually revived original Marxism together with all its contradiction" (ক) তাহা হইলে বিসর্জন নয়, লেনিন বরং এই গ্রন্থে Bernstein কোম্পানীর হাত হইতে জড়বাদ পুনরুদ্ধার করিলেন!

মার্কসবাদ materialist animism—ডাঃ ঘোষের এই অভিযোগও [ঈস্টম্যানের নকলে] ভিত্তিহীন। মার্কসীয় বস্তুবাদ ইট-কাঠ-পাথরকে প্রাণময়, চৈতন্যময় বলে না। বস্তুজগতের গতিপ্রবাহ কোনো লোকোত্তর

ক. Rosenberg—Democracy and Socialism

সত্তাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। বস্তুপুঞ্জের স্তরে স্তরে স্বকীয় শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে ধারাবাহিকতার যতিভঙ্গ, উৎক্রান্তি (leap) ও নূতনের উদ্ভব—ইহাই মার্কসীয় বস্তুবাদের মূল সূত্র। আধুনিক বিজ্ঞান ইহার অজস্র প্রমাণ দিতেছে।

কিন্তু আর একটি কথা। অধ্যাত্মবাদী পণ্ডিতের আবার animism-এর উপর এত বিরাগ কেন? বস্তুজগৎ চৈতন্যময় এই ধারণাও animism-এরই সভ্যতম সংস্করণ। Tylor দেখাইয়াছেন, সভ্যতার উন্নততর পর্যায়ে "conjunction of ethics and animistic philosophy" কিভাবে ঘটিয়াছে। Animism-এর প্রতি বিরাগ supralogical অধ্যাত্মবাদীর সাজে না। আর মার্কসীয় বস্তুবাদকে animist বলা তো কাণ্ডজ্ঞানহীন (ঈস্টম্যানের) নকলনবিসি মাত্র।

মিথ্যা অপবাদ

অথচ এই মিথ্যা উক্তির উপর আমাদের ডাঃ "ঈস্টম্যান" ঘোষ দাঁড় করাইয়াছেন তাঁহার মূল বক্তব্য। "Animism যাহাদের ধর্ম, স্বাধীনতা অবশ্যই তাহাদের নিকট Taboo" এই মিথ্যা উক্তির সমর্থনে তিনি আর একটি মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি Plekhanov-এর নজির দিতেছেন। ডাঃ ঘোষ উদ্ধৃত করিতেছেন, "by submitting to nature (man) increases his power over nature." ইহা নাকি ঘোষ মহাশয়ের মতে Plekhanov-এর সিদ্ধান্ত। "সিদ্ধান্ত" নিঃসন্দেহ, তবে প্লেখানভের নহে, ডাঃ বটকৃষ্ণের। কারণ Plekhanov-এর ঐ উক্তির প্রারম্ভেই আছে—"if we adopt the point of view of the champions of the 'neo-Kantian' criticism of Marx." ডাঃ ঘোষ খুব বাক্‌সংযমে সিদ্ধ বলিয়া এই অংশটুকু বাদ দিয়াছেন এবং তৎপরতার সঙ্গেই উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। তারপর অন্তঃসারহীন দম্ভের সঙ্গে লিখিতেছেন, "Plekhanov was a clown posing as a prophet. এই উক্তিটি আর কাহারও নয়, আমারই। Plekhanov-এর বই পড়িবার সময় পৃষ্ঠাপ্রান্তে একাধিকবার না লিখিয়া থাকিতে পারি নাই।"(ক) ডাক্তার ঘোষ পাঠকদের প্রতারিত করেন নাই। কে যে clown ইহার পরে তাহা পাঠকদের না বুঝিবার উপায় নাই।

কিন্তু এখন ডাঃ ঘোষের মূল অভিযোগে আসা যাক। মার্কসবাদীরা প্রকৃতির

ক. সাম্য ও স্বাধীনতা—বটকৃষ্ণ ঘোষ।

দাস, অতএব capitalism-এর যুগে তাহারা হয় জড়ভরত হইয়া বসিয়া থাকিবে, নয় capitalism-কে সমর্থন করিবে। দিব্যজ্ঞানী পণ্ডিতের ইহাই হইল মৌলিক সিদ্ধান্ত। মার্কসীয় বস্তুবাদের বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তগুলি ডাঃ ঘোষের দিব্যজ্ঞানী শৃঙ্গে লাগিয়া ভোঁতা হইয়া গেল দেখিতেছি। তিনি মার্কস্-এর Capital-এ কিছুই খুঁজিয়া পান না। সম্ভবত তিনি Capital-ও খুঁজিয়া পান নাই—ফরাসী অনুবাদ এ দেশে সহজে পাওয়া যায় না বলিয়া। কিন্তু সেই গ্রন্থেই মার্কস্ বলিতেছেন—আমরা ইংরেজি অনুবাদে অন্তত তাহাই পড়িতেছি—

"Man confronts nature as one of her own forces······ Nature becomes an instrument of his activities with which he supplements his own bodily-organs, adding a cubit to his stature, scripture notwithstanding" মানুষ প্রকৃতির দাস? মর্কট মানুষ? দিব্যজ্ঞানী ভিগ্রীবীর কি বলেন?

মার্কসবাদীরা জড়ভরত? দেখা যাক ডাঃ ঘোষের "clown" Plekhanov কি বলেন? "The Social democracy looks upon its own activity as a necessary link in the chain of those necessary condition the combination of which makes inevitable the triumph of Socialism"

অথবা Plekhanov-এর ভাষাতেই ডাঃ ঘোষের মিথ্যা অভিযোগের স্পষ্ট জবাব—"People often see in the materialist conception of history, a doctrine which prclaims man's subjection to the yoke of an uncompromising blind necessity. It would be difficult to find a more perverse idea. It is precisely the materialist conception of history which shows man the course leading from the kingdom of necessity into the Kingdom of freedom."

আমাদের বিদ্যা-দিগ্‌গজ পণ্ডিতের কথামৃতের জবাবে আর এক পণ্ডিত বলিবেন, "It is amazing that critics should have overlooked the place and function accorded to class consciousness in Marx's thought"। (ক) Amazing ডাঃ ঘোষ!

ক. Hook—Hegel and Marx.

তবুও ডাঃ ঘোষ হাল ছাড়িবেন না। তিনি বলিবেন, রুশিয়ার লেনিনের "বিরাট প্রচেষ্টা" কি জড়বাদের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত করিতেছে না? দিব্যজ্ঞানী পণ্ডিত অবশ্য এ বিষয়ে "ঘৃণ্য জড়বাদী" লেনিন প্রমুখ মার্কসবাদীদের কথা আমলেই আনিবেন না। তবে সব পণ্ডিতই ডাঃ ঘোষের মতো "প্রগতিবাদী" নন। এই রকম এক পণ্ডিত রাশিয়ায় "বিরাট প্রচেষ্টা" সম্বন্ধে বলিতেছেন—"It seems to have been Marx—Marx apparently so unintelligible to the ordinary man who brought the conviction of it and ended the domination of fate. Man is not bound to a pitilessly revolving wheel but can contribute to the making of his own history" (ক). রাশিয়ার "বিরাট প্রচেষ্টা" "ঘৃণ্য জড়বাদী"-দের নেতৃত্ব ও শিক্ষাতেই সম্ভব হইয়াছে। মার্কসও তাহাই বলিয়াছিলেন, "For a practical materialist, a commuuist, the thing is to revolutionise the existing world, that is practically turn aganist things as he finds them and change them."

কিন্তু ডাঃ ঘোষ হাঁকিতেছেন, "ecrasez L'infame' অর্থাৎ "ধ্বংস করো এই পাপ (খ)।" ফরাসী জানি না, ভলটেয়ারের কথা শুনিয়াছি। এই ভলটেয়ারী ভাঁড়ামি তাঁহার হাতে কি পুরস্কার পাইত তাহা বেশ বুঝিতে পারি। মার্কস-বিরোধী ডন কুইকসটের দুরূহ ব্রত এই—সম্বলমাত্র এই দিগগজী ডিগ্রীর গর্ব, অসত্যোক্তি ও নকলনবিসি।

ইতিহাসের সাক্ষ্য

এইবার দর্শন হইতে ইতিহাসে আসা যাক্। মার্কসবাদীরা প্রকৃতির দাস, উহারা অদৃষ্টবাদী; অতএব উহারা স্বাধীনতার চেষ্টাই করিতে পারে না, এমনতর "দিব্যজ্ঞানী" ধাপ্পাবাজীর জবাব ইতিহাসও দিবে। এই ধরনের আধ্যাত্মিক ধাপ্পাবাজীর দার্শনিক গলদ দেখানই যথেষ্ট নয়। Plekhanov-ও

ক The Russian Peasant and other essays—Sir John Maynard

খ সাম্য ও স্বাধীনতা—বটকৃষ্ণ ঘোষ।

তাই বলিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা কর বিসমার্ককে এবং অন্যদেশের অবরমস্ত উজীরদের, সোশ্যাল ডেমক্রাটরা কী রকম চিজ। (ক)

জিজ্ঞাসা কর জাপানী মন্ত্রীকে—যাহার কাছে মার্কসবাদ কেবলমাত্র 'ঘৃণ্য' নয়, বিপজ্জনক চিন্তাও (dangerous thought) বটে। সাত বৎসর ধরিয়া সকলরকমের দমনব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়াও জাপানী বিচারমন্ত্রী চারা (Chara) ১৯৩৫ সনে স্বীকার করিতে বাধ্য হন—Notwithstanding all the measures taken by the Government since 1928 to cut the roots of the Communist movement, this movement has taken such deep roots that, even repeated arrests of Communists and of the entire leadership of the movement, the Government is unable to achieve the final destruction of Communism". "ঘৃণ্য জড়বাদী" "দৈহিক ভোগলিপ্সু" প্রকৃতির দাস জাপানী মার্কসবাদীদের এ কী বেয়াড়া ব্যবহার!

জিজ্ঞাসা কর চীনে, জাপানী ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াইয়ে চিয়াং কাইশেককে বাধ্য করে কাহারা? সাধারণ লোকে তাহা জানে। কিন্তু পণ্ডিতেরা সাধারণ লোক নন, হয় তাঁহারা না জানিয়াই সব জানেন, নয় সব জানিয়াও জানিবেন না! ফরাসীতে মার্কস্‌-পড়া পণ্ডিত মহাশয় কি বলিয়া দিতে পারেন, ফ্রান্সে আজ কমিউনিস্টরা সর্ববৃহৎ দল কেন? জড়শক্তির দাস বলিয়া? না, স্বাধীনতার যুদ্ধে অগ্রণী বলিয়া। ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, ইটালী, নরওয়ে, পোল্যাণ্ড—ইয়োরোপের প্রত্যেকটি নাৎসী-কবলমুক্ত দেশেই আজ মার্কস্‌বাদীরা জনগণের পুরোভাগে। তাহার কারণ তাহারাই নাৎসী-দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ত্যাগ, সংঘশক্তি ও বীরত্ব দেখাইয়াছে বেশি। এক যুগোশ্লোভিয়ারই দৃষ্টান্ত দেই। একজন নিরপেক্ষ সাংবাদিক লিখিতেছেন, নাৎসী-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যুগোশ্লাভিয়ায় নিহত হয় ২৫,০০০ কমিউনিস্ট দলের সদস্য, তাহার মধ্যে ১১ জন

ক. "Even a little conversation with Messieurs Bismarck, Caprivi, Crispi or Casimir Perier will tell you of the miracles of activity and energy of the "necessarians" and "fatalists" of our time—the Social democratic workers".—Plekhanov: Essays etc.

দলের কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য। ইহা ছাড়া ৫০,০০০ কমিউনিস্ট যুবসঙ্ঘের সভ্যও নিহত হয়। (ক)

ইহার পরও কেহ কি বিশ্বাস করিবেন supralogical ডিগ্রীবীরের কথামৃতে —"স্বাধীনতার নামে Marxist animist-দের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আসে।" হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়াছে বই কি—ফ্রান্সের সত্তর হাজার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়াছে বলিয়াই না আজ ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির নাম—'শহীদের পার্টি!"

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও ভারতীয় মার্কস্‌বাদীদের দান কেবলমাত্র দার্শনিক ধোঁকাবাজী দিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় ততক্ষণ যতক্ষণ দিব্যজ্ঞানের পশরা খুলিয়া লক্ষ্মীলাভ সম্ভব। কানপুর মামলার পর হইতে কায়ুর শহীদদের দিন পর্যন্ত ভারতে কমিউনিস্ট পার্টিরও একটা ঐতিহ্য রচনা হইয়াছে, আজও সে ঐতিহ্যে নূতন নূতন অধ্যায় যোগ হইতেছে। ঢাকার রাস্তায় সোমেন চন্দের হত্যা হইতে কলকাতার ও বোম্বাইয়ের রাস্তায় তাহারই আর এক অধ্যায়ের ছোট-খাট পর্ব প্রতিদিন রচনা হইতেছে—সেই রচনার একটু দাম দিতে হয় বৈ কি! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিকটেও কমিউনিস্টদের দাম দিতে হয়। প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্রীদেব নিকটেও দিতে হয়। অশীতিপর বৃদ্ধ বাবা শোহন সিং, রুর সিং-এর সহকর্মীরা তাহা দিতেছে; বাংলাদেশে চট্টগ্রামের স্বাধীনতার শহীদদের সহযাত্রীরাও দিতেছে, দিতেছে শহরের শত শত মজুর আর গ্রামের শত শত কৃষক। স্বাধীনতার ইতিহাস কি করিয়া রচনা করিতে হয় তাহা তাহারা এক-আধটুকু জানে। না হইলে তিন বছর আগে যে পার্টি বে-আইনী ছিল, আজও নাকি যাদের না আছে বিদ্যাবুদ্ধি, না আছে কর্মশক্তি, না আছে অসাধারণ মানুষদের নেতৃত্ব, না আছে সাধারণ জনতার সঙ্গে একত্ব,—তাহারা একই কালে শাদা-কালো মালিকদের এত দুশ্চিন্তার কারণ হইল কেন, আর কৃপালনী-বটকৃষ্ণদের এত গভীর গবেষণার বিষয় হইল কিরূপে? ফরাসী ভাষায় লেনিনের লেখা পড়িয়াছি বলিয়াও আজ ডাক্তারদের দোহাই পাড়িতে হয় কেন?

ক. Report on Yugoslavia—Hans Lehrman; New Statesman and Nation, Sept. 15, 1945.

LEFTIST ঘোড়সওয়ার

ডাক্তার ঘোষের "সার্কাসি খেল" এখানে লেনিনের দোহাই দিয়া মার্কস্‌বাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা। 'প্রগতিবাদী' গুরুমহাশয় ছাত্রদের উপদেশ দিয়াছেন, বৎসগণ! মার্কস্‌বাদ "Infantile disease" উহাকে তাড়াও "কিন্তু leftism কখনও পরিত্যাগ করিবে না", কারণ—"leftism সর্ব্বদেশে সর্ব্বযুগে স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ।" (ক) লেনিনের এই নয়া leftist ভক্ত সম্বন্ধে Lenin কি বলেন?—"The weakness of such revolutionism, its futility, its liabity suddenly to transform itself into obedience, apathy, phantasy and even into a mad infatuation with some bourgeois fashionable tendency—all this is a matter of common knowledge" [Lenin—Leftwing Communism] মার্কসবাদের বিরুদ্ধে "ধ্বংস কর এই পাপ" নয়া leftist ধুয়াও (লেনিনের ভাষায়) "mad infatuation with some bourgeois fashionable tendency" আর এই নয়া leftism-এর পরিণতি হইল "obedience, apathy, phantasy" অর্থাৎ, কোনো নয়া ফুয়েরার-অবতারের চরণে আত্মসমর্পণ—"দিব্যজ্ঞানী" বামপন্থীদের মোক্ষ উহাতেই। আর ডাক্তার ঘোষের? বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকমহলে নিশ্চয়ই তিনি যথানিয়মে রামপ্রসাদী সুরে গাহিয়া চলিবেন, "আমায় দে মা তবিলদারী।"*

ক. সাম্য ও স্বাধীনতা—বটকৃষ্ণ ঘোষ, শনিবারের চিঠি, কার্তিক ১৩৫২।

* পরিচয়, মাঘ ১৩৫২, পৃ. ৪৬৮-৭৯। এই রচনাটি ১৩৮৩ সালে 'পরিচয়'-এর জয়ন্তী সংকলনে শেষদিকের বেশ কিছু অংশ বাদ দিয়ে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। আমরা সম্পূর্ণ রচনাটিই প্রকাশ করলাম। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজনমতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

সংস্কৃতির তত্ত্ব বিচার / বিনয় ঘোষ

সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেই অধ্যাপক ম্যালিনাউস্কির নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। আধুনিক যুগের সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে অধ্যাপক ম্যালিনাউস্কি অন্যতম। সমাজবিজ্ঞানে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জীবনের প্রারম্ভে গণিতবিজ্ঞান ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অধ্যাপক ম্যালিনাউস্কি যে শিক্ষালাভ করেছিলেন, পরবর্তী জীবনে সেই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, সংযম, শৃঙ্খলা ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে অগ্রসর হন। সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানকে আমরা এককথায় "মানব-বিজ্ঞান" বলতে পারি। বিজ্ঞানীর অনির্বাণ অনুসন্ধিৎসা পরিতৃপ্তির এত বড় জীবন্ত ক্ষেত্র আর নেই। আলোচ্য গ্রন্থের প্রারম্ভেই অধ্যাপক ম্যালিনাউস্কি বলেছেন :

"Economics and jurisprudence, political science and aesthetics, linguistics, archaeology, and the comparative study of religions, constitute a more recent addition to humanism. Some two centuries ago psychology, the study of the mind, and later on, sociology, an enquiry into human relations, were added to the list of official academic studies. Anthropology, as the science of man at large, as the most comprehensive discipline in humanism without portfolio, was the last to come.……It consists now of such studies as pre-history, folklore, physical anthropology and cultural anthropology. These come dangerously near other legitimate fields of social and natural sciences: psychology, history, archaeology, sociology and anatomy."

বাস্তবিকই তাই। মানববিজ্ঞান হিসাবে 'নৃবিজ্ঞান' আধুনিক হলেও সমস্ত সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। না করলেও, করছে

দিনদিন এবং অদূর ভবিষ্যতে করবে। আদিম প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষের জৈবিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে গবেষণা যে বিজ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্য, ইতিহাস, প্রত্নবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান সবই তার অন্তর্ভুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে মানুষের জীবন ও সমাজ চিরদিনই জটিলতামুখী। জীবনের জটিলতা-বৃদ্ধি সভ্যতার অগ্রগতিরই পরিচায়ক। সেই আদিপ্রস্তর যুগের যাযাবর শিকারী-জীবন, অথবা নব্যপ্রস্তর যুগের সরল গ্রাম্যজীবন আজ আর নেই। বিকারের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখলেও সেই সরল স্বাভাবিক বর্বর জীবন আর ফিরে আসবে না কোনোদিন। আজ আমাদের জীবন যেমন বিচিত্র জটিলতার কলরবে মুখর, তেমনি বিরোধ-বন্ধুর। শ্রমশিল্পীর কুশলতার ক্ষেত্র যেমন বেড়েছে, নানা শাখা-প্রশাখায় বিজ্ঞানের বিশেষত্বও তেমনি দেখা দিয়েছে। সর্বক্ষেত্রেই 'বিশেষজ্ঞের' সামাজিক মূল্য তাই আজ এত বেশী।

"মানববিজ্ঞানের" প্রতি অধ্যাপক ম্যালিনাউস্কি যখন আকৃষ্ট হলেন তখন প্রকৃত বিজ্ঞানীর নিষ্ঠা, সংযম, অধ্যবসায় ও সুতীব্র অনুসন্ধিৎসা নিয়েই তিনি তার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে অগ্রসর হলেন। পৃথিবীর নানা আদিম মানবজাতির মধ্যে তিনি ঘুরেছেন, তাদের মধ্যে বসবাস করেছেন, তাদের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, আচারব্যবহার, বিধি-নিষেধ-সংস্কার, আমোদ-প্রমোদ, শিল্পকলা, যাদুধর্ম, সব বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর এই পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল নিউগিনি ও উত্তর-পশ্চিম মেলানেসিয়ায়, বিশেষ করে ট্রোব্রিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে। কিন্তু এ ছাড়াও তিনি অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী, আরিজোনার হোপিজাতি, পূর্ব আফ্রিকার বেম্বা ও চাগ্গা জাতি এবং মেক্সিকোর জাপোতেক জাতির জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁর এই সুদীর্ঘ পর্যবেক্ষণের ফলাফল ও এই সব আদিম অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ও সমাজব্যবস্থার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন কয়েকখানি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থে, তার মধ্যে "Argonauts of the Western Pacific", "Crime and Custom in Savage Society," এবং "The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণলব্ধ এই সব মূল্যবান উপাদান বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে "সংস্কৃতি-দর্শনের" (cultural theory)

কোনো সাধারণ বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায় কিনা, এই ছিল অধ্যাপক ম্যালিনাউস্কির শেষ জীবনের একমাত্র সাধনা। সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। নানা সম্প্রদায়ের সমাজ-বিজ্ঞানীদের কঠোর সমালোচনায় উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর "সংস্কৃতি-তত্ত্ব" সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। এই "সংস্কৃতি-তত্ত্ব"ই আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়, সুতরাং সমাজ-বিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্রের কাছেই এর গুরুত্ব যে কতখানি তা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, অধ্যাপক ম্যালিনাউস্কি এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি শেষ করে প্রকাশের পূর্বেই মারা যান (১৬ই মে, ১৯৪২)। এই গ্রন্থের সমালোচনা অল্প কথায় শেষ করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। বিস্তারিত সমালোচনা এখানে করব না। অধ্যাপক ম্যালিনাউস্কির মূল বক্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থের নাম "A Scientific Theory of Culture," এবং এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকেই অধ্যাপক ম্যালিনাউস্কি "The Functional Theory" বলেছেন। "Function" বা "Functionalism" কথার অর্থ কি? জীবনের যে-কোন চাহিদার পরিতৃপ্তিকেই ম্যালিনাউস্কি "function" বলেছেন, সামান্য আহার-বিহার-নিদ্রা থেকে আরম্ভ করে পূজা-পার্বণ-নৃত্য-সঙ্গীত সবই একটা-না-একটা চাহিদার পরিতৃপ্তি। তিনি বলেছেন: "Function means…always the satisfaction of a need, from the simplest act of eating to the sacramental performance" এবং "Functionalism would have no true claim to deal with culture in its fundamental aspects…unless it were able to analyse and thus define each and relate them to the biological needs of the human organism." (P. 159)

সংস্কৃতির সমস্ত বিশেষত্ব ও উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সেগুলি 'means to an end', একটা 'medium' মাত্র, যার মধ্যবর্তিতায় মানুষ তার জৈবিক ও দৈহিক বাসনা-কামনা ও চাহিদা চরিতার্থ করে। ম্যালিনাউস্কি বলেছেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করতে হলে সব সময় এইভাবে 'instrumentally or functionally' 'কাল্‌চার' বিচার করতে হবে। এছাড়া আর

দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টিকোণ নেই, যেখান থেকে বিজ্ঞানীর মতো মানব-সংস্কৃতির বিশ্লেষণ আমরা করতে পারি।

ম্যালিনাউস্কি বলেন: "The cultural process, looked at in any of its concrete manifestations, always involves human beings who stand in definite relations to each other, that is, they are organised, and handle artifacts, and communicate with each other by speech or some other type of symbolism. Artifacts, organised groups, and symbolism are three dimensions of the cultural process that are closely related to each other." (Italics আমার; P. 150—51)

আপাতদৃষ্টিতে বিচার করলে ম্যালিনাউস্কির এই উক্তির বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই, কিন্তু বিশেষভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায় তাঁর 'তত্ত্ব' কুয়াশাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট। মানুষের যে কোনো ক্রিয়াকলাপ অথবা মানবসংস্কৃতির যে কোনো বাহ্যিক রূপের কথাই আমরা ভাবি না কেন, তার সঙ্গে নিঃসঙ্গ, সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের কথা আমরা ভাবতে পারি না। দলবদ্ধ মানুষ, পরিবারভুক্ত মানুষ, গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ, জাতিভুক্ত মানুষ—এইভাবে 'সক্রিয় মানুষ' সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করতে হবে। আদিম আদিপ্রস্তর যুগের অসভ্য মানুষ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগের অসভ্য মানুষ পর্যন্ত কাউকেই আমরা দলহীন বা গোষ্ঠীহীন ভাবতে পারি না। এই জন্যই ম্যালিনাউস্কি বলেছেন যে, "Institution"-ই হলো সমস্ত culture-এর 'Primary unit' এবং 'ইনস্টিটিউশন্' হলো "an organised system of activities." মানুষের জীবিকা উৎপাদনের কলা-কৌশলেই (technique of production) হোক বা উৎপাদন-হাতিয়ারই হোক (tools of production), সাহিত্য, ভাষা, শিল্পকলা, শিক্ষা, সংস্কার, ধর্ম, রীতিনীতি যাই হোক না কেন, সবই মানুষের একটা "বিশেষ সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাত্রার" পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। ম্যালিনাউস্কি তাই জোর দিয়েই বলেছেন: I would challenge any one to mention any object, activity, symbol, or type of organisation, which could not be placed within one institution or other···" (P. 161)

'চ্যালেঞ্জের' প্রশ্ন নয়, কারণ ম্যালিনাউস্কি যে বিষয়ে 'চ্যালেঞ্জ' করেছেন সে

বিষয়ে কারও প্রতিবাদ করার কিছু নেই। সমাজ-বিজ্ঞানী মাত্রেই স্বীকার করবেন যে, গোষ্ঠী, পরিবার, বা জাতি বা বিশেষ কোনো সমাজ-ব্যবস্থার পশ্চাৎপটেই মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ, রীতিনীতি, আদর্শ, ঐতিহ্য, সব বিচার করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে-'institution' বা 'organised system of activities'-এর কথা ম্যালিনাউস্কি বলেছেন সেটা কি কোনো আদিম যাদুবিদ্যার প্রভাবে আকাশ থেকে মাটিতে পড়েছে, না মাটি থেকে মানুষেরই প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে? এই যে 'ইনস্টিটিউশন্' বা 'বিশেষ সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাত্রা,' এটা কি পরিবর্তনশীল নয়? ম্যালিনাউস্কি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে পরিবর্তনশীল, কিন্তু "কেন" তা ব্যাখ্যা করেন নি। ম্যালিনাউস্কির "functionalism"-এর সূত্র ধরেই যদি মানবজীবনের সমস্ত সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তিকে জীবনের কোনো-না-কোনো চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা পরিতৃপ্তির সহায়ক হিসাবে বিচার করতে হয়, তাহলে তার 'ইনস্টিটিউশন' তার বাহিরে স্থান পাবে কেন? অর্থাৎ প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের 'বিশেষ কোনো সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাত্রা' বা 'institution' কি মানুষেরই কোনো চাহিদা বা উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য একটা সাময়িক 'apparatus' বা 'instruments' নয়? ম্যালিনাউস্কির 'চ্যালেঞ্জের' উত্তরে আমাদের কিছু বলবার নেই, কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে এই কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই আমরা চাইতে পারি। এছাড়াও আরও দুটি প্রশ্ন আমরা করতে পারি। প্রথমত, যে সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাত্রার কথা ম্যালিনাউস্কি বলেছেন সেই "সঙ্ঘবদ্ধতার" স্বরূপ কি? সেই 'সঙ্ঘবদ্ধতা' কি 'mutual co-operation' বা 'পারস্পরিক সহযোগিতা' মাত্র, তার মধ্যে কি কোনো 'conflict' বা 'বিরোধ' নেই? যদি থাকে, তাহলে থাকার কারণ কি? দ্বিতীয়ত, জৈবিক চাহিদা তৃপ্তির মাপকাঠিতে 'ইনস্টিটিউশনের' প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে, সাংস্কৃতিক প্রগতি (cultural progress) বা সাংস্কৃতিক অবনতির (cultural disintegration) কারণ বা ইতিহাস ব্যাখ্যা করা যায় কি? ম্যালিনাউস্কি বলবেন, ঐ 'functionalism'-এর সূত্র ধরেই ব্যাখ্যা করা যায়। জীবনের কতকগুলি মুখ্য চাহিদা (Primary needs) আছে, যা চরিতার্থ করার জন্য মানুষ কতকগুলি গৌণ চাহিদার (secondary needs) সৃষ্টি করে। এই গৌণ চাহিদা থেকেই আবার নূতন চাহিদা সৃষ্টি হয়। এই ভাবে নানা স্তরের চাহিদার সৃষ্টি ও পরিতৃপ্তির ভেতর দিয়ে যুগে যুগে মানুষ নূতন নূতন সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাত্রা

ও সংস্কৃতি গঠন ক'রে চলে। কিন্তু এ-ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নিতান্ত যান্ত্রিক (mechanical) নয় কি? এ-যেন পাটিগণিতের 'unitary method,' বিজ্ঞানীর 'scientific method' নয়। জীবনযাত্রা, সমাজব্যবস্থা, নীতি বা আদর্শ, সবই যেন অটোমেশন, মানুষও কতকটা তাই, কোনো রকমে নড়ে চড়ে এগিয়ে চলেছে আর কি!

এইভাবে "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" শ্রেণীর যুক্তির সাহায্যে অধ্যাপক ম্যালিনাউস্কি আলোচ্য গ্রন্থে সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন। বিজ্ঞানীর শ্রম, নিষ্ঠা ও ধৈর্য তাঁর আছে, বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণ শক্তিও তাঁর অসাধারণ। কিন্তু বিজ্ঞানীর চোখেও যে 'রঙ্গীন কাচ' থাকে, অর্থাৎ বিজ্ঞানীরও যে কল্পনা-শক্তি থাকার প্রয়োজন, তা অধ্যাপক ম্যালিনাউস্কির নেই বলতেই হয়। তাই শ্রমসাধ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাঁর গ্রন্থে শেষ পর্যন্ত কোনো সুসমন্বিত, নিটোল, বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি-দর্শন মূর্ত হয়ে ওঠে নি। মূল ও মুখ্য পরিপ্রেক্ষিতের আশেপাশে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাই তাঁর গ্রন্থের মধ্যে আগাগোড়া তাঁকে চক্রাকারে যুক্তির অবতারণা করতে হয়েছে এবং পুনরুক্তিরও অন্ত নেই।

সমাজ-বিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী ও প্রত্নবিদ্‌রা প্রাগেতিহাস ও ইতিহাস আলোচনা ক'রে যেসব অভিজ্ঞতা ও উপাদান আহরণ করেছেন, তা থেকে আজ আমরা সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশের একটা বৈজ্ঞানিক থিয়োরি রচনা করতে পারি। ম্যালিনাউস্কি যাকে 'material substratum of culture' বলেছেন, জীবনে তার প্রভাবকে কোনো স্থানে খর্ব না করেও তিনি সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক রূপ বিশ্লেষণে তার স্থান কোথায় তা নির্ধারণ করতে পারেন নি। মোটামুটি এই ভাবে সংস্কৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণে আমরা অগ্রসর হতে পারি।

জৈবিক ক্রমবিকাশের সর্বোচ্চ স্তরেই আমরা 'মানুষকে' দেখতে পাই। 'মানুষ' নিঃসংশয়ে জীবশ্রেষ্ঠ। মানুষের সঙ্গে অন্যান্য জীবের প্রধান পার্থক্য কি? প্রকৃতি ও পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কোনো হাতিয়ারই জীবজন্তু বাইরের জগৎ থেকে সংগ্রহ করতে পারে না। সমস্ত হাতিয়ার তার দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যেমন তার ধারাল দাঁত, নখ, থাবা, শিং ইত্যাদি। প্রাকৃতিক পরিবেশকে পরিবর্তন ক'রে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া, অথবা নিজের আবয়বিক পরিবর্তন ঘটিয়ে বাইরের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাওয়ার জন্যে

যে সংগ্রাম বিভিন্ন শ্রেণীর জীবকে বিভিন্ন কালে করতে হয়েছে, তার জন্তে বাইরের জগৎ থেকে হাতিয়ার সংগ্রহ করা, অথবা প্রাকৃতিক উপাদান থেকে হাতিয়ার তৈরী করে নেওয়ার শক্তি তাদের ছিল না। তাদের সমস্ত শক্তির উৎসই তাদের 'দেহ' এবং সংগ্রামের সমস্ত সরঞ্জামই 'corporeal equipment' বা দৈহিক সরঞ্জাম। কিন্তু মানুষের এই দৈহিক সরঞ্জাম নেই বললেই হয়, সামান্ত বিড়ালের থাবার কাছেও মানুষের নখ অত্যন্ত দুর্বল। বাইরের জগতের উপাদান থেকেই মানুষকে হাতিয়ার তৈরী করতে হয় এবং তার সমস্ত হাতিয়ারই 'extra corporeal' বা দেহ বহির্ভূত। খাদ্য সংগ্রহ (food gathering), খাদ্য উৎপাদন (food production), শত্রুসংহার, আত্মরক্ষা, বাসস্থান নির্মাণ প্রভৃতি সমস্ত কাজের জন্তেই মানুষকে বহির্জগতের উপাদান থেকে হাতিয়ার বা 'tool' তৈরী করতে হয়। অবশ্য এই হাতিয়ারেরও দৈহিক ভিত্তি আছে। 'হাত' (hand) ও 'মস্তিষ্ক'ই (brain) হলো মানুষের এই নির্মাণ-শক্তির উৎস। হাত দু'খানা যদি দেহের ভার বহন করার দায়িত্ব থেকে মুক্ত না হতো, তাহলে এত কারিগরির শক্তি অর্জন করাও মানুষের দ্বারা সম্ভব হতো না। তারপর 'মস্তিষ্ক', মানুষের মস্তিষ্কও আজ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি সম্পন্ন জটিলতম যন্ত্রবিশেষ। 'পিথিক্যানথ্রোপাস্' আর 'আইনস্টাইন'-এর মস্তিষ্ক একরকম নয়। নিজের মাথা ঘামিয়ে, নিজের হাতে তৈরী হাতিয়ার দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে মানুষ প্রকৃতির রূপ বদলেছে, নিজেও বদলেছে। যুগে যুগে মানুষ তার জীবিকা উৎপাদনের কলাকৌশল ও হাতিয়ার বদলেছে এবং তার ফলে তার গোষ্ঠী-জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ-জীবনেও পরিবর্তন এসেছে। ইতিহাসে দেখা যায়, অর্থনৈতিক উৎপাদনের কলাকৌশল ও হাতিয়ার বদলাবার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ারূপে গোষ্ঠীবদ্ধ বা শ্রেণীবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তিও বদলে যায়, এবং তার ফলে সমস্ত ব্যবস্থার একটা বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে। তাহলে ম্যালিনাউস্কির জটিল 'চার্ট' ও 'ডায়াগ্রাম'-এর গোলকধাঁধায় না হয়রান হয়ে আমরা সহজভাবেই শুরু করতে পারি। প্রথমে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে এখান থেকে :

উৎপাদন-রীতি ও কলাকৌশল	সমাজ-ব্যবস্থা	(Social and
(Technique of Production	ও	political
অথবা Technology)	রাষ্ট্রব্যবস্থা	organisation)

উৎপাদন-রীতি ও কলাকৌশলের (tools of production) সঙ্গে মানুষ আরও 'tools' তৈরী করল, তার নাম 'tools for communication'. সমাজের মধ্যে ভাব ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের জন্যে এই যে 'হাতিয়ার' মানুষ তৈরী করল—এরই নাম 'ভাষা (language)। নৃত্য (dance) ও চিত্রকলাকেও (painting) আমরা ভাব আদান-প্রদানের 'tools' বলতে পারি : শব্দ (articulate sound) এবং তার সমাজ-গৃহীত প্রচলিত অর্থ (conventional meanings), এই নিয়েই 'ভাষা' বলা চলে। 'ভাব' বা 'idea' হলো কোনো কাজ (action) বা বস্তুর (material) কল্পিত রূপ বা মানস রূপ। ভাব লেনদেনের এইসব 'বাহন' বা 'হাতিয়ারকে' আমরা মানুষের 'spiritual equipment' বলতে পারি। মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও দক্ষতা কিছুই আর লুপ্ত হয়ে যায় না, বংশপরম্পরায় তা জ্ঞাপন করা যায় এবং মানুষের সংগ্রামের একটা ঐতিহ্য (tradition) গড়ে ওঠে।

তাহলে 'পরিবেশ' (environment) বলতে 'বাস্তব' (material) ও 'মানস' (spiritual) পরিবেশ, দু'রকমই বুঝতে হবে। এই পরিবেশের মধ্যে মানুষ সংগ্রাম করে দু'রকমের 'হাতিয়ার' নিয়ে—বাস্তব হাতিয়ার (material tools এবং মানসিক হাতিয়ার (spiritual tools)। কোনো একজন বিখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানীর ভাষায় আমরা বলতে পারি : "...Ideas form as effective an element in the enviroment of any human society as do mountains, trees, animals, the weather and the external nature. Societies, that is, behave as if they were reaching to a spiritual environment as well as to a material environment." কিন্তু মানস পরিবেশের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য থাকলেও, তার স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। বাস্তব পরিবেশ বা বস্তুজগতের স্বতন্ত্র ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। বস্তুজগতের এই প্রাথমিক ধারার উপরে মনোজগতের স্রোত বয়ে চলেছে। বস্তুজগৎ হলো বনিয়াদ, তার উপরের সৌধ হলো মনোজগৎ। আরও পরিষ্কার করে বললে বলা যায়, বনিয়াদ হলো অর্থনৈতিক উৎপাদন-রীতি, হাতিয়ার ও কলাকৌশল, অথবা এককথায় 'technology', তার উপরে সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, এবং তার উপরে মানসলোক বা 'Ideology'র স্থান। Technology অর্থাৎ Social

and political organisation—Ideology—মোটামুটি এইভাবে আমরা একটি 'chart' করতে পারি। এই তিনটি স্তর পরস্পর-সংলগ্ন এবং পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে প্রত্যেকটি স্তরের বিকাশ হয়।

এই জন্যে কার্ল মার্কস বলেছেন, "...men developing their material production and their material intercourse alter, along with this their real existence, their thinking and the products of their thinking." (German Ideology)। এঙ্গেল্স্ আরও পরিষ্কার করে বলেছেন: "Political, legal, philosophical, religious literary, artistic etc., development is grounded upon economic development. But all of them react, conjointly and separately, one upon another, and upon the economic foundation" (Marx-Engels Selected Correspondence Italics আমার)

অধ্যাপক ম্যালিনাউস্কি দু'টি বিখ্যাত সংস্কৃতি-দর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন—একটি "Marxian". আর একটি "Freudian" মার্কসীয় সংস্কৃতি-দর্শন সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: "The Marxian system implies that the hunger—feeding—satiation series is the ultimate basis of human motivation". (P. 82) ফ্রয়েড সম্বন্ধে বলেছেন যে, ফ্রয়েড অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সব কিছুরই বিচার করেন 'by infantile fixations of libidinous drives' ফ্রয়েড সম্বন্ধে তাঁর উক্তি অনেকাংশে সত্য হতে পারে (সম্পূর্ণ সত্য নয়), কিন্তু মার্কস সম্বন্ধে উক্তি বিকৃত, মার্কসীয় দর্শনের অপব্যাখ্যা বলা চলে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কৃতি-দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পূর্বে দিয়েছি। বরং আমরা বলতে পারি যে, "functionalism"-এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে "vulgar materialism'-এর দুর্গন্ধ ম্যালিনাউস্কির গ্রন্থের সর্বত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু তাহলেও আমরা বলব, কষ্টকর ও বিরক্তিকর হলেও, অধ্যাপক ম্যালিনাউস্কির গ্রন্থখানি প্রত্যেক মার্কসিস্টের অবশ্য পাঠ্য। গ্রন্থের শেষে বিশ্ববিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী স্যার জেম্‌স্ ফ্রেজার (Sir James George Frezer) সম্বন্ধে যে-সমালোচনা ম্যালিনাউস্কি করেছেন তা অত্যন্ত চমৎকার, যদিও তাঁর সমালোচনা সর্বত্র সমর্থনযোগ্য নয়। 'Magic', 'Totem', 'Taboo' প্রভৃতি সম্বন্ধে ফ্রেজারের মতামতকে ম্যালিনাউস্কি তাঁর "functionalism"-এর দিক থেকে বিচার

করেছেন এবং মধ্যে মধ্যে ভুল প্রতিপন্নও করেছেন। কিন্তু ম্যালিনাউস্কির যুক্তিও বহু নৃবিজ্ঞানী সমর্থন করবেন না। ফ্রেজারের মতামত আজও অধিকাংশই সত্য ও বিজ্ঞানসম্মত বলে গৃহীত হয়ে থাকে।*

* পরিচয়, বৈশাখ ১৩৫৩, পৃ. ৭১৪-২০। Bronislow Malinowski-র 'A Scientific Theory of Culture and other Essays' নামক গ্রন্থখানির সমালোচনা-প্রসঙ্গে আলোচ্য রচনাটি উক্ত শিরোনামে 'পুস্তক-পরিচয়' বিভাগে প্রকাশিত হয়। রচনার রেখাঙ্কিত অংশে লেখক 'ইটালিকস' ব্যবহার করেছিলেন। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজনমতো সংশোধন করা হয়েছে।
—সম্পাদক

'প্রচারবাদী' সাহিত্য / চিদানন্দ দাশগুপ্ত

কিছুকাল ধ'রে বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় সাহিত্য ও রাজনীতির সম্বন্ধ নিয়ে একটি বাদ-বিসম্বাদের ধারা চলে আস্‌ছে, যার তীব্রতার বহু মাত্রাভেদ দেখা গেলেও সমগ্রভাবে কোনো মীমাংসা সর্বজনগ্রাহ্য হচ্ছে না।

গোড়ায় যখন "প্রচার"-সাহিত্যের আবেদন এসেছিল তখনকার পরিমাপে আজকের প্রচারবাদী সাহিত্যিকের সংখ্যা অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে, এবং কেবল যে নিরপেক্ষ ও বিরুদ্ধবাদী বহু সাহিত্যিককে আকৃষ্ট করে এনেছে তাই নয়, নতুন প্রগতিশীল ও সম্ভাবনাপূর্ণ সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সৃষ্টি করেছে। এমন কি দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও এখানেই অনেকাংশে কেন্দ্রীভূত। নতুন সাহিত্যের অন্য কোনো পথ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

এই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন সাহিত্য নিজের অন্তরের কথাটিকে আরো স্পষ্ট করে, সম্পূর্ণ করে দেখতে পাচ্ছে। পূর্বে যেখানে কেবল একটি তাগিদ অসহিষ্ণু অর্ধ-উচ্চারণে প্রকাশ হয়েছিল আজ তা সমগ্র জীবন ও সাহিত্যের চেহারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরো সত্যভাবে উপলব্ধ হচ্ছে। এর ফল হয়েছে বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় একটি নতুন ধারার আত্মপ্রকাশ।

বিরুদ্ধবাদী খাঁটি "বিশুদ্ধ" সাহিত্যিক যাঁরা, তাঁরা এই বিস্তৃতি ও বিবর্তনের মর্মার্থকে হয় বোঝেন নি, নয় অবহেলা করেছেন। তাঁদের ভ্রান্তি এইখানে যে, তাঁরা সাহিত্যে সমাজচেতনার আন্দোলনকে একটি জ্যামিতিক, অনড় কাঠামোর মধ্যে এঁটে ফেলে পূর্ণ আত্মপ্রসাদে সেই ভিত্তিতেই এর বিচারাসনে বসেছেন। এই কাঠামো দুটি কথায় বিবৃত—"রাজনৈতিক প্রচার"। তাঁরা রায় দিয়ে থাকেন যে, এই শ্লোগানের প্রয়োগার্থ সাহিত্যের মৃত্যু।

সম্প্রতি এই অনগ্রসর, যান্ত্রিক (mechanical) সমালোচনার একদফা প্রকাশ দেখতে পাওয়া গেছে অধুনা-প্রকাশিত বার্ষিকপত্র 'দিগন্ত'-এ, খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের ধারণার মধ্যে।[১]

---

১. কবি অজিত দত্ত 'দিগন্ত' বার্ষিক সংকলনটির সম্পাদক ছিলেন। —সম্পাদক

তাই আজ প্রচারবাদী সাহিত্যদর্শনের ভিত্তিটি নতুন করে দেখার প্রয়োজন। এর আবেদন তাঁদের কাছে—যাঁরা রাজনৈতিক দলাদলির কুয়াশা ভেদ ক'রে সাহিত্যকে দেখতে ও যাচাই করতে চান।

আজকের প্রচারবাদী সাহিত্য কেবল একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি।* কেবল রাজনৈতিক মতামতও এর বিশেষত্ব নয়। এর ভিত্তি একটি সম্পূর্ণ নতুন জীবনদর্শন—কমিউনিজম্।

আজকের ইতিহাসে মানুষ এমন একটি স্তরে এসে পৌঁছেচে যে-স্তরে রাজনীতি ও অর্থনীতি জীবনের প্রায় কেন্দ্রস্বরূপ; তার কারণ এই যে, আজকের সভ্যতার সংকটের মূলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট রয়েছে। এই কথাটি বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সঙ্গে ইতিহাসের মধ্য থেকে উদ্ধার করেছে কমিউনিজম্। তাই আমাদের কালে কমিউনিস্টদের তীব্রতম আক্রমণ রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার ওপর। কিন্তু রাজনৈতিক বিপ্লবের খাতিরেই কমিউনিজ্‌মের কদর নয়, এঙ্গেলসের ভাষায় কমিনিজ্‌মের উদ্দেশ্য মানুষকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঐতিহাসিকে নিয়ে যাওয়া "re-history ends and history begins." মানুষকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে নতুন সভ্যতার বুনিয়াদ রচনা করাই কমিউনিজমের ঐতিহাসিক ভূমিকা। তাই মার্কস, এঙ্গেলস্ বা লেনিন কেবল কী করে বিপ্লবের দ্বারা শোষিতশ্রেণী শোষণ থেকে আপনাকে মুক্ত করবে তাই বলেন নি; প্রকৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ললিতকলা নিয়ে মানুষের যে সমগ্র জীবন—তার মূলেই একটি সমগ্র বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছেন। তাঁদের মতবাদ যে নতুন সোভিয়েত সমাজ সৃষ্টি করেছে সেই সমাজ দর্শনের সত্যতার সাক্ষ্য। উনত্রিশ বৎসরের অক্লান্ত অবসরহীন যোদ্ধা সোভিয়েত পৃথিবীর সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে শুধু আত্মরক্ষা করে নতুন সমাজ-ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করেছে তাই নয়, এই অবিরত আক্রমণের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেও একটি অপূর্ব নতুন সংস্কৃতির সৌধ নির্মাণ করেছে,—লেনিনগ্রাদ অবরোধের মধ্যে দাঁড়িয়ে রচনা করেছে Leningrad Diary র মতো কাব্য। আইজেনস্টাইন, মাইএরহোল্ড, গোর্কি, শোলোকভ, টিখোনভ, মায়াকোভস্কি, শোস্তাকোভিচ, পপভ—এঁরা কেবল ব্যক্তিগত প্রতিভাকেই

* সঞ্জয় ভট্টাচার্য, গোপাল ভৌমিক প্রমুখ অনেকে আছেন যাঁরা ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য বা সমর্থক নন, এমন কি বিরোধী।

প্রকাশ করেন নি, প্রকাশ করেছেন সোভিয়েত মানবের প্রতিভাকে; সূচনা করেছেন সভ্যতার এক নতুন অধ্যায়ের।

তাই কমিউনিস্ট কবিতা কেবল "রাজনৈতিক প্রচারের" কবিতা নয়, নতুন পৃথিবীর কবিতা। অতীতে খ্রীষ্টধর্ম যেমন খ্রীষ্টীয় সভ্যতাকে সৃষ্টি করেছে, বৌদ্ধধর্ম বৌদ্ধ-সংস্কৃতিকে সৃষ্টি করেছে, তেমনি আজ কমিউনিজ্‌ম্ জন্ম দিচ্ছে কমিউনিস্ট সভ্যতার। সাধারণ সাময়িক রাজনীতির প্রচারের মানদণ্ডে এর সম্পূর্ণ রূপ দেখতে পাওয়া যাবে না। "কংগ্রেসী কবিতা" বলে কোনো পদার্থ সৃষ্টি আজ সম্ভবপর নয়, কারণ, জাতীয় আন্দোলনকারীর কাছে কংগ্রেসী হওয়াটা কেবল সাময়িক রাজনীতির ব্যাপার। তাতে স্বাধীনতালাভের পরবর্তী ভবিষ্যতের কোনো রূপায়ণ করে না, জীবনের সর্বমুখীনচেতনাকে স্পর্শ করে না। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সমাজজীবন কি সভ্যতা সম্পর্কে কংগ্রেসের কোনো কল্পনা নেই (ব্যক্তি-বিশেষের থাকতে পারে), কারণ কংগ্রেসী আন্দোলন একটি বিশেষ দেশের ও সময়ের মধ্যে গণ্ডীভূত। তার অনুভূতিক্ষেত্র অপ্রশস্ত রয়ে যায়, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বাইরে প্রসারিত হবার কোনো ফাঁক পায় না। কাজেই তা কাব্য-সৃষ্টির অনুকূল কোনো বিশেষ ক্ষেত্র রচনা করে না। একথা মানতেই হবে যে, পঁচিশ বৎসরের কংগ্রেসের রাজনীতি বাংলার জনগণের জন্য কোনো সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে জাগাতে পারে নি; কারণ সেটা ছিল নিছক রাজনীতি। অপরপক্ষে মাত্র কয়েক বছরের কমিউনিস্ট আন্দোলন শ্রমিক ও কৃষককদের মধ্যেও একটি নতুন সাংস্কৃতিক ধারাকে ক্রমশই জাগ্রত করতে সক্ষম হচ্ছে, নতুন নাটক, গান, নৃত্য জনসাধারণের মধ্যে শিকড় খুঁজে পেয়ে জনসাধারণের হয়ে উঠছে। নতুন গ্রাম্য-কবিতারও উত্থান হচ্ছে।

সেদিক থেকে বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক-গৌরব গ্রাম্য-কবি নিবারণ পণ্ডিতের 'রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে' কবিতাটি* ('পরিচয়' ভাদ্র,

* সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ এই কবিতাটি প্রকাশ করা হয়। 'পরিচয়' সম্পাদক লিখেছিলেন: "এ কবিতাটির রচয়িতা ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের একজন পল্লী-কবি।…মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে পরিচিত হন —ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের শম্ভু মিত্রের মুখে ময়মনসিংহে কবিতাপাঠ শুনে তাঁর স্বাভাবিক রসবোধ জাগ্রত হয়…" [দ্র. পরিচয়, ভাদ্র ১৩৫২, পৃ ৯৫]। —সম্পাদক

১৩৫২)। তবু তো বাংলার এই ধারায় সবে সূত্রপাত মাত্র। অন্যান্য দেশেও কমিউনিস্ট-আন্দোলন একটি নতুন সাংস্কৃতিক ধারার প্রবর্তন করছে যার দিকে ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা একত্র সংহত। প্রগতিকামী শিল্পী সর্বত্রই এই আন্দোলনের মধ্যে ক্রমশ এগিয়ে আসছেন। প্রবীণ, পরিণত বয়সে রম্যাঁ রলাঁ, থিয়োডোর ড্রেইজার, জোশ মালিহাবাদী এই পথে পা বাড়িয়েছেন। কারণ, তাঁরা এখানে দেখেছেন জীবনের স্পন্দন, আগামী দিনের ইঙ্গিত। অন্যান্য দেশে কমিউনিস্ট-বিরোধীরা এই পরিস্থিতির অর্থও উপলব্ধি করছেন। হয়তো শঙ্কিত হচ্ছেন, কিন্তু বালুতে মুখ গুঁজছেন না। ড্রেইজারের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের সম্পর্কে জেমস্ ক্যারেল (কমিউনিস্ট বিরোধী) 'Saturday Review', ১২ই জানুয়ারী সংখ্যায় লিখেছেন : "still seeking to know, to learn, to be free, Dreiser joined the Communist Party of the United States last summer. The major significance of this act is that it was the way he took to repudiate the values of bourgeois America. As such it was a militant action and it casts a meaning on all of his past writing. It shows us that the novelist who most truly, most thoroughly, most broadly pictured in the meaning of life in America its most hopeful period of growth, came at the end of his days, to repudiate the values of that same society, in this sense, Dreiser, as an old man, moved towards the ideas of socialism···For this one honors him for his courage and his integrity ·· The statement he issued when joining the Communist Party is—like recent statements of Picasso—unmistakably sincere···a rejection of capitalism and a deep concern because of the impasse into which modern man has now come to find himself. Dreiser was not a man who trifled in these matter. He declared that he was joining the Communist Party as this was the logical consequence of his life-work and life-experience. There is here a note of warning. For this was one of

the final conclusions reached by America's greatest writer". (ইতালিক প্রয়োগ আমার)। ড্রাইজার নিজে তাঁর আবেদনপত্রে বলেছিলেন —"Belief in the greatness and dignity of man has been the guiding principle of my life and work. The logic of my life and work (ইতালিক প্রয়োগ আমার) leads me, therefor, to apply for membership in the Communist Party."—People's War, September 30, 1945

এই নতুন সাহিত্য গায়ের জোরের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, অন্তরের আবেগ ও বুদ্ধিবৃত্তির ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর শক্তি যান্ত্রিক (mechanical) নয়, সৃষ্টি-দ্যোতক (creative)। নতুন সাহিত্যিক এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, প্রবীণ এগিয়ে আসেন কোনো বাইরের চাপানো কর্তব্যের তাগিদে নয়—কেবল 'দেশঋণ' শোধ করতেও নয়। সাহিত্যিক সর্বোপরি জীবনকে ভালোবাসেন, তাই মানুষের জীবনের সংকটে তাঁর মন বিচলিত হয়, বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে আলোকের পথ খোঁজেন। যে দেশে, কালে, পরিবেশে তাঁর জীবনের গতিপথ—তাঁর মনের অনুভূতিক্ষেত্র, সেই দেশকাল আজ সংকটাপন্ন। এই সংকটে কেবল যৌথ-জীবনের দায়িত্ববোধ তাঁকে জাগ্রত করে তা নয়, তাঁর ব্যক্তিগত, দৈনন্দিন, নিভৃত জীবনও এই বিষবাষ্পের ছোঁয়ায় মলিন হয়ে ওঠে। তাই তাঁর অনুভূতির প্রকাশ যে কাব্য, সেই কাব্য বেদনায় মন্থিত হতে থাকে। যে কবির ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে না, তাঁর রাজনীতিতে গোলযোগ নেই, গোলযোগ তাঁর হৃদয়বৃত্তিতে, তাঁর স্পর্শানুভূতি ও সংবেদনশীলতায়। কবির মন সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক স্পর্শানুভূ ও সংবেদনশীল; তাই তাঁর বেদনার প্রকাশ চেষ্টাকৃত নয়, স্বতঃস্ফূর্ত। ব্যক্তিগত সীমাকে ছাড়িয়ে এই বেদনা সহজেই সাধারণের হয়ে ওঠে; কারণ দু'য়ের মূল একই। জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হতে কবির কোনো হিংস্র কর্তব্যবোধের প্রয়োজন করে না। একাগ্র খোঁজার পর যখন কবি দেখতে পান যে তাঁর একক মুক্তির পথ একেবারেই রুদ্ধ, সাধারণের মুক্তিতেই তাঁর মুক্তি, তখন তাঁর সামনে পথ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। বন্ধন যেখানে এক, সেখানে বেদনাও এক—মুক্তিও এক। তাই সাধারণের বেদনা কবিমনকে বিচলিত করে, কারণ তার মধ্যে তাঁর নিজেরই বেদনার প্রকাশ। সাধারণের মুক্তির আহ্বানে তাঁর মন সাড়া দেয়, কারণ তাতে তাঁর নিজেরও মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত।

সুতরাং কমিউনিস্ট কবিতায় ব্যক্তিগত আবেগের প্রকাশ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ—এ দু'য়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই 'দেশঋণ' শোধ করতে কবি দেশের প্রতি কর্তব্যের তাগিদে আসেন না, প্রাণের তাগিদেই আসেন। যেমন প্রাণের তাগিদে কবি লেখেন কবিতা,। 'প্রচার' ও 'ব্যক্তিগত' আবেগের প্রকাশ এখানে মিলিত, দ্বিখণ্ডিত নয়। বরং জীবনকে এই অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখতে হলে আজ অন্য কোনো ইডিয়লজি বা মতাদর্শে কুলোয় না। না কুলোলে তখন দরকার হয় একটাকে 'সাহিত্যিক' কর্তব্য, অন্যটাকে 'বৈষয়িক' কর্তব্য বা 'রাজনৈতিক' কর্তব্য এমনিভাবে খণ্ড করে দেখা। তাতে মানবসত্তাকেই খণ্ড করতে হয়। আর খণ্ডিত সত্তাকেই শ্রেয় বলে গ্রাহ্য করতে হয়। এ-জন্যই 'কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘে' এসে "অ-সাহিত্যিক" প্রচারও সঙ্ঘের বাহিরে মনের একক লীলার প্রকাশ—শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্তের মতো মহাজ্ঞানী মনীষীও এইরূপ সত্তার খণ্ডিকরণ মেনে নিচ্ছেন।* সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করার এই মারাত্মক নিয়তি কমিউনিস্ট কবিতাকে ভর করে না। কারণ আসলে আর্টের মধ্য দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব একীভূত (unified) হয়, বিভক্ত হয় না। আর্টের মূলেই এই unification of personality বা unity of self: আর্টে যেখানে এই সত্তা যত একীভূত সমাহিত প্রকাশ পায়, সেখানেই আর্ট হিসাবে তা তত সম্পূর্ণ। কমিউনিজম শ্রেষ্ঠ জীবনদর্শন এই জন্য যে এতে ব্যক্তি ও সমাজকে মিলিত (synthesise) করে তদ্দ্বারা সমাহিত (Integrated) ব্যক্তিত্ব ও সমাহিত সমাজকে জন্ম দেয়। "All I have of outer things to be at peace with those within"—প্লেটোর এই প্রার্থনা কমিউনিজমে এসে সার্থক হয়। এর দ্বারা কমিউনিজম কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রকে অনেকখানি প্রশস্ত করে দিয়েছে। অপর পক্ষে দ্বিখণ্ডিত সত্তা বর্তমানের বুর্জোয়া কবির জীবনে অবশ্যম্ভাবী অভিশাপ। কাব্যের পক্ষেও তা মৃত্যুর পথ, কারণ এতে কাব্যসৃষ্টির একেবারে মূলে কুঠারাঘাত করছে। শেষ পর্যন্ত এতে যা ঘটায় তা হচ্ছে অনুভূতির অবাস্তবতা (unreality) বা অনুভূতি ও তার প্রকাশের মধ্যে বিচ্ছেদ। প্রকাশের অভাবে সেখানে সত্য অনুভূতির মৃত্যু, সত্য অনুভূতির অভাবে প্রকাশের মৃত্যু। কবির সুখ-দুঃখ যে বহির্জাগতিক পরিবেশের আওতায় চলা-ফেরা, ঘাত-সংঘাত, ওঠা-পড়ার মধ্য হতেই উত্থিত হয়, সম্পূর্ণ

* 'দিগন্ত'-এ শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্তের লেখা 'কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ'।

বিচ্ছিন্নভাবে যে তার কোনো সুখ-দুঃখ নেই—এই সত্যকে উপেক্ষা করার ফলে সাহিত্যের ভিতরে ঘুণ ধরে। পৃথিবীব্যাপী বুর্জোয়া সাহিত্য আজ তাই মৃত্যু-মুখীন। আবেদনের ভূমি সংকুচিত হতে হতে ক্রমশ নিজেতেই আবদ্ধ হচ্ছে। 'ওয়েস্টল্যাণ্ড'-উত্তর এলিয়ট থেকে ডাইলান টমাস, টমাস থেকে গার্ট্রুড স্টাইনের পথ—এই মৃত্যুর পথ। স্টাইন 'mzn:ss'-এর প্রকাশ করতে বসেছেন। প্রশ্ন করি, এর পরের ধাপ সাহিত্যে কী—নিশ্চিহ্ন অবলোপ ছাড়া? আর্ট একের মনের বার্তাকে সামাজিকভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত কতকগুলি প্রতীকের মধ্য দিয়ে অপরের মনে পৌঁছে দেয়। তাই আর্ট কেবল ব্যক্তিগত নয়, সামাজিকও। অপরের মনের সঙ্গে আর্টিস্টের সান্নিধ্য যখন হারাতে থাকে তখন যোগাযোগের ভাষাটিও হারিয়ে যায়।

জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পশরা ···

তাই কমিউনিস্ট সাহিত্য কেবল কয়েকটি সাহিত্যিকের একটি উদ্ভট খেয়াল নয়, কমিউনিস্ট সাহিত্য আজকের সাহিত্যের বাঁচবার একমাত্র পথ। টলস্টয় এক সময়ে বলেছিলেন, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকে স্বীয় যুগে 'Highest life conception'-এর ভিত্তির উপর দাঁড়াতে হবে। কমিউনিজম-ই আজকের Highest life conception.

অতীতের সাহিত্য-চেতনার সঙ্গে আধুনিকের মূল প্রভেদ আত্ম-সচেতনায় 'self-consciousness। পূর্বে যেখানে কবিতায় হৃদয়বৃত্তির প্রাবল্যে আত্ম-অবলোপ ঘটত, আজ সেখানে গভীর উচ্ছ্বাসের মধ্যেও আত্মসচেতনতা প্রখর। সুতরাং কাব্যে ফলের প্রতি লোভ নিয়ে কমিউনিস্ট কবিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ একদিক থেকে নিরর্থক, তাছাড়া এ প্রশ্নটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক কবিতার প্রশ্নেরই অন্তর্গত। ফললাভের ইচ্ছা এবং ব্যক্তিগত আবেগ-প্রকাশের চরিতার্থতা কাব্যসৃষ্টির আধুনিক স্তরে ও বিশেষত কমিউনিজমের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী নয়, একই। কিন্তু এ কথাটির কদর্থের ক্ষেত্র সম্বন্ধে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। কমিউনিস্ট কবি একটি কবিতা লেখেন এই উদ্দেশ্যে নয় যে, এই বিশেষ কবিতা পড়ে জনসাধারণ এই বিশেষ রাজনৈতিক কমিটি গড়ুক; যদি নেহাৎ না গড়ে তাহলে সে কবিতা ব্যর্থ। আসল কথা হচ্ছে এই যে, উদ্বোধক আবেগকে যদি সার্থকভাবে প্রকাশ করতে পারা যায় তাতে পাঠকের মন উদ্বোধিত হয়। কবিতার সার্থকতার বিচারের এও একটি উপায়। অপর

পক্ষে বিশেষ কবিতার বিশেষ মূল্য না থাকলেও সমগ্রভাবে কমিউনিস্ট কবিতার একটি প্রভাব আছে। কল্যাণকামী প্রতি রাজনৈতিক কর্মের একটি মানবিক বাস্তবতার (human reality) পটভূমি আছে, সেই পটভূমিকে উজ্জ্বল করে তোলাতেই 'রাজনৈতিক' কবিতার সার্থকতা।

সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মানুষের সম্বন্ধে গভীর কল্যাণকামনা আছে। কিন্তু 'মানস সুন্দরী' লেখার সময় প্রশ্ন করলে এ জবাব রবীন্দ্রনাথের কাছে মিলত না, কারণ প্রশ্নই হতো অবাস্তর। রবীন্দ্রোত্তর যুগের পটভূমি অন্য। রবীন্দ্রনাথেরই শেষ পর্যায়ে যখন সভ্যতার সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে তখন কবির সংকট-চেতনাও সমভাবে তীব্র। 'প্রান্তিকে'র পরবর্তী কাব্যে দুটি সুর প্রধান—এক মৃত্যু, আরেক বিশ্বসংকট। মৃত্যুর ছায়ায় কবির দৃষ্টি বহির্জীবনের নৈকট্যবঞ্চিত, দূরাগত। বিশ্বসংকটের বেদনা আছে কিন্তু সংকট দূরীকরণের অপরোক্ষ তাগিদ নেই। সেই তাগিদ পরবর্তীদের, সুতরাং স্পষ্ট সচেতন কল্যাণকামনাও তাঁদেরই। রবীন্দ্রনাথে যা প্রচ্ছন্ন অন্তর্লীন সুর বা মনোভঙ্গী attitude শেষ পর্যায়ে আকস্মিকতামুক্ত, তীব্র—আধুনিকে সেই কল্যাণকামনা স্পষ্ট প্রকাশে উজ্জ্বল। এইটেই কি স্বাভাবিক বিকাশের পথ নয় যে, আত্মসচেতনার তীব্রতায় যা প্রচ্ছন্ন ছিল তা ক্রমশ দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠবে? অতীতের কাব্যে কল্যাণ-কামনা উত্তরকালিক আরোপণ বলে প্রতিভাত হতে পারে, কারণ তা প্রচ্ছন্ন, স্বগোচর নয়। আধুনিকে কল্যাণকামনা তাৎকালিক, কারণ তা স্পষ্ট, সচেতন। এই সচেতনতা সাহিত্যিককে স্বভাবতই সঙ্ঘবদ্ধতার দিকে চালিত করে। কল্যাণকামনা যখন জীবনের মূলে ঠাঁই নেয় তখন একক প্রচেষ্টার নিরর্থকতা সহজেই ধরা পড়ে। সৃষ্টির মূল কাজে সাহিত্যিক অবশ্যই নিঃসঙ্গ, কিন্তু সৃষ্টিকে সুস্পষ্ট দিক-নির্ণয়ের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ শক্তি অর্জনের সুযোগ কেবল সঙ্ঘের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। সচেতন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সঙ্ঘবদ্ধতা অবশ্যম্ভাবী।

পরিশেষে একটি কথা। রাজনৈতিক দলবিশেষের মতামতের উগ্রতার দ্বারা সত্যই অনেক সুসাহিত্যিক বিভ্রান্ত হচ্ছেন। বিভ্রান্ত হচ্ছেন বলেই তাঁরা কমিউনিস্ট কবিতাকে বিরুদ্ধদলের কবিতা হিসাবেই বিচার করতে আসেন। সাহিত্যের ধর্ম ও মূলনীতিগুলিকে সহজেই ভুলে যান। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের মতো সুসমালোচককেও দ্বিখণ্ডিত সত্তার খিয়োরী খাড়া করতে দেখে এই সংশয়ই আরও দৃঢ় হয়। বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত অতুল

গুপ্ত কমিউনিস্ট অকমিউনিস্ট বহু লেখকের গুরুস্থানীয়। তাঁরা সবাই জানেন, সঙ্ঘ বিশেষের নায়কত্ব যতই তিনি গ্রহণ করুন না, সাহিত্য ও জনসাধারণের মধ্যে দেয়াল তুলে, জনসাধারণের জন্য 'অসাহিত্তিক' প্রচারের 'ভালগারিটি'কে সমর্থন করা তাঁর মনীষার পক্ষে অস্বাভাবিক।

বুর্জোয়া সাহিত্যের ডেকাডেন্স আজ এমন স্তরে পৌছেচে যেখানে সনাতনী সাহিত্যিক সাহিত্যের সনাতন নীতির বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করেন, অর্থাৎ নিজে যে-ডালে বসে আছেন তাতেই কুঠারাঘাত করতে থাকেন। 'বুদ্ধিভ্রংশ তারি ঘটে, সর্বনাশ ভবিতব্য যার'। তবু তাঁর সমুজ্জ্বল বুদ্ধি এই স্থূল যুক্তি ও ব্যবসাদারিকে স্বীকার করলে কেন? প্রথমত সাহিত্যে অনুভূতি ও প্রকাশের সম্বন্ধকে তিনি কমিউনিস্ট কবিতার পটভূমিতে বিচার করেন নি। সেটাই তাঁর প্রধান কর্তব্য ছিল। স্পষ্ট করে তিনি অবশ্য কমিউনিস্ট সাহিত্যের বা অ-কমিউনিস্ট সাহিত্যের সম্বন্ধে কোনো আলোচনায় অবতীর্ণ হন নি তা স্মরণীয়। 'কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের' জন্মকথা বলতে গিয়েও তিনি কমিউনিস্ট বা 'প্রগতি সাহিত্য ও শিল্পীসঙ্ঘ' কারও নামই করেন নি, শুধু জানিয়েছেন তখন নানাভাবে কংগ্রেস-বিরোধী প্রচার হচ্ছিল—তা যে হচ্ছিল তা এখনকার প্রত্যেকটি কংগ্রেসধ্বজী কাগজের তখনকার পাতা খুললেই দেখা যাবে। এই প্রচারের বিরুদ্ধে প্রচারে নামার দরকার ছিল। তিনি এই বলে সাহিত্যিক প্রচারের সমর্থন জানিয়েছেন; কারণ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এ-সত্য প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণের জন্য সাহিত্য সৃষ্টির অক্ষমতার দোষ সাহিত্যিকের, জনসাধারণের নয়, একথা অতুলবাবুও জানেন। তাই সাধারণকে পরোক্ষভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে সেই অক্ষমতা থেকে লেখকের মুক্তি নেই। সাহিত্যিক আজ কী প্রচার করতে বসেছেন? জনসাধারণের মুক্তির উপায়কে। যদি সেই প্রচারে তাঁর প্রাণের কোনো সাড়া না থাকে, তবেই তিনি 'অসাহিত্যিক' পর্যায়ে নেমে যাবার প্রয়োজন বোধ করেন। তাতে প্রচারের লক্ষ্যস্থল যারা, তাদের সম্মান হয় না, অপমান হয়। প্রচারও স্বভাবতই ব্যর্থ হয়। বানিয়ান-এর 'পিলগ্রিম্‌স্‌ প্রোগ্রেসে' কি তিনি অ-সাহিত্যিক হয়েছিলেন? খুব উগ্র এবং বহু তিরস্কৃত একটি এদেশের উদাহরণই নিচ্ছি—প্রচারাত্মক চেতনয় তীব্র ভাটিয়ালী সুরে এই 'জন-যুদ্ধের গান' কি ভাল্‌গার, অসাহিত্যিক?

ও কিষাণ, তোর ঘরে আগুন বাহিরে তুফান,
বিদেশী সরকার ঘরে, তুয়ারে জাপান রে,
কাস্তেটারে দিয়ো জোরে শান।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'জবাব চাই' কবিতাটি অনেকেই দেখেছেন। ব্রেথওয়েটে গুলিচালনার খবরের তুঘণ্টার মধ্যেই লেখা। এই কবিতায় কি জনসাধারণকে বর্বর মনে করে তাদের কাছে অসাহিত্যিক প্রচার চালানো হয়েছে? 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ' শ্রেণীনির্বিশেষে জনসাধারণের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেন। তাঁদের সৃষ্টি কি আর্ট হয় নি? প্রচার তাঁরা অবশ্যই করেছেন। পেটের ক্ষুধার সঙ্গে সঙ্গে যে সাংস্কৃতিক বুভুক্ষা জনসাধারণের মধ্যে আছে বলেই গ্রাম্য-কবি জীবনে প্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতা, সভ্যজীবনের কবিতা শোনার পরেই "রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে"র মতো কবিতা লিখতে পারেন, সেই বুভুক্ষাকে কি 'অসাহিত্যিক' প্রচারের দ্বারা আমরা মেটাব, না ব্যক্তিমনের একক বিরহমিলন লীলার প্রকাশের দ্বারা মেটাব?

আজকের সাহিত্যিক এই প্রশ্নের সদুত্তর দিন। কেবল রাজনীতি নয়, সাহিত্যিক দিক থেকে এই নতুন ধারাকে বিচার করুন। 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যচেতনা মনের সকল দিকের দ্বারকে উন্মুক্ত করে দেয়, বিশুদ্ধ সাহিত্যের নামে তা জীবনের সম্পূর্ণতাকে অস্বীকার করে না। চেতনার অখণ্ডতাকে গণ্ডীবদ্ধ বা water-tight compartment-এ ভাগ করে না।*

* পরিচয়, আষাঢ় ১৩৫৩, পৃ. ৭৯৩-৮০০। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক।

পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা উৎপাদন-যন্ত্রের (Tools of production) নামে পুরাতন প্রাগৈতিহাসিক যুগগুলির নামকরণ করেছেন—যেমন প্রস্তর-যুগ (Stone Age), ব্রোঞ্জ-যুগ (Bronze Age) লৌহ-যুগ (Iron Age ইত্যাদি। কিন্তু সংঘবদ্ধভাবে শ্রমকে নব নব সৃষ্টির পথে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করার পরিবর্তে যখন ঐতিহাসিক যুগে (প্রাগৈতিহাসিক যুগেই অবশ্য শ্রেণীসমাজের উদ্ভব হয়েছে) শ্রেণীবদ্ধভাবে শ্রমার্জিত সম্পদ শোষণের সুযোগ এলো, সমাজে শ্রেণী-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন থেকে আমরা প্রধান শ্রেণীর নামে যুগগুলির নামকরণ করেছি —যেমন 'ফিউডাল যুগ', 'বুর্জোয়া যুগ' ইত্যাদি। শ্রেণীযুগের এই নামের সঙ্গে বিবর্তনের (Evolution) ইতিহাসে প্রাক্-মানবিক যুগগুলির নামকরণের এক অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। ভূবিজ্ঞানীরা এই যুগগুলির নামকরণ করেছেন প্রধান জীবের নামানুসারে। প্রধান জীব (Dominant Life) বলতে কিন্তু বিবর্তনের মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠ জীব বুঝায় না, যে জীবের প্রভাব প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশী থাকে কোনো যুগে, সেই জীবকেই বুঝায়। যেমন 'ডিভোনিক' যুগে মৎস্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বেশী ছিল বলে এই যুগকে 'Age of Fishes' বলা হয়, মধ্যজীবক কালে স্থলে-জলে-শূন্যে সরীসৃপের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে একে 'Age of Reptiles' বলা হয়। বিবর্তনের সোপানগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রধান থেকে প্রধানের দিকে জীবের ক্রমবিকাশ হয় নি, প্রধান থেকে অপ্রধানের প্রাধান্যের দিকে হয়েছে। বিখ্যাত জীবাশ্মবিদ্ (Paleontologist) রিচার্ড সোয়ান লাল বলেছেন: "It is interesting to note that each wave of dominance arises out of what were humbler and less specialised forms. Dominant never produces dominant of the same lineage ···It is a 'replacement' not a succession".১ ··· মানুষের সমাজ ও শ্রেণীসভ্যতার ইতিহাসেও এই জৈবিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা

Fossils : By Richard Swan Lull (P-72)

যায় না। শ্রেণীসভ্যতার বিকাশও প্রধান (Dominant class) থেকে প্রধানের দিকে হয় নি, প্রধান থেকে অপ্রধানের প্রাধান্যের দিকে হয়েছে। ফিউডাল যুগের অপ্রধান বণিকদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো পরবর্তী 'বুর্জোয়া যুগে', আবার 'বুর্জোয়া যুগে'র অপ্রধান শ্রমজীবীরাই প্রধান হলো 'সমাজতান্ত্রিক যুগে' (সোভিয়েট ইউনিয়নে)। এই হলো প্রকৃতির নিয়ম, মানুষের ইতিহাসেরও নিয়ম। এককথায় একেই 'প্রগতির' মূলসূত্র বলা চলে। কিন্তু এ-আলোচনা থাক। যা বলছিলাম।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানদণ্ড নিয়ে যদি এ যুগের নামকরণ করতে হয় তাহলে বর্তমান যুগকে বলতে হয় 'সংকর ধাতু-যুগ' (Alloy Age)। সংকর ধাতু অবশ্য এ-যুগের আবিষ্কার নয়, বহুযুগ আগেকার আবিষ্কার। মানুষ যখন প্রথম আগুন জ্বালতে শিখল, তারপর চুল্লী তৈরী করতে তার খুব বেশী দেরী হলো না। চুল্লী তৈরী করে তাতে ধাতু গলিয়ে, সেই গলা ধাতু পাথরের ছাঁচে ঢেলে সে তার ইচ্ছামতো রূপ দিতে আরম্ভ করল। মানুষের প্রথম আবিষ্কৃত সংকর ধাতু হলো 'ব্রোঞ্জ'—তামা ও রাং-এর সংমিশ্রণ। তারপর সভ্যতার প্রগতি এই ধাতুর আবিষ্কারের জন্যই সম্ভব হয়েছে বলা চলে। একদিন যা ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে "ধাতুকলা" তাই আজ বহুযুগ পরে বহু মানুষের শ্রম, গবেষণা ও কর্মকুশলতার ফলে, হাজার গুণ উন্নত বৈজ্ঞানিক রীতির সাহায্যে 'ধাতুবিজ্ঞানে' পরিণত হয়েছে। বিশিষ্ট ভূবিজ্ঞানীরা বলেন যে, বর্তমান যুগে গত চল্লিশ বছরের মধ্যে যত রকমের ধাতু ও সংকর ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছে তা নাকি মানুষের সভ্যতার প্রথম যুগ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আবিষ্কারের চাইতে অনেক বেশী। আমরা কজনই বা জানি যে আমাদের এই বিরাট সভ্যতা, আমাদের এই জীবনের যাবতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি পর্যন্ত নির্ভর করছে ধাতু-বিজ্ঞানীর গবেষণার উপর, পদার্থবিদ ও রাসায়নিকের আবিষ্কারের উপর এবং লক্ষ লক্ষ সুদক্ষ শ্রমিকের কারিগরির উপর। জানি না, জানার কৌতূহলও নেই, কারণ আমরা সাহিত্যের ব্যাপারী, চারুকলার ব্যাপারী, কঠোর ধাতুবিদ্যা ও মণিক-বিদ্যার খবর রেখে আমরা কি করব? অথচ নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে, সে-সাহিত্য আধুনিক মনকে স্পর্শও করবে এবং তা 'প্রগতি সাহিত্য' বা 'যুগ সাহিত্যও' হবে।

আধুনিক শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক সুশিক্ষার অভাব

অত্যন্ত বেশী। এ-সম্বন্ধে আমি দু'জন বিজ্ঞানীর অভিমত এখানে উদ্ধৃত করছি। একজন জে. বি. এস্. হল্‌ডেন্, আর একজন এইচ. জে মুলার। দুজনেই বিশ্ব-বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী। মিঃ হল্‌ডেন্ বলেন যে বৈজ্ঞানিক প্রগতির প্রভাব সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে তেমনভাবে দেখা যায় না। একদিকে বিজ্ঞানের এই বৈপ্লবিক প্রগতি, আর একদিকে সাহিত্য ও শিল্পকলার শোচনীয় অবনতির কারণ কি? কারণ শিল্পীদের সুশিক্ষার অভাব—"I think that the blame for the decay of certain arts rests primarily on the defective ducation of the artists".১ যে উপাদান নিয়ে শিল্পী কাজ করবেন, তা তাঁর কাছে অপরিচিত। মুলর বলেন যে, সাহিত্য ও শিল্পকলার বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রভাব আজও তেমন সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় না। কিন্তু এমন দিন আসছে যখন সত্যিকার সাহিত্যিক কখনও তাঁর যুগের চিন্তাধারা ও জ্ঞানধারা থেকে দূরে থাকতে পারবেন না। যদি থাকেন তাহলে তিনি ধীরে ধীরে একজন ভেলকিবাজের স্তরে নেমে আসবেন, তাঁর সাহিত্যের কারদানি দেখে অজ্ঞদের মন আহ্লাদে ভরে উঠবে, আধুনিক মন আদৌ আকৃষ্ট হবে না। আজকের মানুষের সাহিত্যের চাহিদা কখনও অস্ট্রেলিয়ান অসভ্যদের ভুতুড়ে কাহিনীতে মিটতে পারে না। কিন্তু বর্তমান যুগের সাহিত্যিকদের এই বোধশক্তি একেবারেই নেই বলা চলে, পরিপার্শ্ব ও বহির্জগৎ সম্বন্ধেও তাঁরা একেবারেই উদাসীন। এ তাঁদের অশিক্ষা বা কুশিক্ষার ফল বলতে হবে।২

বিজ্ঞানীদের অভিমত হলেও, এ মত বিশেষভাবে প্রণিধেয়। বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক প্রগতির যুগে বাস করেও শিল্পী ও সাহিত্যিকরা মধ্যযুগের নিভৃত প্রাসাদকক্ষে নিশ্চিন্তে বসে আছেন। মধ্যযুগীয় সমাজ ও সংস্কার, শিক্ষা ও স্মৃতি, মানসপ্রতিমা, কল্পনা-রূপক-উপমা আজও তাঁদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে আছে।

১. Daedalus or Sicence and the Future : By J. B. S Haldane.
২. "The appalling paucity of concepts on the part of the average literary man of to-day, his blindness to the actual universe around him, is but one expression of the lack of education—or more properly of the miseducation……" (Out of the Night : By prof. H. J. Mullar, p 37)

আমাদের দেশের শিল্পকলায় ও সাহিত্যে এই সত্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে। হয় আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে বসে আধুনিক নাগরিক জীবন নিয়ে গল্প-উপন্যাস রচনা করেন, না-হয় নগরের ড্রয়িং রুমে বসে গ্রাম্য ও কথ্য ভাষা সম্বল করে গ্রাম্য জীবনের ছবি আঁকেন। জীবনের সঙ্গে জীবনের কোথাও নিবিড় যোগ নেই। আঙ্গিকের যতই কারিগরী তাঁরা দেখান না কেন তাঁদের রূপক-উপমা-ভাষা-ভঙ্গিমার মধ্যে মধ্যযুগের পলাতক মনটি ধরা পড়ে যায়। একে শুধু আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের অভ্যন্তরীণ বিরোধ বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ হলো প্রকাণ্ড ফাঁকি, ভয়াবহ অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও অনভিজ্ঞতার ফল। যাঁরা আধুনিক প্রগতিশীল ভাবধারা (যেমন সোশ্যালিজম্-কম্যুনিজম্) উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের হয়তো একেবারেই বাস্তব সামাজিক প্রগতির সঙ্গে সংস্পর্শ নেই। অর্থাৎ অনেকেরই বস্তুজগতের জ্ঞানের অভাব, কিন্তু ভাবজগতের জ্ঞান 'পাঠ্যপুস্তক' মারফৎ টনটনে। কামারের আদিম চুল্লী ও ভস্ত্রা থেকে আধুনিক ব্ল্যাস্ট-ফার্নেসের ইতিহাস অনেকেই জানেন না, অনেকেই এসব আজও হয়তো চোখেই দেখেন নি, অথচ ফিউডালিজম, ক্যাপিটালিজম্ ও সোশ্যালিজমের ডেফিনিশন তাঁদের কণ্ঠস্থ। সামান্য লেদ মেশিনের কাজের নমুনা তাঁরা হয়তো দেখেন নি, অথচ আধুনিক কারখানার শ্রমিকদের দুঃখদুর্দশার নাকীকান্না তাঁদের সাহিত্যে অহরহ কারখানার 'ভো'র মতো একঘেয়ে ধ্বনিত হচ্ছে। কোনো কয়লা খনির তলায় তাঁরা আজ পর্যন্ত নামেন নি, খনির কাজকর্মের ধারার সঙ্গে কোনো পরিচয় নেই, খনিমজুরদের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই, ভূ-বিজ্ঞানীর কাছে কয়লার 'রোমান্টিক' ইতিহাসও কোনোদিন শোনেননি, শুনবার আগ্রহও নেই, অথচ খনিমজুরদের নিয়ে 'প্রগতি-সাহিত্য' তাঁদের রচনা করতেই হবে। এই অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার অভাবের মধ্যে সমাজের অর্থনৈতিক কোনো বিরোধ নেই, আছে সমাজের সেই দুরারোগ্য ব্যাধি যার নাম "নিষ্ঠার অভাব", যার নাম "ফাঁকি"। বিজ্ঞানী হলডেন্ ও মুলর এই নিষ্ঠার অভাব, এই অশিক্ষা ও কুশিক্ষার কথা বলেছেন।

সাহিত্যের স্বরূপ

শুধু যে সাহিত্য-শিল্পকলার বিষয়বস্তু ও প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও আধুনিক বস্তুজগতের জ্ঞানের অভাব-প্রকট হয়ে ওঠে তা নয়, 'সাহিত্যের স্বরূপ'

নিয়ে আজও যেসব মধ্যযুগীয় তর্ক-বিতর্ক হয় তার মধ্যেও এই অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার প্রমাণ পাওরা যায়। আজও অনেকে 'মনোজগৎ'-কে 'বস্তুজগৎ' থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে একটা স্বতন্ত্র 'জগৎ' বলে প্রতিপন্ন করতে চান। 'বস্তুজগৎ'-থেকেই 'মনোজগতের' বিকাশ, এ-কথা তাঁরা কোনোমতেই মানতে চান না, এবং এই বিকৃত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের সাহিত্যে-শিল্পকলায় আজও প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এই ধারণা বা 'বিশ্বাস' ভুল প্রতিপন্ন করার জন্যে কোনো দার্শনিক যুক্তির অবতারণার প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় জ্ঞানের, শিক্ষার। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রগতির ধারার সঙ্গে আমাদের কোনো সংস্রব নেই বলেই আজও এইসব মধ্যযুগীয় 'সংস্কার' আমাদের মনের মধ্যে শিকড় গেড়ে রয়েছে। আধুনিক জীববিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান যে সেই পুরাতন রাজা-বাদশাহের আমলের নিরবলম্ব 'মনোজগৎ' ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়েছে, তার কোনো সংবাদই আমরা রাখি না। বস্তুজগতের রহস্যদ্বার একটির পর একটি উদ্‌ঘাটন করে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান আজ যতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে সেখানে এই বস্তু-নিরপেক্ষ 'মনোজগতের' কথা অসম্ভব ভৌতিক কাহিনী ভিন্ন আর কিছুই নয়। জৈবিক ক্রমবিকাশের মূলে আমরা দেখতে পাই জীবের শ্রম ও প্রকৃতি। প্রকৃতির ও জীবের দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও সংঘাতের ফলেই জীবের 'মানবত্ব' লাভ, এবং মানবের 'মানসত্ব' লাভ। তারপর যুগে যুগে মানুষের শ্রম (Labour) ও প্রকৃতির (Nature) সংঘাতের ফলেই "মানসের" (Mind আধিপত্য, স্বাধীন কর্মশক্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ সম্ভব হয়েছে। আজ তাই "মানস" (Mind) ও "মস্তিষ্ক"ই (Brain) মানুষের সমস্ত শক্তির উৎস, সভ্যতার ও সংস্কৃতির গিরিনির্ঝর।

কার্ল মার্ক্স তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের মধ্যে বলেছেন: "শ্রম হলো একটা কর্মধারা যার ভিতব দিয়ে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ ঘটে, যার ভিতর দিয়ে মানুষ তার নিজের সঙ্গে প্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাত শুরু করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষ নিজেকে নিযুক্ত করে। তার হাত-পা-মাথা, তার দেহের সমস্ত শক্তি এইভাবে নিযুক্ত হয় তার নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকৃতির উৎপাদিকা-শক্তির বিকাশের জন্যে। এইভাবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে মানুষ যেমন প্রকৃতি ও বহির্জগৎকে বদলায় তেমনি তার নিজের রূপ ও প্রকৃতিও বদলায়।" কার্ল মার্ক্সের এই কথা আধুনিক ভূবিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী,

শরীরবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীও সম্পূর্ণ সমর্থন করবেন। বিজ্ঞানীরা কি বলেন? মানুষের মতো এমন সুন্দরকান্তি, শক্তিমান, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান জীব হঠাৎ একদিন শূন্য থেকে মাটিতে পড়ে নি অথবা মাটি থেকে ফুঁড়ে ওঠে নি; এ্যামিবা থেকে স্তন্যপায়ী জীবের নানা শাখা ধরে আধুনিক বুদ্ধিমান মানুষের বিকাশ পর্যন্ত ইতিহাস এক-আধদিনের নয়, কোটি কোটি বছরের। বানর ও বানরেতর জীবকে ঋজুদেহ, দ্বিপদী 'আধুনিক মানুষ' হয়ে উঠতে লক্ষ লক্ষ বছর প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়েছে। এই সংগ্রামের ফলে 'হাতের' (Hands) মুক্তি একটা যুগান্তরী ঘটনা। যে-হাত আজ শ্রমের ও শিল্পকলার 'স্রষ্টা', সেই হাত শ্রমের 'সৃষ্টি'ও বটে। হাতের মুক্তির পর, হাতের শক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্যও বাড়তে থাকে। সংঘবদ্ধ জীবন ও পরস্পর সহযোগিতার অনুভূতি আসে। ভাবপ্রকাশের অদম্য ইচ্ছা জাগে। তারপর দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায়, স্বরযন্ত্রের (Larynx) কতো উন্নতি ও পরিবর্তনের পর একদিন 'ভাষা' হলো ভাবের বাহন, এবং সুরময় সঙ্গীত ঝংকৃত হয়ে উঠলো সমবেত কণ্ঠে। তাইতো সুরময় সঙ্গীত ও দেহ-ভঙ্গিমাময় নৃত্যই হলো মানুষের আদিতম শিল্পকলা। তারপর চিত্রকলা এবং তার অনেক পরে 'সাহিত্য'। 'নৃত্য-সঙ্গীত-চিত্রকলার' কাছে 'সাহিত্য'কে শিশু বলা চলে।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রথমে 'শ্রম', তারপর 'ভাষা', এবং এই শ্রম ও ভাষার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় মানবেতর জীবের যান্ত্রিক মস্তিষ্ক আধুনিক মানুষের 'ব্রেনে' পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের বিকাশের ফলে মানুষের গুরুমস্তিষ্ক (Cerebrum) পরিপুষ্ট হয়েছে। গুরুমস্তিষ্কের অর্ধাংশ দুটি কতকগুলি গভীর খাঁজের মতো পিণ্ডে ভাগ হয়ে গিয়েছে। এই বিভাগগুলির কোনোটি শ্রুতিকেন্দ্র, কোনোটি স্বাদকেন্দ্র, দৃষ্টিকেন্দ্র, ঘ্রাণকেন্দ্র, কোনোটি অনুভূতি-কেন্দ্র, মনন চিন্তন ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার কেন্দ্র। শরীর-বিজ্ঞানীরা তাই বলেন যে, জীবন (Life) ও চেতনার (Consciousness) বিকাশ 'যুগপৎ' হয় নি। স্টার্লিং বলেন: "জীবনের সঙ্গে চেতনা যে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত, এ-কথা বলার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। অতি উন্নত কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে চেতনার গভীরতা ও ব্যাপকতা নির্ভর করে এই

কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রেরই জটিলতর ও পূর্ণতর বিকাশের উপর।"১ আধুনিক যুগের অন্যতম শরীরবিজ্ঞানী প্যাভ্‌লভ বলেন, ২ কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের ক্রমবিকাশের মোটামুটি তিনটি স্তর বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। প্রাথমিক স্তরে দেখা যায় মস্তিষ্ক-পাদস্থ গ্যাংলিয়নগুলি, যেটা হলো সাহজিক বৃত্তিকেন্দ্র (Unconditioned Reflexes)। এই কেন্দ্রের সাহায্যে প্রত্যেক জীব তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। এই খাপ-খাওয়ানোর শক্তি খুব সামান্য, শুধু আত্মরক্ষা ও যৌনবৃত্তি-নিবৃত্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই প্রাথমিক স্তরের উপর দ্বিতীয় স্তর, 'Conditioned Reflexes'-এর কেন্দ্র। এই কেন্দ্র বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে মানুষের খাপ-খাওয়ানোর শক্তি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফলে, ভাবের আদান-প্রদান ও উৎপাদন-যন্ত্রের ক্রমোন্নতির ফলে মানুষের মস্তিষ্কের এমন আর একটি তৃতীয় কেন্দ্রের বিকাশ সম্ভব হয়েছে যার সাহায্যে মানুষ সমন্বয়-সাধনের (synthesise) শক্তি অর্জন করেছে। এ-শক্তি আর অন্য কোনো জীবের নেই। প্যাভ্‌লভ একেই বলেছেন মানুষের 'capacity of abstraction' বা রূপায়ণ-শক্তি। ব্যবহারবাদী মনোবিজ্ঞানীদের (Behaviourists) সঙ্গে প্যাভ্‌লভের পার্থক্য এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। ব্যবহারবাদীরা বলেন, চিন্তা 'নীরব ভাষা' '(dumb speech)' ভিন্ন আর কিছুই নয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মতো চিন্তাও একটি 'ব্যবহার' বিশেষ। প্যাভলভ এই যান্ত্রিক মতবাদ স্বীকার করেন না। মানস ও চেতনার স্বাধীন স্বভাবধর্ম প্যাভলভ স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র ও মস্তিষ্কের জটিল বিকাশের জন্য (যে বিকাশ ভাবের আদান-প্রদান ও উৎপাদন যন্ত্রের ক্রমোন্নতির ফলেই সম্ভব হয়েছে) এই স্বাধীনতা লাভ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে 'মানস' বস্তু-নিরপেক্ষ,

১. "That it (চেতনা) is a necessary accompaniment of life is certainly not the case. Consciousness is in fac connected with the possession of a highly developed central nervous system, and its degree is in proportion to the complexity and activity of this system" (Sterling's Principles of Human Physiology—7th Edition—p.7)

২. Povlov and His School: By prof. Y. P, Frolov, (p76–82—'Pavlov's latest theory of Two System in the Cerebral Cortex' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য)

আধিভৌতিক কিছু। আধুনিক বিজ্ঞানের এই সূত্র ধরে আমরা 'মানসের' স্বরূপ কতকতটা এইভাবে নির্ধারণ করতে চেষ্টা করব : মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ কোটি কোটি সেল দিয়ে গঠিত। এইসব সেলের তাড়িত-তরঙ্গের আঘাতে মস্তিষ্কের মনন-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই তাড়িত-তরঙ্গের সম্মিলিত শক্তিকেই আমরা 'মানস' বলতে পারি।১ সেইজন্যে মার্ক্সবাদীরা, যাঁরা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী, তাঁরা মন-কে বস্তুবাদীও বলেন না, মনের স্বাধীনতাও অস্বীকার করেন না। চিন্তাশক্তি ও মননশক্তির স্বাধীনতা বিজ্ঞানীদের মতো মার্ক্সবাদীরাও স্বীকার করেন। কিন্তু মনোজগৎ ও বস্তুজগৎ যে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অথবা 'মনোজগৎ' কোনো ইন্দ্রিয়াতীত ঊর্ধ্বলোকে অবস্থিত, এ কথা কোনো মার্ক্সবাদী স্বীকার করবেন না, করার কোনো বৈজ্ঞানিক কারণও নেই। মনোজগতের রূপ যদি এই হয় তাহলে 'সাহিত্যের স্বরূপ' নিয়ে অনর্থক ভাববাদী-বস্তুবাদী বিতর্কের অবসর নেই।

আধুনিক সাহিত্য

সাহিত্য ও শিল্পকলার 'মূল' পর্যন্ত আলোচনা করা হলো দুদিক দিয়েই। একদিক হলো বিজ্ঞানের বাস্তব প্রগতির দিক, সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার দিক, আর একদিক, বিজ্ঞানের জীবন-দর্শনের দিক। একদিকে আমরা দেখলাম, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বাস্তব প্রগতি সম্বন্ধে আধুনিক শিল্পী সাহিত্যিকদের কোনো অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নেই বলে সাহিত্যের উপাদান ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে আমরা আজও মধ্যযুগীয় 'ম্যাট্রিক্স' ভেঙে ফেলে নতুন কোনো 'ম্যাট্রিক্স' গড়তে পারি নি। অবশ্য পুরনো 'কাঠামো' ভেঙে ফেলার কোনো উল্লেখ্যযোগ্য প্রচেষ্টা আধুনিক

১. "We find that various different sections of the human cerebral cortex, each of them composed of many millions of cells, are giving rhythmical electric discharges which involve simultaneous electrical activity of many of these cells,...mind, considered as a thing (or the physical fact which determines the existence of mind) consists of the resonance-energy of these simultaneous discharges of living cells" The Marxist Philosophy and the Science : By J. B. S. Haldane-pp.143-44

কালে হয় নি যে তা নয়। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আধুনিক 'Art form' উপন্যাসের কথাই উল্লেখ করা যাক্। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এ-যুগের দুজন ঔপন্যাসিকের নাম করতে হয়—প্রুস্ত ও জয়েস। এঁদেরই প্রদর্শিত পথ ধরে নানাদিকে এগিয়ে গিয়েছেন ভার্জিনিয়া উলফ, হাক্সলি, ইশারউড, গ্রীন, রেক্স, ওয়ার্নার, জিদ্, হেমিংওয়ে, ডস্ প্যাসস্ প্রমুখ সাহিত্যিকরা। কিন্তু এখনও কেউ শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেন নি। প্রুস্ত-জয়েস প্রদর্শিত পথের খানা-ডোবাগুলি ভরাট করে, আগাছাগুলি ছাঁটাই ক'রে, কেউ একটা আধুনিক কালোপযোগী নিটোল 'আঙ্গিক' গড়ে তুলতে পারেন নি। অনেকে ইতিমধ্যে অন্ধকারে বিপথে ঘুরপাক্ খেতে আরম্ভ করেছেন, কেউ কেউ পিছুও হটছেন। ফ্লোবের বলেছিলেন যে, 'নভেলের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 'নভেলটি'। এতবড় খাঁটি কথা বোধহয় আর কেউ বলেন নি। কিন্তু একথা এযুগের খুব কম সাহিত্যিকই উপলব্ধি করেছেন, আর যাঁরা করেছেন তাঁদের অনেকেই 'নভেল্‌টির' প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন। এ সম্বন্ধে একজন আধুনিক সমালোচকের মন্তব্য আমি বিশেষভাবে প্রণিধেয় বলে মনে করি। তিনি বলেছেন :"...the novel cannot live without perpetual pioneering, and in recent years the novelist's nerve has either given way or else has been insufficiently fortified. Here 'technique' is the miner's drill, and it is a peculiarity of this mine that 'new tools' are required for every new seam. The technical problem has never been more acute, but unless every novelist is prepared to attempt his own solution no further progress can be made"[১] ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সংকট যেমন দেখা দিয়েছে, আমাদের বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তেমনি। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ও ঔপন্যাসিকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কিন্তু সকলেই প্রায় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের 'ম্যাট্রিক্সের' মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন। দু-একজন পুরনো 'কাঠামো'তে নতুন 'উপাদান' দিয়ে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছেন, যদিও এ-চেষ্টা হাস্যকর। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে

১. New Writing and Daylight (Winter 1943-44)—Philip Toynbee-র "The Decline and Future of the English Novel" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দু'একজন ঔপন্যাসিক বলিষ্ঠ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় গোপাল হালদার ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। অন্নদাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও করা যায়, কিন্তু তাঁরা অতর্কিতে কয়েক পা এগিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছেন। গোপাল হালদার ও ধূর্জটিপ্রসাদের 'পরিণতি' সম্বন্ধে অনেকেই নিশ্চয়ই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবেন। 'উপন্যাস' হিসেবে তাঁদের রচনা কতটা সার্থক হয়েছে তা বিচার করার ক্ষেত্র এটা নয়। তবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, নতুন উপন্যাসের জন্যে যে 'new tools' প্রয়োজন, এ-নির্দেশ তাঁরা স্পষ্টভাবেই দিয়েছেন।

সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে এই 'new tools'-এর দৈন্যের প্রধান কারণ বাস্তব জগতের 'new tools of production' সম্বন্ধে শোচনীয় জ্ঞানের অভাব, অর্থাৎ বিজ্ঞানের বাস্তব প্রগতি (Material progress) সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের, বিশেষ করে উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ হলো 'detail, detail, detail' এবং একথাও ঠিক যে "neglect of detail is a far more ruinous and a far commoner) fault than too fastidious an attention to it" ১. কিন্তু শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ড যদি শূন্য থাকে তাহলে 'detail' আসবে কোথা থেকে, এলেও যে তা প্রাণান্তকর হয়ে উঠবে। এই গেল 'আঙ্গিক' বা 'tools'-এর দিক। আর আঙ্গিক সম্বন্ধে সজাগ থেকেও অনেকের মধ্যে যে বিকৃত জীবনদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়, যে ব্যাধিগ্রস্ত দৃষ্টিভঙ্গী পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে, তারও একমাত্র কারণ হলো আধুনিক বিজ্ঞানের জীবনদর্শন (Ideological progress) বা সমাজ-দর্শন সম্বন্ধে অজ্ঞতা। আধুনিক সাহিত্যের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ তখনই একমাত্র সম্ভব হবে যখন আধুনিক বিজ্ঞানের বাস্তব (Technical) ও দার্শনিক (Ideological) প্রগতি সম্বন্ধে সাহিত্যিকদের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য কেটে যাবে। তার আগে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে বাধা নেই, এবং সে পরীক্ষা দুঃসাহসিক হলেও ক্ষতি নেই। গতানুগতিকতা ও জড়তার চেয়ে নতুনের পথে দুঃসাহসিক অভিযান অনেক ভালো। কারণ 'জীবনের ধর্ম' তাই, এবং 'সাহিত্যের ধর্মও' তাই হওয়া উচিত।*

১ পূর্বোক্ত প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

* পরিচয়, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৫৩, পৃ. ১৯৭-২০৪। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজনমতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

আধুনিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য / বিষ্ণুকুমার মুখোপাধ্যায়

'পরিচয়' সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

শারদীয় সংখ্যা 'পরিচয়'-এ 'আধুনিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য' নামে প্রবন্ধের লেখক তাঁর প্রবন্ধের যে বিরাট প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন তা শেষ পর্যন্ত উপন্যাসে টেকনিকের সংকট সম্পর্কে কতকগুলি অসতর্ক মন্তব্যে পর্যবসিত হয়েছে। উপন্যাসে টেকনিকের সংকট সম্পর্কে তিনি যে বিশ্লেষণ ও সমাধান দিয়েছেন তা মোটামুটি দেওয়া হলো।

"····· ইয়োরোপীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে·· যেমন ···· তেমনি · আমাদের বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রেও কেউ একটা আধুনিক কালোপযোগী নিটোল আঙ্গিক গড়ে তুলতে পারেন নি।" এই সংকট দেখা দিয়েছে। কেন সংকট? "····· বিজ্ঞানের বাস্তব প্রগতি (technical advance) সম্বন্ধে আধুনিক শিল্পী-সাহিত্যিকদের কোনো অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নেই বলে।" কেন ঘটল এই জ্ঞানের অভাব? "·· এ হলো প্রকাণ্ড ফাঁকি, ভয়াবহ অশিক্ষা-কুশিক্ষার ফল।" সমাধান আছে—new tools! "·· এই new tools-এর দৈন্যের প্রধান কারণ বাস্তব জগতে 'new tools of production' সম্বন্ধে শোচনীয় জ্ঞানের অভাব"—সেই অভাব ঘুচলেই আসবে সেই new tools!

উপন্যাসে new tools সম্পর্কে তাঁর ধারণাটা new tools of production-এর সঙ্গে এমন একটা যান্ত্রিক ঐক্যে বন্দী হয়ে গেছে যে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে, বিজ্ঞানের জীবনদর্শনের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের new tools-এর প্রশ্নটি যে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে তা তিনি দেখতে পান নি। কারণ হলো তাঁর যান্ত্রিক চিন্তার ফল। সবেমাত্র আত্মসচেতন হয়ে উঠছেন আমাদের নতুন সাহিত্যিক, আমাদের নতুন সাহিত্য, আমাদের নতুন সমালোচক। এ তারই এক অবশ্যম্ভাবী পর্যায়।

প্রবন্ধ লেখক তাই সমাজের ওপর, মানুষের ওপর বিজ্ঞানের প্রভাব বা সে

প্রভাবের অভাবটাকে দেখেছেন সংকীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সম্পর্কের যে একটা ইতিহাস আছে তা না দেখেই তিনি শিল্পী-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন এবং সংকটের সমাধানকল্পে নেহাত্ যান্ত্রিক ফতোয়া প্রচার করেছেন।

কার্যক্ষেত্রে যে ভাবধারা প্রাধান্য লাভ করে সংস্কৃতি তার থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। তা থাকলে যে সংস্কৃতি বাক্ সবর্বস্ব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বর্তমানের উন্নত বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে সাহিত্যক্ষেত্রকে আজ একরকম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নই বলা যেতে পারে। কিন্তু এ চলতে পারে না। আবার, বিজ্ঞান ও সাধারণ ঐক্য আপনা থেকেই ঘটবে না। তার জন্যে বিজ্ঞানশিক্ষার (বিজ্ঞানেরই) কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ-পরিবর্তন চাই। এ-কথা বলেছেন বৈজ্ঞানিক জে. ডি. বর্ণাল।

বিশেষ করে আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার (বিজ্ঞানের) অবস্থা, প্রসার ও প্রচারের পথে যে বিরাট বাধা তার ফলে দেশের সাধারণ সংস্কৃতিজীবনে, শিল্পে, সাহিত্যে বিজ্ঞানের প্রভাব পড়া খুবই শক্ত মৌলিক পরিবর্তন না ঘটলে কোনো ব্যাপক ও সুস্পষ্ট ফল পাওয়া যাবে না। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিচ্ছেদ কী করে ঘটল তার কিছু আলোচনা করলেই কথাটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

'আদিম সমাজের শিল্পীর সৃষ্টিতে শ্রমের রীতিপদ্ধতি প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হতো; কারণ, তার সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ। শ্রেণীবিভাগের ফলে শিল্পী শ্রমের রীতি ও পদ্ধতি থেকে ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল। ধনতন্ত্রের যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তনের ফলে সেই বিচ্ছেদ ষোলকলা পূর্ণ হলো—কায়িক ও মানসিক শ্রম ও বৃত্তির চরম বিচ্ছেদ, এমন কি বিরোধ দেখা দিল। সেই অবস্থার মাঝে ক্রমে নানা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়, সাহিত্য ও বিজ্ঞানক্ষেত্রে নানা অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও ব্যবস্থা প্রচলিত হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এমন বিশাল যে, সর্বক্ষেত্রে কোনো মোটামুটি ধারণা দূরের কথা, সামান্যতম অংশেরও অতি সাধারণ জ্ঞান সংগ্রহ করাই দুরূহ—এই রকমের একটা কথা বেশ প্রচলিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরাও অনেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রের বাইরেকার অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার প্রয়োজন বোধ করেন না। জ্ঞানবিজ্ঞানেরও যে একটা বিজ্ঞান আছে এই উপলব্ধির অভাবই এই সংকীর্ণতার প্রধান কারণ। তার ফলে ব্যাপক সমাজদৃষ্টির অভাব ঘটে।

আর জনসাধারণের বোধগম্য করবার জন্যে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও প্রচারব্যবস্থার অভাবের ফলেই সাধারণ মানুষের জ্ঞানের অভাব ও জ্ঞানের সংকীর্ণতার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণ দুটি আবার সমগ্র সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। প্রধানত এই দুটি কারণেই বিজ্ঞান ও জন-সংস্কৃতি এবং ক্রমে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিচ্ছেদ ঘটেছে। একদিকে কোনো কোনো শিল্পী, সাহিত্যিক তাদের বিজ্ঞানের জ্ঞানের অভাবের বড়াই করে এক বিশ্রী আত্মসন্তুষ্টি নিয়ে রয়েছেন; অপর দিকে বহু বিজ্ঞানীও এক অদ্ভুত "দার্শনিক" ভাব নিয়ে বলছেন: সাহিত্য আমি বুঝি না!

সমাজের প্রকৃতি ও গতি বিশ্লেষণ ও নিরূপণের পদ্ধতিও যে অন্যান্য সঠিক (exact) বিজ্ঞানের মতো সমান মর্যাদা দাবী করতে পারে এই স্বীকৃতি এবং কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ না ঘটলে—যুক্তিসংগত দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপক প্রসার না হলে—এবং এমনি করে বিজ্ঞানের গড়া পৃথিবীর রূপ সমগ্র সংস্কৃতির অঙ্গীভূত না হলে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিচ্ছেদ ঘুচবে না। সে প্রশ্নটিকে এড়িয়ে প্রস্তর যুগ থেকে 'সংকর ধাতু-যুগ' পর্যন্ত এবং এ্যামিবা থেকে রূপায়ণ-শক্তিসম্পন্ন মানুষ পর্যন্ত পাইকারী ফিরিস্তি দিলেই "সাহিত্য ও শিল্পকলার 'মূল' পর্যন্ত" আলোচনা করা হয় না, "বিজ্ঞানের জীবনদর্শনের দিক"ও দেখানো হয় না।

তাই, কেবল যন্ত্র আর মানুষের স্থূল, বাহ্যিক, যান্ত্রিক সম্পর্কটাকেই তিনি দেখিয়েছেন আর তা-ও নেহাত বিচ্ছিন্নভাবে, তাই তিনি ভেবেছেন, ব্লাস্ট ফার্নেস আর ভস্ত্রা ইত্যাদি নতুন-পুরনো tools of production সম্পর্কে একটু জেনেশুনে নিলেই আর "কয়লার রোম্যান্টিক ইতিহাস" জাতীয় কতগুলি হঠাৎ-চমক লাগানো চালাকি জানা থাকলে সাহিত্যে বিজ্ঞানের প্রভাব এসে যাবে, আর "আধুনিক কালোপযোগী নিটোল আঙ্গিক" গড়ে উঠবে। আসলে এর ফলে টেকনিক সম্পর্কে বিকৃত ধারণাই সৃষ্টি হয়। কোনো শ্রমিকের জীবন অবলম্বনে রচিত গল্পে বা উপন্যাসে সেই শ্রমিকটির বিশেষ শ্রমশিল্পের ইতিহাস আর তার নানা হাতিয়ার ও কাঁচামালের রূপ ও রকম বর্ণনা করে শ্রমিকটিকে সে বইয়ের মাঝে বসিয়ে দিতে পারলেই বুঝি বিজ্ঞান-প্রভাবিত সাহিত্য সৃষ্টি করা গেল। কিন্তু একেই তো বলা হয় 'ডক্যুমেণ্টারি ন্যাচুরালিজম'। শুধু যে নিদারুণ ভাগ্য-বিড়ম্বনার মাঝে মানুষ পড়েছে, এমনি করে তারই এক রোমাণ্টিক চিত্র ফুটিয়ে তোলা যায় মাত্র। আর তার পরিণতি হয় হতাশার মাঝে; তা

মানুষকে ভয়াবহ নিষ্ক্রিয়তার অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়। ঠিক এই জিনিসটিকে কাটিয়ে উঠতে হবে। ভাগ্যের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে মানুষের সংগ্রামকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। মানুষের জীবন-নাট্যের গতিটিকে ধরতে হবে সাহিত্যের মাঝে। তবেই সাহিত্যে 'সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম' অর্থাৎ বিজ্ঞানের কালোপযোগী ধারা সৃষ্টি হবে। যন্ত্র আজ প্রতিমুহূর্তে মানুষকে যান্ত্রিক করে তুলবার চেষ্টা করছে। আবার মানুষও প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করছে আজকের যন্ত্রপ্রভুকে পদানত করে তাকে মানুষের অনুগত দাসে পরিণত করার জন্যে। সেই মানুষের জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে হলে যন্ত্রের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও আসবে। তার জন্যে tools of production সম্পর্কে জ্ঞানও চাই; কিন্তু মনে রাখা দরকার, সেই জ্ঞানই সাহিত্যে বিজ্ঞানের প্রভাব আনবে না। তার আগে, কিংবা হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের মানুষকে—সামাজিক মানুষ, ঐতিহ্যের মাঝে গড়ে-ওঠা মানুষ, অশিক্ষা-কুশিক্ষার মাঝে বেড়ে-ওঠা মানুষ, ব্যাধিগ্রস্ত সমাজে মানুষ-হওয়া মানুষ—মানবিক মানুষ হিসাবে দেখতে শিখতে হবে। একটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের অংশ বিশেষের জ্ঞান থাকাটাই সাহিত্যিকের পক্ষে যথেষ্ট নয়—সাহিত্যিকের চাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীর কথা একবারও না বলে প্রবন্ধলেখক শুধুই 'অ্যাকাডেমিক' অর্থে সাহিত্যিকদের "বৈজ্ঞানিক সুশিক্ষার অভাবের" কথা বলেছেন।

সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে মানুষের বাস্তব জীবনে বিরাট পরিবর্তন ঘটে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেও পরিবর্তন আসে, মানুষের মনোবৃত্তিরও পরিবর্তন ঘটে। শিল্পে-সাহিত্যে সে পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় শিল্পী-সাহিত্যিকের রাজনৈতিক মতবাদ বা কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের অভাবের ভেতর দিয়ে এবং তাদের ন্যায্য-নীতি-বোধের ভেতর দিয়ে। তেমনি মানুষ ও বহিঃপ্রকৃতি এবং মানুষ ও সামাজিক পরিবেশের সম্পর্কও বদলায়। শিল্পে-সাহিত্যে সে-সম্পর্কের প্রতিফলন কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে—সমসাময়িক বিজ্ঞানের প্রগতির পর্যায়, শিল্পী-সাহিত্যিকের নিজস্ব জ্ঞানের পরিধি, শিল্পী-সাহিত্যিকের দার্শনিক ও ধর্মমত।

সে-সব দিক বিবেচনা না করে শিল্পী-সাহিত্যিকদের কিছু ভস্ত্রা আর ব্ল্যাস্ট ফার্নেসের জ্ঞান দিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না। সেই বিচ্ছেদ ঘুচাতেই হবে। কিন্তু ফাঁকি দিয়ে, কোনো 'মেড-ইজি' পড়া বিদ্যায় এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হওয়া যাবে না। সুখের বিষয়, সে-বিচ্ছেদ ঘুচাবার কাজে খুবই নিষ্ঠা নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন আমাদের কোনো কোনো গল্প-লেখক, ঔপন্যাসিক, কবি ও অন্যান্য ক্ষেত্রের কোনো কোনো শিল্পীও। যে-জীবন, যে-সংগ্রামের রূপ তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুলছেন, সেই জীবনে, সেই সংগ্রামে তাঁরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন। শ্রম ও শ্রমিক সম্পর্কে আমাদের এই নতুন শিল্পী-সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গীও নতুন। সেই পুরনো বন্দী-ক্রীতদাস যন্ত্রামানুষ আর নয়, সে মরেছে। এ এক নতুন জীবনদর্শন—সমাজ, বন্ধুবান্ধব, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, শিশু, শিল্প এ সব কিছুর সম্পর্কে এ এক নতুন দৃষ্টি; আর শিল্প নিজেও সেই নতুন জীবন গড়বার সংগ্রামের সৈনিক। যুগোপযোগী নতুন সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করবেনই। তার প্রাথমিক ক্রটি অসম্পূর্ণতার অসন্তোষই তাঁকে এগিয়ে দেবে ব্যাপকতার ক্ষেত্রে আরও সুন্দর সৃষ্টির পথে। এ দিকটাকে বাদ দিয়ে কেবল new tools of production-এর ওপর গড়ে-তোলা সাহিত্যিক new tools সম্ভবই নয়।

তাঁর প্রবন্ধে তাই new tools-এর রূপ-প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো নির্দেশ নেই, খুবই অস্পষ্ট ইঙ্গিত মাত্র আছে। অথচ 'উপন্যাস' হিসেবে তাঁদের রচনা কতটা সার্থক হয়েছে সে আলোচনা করলেন না বলতে গিয়ে উপন্যাস শব্দটিকে উর্ধ্বকমায় ঘিরে যেন সন্দেহই প্রকাশ করলেন। ফলে, কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্য বেরিয়ে এল না। তিনি আলোচনা করতে নারাজ; কেবল কতকগুলো সূত্র বলে দিয়েছেন।

নানা প্রতিকূল অবস্থার ভেতরও আমাদের যে-সব লেখক নানাভাবে চেষ্টা করছেন, তাঁদের সম্পর্কে অসহিষ্ণু হয়ে 'যান্ত্রিক' চাপ দিয়ে কোনো সুফল ফলবে না। সাহিত্যিকরা ফাঁকিবাজ, তাঁরা কিছু জানতে বুঝতে চান না—এই রকমের উষ্মা প্রকাশ করলে ক্ষতিই হবে। ফাঁকিবাজ সাহিত্যিকও নিশ্চয়ই আছেন; তথাকথিত নতুন আবিষ্কার চটক লাগিয়ে তাঁরা মাঝে মাঝে আসর জমাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সবাই ওই মহা-ফাঁকিমন্ত্র নিয়ে বেসাতি করেন না। শিল্পী সাহিত্যিকরা তো অতি-সামাজিক জীব নন—তাঁরাও এই সমাজেরই মানুষ। শিল্পে-সাহিত্যে বিজ্ঞানের প্রভাব যেমন যান্ত্রিকভাবে আসে না, এলে সাহিত্যের অনিষ্ট হয়; তেমনি অতি জটিল পথে হলেও মূল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি শিল্প-সাহিত্য ও শিল্পী-সাহিত্যিককে সে সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য না করে লেখক বলছেন, "এই অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার অভাবের মধ্যে সকলের অর্থনৈতিক কোনো বিরোধ নেই"।

এ কেবল "নিষ্ঠার" অভাব, সবই "ফাঁকি"! সাহিত্যিকরা যদি ব্যাপকভাবে তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টিতে এই ফাঁকিবাজি চালাতে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে যে তাঁদের সামাজিক অস্তিত্বের বিন্যাসটাই সমগ্রভাবে সেই ফাঁকিবাজির আশ্রয়। অথচ উক্ত প্রবন্ধের লেখক বলেছেন, এ ফাঁকি "আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের অভ্যন্তরীণ বিরোধ" নয়। সাহিত্যিককে তাঁর সামাজিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সমালোচক তাঁকে দেখছেন নিতান্ত আংশিক ও অসম্পূর্ণ এক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে।

"যাঁরা আধুনিক প্রগতিশীল ভাবধারা (যেমন, সোশ্যালিজম, কমুনিজম) উপলব্ধি করেছেন" বিশেষ দৃঢ় সেই সব লেখক সম্পর্কে প্রবন্ধকার উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। আধুনিক tools of production সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞানের অভাব ধরে নিয়ে তিনি বিদ্রূপে বিজ্ঞানের "কালোপযোগী" উপমা দিয়ে 'শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশা' তাঁদের 'নাকী কান্নাকে' 'কারখানার ভোঁ'র সঙ্গেই তুলনা করেছেন!

আমাদের যেসব লেখক সোশ্যালিজম্-কম্যুনিজমের ভাবধারা উপলব্ধি করেছেন তাঁদের রচনায় সেই উপলব্ধি যদি এতটুকুও ফুটে উঠে থাকে, সে কিছু কম হয় নি। আর অনেকে নিশ্চয়ই এই পত্রলেখকের সঙ্গে একমত হবেন যে, আমাদের কয়েকজন গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, কবির রচনায়ও প্রগতির ছাপ বেশ স্পষ্টই দেখা গেছে; তাঁরা অন্তত পলায়নপর নিষ্ক্রিয়তাধর্মী রোমান্টিক সাহিত্যের প্রচার কম-বেশি কাটিয়ে উঠেছেন, আজও হয়তো তাঁদের রচনায় মানুষ ও সমাজের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের চিত্র তেমন রসোত্তীর্ণ হয়ে বলিষ্ঠ রূপে ফুটে ওঠে নি। আজও হয়ত সেই সংগ্রামের ভেরী দিয়ে ভবিষ্যতের পথে মানুষ ও সমাজের ঊর্ধ্বগতি তেমনভাবে ফুটে ওঠে নি; কিন্তু তাঁরা যে নিষ্ক্রিয় সমালোচনার স্তর পেরিয়ে সক্রিয় আশাবাদের পথে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম্-এর ধারা অধিগত করবার পথেই অগ্রসর হয়েছেন, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। প্রবন্ধকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেছেন: "তিনি অতর্কিতে কয়েক পা অগ্রসর হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছেন"। সবই মাপা: "অতর্কিতে"..."কয়েক পা"! নিখুঁত বৈজ্ঞানিক ভাষায় এককথায় রায় দেওয়া হয়েছে! কিন্তু তাঁর এই রায় মেনে নেবার স্বপক্ষে তো কোনো যুক্তিই তিনি দেখান নি। আমরা তো দেখছি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের লেখায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর

প্রভাব ও প্রকাশ বেশ জোরালো হয়েই দেখা দিয়েছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবেই তাঁরা উপযুক্ত টেকনিকও আয়ত্ত করছেন। কিন্তু ওই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া এক নিরবলম্ব সকল বিষয়ের দাবী প্রশ্নটিকে বিপথে চালিত করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা বললেই প্রতিপন্ন হবে—এ আশা করা যায়। এখনও আমাদের এই লেখকরা হয়ত প্রচারধর্মী ও মেলোড্রামাটিক হবার ভয়ে সংগ্রামশীল ও সংগ্রাম-মুখী মানুষের পরিপূর্ণ চেহারাটিকে নিঃসঙ্কোচে অবলম্বন করে উঠতে পারছেন না, সমগ্রভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারছেন না। কিন্তু ইতিমধ্যেই তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও উপাদানের ওপর গাঢ় মনঃসংযোগের বহু উদাহরণ আমরা পেয়েছি। বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা নিখুঁত টেকনিকের জন্যে আরও বহু মালমশলা সংগ্রহ করবেন। মানুষের সংগ্রামে সক্রিয় অংশীদার হিসেবে তার সুযোগও বেড়ে গেছে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিককে তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব পূর্ণ করে তুলতে হবে শ্রমিক-জীবনের সার্থক পরিবেশটুকু সৃষ্টি করবার জন্যে রূপে-রসে-ধ্বনিতে সঠিক পরিস্থিতিটি বাস্তব করে তুলতে হলে কলকারখানার যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকাটা অপরিহার্য। মানুষ ও তার কর্মক্ষেত্রের দৈনন্দিন পারিপার্শ্বিক ও প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সম্পর্কে সাহিত্যিককে আরও সচেতন ও সতর্ক হতে হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু সমালোচনার ভেতর দিয়ে মানুষের ও সকলের ঊর্ধ্বগতি পথের নির্দেশটি তাঁদের রচনার চালনীশক্তি রূপে যত বেশি প্রাধান্যলাভ করবে ততই তাঁরা একরকম আপনার থেকেই এই সমস্ত বিষয়ে অধিকতর সচেতন ও সযত্ন হবার প্রয়োজন বোধ করবেন। কারণ তাঁরা, বিশেষ করে যাঁরা প্রগতিশীল ভাবধারা "উপলব্ধি" করেছেন তাঁরা, আসলে "ফাঁকিবাজ" নন। ইতিমধ্যে সমালোচকের কাজ হবে উপযুক্ত নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁদের সৃষ্টির যথার্থ মূল্য বিচার করা। *

* পরিচয়, পৌষ ১৩৫৩, পৃ. ৪৫১-৫৫। 'পরিচয়'-এর 'পাঠকগোষ্ঠী' বিভাগে উক্ত শিরোনামে পত্রখানি প্রকাশিত হয়। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক।

কবিতায় বক্তব্য / নীরেন্দ্রনাথ রায়

নিউটন সম্বন্ধে নানা প্রচলিত গল্পের মধ্যে একটি এই: 'প্যারাডাইস লস্ট' আগাগোড়া শোনার পর তিনি নাকি প্রশ্ন করিয়াছিলেন—এতে শেষ পর্যন্ত কি প্রমাণ হলো? (আফটার অল, হোয়াট ডাজ ইট প্রুভ?)

যুগপ্রবর্তক বৈজ্ঞানিকের এই সাহিত্যিক মূঢ়তায় হয়ত হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য। সারা জীবন অঙ্ক কষিয়া কি তাঁহার ধারণা হইয়াছিল কোনো কিছু প্রমাণ করা ছাড়া মানুষের প্রতিভার করণীয় কিছু থাকিতে পারে না? গণিতের নিকট যে দাবী করা চলে, কবিতাকেও কি তাহাই মানিয়া চলিতে হইবে? প্রমাণ-অতিরিক্ত বক্তব্য থাকা কি বুদ্ধির অপব্যবহার?

কিন্তু নিউটনকে ব্যঙ্গ করিবার পূর্বে আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে নিউটন মিলটনের নিজের উক্তিকেই মানিয়া লইয়াছিলেন, মিলটনকে ওজন করিতেছিলেন কবির স্বনির্বাচিত তুলাদণ্ডে। এই মহাকাব্যের উদ্বোধন-অংশে কবি নিজেই বলিতেছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য প্রমাণ করা যে মানবের প্রতি ঈশ্বরের ব্যবহার সর্বদাই ন্যায়নিষ্ঠ। সুতরাং নিউটনের মনে গ্রন্থ পাঠান্তে যদি প্রশ্ন জাগে যে মহাকবি রাশি রাশি কথা জড় করিয়াও আসল কথাটি চাপিয়া গিয়াছেন, নিজের বক্তব্য প্রমাণ করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে এমন কি অপরাধ হয়? এবং অবৈজ্ঞানিক পাঠকও স্বীকার করিবেন, নিউটনের এ অভিযোগ একান্ত ভিত্তিহীন নয়।

তবে কি মিলটনের মহাকাব্য নিরর্থক সঙ্গতিহীন কথার বাঁধুনি? তার অবিসংবাদিত আকর্ষণ ও প্রভাবের কারণ কি শুধুই তার ছন্দের গাম্ভীর্য ও উপমার চমৎকারিত্ব? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই। কোনো মহাকাব্যই কেবল ছন্দ ও উপমার জোরে দাঁড়াইতে পারে না। দাঁড়াইবার জন্য চাই শক্ত মেরুদণ্ড, যাহাকে ছন্দ দেয় রক্তমাংসের আবরণ ও উপমা যোগায় নানা বিচিত্র আভরণ। সেই মেরুদণ্ড হইতেছে কবিতার ভিতর দিয়া কবির উপলব্ধিগত বক্তব্য। যে কবির জীবনে এমন কোনো উপলব্ধির অভাব আছে, যে

উপলব্ধি অন্যের কাছে প্রকাশের উপযোগী নয়, তাঁহার পক্ষে সার্থক কবি হইবার সম্ভাবনা সুদূর।

কবির প্রথম ও প্রধান কাজ আত্মপ্রকাশ। যিনি নিজের উপলব্ধিকে ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারেন, তাঁহার আন্তরিক উপলব্ধি যত বিরাট হউক না কেন, তিনি কবিত্বের দাবী করিতে পারেন না। তাহাতে 'কবিত্ব' শব্দের সংজ্ঞারই ব্যতিক্রম হয়। 'নীরব কবি' বা 'মিউট্ ইন্‌গ্লোরিয়াস মিলটন' স্বতো-বিরোধী প্রত্যয় বা মিথ্যা জল্পনা। কবি মাত্রেই প্রকাশধর্মী।

কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিলেই কিছু নিজেকে প্রকাশ করা যায় না। আত্মপ্রকাশ দক্ষতাসাপেক্ষ। এ দক্ষতা কবিকে অর্জন করিতে হয়। আপনাকে প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। এ প্রবৃত্তির মূলে আছে আদিম যুগ হইতে মানবগোষ্ঠীর যৌথ-জীবন। হাতিয়ার ও ভাষা,—এ দুয়ের উদ্ভব ও ব্যবহারের ফলেই মানুষ প্রাণীজগতের নূতন স্তরে পৌছাইল। যৌথ-জীবনের প্রভাবেই নৃত্য, গীত ও কবিতার উৎপত্তি।* কবিতার ভাষা তাই ছন্দোময়—যে ছন্দের তালে তালে অনেকের চিত্ত একই গতিতে নিয়ন্ত্রিত হয়। কবি তাই নিরবচ্ছিন্ন একক নহেন, তিনি অনেকের মধ্যে এক। কবিতার পূর্ণ ব্যঞ্জনা তাই ঘরের কোণে বসিয়ে মনে মনে একলা পড়ায় নয়। কবিতার পূর্ণ উপভোগ আবৃত্তিতে, যাহাতে কবি শ্রোতৃবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া আপন আবেগ সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পারেন। কিন্তু এ আবেগ সঞ্চার করা সম্ভব হয় না যদি কবি ও শ্রোতার ভিতর অনুরূপ উপলব্ধির সংযোগসূত্র বর্তমান না থাকে। ভাষা, ছন্দ ও অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে আপন অন্তর হইতে কবি যাহাকে রূপ দিয়া বাহিরে প্রকাশ করিলেন তাহা শ্রোতার বোধগম্য না হইলে কবির প্রয়াস ব্যর্থ হইল, কেননা যৌথজীবনে ছেদ ঘটিল। কবির প্রয়াস সেখানেই সার্থক যেখানে যৌথজীবনের অন্তরের কথাটি কবি তাঁহার নিজের অন্তরেই আবিষ্কার করেন ও স্বাভাবিক দক্ষতার সহিত অন্যের কাছে প্রকাশ করেন। যে শক্তির সহায়তায় কবি আপন অন্তরে যৌথজীবনে অন্তরের কথাটি ধরিতে পারেন, তাহাকে বলা যায় অনুপ্রেরণা, এবং অনুপ্রেরিত কবিই তাঁহার পাঠক বা শ্রোতৃবর্গকে

* এই প্রসঙ্গে অনুসন্ধিৎসা থাকিলে নিম্নলিখিত বইগুলি দ্রষ্টব্য: Christopher Caudwell—Illusion & Reality, George Thomson—Æschylus & Athens, Marxim & Poetry.

অনুপ্রেরিত করিয়া তুলিতে পারেন। মিলটন নিঃসন্দেহ অনুপ্রেরিত কবি। তবুও যে নিউটন তাঁহাকে বুঝিতে পারেন নাই তাহার কারণ তিনি মিলটনের আসল বক্তব্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। মিলটনের কাব্যোক্তিকে তিনি আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করিয়া সর্বদা সতর্ক ছিলেন কবি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করেন কি না। কিন্তু যে গভীর বক্তব্য কবি তাঁহার সমস্ত মহাকাব্যের ভিতর দিয়া ফোটাইয়া তুলিলেন তাহা বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়াইয়া গেল।

ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম প্রকাশ্য বৈপ্লবিক কবি মিলটন—ভাবে ভাষায় অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক। ইংলণ্ডের ইতিহাসের যে যুগে মিলটনের আবির্ভাব সে যুগে এক বিরাট বিপ্লব সে দেশে সংসাধিত হইতেছিল। নবোদ্ভূত বুর্জোয়া-শ্রেণী প্রাচীন ফিউডাল শৃঙ্খল বিচূর্ণ করিয়া পৃথিবীতে নূতন সামাজিক বিন্যাস রচনায় রত ছিল। ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজশক্তি প্রথম পর্বে এই বিপ্লবের সহায়ক হওয়ার পর শেষে প্রতিক্রিয়াপ্রবণ ভূস্বামীবর্গের সহিত মিতালী করিয়া বিপ্লবের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইল। ফলে ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধ ও রাজশক্তির সাময়িক অবসান। প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ ও ক্রমওয়েলের অভ্যুত্থান। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম প্রবল রাজশক্তি সংঘবদ্ধ জনতার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। কিন্তু বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রকৃতিই এই যে তাহা কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আর আগাইতে চাহে না। কেননা তখন বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থের সহিত তাহার পশ্চাদ্‌বর্তী নির্বিত্তশ্রেণীর স্বার্থের সংঘাত বাধে। বিপ্লবকে তাহার ন্যায়সঙ্গত পরিণতিতে পরিচালিত করিতে গেলে প্রয়োজন হয় বুর্জোয়াশ্রেণীর আপন অস্তিত্বের উচ্ছেদ। স্বভাবতই তাহারা ইহাতে ভয় পায়। তাই তখন রব উঠে বিপ্লব 'মাত্রা' ছাড়াইয়া যাইতেছে, তাহার প্রতিরোধ করিতে হইবে। ইতিহাসের যে বিধি অনুসারে বিপ্লবের রঙ্গমঞ্চে রোবস্‌পিয়ারের পর নেপোলিয়নের আগমন হয়, সেই বিধি অনুসারেই ক্রমওয়েলের পর আসিলেন জেনারেল মনক্ ও দ্বিতীয় চার্লস। প্রজাশক্তি পরাভূত হইয়া আবার রাজশক্তির আসন সুদৃঢ় করিল।

মিলটন এই বিপ্লবের দুই পর্বেরই জীবিত সাক্ষী। তিনি ছিলেন ক্রমওয়েলের সহকর্মী। জন্মাবধি আপন কবিত্বশক্তির প্রাচুর্য সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। তাই বলিয়া দেশে যখন রাজশক্তির বিরুদ্ধে জনশক্তির মুক্তির সংগ্রাম চলিয়াছে তখন জন্মগত কবিত্বের খাতিরে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে হইবে, এই অদ্ভুত উন্নাসিক ধারণা তাঁহার মস্তিষ্কে কখনও প্রবেশ

করে নাই। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে বিশ বছরের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ব্যর্থ হইল। বিপ্লবের শেষ পর্ব তাহার প্রথম পর্বের সমস্ত প্রতিশ্রুতির ব্যত্যয় করিয়া বসিল। পিউরিটান কবি মিলটন আবার আপন কোটরে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন মহাকাব্য রচনার বাসনায়। 'প্যারাডাইস লস্ট'-এ তাই ফুটিয়া উঠিয়াছে দরিদ্র নিপীড়িত পিউরিটান সমাজের দুর্ধর্ষ বিপ্লবী মনোবৃত্তি ও তাহার চরম আশাভঙ্গ। ধর্মভীরু মিলটনের রচনায় তাই দেখিতে পাওয়া যায় এই প্যারাডক্স, তাঁহার ঈশ্বরে পড়িয়াছে স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী স্টুয়ার্ট-রাজের প্রতিচ্ছায়া, ও তাঁহার শয়তান বিপ্লবী নেতৃত্বের সমস্ত বিভূতিতে বিভূষিত। 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর প্রকৃত বিষয়বস্তু তাই, বাইবেল-কথিত অপরাধে ঈডেন উদ্যান হইতে আদিম নরনারীর বিতাড়ন নহে, তাহা হইতেছে, সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের বিরুদ্ধে আদর্শ জননেতা শয়তানের বিদ্রোহ। শয়তানের অভ্রভেদী মহিমার অন্তিম অধোগতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে পিউরিটান সমাজের মুখপাত্র মহাকবির মনে বুর্জোয়া-বিপ্লবের অন্তহীন সম্ভাবনা ও তাহার আশাভঙ্গের মর্মভেদী বেদনা। এই বিদ্রোহ ও তাহার পরিণামের কাহিনী অমর অক্ষরে বর্ণনা করিতে পারায় মিলটনের প্রতিভা যুগে যুগে মুক্তিকামী মানবের নমস্য কীর্তি বলিয়া ঘোষিত হইতেছে।

বাংলার মিলটন মাইকেল, আধুনিক কবিদের আদি গুরু, বাংলা ভাষায় প্রথম বৈপ্লবিক কবি, ভাবে-ভাষায় অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক। বাংলার ইতিহাসের যে যুগে তাঁহার জন্ম তখন সে দেশেও এক প্রচণ্ড বিপ্লব সংসাধিত হইতেছিল। বাংলাদেশে ইংরাজ-রাজের পত্তন শুধু এক রাজশক্তির পরিবর্তে অন্য রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা নয়, সামাজিক বিন্যাসের এক পর্যায় হইতে নূতনতর পর্যায়ে অভিবর্তন, সমাজ-চেতনার নিম্নতর স্তর হইতে উন্নততর বিস্তৃততর স্তরে উদ্‌বর্তন। এই যুগে সামাজিক মূল্যজ্ঞানেরও রূপান্তর না ঘটিয়া পারে না। তাই মেকলের স্বপ্নলোকের "কালা ইংরাজ" মাইকেল বলিতে একটুও কুণ্ঠিত নহেন যে, রাম ও তাঁহার চেলাচামুণ্ডাদের তিনি ঘৃণা করেন। সমগ্র হিন্দু ঐতিহ্যের বিরোধিতায় তাঁহার সমস্ত সৃজনী-সহানুভূতি রাবণ ও ইন্দ্রজিতের দিকে, ভগবানের অবতার রাম বা তাঁহার পদাঙ্কগামী লক্ষ্মণের দিকে নহে। মূল্যজ্ঞানের এই যে বৈপরীত্য, ইহা কি কেবল বিজাতীয় ভাবাপন্ন কবির ব্যক্তিগত খাম-খেয়াল? তাহাই যদি হইবে তাহা হইলে সমস্ত শিক্ষিত বাঙালী পাঠক-সমাজ, এমন কি প্রাচীন-

পন্থী বিদ্যাসাগর বা ভূদেব পর্যন্ত, তাঁহার সৃষ্টিকে যুগান্তকারী কীর্তি বলিয়া গ্রহণ করিলেন কিরূপে ? জনসমাজের এই সমর্থনকে আপন অন্তরে উপলব্ধি না করিতে পারিলে মাইকেল কি সার্থক কবি হইতে পারিতেন ? কবির সহিত পাঠকের কোথায় ছিল সেই সামাজিক যোগসূত্র যাহার সুনিপুণ ব্যবহারে মাইকেল প্রাচীন ধ্যান-ধারণার উপর এই নির্মম বলাৎকার বাঙালীকে দিয়া সানন্দে স্বীকার করাইয়া লইলেন ?

ইংরাজ বণিক-রাজের অপ্রতিহত অগ্রগমনে বাংলায় ফিউডাল সমাজবিন্যাস বিধ্বস্ত হইতে বসিল, কিন্তু বিশ্বব্যাপী নূতন বুর্জোয়া-যুগের অন্তর্ভুক্ত হইতে চলিল। ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া বাংলা সাহিত্যে ঘটিল নবজন্ম। নূতন সাহিত্যের উপজীব্য আর দেবদেবীর লীলাখেলা বা কলহ-কোন্দল নহে, পার্থিব নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা। কবি তাই আঘাত করিতে লাগিলেন মানুষেরই অন্তরের দ্বারে দ্বারে তাহার ভাবসম্পদ আহরণের জন্য। 'মেঘনাদ বধ'-এ মাইকেলের সৃষ্ট চরিত্রাবলী তাই আর পৌরাণিক চরিত্র নহে, বিভিন্ন মানবীয় গুণের আধার। রাম কতখানি দেবতা, বা রাবণ কতখানি রাক্ষস এ বিচার আর চলে না ; তাহারা সকলেই দোষে-গুণে মানুষ, মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিয়াই তাহাদের বিচার করিতে হইবে—পাঠকের নিকট ইহাই ছিল মাইকেলের অন্তরের দাবী। এই মানদণ্ডের প্রয়োগে মাইকেলের চিত্ত রাম অপেক্ষা রাবণের দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছিল, তাহার কারণ, ইংরাজের অধীনে আমাদের পরাধীনতা। এ অধীনতাবোধ সে যুগে রাজনৈতিক প্রতিরোধের কর্মসূচীর ভিত্তিতে আন্দোলিত হইয়া না উঠিলেও বিজাতীয় প্রভুশক্তির সর্বগ্রাসী কবল হইতে জাতীয় আত্মার বৈশিষ্ট্যকে সংরক্ষিত করিবার সুস্পষ্ট প্রয়াস বিদ্যাসাগরের তালতলার চটিতে, ভূদেবের বলিষ্ঠ আচারনিষ্ঠায় ও রাজনারায়ণের সংস্কৃতি-দীপ্ত চরিত্রবত্তায়। মাইকেলের নোঙর-ছেঁড়া জীবনে এই তিনটি স্থিতধী মনস্বীর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অকৃত্রিম ও অপরিসীম। ইংরাজী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঔজ্জ্বল্যে যতই বিমুগ্ধ হউন না কেন, কোনো শিক্ষিত বাঙালী পরাধীনতাকে কখনও স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বরং ইংরাজী সাহিত্যে স্বাধীনতার বাণী আমাদের চিত্তে অনুরূপ প্রেরণা জাগাইয়া পরাধীনতা-বোধকে আরো দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে। ডিরোজিও-র চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব ও কবিপ্রতিভার প্রভাব তাঁহার শিষ্য-অনুশিষ্যগণের উপর মোটেই ব্যর্থ হয় নাই।

মাইকেলের সমকালে ও অব্যবহিত পরে হেম-নবীন-রঙ্গলালের কবিতায় যে স্বাধীনতার স্পৃহা স্থূল অথচ স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, মাইকেলে তাহার প্রকাশ পরোক্ষ। পরোক্ষ কিন্তু গভীরতর। রাম দেবতা হইতে পারেন, রাবণ রাক্ষস হইতে পারেন, তবু রাম অভিযানকারী। রাবণ স্বদেশ-রক্ষণশীল। মাইকেলের অন্তরস্থ জাতীয়তাবোধ তাই কিছুতেই রামের দিকে পক্ষপাত দেখাইতে পারে না। এই কারণেই একিলিস বা আগামেম্‌নোন অপেক্ষাও হেক্টর ও প্রায়াম তাঁহার প্রিয়তর ছিল, গ্রীক কবির অনভিপ্রেত হওয়া সত্ত্বেও। পুরাণে যাহা বলে বলুক, পরলোকে যাহা ঘটে ঘটুক, তবু মাইকেলের বিচারে. ইহলোকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, প্রমীলা, মন্দোদরী প্রভৃতি সকলেই রাম, সীতা, লক্ষ্মণ প্রভৃতি অপেক্ষা মহত্তর। বিভীষণ সে-হিসাবে দেশদ্রোহী, ও হতভাগিনী সরমা বিশ্বাসঘাতকের সহধর্মিণী। এই বিচার যে বিজাতীয় বিচার নয়, জাতীয়তাবোধেরই অঙ্গ তাহা স্পষ্ট হয় যখন শুনি বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তা-বোধের আদি পুরোহিত বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, যে-দেশে বিভীষণ ধার্মিক সে-দেশের উন্নতি সুদূর-পরাহত। সুতরাং মাইকেলের অন্তর্নিহিত জাতীয়তা-বোধ বাদ দিলে 'মেঘনাদ বধ'-এর বক্তব্য সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয় না।

সামাজিক উপলব্ধির এই প্রাধান্য শুধু মহাকাব্যে সীমাবদ্ধ নহে, গীতিকবিতার বিচারেও তাহাকে পরিহার করা যায় না। উনিশ শতকের প্রথম পাদকে ইংরাজী গীতিকবিতার স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। যদি কোনো একটি কবিতাকে এই গরিমাময় যুগের প্রতিভূকল্প বলিয়া বাছিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে, বহু পণ্ডিতের মতে, সে গৌরবের উপযুক্ত পাত্র,কোলরিজের'প্রাচীন নাবিকের ছড়া'। নৈর্ব্যক্তিক কল্পনার এরূপ সুদূর প্রসার, যাহাকে শেকস্‌পিয়ারের ভাষায় বলা যায়, 'বায়বীয় অবস্তু' তাহাতে 'নামরূপ' আরোপ করিবার এহেন অপরূপ সাফল্য কোনো দেশে আর কোনো কবি অর্জন করিয়াছেন কি না সন্দেহ। অথচ এ কবিতা একান্ত একাকীত্বের কবিতা। কোলরিজের 'প্রাচীন নাবিক' ডিফো-র 'রবিনসন ক্রুসো' অপেক্ষাও নিঃসঙ্গ—যে ক্রুসোকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিচারে সমাজবিহীন একক ব্যক্তির মডেল বলিয়া ধরা হয়। ক্রুসোর অসভ্য অনুচর ফ্রাইডের কথা বাদ দিয়াও বলা যায়, ক্রুসো তবু যে জগতে বাস করিত তাহা অপরিচিত হইলেও অজ্ঞাত নয়। কিন্তু 'প্রাচীন নাবিক' কিছুদিনের জন্য যে জগতের অধিবাসী হইয়াছিল তাহার বাস্তব অস্তিত্ব কোনো দিন ছিল না, হইবেও

না। তাহা উদ্ভূত হইয়াছিল কোলরিজের কুহকী কল্পনা হইতে, ফেনক-বুদ্‌বুদের মতো। তাহার বাস্তবতা স্বপ্ন-জগতের মায়াময় বাস্তবতা। স্বপ্ন যতক্ষণ চলে ততক্ষণই তাহার বাস্তবতা, যাহা ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে অনস্তিত্বে বিলুপ্ত হয়।

ফেনক-বুদ্‌বুদের লঘু তনিমাকে মনে হয় যেন জড়-নিয়মাতীত, বস্তুভারহীন, অথচ আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান তাহাতেই খুঁজিয়া পাইয়াছে ক্রমবিবর্ধমান বিশ্বজগতের প্রত্যক্ষ প্রতীক। আধুনিক মনোবিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে, উদ্ভটতম স্বপ্নেরও অগোচরে থাকে দ্রষ্টার বাস্তব অভিজ্ঞতা। কোলরিজের এই অতি-প্রাকৃত সাহিত্যিক সৃষ্টির অন্তরেও ছিল তাঁর তীব্র সামাজিক উপলব্ধি। যৌবনে ফরাসী বিপ্লবের উন্মাদনার পর, আদর্শ সাধারণতন্ত্র গঠনের ব্যর্থ তারুণ্য-চাঞ্চল্যের পর, স্বদেশে বাস্তব পারিপার্শ্বিকের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনোভাব কিরূপ হইতে পারে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে ১৮০২ সালে রচিত কবিভ্রাতা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের একটি সনেটে :

> O Friend! I know not which way I must look
> For comfort, being, as I am opprest
> To think that now our life is only drest
> For show; mean handiwork of craftsmen, cook,
> Or groom!—We must run glittering like a brook
> In the open sunshine, or we are unblest;
> The wealthiest man among us is the best;
> No grandear now in Nature or in book
>
> Delights us. Rapine, avarice, expense,
> This is idolatry; and these we adore;
> Plain-living and high-thinking are no more;
> The homely beauty of the good old cause
> Is gone; our peace, our fearful innocence
> And pure religion breathing household laws

যে চিত্র এই সনেটে ফুটিয়াছে তাহা উনিশ শতকের ইংলণ্ডে যান্ত্রিক বিপ্লবের

সাকল্যে শোচনীয় সমাজব্যবস্থার চিত্র। সমগ্র জাতির ক্রমবর্ধমান মূলধন জমা হইতেছে একটি সংখ্যাল্প ধণিকশ্রেণীর দৃঢ় মুষ্টির অভ্যন্তরে। আর দেশের জনসাধরণের দুর্গতির অন্ত থাকিতেছে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোলরিজের মুক্তিকামী কবিচিত্ত এই রূঢ় পরিবেশের প্রতিক্রিয়ায় নির্ভরযোগ্য আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে ওয়ার্ডসওয়ার্থ আশ্রয় পাইলেন পরিচ্ছন্ন প্রকৃতির শান্ত সাহচর্যে আর কোলরিজ অহিফেন-সঞ্জাত উদ্ভট স্বপ্নবিলাসে। মনোজগতে তাই তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ, একাকী। কোলরিজের বেলায় খাটে নিউটনের উল্লেখ-প্রসঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখিয়াছিলেন যে স্মরণীয় লাইনটি--

Voyaging thro' strange seas of thought, alone.

'প্রাচীন নাবিকের' একাকী অবস্থান,

Alone, alone, all, all alone,
Alone on a wide wide sea,
And never a saint took pity on
My soul in agony

কোলরিজেরই মানসিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এই করুণা-ভিখারী জ্বালাময় একাকীত্ব স্বাভাবিক নহে, প্রতিবাদ-প্রসূত। দুর্লভ কবিত্বশক্তির অধিকারী হইয়াও কোলরিজ দেখিলেন তাঁহার কল্পনাকে পরিপুষ্ট করার উপযোগী বিষয়বস্তু বাস্তব পরিবেশে অসম্ভব। সে পরিবেশকে তিনি মানিয়া লইতেও পারেন না, তাহাকে রূপান্তরিত করার পথও তাঁহার অজ্ঞাত। তাই কল্পনার প্রসারের একমাত্র প্রশস্ত পথ, বর্তমান বাস্তব হইতে দূরে প্রস্থান। এই মহাপ্রস্থানের প্রচেষ্টায় কোলরিজের মনীষা কত যে অপ্রচলিত বিদ্যার দুস্তর সাগর পার হইয়াছিল, তাঁহার স্মৃতি কত যে তুচ্ছ খুঁটিনাটির শুক্তিমুক্তা আহরণ করিয়াছিল যাহাদের অদৃশ্য ব্যঞ্জনায় এই নাতিদীর্ঘ মোজেইক-কঠিন কবিতাটির চারপাশে সৃষ্ট হইয়াছে একটি অবর্ণনীয় বর্ণাঢ্য বায়ুমণ্ডল, তাহার হদিস পাওয়া যায় বিখ্যাত সমালোচনা-গ্রন্থ 'দি রোড টু জানাডু' পড়িলে। আর এই নিষ্ক্রমণের সুদূরত্বের পরিমাপেই বুঝিতে পারা যায় তাঁহার প্রতিবাদের প্রগাঢ়তা। 'প্রাচীন নাবিকের ছড়া'-র অবাস্তব অভিযানের ইহাই বাস্তব ব্যাখ্যা।

যত দূরেই যান, কবিকে তবু সমাজের নিকট ফিরিতে হইবে। সমাজের এই দাবী কোনো কবি উপেক্ষা করিতে পারেন না। বিশেষ করিয়া কোলরিজের

মতো কবি, যাঁহার ছিল ভাষার অলৌকিক ক্ষমতা, 'স্ট্রেঞ্জ পাওয়ার অব স্পীচ'। তাই এই অতি-প্রাকৃত অভিযান-কাহিনীতে আছে একটিমাত্র বাস্তব ঘটনা যাহাতে কবির নীতিবোধ সুপ্রকট। প্রাচীন নাবিকের যাহা কিছু শাস্তি ও দুর্ভোগ তাহার মূলে আছে একটি নিরপরাধ খেলার সাথী পাখীকে অকারণ হত্যা। কবির বিধানে, এই অপরাধের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত হইল এই যে তাহার হৃদয়হীন বর্বরতার কাহিনী প্রাচীন নাবিককে আদ্যোপান্ত প্রচার করিতেই হইবে। তাহার শারীরিক যন্ত্রণার একমাত্র প্রতিষেধক হিসাবে সে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায় নিশার মতো; আর শোনাইবার উপযুক্ত মানুষের মুখ দেখিলেই তাহার উপর আপন যাদু বিস্তার করে। তাহাকে এই শিক্ষা দেয় যে, মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য, ভগবানের নিকট মহত্তম প্রার্থনা হইতেছে কার্যত ভালোবাসার পরিধিকে বিস্তৃত করা। শুধু দেশবাসীকে ভালোবাসিলে চলিবে না, সমগ্র মানবসমাজকে ভালোবাসিতে হইবে (নীতির দিক দিয়া ইহাকে বলা যায় ফরাসী-বিপ্লবের মহার্ঘ্যতম বাণী); সেখানেও থামিলে চলিবে না, মানুষের ভালোবাসাকে মূক প্রাণীজগতে, পশুপক্ষীতেও বিস্তৃত করিতে হইবে—এই সামাজিক নীতির আদর্শকে যেন খানিকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবে স্থান দেওয়ায় কোলরিজের স্পৃশালু শিল্পীমন চিরদিন খুঁতখুঁত করিত, ইহাকে তিনি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। জনৈক মহিলা-পাঠকের সমালোচনার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার কবিতায় নীতি-প্রচারে মাত্রাধিক্য ঘটিয়া গিয়াছে। কোলরিজ বুঝিতে পারেন নাই, কবি হিসাবে এই সামাজিক দায়িত্ব এড়াইবার পথ ছিল না। এড়াইলে, কবিত্বের যে উচ্চাসনে তিনি আজ প্রতিষ্ঠিত সেখানে তাঁহার ঠাঁই মিলিত না। সামাজিক উপলব্ধির প্রকাশ ব্যতীত তাঁহার কবিতা হইত দুর্বল, রক্তহীন, ক্ষীণায়ু। যে-সমাজে নরনারীর প্রাত্যহিক ব্যবহারে রুচিজ্ঞান লোপ পাইতেছে, ধর্মাচরণ উপেক্ষিত হইতেছে, যে-সমাজে সবকিছুই পণ্যদ্রব্যে পরিণত, যে-সমাজে মানুষে মানুষে একমাত্র বন্ধন হইতেছে টাকার বন্ধন—সাম্যবাদী ঘোষণার ভাষায় যাহাকে বলা যায়, উলঙ্গ, অনুভূতিহীন, টাকার বন্ধন—কোলরিজের সংবেদনশীল বিপ্লবপ্রবণ অন্তরাত্মা ইহার বিরুদ্ধে প্রতিঘাত না করিয়া পারে নাই। সেইজন্য বিশুদ্ধ শিল্পী হিসাবে যে কথা বলা কোলরিজের অভিপ্রেত ছিল না, বৃহৎ কবিপ্রতিভার দায়িত্ব নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে দিয়া সেই কর্তব্য পালন করাইয়া লইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার অদ্বিতীয় গীতিকবি। তাঁহার অসংখ্য গীতিকবিতার কোনটি সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহা জনমতের ভিত্তিতে নির্ধারণের জন্য কিছুকাল পূর্বে

একটি পরীক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। দেখা গেল, অধিকাংশ পাঠকের ভোট পাইয়াছে, 'সোনার তরী' কবিতাটি। একথা নিশ্চয়, অনেক বিদগ্ধ পাঠক এই মতে সায় দিবেন না। সেই সঙ্গে ইহাও মানিতে হইবে, এই কবিতাটির জনপ্রিয়তা তর্কাতীত। সাধারণ বিচারে মনে হয়, জনপ্রিয় সেই কবিতাই হইতে পারে যাহা সহজ, অর্থাৎ, যাহার অর্থবোধে কোনো গোলমাল নাই। অথচ, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, এই জনপ্রিয় কবিতাটির অর্থ লইয়া পণ্ডিতমহলে যত তর্কবিতর্কের অবতারণা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের দুর্বোধ বলিয়া চিহ্নিত অন্য কোনো কবিতায় তাহা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই কবিতাটির অর্থ লইয়া কবিকে অনেক জবাবদিহি করিতে হইয়াছে, স্বয়ং কবিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহার জন্য স্পষ্টবাদী দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই। তবুও প্রশ্নটি থাকিয়া যায়, এত অনর্থপাত সত্ত্বেও কবিতাটি এত জনপ্রিয় হইল কি করিয়া। বলা যাইতে পারে, কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের শিল্পকৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, ছন্দনৈপুণ্যে ও পদলালিত্যে অনুপম। এ-উত্তর তথ্যের দিক দিয়া টেঁকে না। 'ভরা ভাদরে' 'সোনার তরী'র সমকালেই রচিত, একই গ্রন্থে প্রকাশিত। কবিতা দুইটি ছন্দোবন্ধনে অবিকল এক, পদলালিত্যে তারতম্য খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তথাপি কেন একটি হইয়া রহিল মাত্র সুপরিচিত কবিতার অন্যতম, আর অন্যটি হইয়া উঠিল জনপ্রিয়তায় সর্বশ্রেষ্ঠ?

রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পাঠক-সাধারণের সামাজিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করিলে হয়তো এই সমস্যা-সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। 'ভরা ভাদরে' কবিতাটি কবির একটি ব্যক্তিগত মুড্-এর প্রকাশ। এক 'অম্লান উজ্জ্বল' 'বৃষ্টি অবসান' দিনে কবির মন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কত কি তাঁহার মনে পড়িতেছে, তিনি ভাবিতেছেন 'কার আঁখি দুটি কালো'; তাঁহার সাধ যাইতেছে নিজেকে শতখান করিয়া ছড়াইয়া দিতে, শরতের সমস্ত শোভা তাঁহাকে বিকল করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু 'সোনার তরী'-র 'আমি' কবি নিজে নহেন। কল্পনায় তিনি বাংলার এক চাষীর সহিত একাত্ম, যে চাষী একখানি ছোট খেতে একেলা খাটিয়া সোনার ফসল ফলাইয়াছে। বাস্তব জীবনের জমিদার রবীন্দ্রনাথ নিজের অন্তরে চাষীর সহিত যোগসূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এ আবিষ্কার রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিজ্ঞান-দৃষ্টির ফল নয়, ইহা যৌথজীবনের

মর্মস্থলে উপনীত হইবার কবির সহজাত ক্ষমতা। 'সোনার তরী'র যুগে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশে যে নামে পরিচিত ছিলেন আজ তাহা বিস্মৃতপ্রায়। তিনি তখন 'রবিবাবু'। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত এই বাবু-শ্রেণীর কবি; 'শেলী-গ্যেটে-কোলরিজ'-পড়া উচ্চশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের অন্তর্যামী বাণী-রূপ। যে বংশে তাঁহার জন্ম তাহা ধনী হইলেও অভিজাত নহে। ব্রাহ্মণ্যের কৌলীন্য তাহাতে কলঙ্কিত; দেশীয় জায়গীরদারের প্রাচীনত্বও তাহার অনায়ত্ত। দ্বারকানাথ 'প্রিন্স' হইতে পারেন, মহারাজা নহেন। তাঁহার বিশাল ভূসম্পত্তি ও অর্থসম্পদ বৈশ্য-সুলভ ব্যবসায়লব্ধ। দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সত্যনিষ্ঠার ফলে যে উত্তরাধিকার সান্তজ দ্বিজেন্দ্রনাথ পাইয়াছিলেন, ভাগাভাগি করিলে হয়ত রবীন্দ্রনাথকে অন্য পাঁচজন শিক্ষিত বাঙালীর মতো স্বোপার্জনের উপরে নির্ভর করিতে হইত। মধ্যমভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ আমরণ সরকারী বৃত্তিভোগ করিয়াছেন, এবং কবি নিজেও ব্যারিস্টারীর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সমস্ত বাঙালী শিক্ষিতসমাজ আজ বাংলাদেশের ভাগ্যদেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাইবে যে সে ব্যবস্থা সফল হয় নাই, রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে কবিত্ব-সাধনার নিরঙ্কুশ সুযোগ ঘটিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের যৌবন হইতেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশ স্পষ্টতর রূপ পরিগ্রহণ করিতেছিল, যে আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন ইংরাজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। ইংরাজের শাসনে ও শোষণে দেশের মর্মে তখন যে প্রগতির প্রেরণা ও মুক্তির আকুতি জাগিতেছিল, মধ্যবিত্তেরাই তখন তার ধারক, পথিকৃৎ। বিশুদ্ধ কবিত্ব-সাধনার অজুহাতে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে এই ভাবাবেগ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখেন নাই, অনেক সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবেও রাজনীতিতে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু কবি হিসাবে তাঁহার বিশিষ্ট দায়িত্ব ছিল—দেশের অন্তরে প্রবেশ করা, তাহার দুঃখবেদনার সহভাক্ হওয়া। দেশ বলিতে তখন প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কেই বোঝায়, কারণ বাংলাদেশের জনসাধারণ, তাহার বিশাল সংখ্যাগুরু চাষীশ্রেণী, তখন মোহাচ্ছন্ন, ভাষাহীন। শহরের সহিত গ্রামের সম্বন্ধ ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে, যদিও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই জমি হইতে কোনো না কোনো রূপ উপস্বত্বে লাভবান ছিলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে। চাষীর জগত ও শিক্ষিতের জগত ঘুরিয়া বেড়ায় বিভিন্ন কক্ষায়। ছুটির দিনে বা কার্যব্যপদেশে শিক্ষিত ভদ্রলোক

চাষীর জীবনকে দেখিতে পান যেন দূর হইতে, কল্পনার মাধ্যমে। যেটুকু সম্বন্ধ গ্রামে ছিল, তাহা লেনদেনের সম্বন্ধ, তাহাতে হৃদয়ের ব্যবহার ছিল অল্পই। রবীন্দ্রনাথও এইভাবেই তাঁহার জমিদারীর কাছারী হইতে, বা পদ্মাবক্ষের নৌকা হইতে বাংলাদেশের বৃহৎ জনসমাজের জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা তাঁহাকে তাঁহার সামাজিক কর্তব্য হইতে রেহাই দেয় নাই। বাংলাদেশের কৃষিজীবনের সমস্ত ব্যর্থতা তাঁহার অন্তরে পুঞ্জীভূত হইল। এ-দৃশ্য তাঁহার অপরিচিত থাকার কথা নয়, রৌদ্রে-বৃষ্টিতে সারা বৎসর খাটিয়া চাষী ক্ষেতে সোনার ধান ফলায়, আর নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবসায়ীর নৌকা আসিয়া তাহার সমস্ত ফসল উজাড় করিয়া লইয়া যায়। পড়িয়া থাকে কেবল শস্যহীন রিক্ত ক্ষেত্র, চাষীর মন হাহাকার করিয়া উঠে; এতদিন যাহা লইয়া সে ভুলিয়াছিল সবই যে থরেবিথরে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, এখন কি লইয়া তাহার দিন কাটিবে? যে তরীতে তাহার সোনার ধান সাজানো হইয়াছে সেথায় তো তাহার ঠাঁই নাই। মহাজন শ্রমফলকে চায়, শ্রমিককে তাহার কি প্রয়োজন? সে কৃপা করিয়াও চাষীকে লইতে রাজী নয়, ঠাঁইয়ের এই অপব্যয় তাহার সহিবে কেন? কাজেই সোনার তরী চাষীর যাহা কিছু ছিল লইয়া চলিয়া যায়। চাষী 'শূন্য নদীর তীরে' পড়িয়া থাকে, আর 'শ্রাবণ গগন ঘিরে' ঘন মেঘ তাহারই সমবেদনায় ঘুরিতে ফিরিতে থাকে।

এই কবিতায় যখন 'রাশি রাশি ভারা ভারা ধানকাটা' সারা হইয়াছে তখন শ্রাবণ মেঘের অবতারণা করায় রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে এবং বাহিরের দিক হইতে এ অভিযোগ যথার্থ। ইহাও জানা কথা, রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি কোনো শ্রাবণ-দিনে লেখেন নাই, যখন 'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা'। কিন্তু তাঁহার অন্তরে শ্রাবণের ঘন ম্লানিমা চাষীর বঞ্চিত জীবনযাত্রার ঘন কারুণ্যের সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছিল। কাজেই একটিকে অন্যটির পশ্চাদ্‌পট হিসাবে ব্যবহার করিতে তাঁহার শিল্পবোধে বাধে নাই। বরং আপন শক্তিতে দুর্জয় বিশ্বাস না থাকিলে এরূপ দুঃসাহস সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ দুঃসাহস সম্ভব হইয়াছিল এই নিগূঢ় বোধ হইতে যে, তিনি যে ব্যর্থতার চিত্র আঁকিতে যাইতেছেন, তাহা কেবল কোনো বিশেষ চাষীর বাৎসরিক বঞ্চনার চিত্র নয়, তাহা বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষিত সমাজের ব্যর্থতার প্রতীক। প্রতীক হইতেছে সেই রূপক যাহার আবেদন প্রত্যক্ষ ও পর্যাপ্ত, যাহাতে বহু

চিত্তের অস্পষ্ট অনুভূতি একত্র সমাহিত হইয়া ভাবযোগ্য হইয়া উঠে। বাংলা-দেশের মধ্যবিত্ত জীবনে ব্যর্থতা বহুপ্রকারের। সার্থকতাও কিছু কিছু আছে তবুও একথা মানিতে হইবে ব্যর্থতাই তার মূল সুর। চাষীর জীবনের ব্যর্থতার বর্ণনায় এই মূল সুরে ঘা পড়ে। এত স্পষ্ট, এত প্রত্যক্ষ ব্যর্থতা, আমাদের দেশে আর কোন শ্রেণীর জীবনে আছে? আর এ ব্যর্থতা এমনই ব্যাপক যে শিক্ষিত জীবনের খণ্ডিত ব্যর্থতা ইহার মধ্যে অনায়াসে নিজেকে নিমজ্জিত করিতে পারে। তাই 'সোনার তরী'তে প্রকাশ্য বিষয়বস্তু ও তাহার পশ্চাৎপটের আবেগময় স্বতো-বিরোধ বাঙালী পাঠকসমাজ যেন ইচ্ছা করিয়াই লক্ষ্য করে নাই; কবিতার ছন্দের ও মিলের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে; আর আপন আপন ব্যর্থতার প্রকাশ কবিতাটিতে খুঁজিয়া পাইয়া কবিকে সকৃতজ্ঞচিত্তে বলিতে চাহিয়াছে, —ইহা তো আমাদেরই অন্তরের কথা; আমরাও তো নিঃস্ব, খাটিয়া মরি, কিন্তু তাহার কতটুকু ফল পাই; নির্মম নিয়োগকর্তা আমাদের শ্রমের ফলটুকু আদায় করিয়া লইয়া অনাদরে হেলাভরে চলিয়া যায়, আর আমরা সংসার সাগর-তীরে শূন্য প্রেক্ষণে চাহিয়া থাকি। তোমার এ কবিতার মধ্যে আমরা নিজেদেরই খুঁজিয়া পাইলাম। তুমি আমাদের মুখে ভাষা দিয়া আমাদের অন্তরের ভার লাঘব করিলে।

আপন মানস-কবির মুখ দিয়া গ্যেটে বলিতেছেন—

> প্রকৃতি দিয়েছে মানুষকে অশ্রু আর যন্ত্রণার আর্তনাদ
> যখন মানুষ আর সইতে পারে না;
> আর আমাকে দিয়েছে সব চেয়ে বেশী মাত্রায় ভাষা ও সুর—
> যন্ত্রণার পরিপূর্ণ গভীরতা, যাতে আমি বলতে পারি;
> মানুষ যখন তার বেদনায় মূক, তখন আমারই আছে বিধির দান,
> অন্তরে যা ভোগ করি বাইরে তা প্রকাশের শক্তি।

মনে হয় না কি এ বর্ণনা 'সোনার তরী'-র রবীন্দ্রনাথেও প্রযোজ্য?

জনপ্রিয়তার যে নির্বাচনে প্রথম স্থান পায় 'সোনার তরী' তাহাতে দ্বিতীয় হয় 'উর্বশী'। এই কবিতাটির উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিদগ্ধতম রবীন্দ্র-পাঠক মহলেও দ্বিধা থাকিতে পারে না। ইহাতেও বোধ হয় সন্দেহ নাই, সাধারণ পাঠক বাদ দিয়া শুধু উচ্চশিক্ষিত পাঠকের মত লইলে 'উর্বশী' 'সোনার তরী'-র উপরেই স্থান পাইবে। এই সুবিখ্যাত কবিতাটির গুণ ব্যাখ্যানের প্রয়োজন নাই এ প্রবন্ধে। কিন্তু কি

করিয়া একথা ভোলা যায় যে এই কবিতাটির সম্পূর্ণ রূপ কি হইবে, তাহা লইয়া কবির মনে বহুদিন অনিশ্চয়তা ছিল। গীতিকবিতার রূপায়ণে মূল সূত্র হইল তাহার অবিচ্ছেদ্য ঐকিকতা। ভাবে ভাষায় মিলিয়া গীতিকবিতা একটি অখণ্ড প্রকাশ। যদি তাহার কোনো অংশ বিনা ক্ষতিতে বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে কবিতাটির প্রকাশের পিছনে যে মানসিক ধারণা আছে কবির ধ্যাননেত্রে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই; তিনি নিজেই জানেন না কবিতাটিতে তিনি কি বলিতে চাহেন। আমরা জানি, কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ প্রথম রচনা করেন আটটি স্তবকে। পরে শেষ দুইটি স্তবক বাদ দেওয়া হয়, বহুদিন ধরিয়া ছয়টি স্তবকই প্রচলিত ছিল। শেষকালে প্রাচীন বয়সে কবি আবার বিচ্ছিন্ন স্তবক দুটিকে পুনর্যোজিত করেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান কি সাহিত্যামোদী পাঠকের কর্তব্য নয়?

যে সময়ে 'উর্বশী' রচিত হয় তখন কবির সহিত ঘনিষ্ঠ প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন লোকেন্দ্রনাথ পালিত। যাঁহারা ইঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারই সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি ছিল যেমন বিস্তৃত, রসবোধ ছিল তেমনই গভীর। এ হেন পাঠকের সহিত অন্তরঙ্গতা যে যে-কোনো কবির পক্ষে সৌভাগ্য তাহা দুই বিভিন্ন প্রকৃতির কবিপ্রতিভা, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। লোকেন্দ্রনাথের মার্জিত রুচি যাহা শ্রেষ্ঠ ইয়োরোপীয় সাহিত্যের পরিশীলনে সুসমৃদ্ধ ছিল, 'উর্বশী' পড়িয়া তাহা উল্লাসে অভিভূত হয়। অথচ তাঁহারই বিচারানুসারে রবীন্দ্রনাথ শেষ দুইটি স্তবক বাদ দিতে সম্মত হন। কাব্যোপভোগে কবির উপর পাঠকের প্রভাবের ইহা একটি মূল্যবান নিদর্শন। এই সংশোধনের কারণ কি কেবল ব্যক্তির উপর ব্যক্তির প্রভাব, না ইহারও পশ্চাতে আছে সামাজিক বিবর্তনের অগোচর সক্রিয়তা?

এই বিযোজনে 'উর্বশী'-র অঙ্গহানি ঘটিয়াছিল কি না, নির্ভর করে এই কবিতায় কবির কি বক্তব্য ছিল তাহা নির্ধারণের উপর। যদি সে বক্তব্য ছয় স্তবকেই সম্পূর্ণরূপে বলা হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে মাধুর্য সত্ত্বেও বাকি অংশ নিশ্চয়ই অতিরিক্ত, কবির পক্ষে সময়োচিত সংযম-প্রয়োগের শক্তিহীনতার দ্যোতক।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের কল্পিত উর্বশী পুরাণের বা কালিদাসের উর্বশী

নয়, যদিও উত্তরাধিকারী হিসাবে আধুনিক কবি প্রাচীন যুগের সমস্ত সুরভি আত্মসাৎ করিতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই। কেবলমাত্র পুরাতন কাব্যসম্পদের অটুট রক্ষণকারী হইলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ভাবা সম্ভব হইত না,

আপাতত এই আনন্দে গর্বে বেড়াই নেচে,
কালিদাস তো নামেই আছেন, আমি আছি বেঁচে।
তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ আমি তো পাই মৃদুমন্দ
আমার কালের কণামাত্র পান নি মহাকবি।

যে আধুনিক বিনোদিনীরা কবির যৌবনে বেণী দুলাইয়া চলিতেন 'উর্বশী' তাঁহাদেরই আদর্শীকৃত রূপনা। আর যে নন্দনে রবীন্দ্র-কল্পিত উর্বশীর বসবাস তাহা বুর্জোয়াসমাজ-ব্যবস্থার সীমা-বিমুক্ত সংস্করণ। পৃথিবীর কোনো দেশে নিখুঁত বুর্জোয়া-ব্যবস্থা প্রচলিত হয় নাই, ইহা সত্য। তবু বুর্জোয়া-ব্যবস্থার আন্তরিক অভিপ্রায় ফিউডালতন্ত্রের বিলোপ সাধন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, বিশেষ করিয়া নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, ফিউডাল সমাজে অজ্ঞাত ছিল। যে নারী মাতা নহে, কন্যা নহে, বধূ নহে, ফিউডাল সমাজে তাহার স্থান ছিল না। স্বর্গের অপ্সরীদেরও স্থান ছিল স্বর্গীয় সমাজ-ব্যবস্থার প্রান্তদেশে। উর্বশী যতই সুন্দরী রূপসী হউক না কেন, ইন্দ্রাণীর গৌরবের নিকট তাহাকে মাথা নত করিতে হইত। পুরুষের সহিত নারীর যে সম্বন্ধ নিছক প্রত্যক্ষ, যাহা সমাজের অন্যান্য দাবী হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহার সগৌরব স্বীকৃতি অতীত যুগে অসম্ভব ছিল। তখন সমাজ-ব্যবস্থা ছিল স্থিতিশীল, প্রসার-বিরোধী। ব্যক্তির যেমন স্বাধীনতা ছিল না বৃত্তি নির্বাচনে, তেমনই ছিল না প্রিয়া-নির্বাচনে। কে কাহাকে ভালোবাসিবে তাহা ঘটক-কারিকার নিয়ম-শৃঙ্খলে শাসিত ছিল। রোমান্টিক প্রেম বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার মুখ্য ফল। যান্ত্রিক সভ্যতা ও রোমান্টিক সাহিত্য সহগামী, সমোৎস-সম্ভূত। আমাদের দেশে ইংরাজ আগমনের সঙ্গে যান্ত্রিক সভ্যতার প্রবর্তন না হইলে উর্বশীর এই নব্যরূপ কল্পনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হইত না। উর্বশী নব্যনারীত্বের উন্মুক্ত রূপ, যে নারী শুধু পুরুষের প্রিয়া, আর কেহ নহে। 'যুগযুগান্তর হতে' সে যে 'শুধু বিশ্বের প্রেয়সী'। তাহার আত্মীয়-স্বজন, পিতামাতা কেহ নাই, তাহার বিকাশ 'বৃন্তহীন পুষ্পসম'। অমৃত ও গরল পরিবেশনে তাহার সমান দক্ষতা। তাই উর্বশীর বাল্য নাই, জরা নাই, আছে কেবল অনন্ত যৌবন। 'যখন জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা—পূর্ণ প্রস্ফুটিতা'। সমাজের কোনো

বন্ধনে সে আবদ্ধ নয়, মিথ্যা লজ্জা-শরমের তাহার প্রয়োজন নাই, অসম্বৃতা সে, তাহার মেখলা আচম্বিতে দিগন্তে টুটিয়া গেলেও সে ভ্রূক্ষেপ করে না, কারণ সে জানে পুরুষের বক্ষোমাঝে যেখানে রক্তধারা নাচিয়া চলিয়াছে সেখানে তাহার স্থান কোথায়।

মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার—
অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।

নারীর এই রূপকে ফিউডাল জগতে কল্পনা করাও যাইত না। বুর্জোয়া-যুগে তাহাকে কল্পনায় রূপায়িত করা যায়, কারণ তাহার আংশিক প্রকাশ জগতে প্রত্যক্ষ। কিন্তু পরিপূর্ণ প্রকাশের জন্য বাস্তবের সীমানা ছাড়াইয়া প্রবেশ করিতে হয় স্বপ্নের রাজ্যে। তাই রবীন্দ্রনাথের উক্তি:

অখিল মানসস্বর্গে অনন্তরঙ্গিণী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনী।

লোকেন্দ্রনাথের মতে কবিতাটির শেষ এইখানেই। পুরাতন কাহিনীর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ নারীর নবতম রূপের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা ইহাতেই সম্পূর্ণ। পরের দুটি স্তবকে আছে উর্বশীর বাস্তবতার অভাবে কবির ক্রন্দন। সুতরাং উর্বশীর চিত্রণে তাহা কোনো নূতন রেখাপাত করিয়া নূতন ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্য ফোটাইয়া তোলে না। কীটস্-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ওড্ টু দি গ্রীসিয়ান আর্ন'-এর সহিত পরিচিত পাঠক সহজেই এ যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। রবীন্দ্রনাথও নিজের রচনার প্রতি সুগভীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া নিজের রচনাকে খণ্ডিত করিতে সম্মত হইলেন। অযথা আধিক্যকে বর্জন করিতে পারাতেই সাধিত হয় শিল্পের সম্যক্ পর্যাপ্তি।

পরে যে রবীন্দ্রনাথ স্তবক দুটিকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন তাহাতে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ বক্তব্য লোকেন্দ্রনাথ ধরিতে পারেন নাই। শিক্ষায়-দীক্ষায় লোকেন্দ্রনাথ ছিলেন একান্ত বিজাতীয়, ইয়োরোপীয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের কঠিন মাত্রাজ্ঞানে অভ্যস্ত। তাই শেষের দুটি স্তবক তাঁহার রসজ্ঞানে ঠেকিয়াছিল অসংলগ্ন। বিশুদ্ধ সাহিত্যের বিচারে এ সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করা যায় কি না জানি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' দুটি বিপরীত আবেগের একত্র সমাবেশ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার নিকট উর্বশী তো কেবল ধনতান্ত্রিক যুগে উদ্বর্তমান

নারীত্বের পূর্ণাঙ্গ প্রতিমা নয়, সে যে অতীত হিন্দু-ভারতের সমস্ত জাগতিক উপভোগের নির্বিকল্প প্রতীক। স্বর্গের অপ্সরী উর্বশী যে হিন্দু নৃপতি পুরুরবা-বিক্রমের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের প্রতি তাহার পক্ষপাতিত্ব যে মহাভারতের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সভ্য জাতি পরাধীন হইলে তাহার অতীত গৌরবের কাহিনী কখনই বিস্মৃত হইতে পারে না। বরং অতীত সম্বন্ধে অত্যধিক চেতনা পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-কামনার অগ্রদূত। ভবিষ্যতের দুর্মর আশার সহিত অতীতের জন্য করুণ দীর্ঘশ্বাস তাহার কবিতায় ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় তাহার আধার আধেয়কে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। উর্বশীকে অবলম্বন করিয়া বর্তমানের কল্পনাকে রূপ দিতে গিয়া কবি অতীতের জন্য আক্ষেপকে পরিহার করিতে পারেন নাই। মাটির পৃথিবী হইতে উর্বশীর স্বর্গলোকে চিরপ্রয়াণ, এ যেন বর্তমান ইতিহাসের কঠিন বাস্তব হইতে দেশপ্রেমের কল্পলোকে ভারতের হিন্দু-ঐতিহ্যের স্বপ্নোজ্জ্বল অবসান। কবির মনে তাই প্রশ্ন জাগে,

আদিযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর—
অতল অকূল হতে সিক্তকেশে উঠিবে আবার?

তৎকালীন ক্ষীণধারা মুক্তি-আন্দোলনের আশা-আশঙ্কামিশ্রিত উত্তর কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় বন্ধনহীনা উর্বশীর উদ্দেশে রচিত শেষ স্তবকে:

ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী!
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে,
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশ দিকে পরিপূর্ণ হাসি
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি,
ঝরে অশ্রুরাশি।
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
অয়ি অবন্ধনে॥

মুক্তিকামী কবির সুদীর্ঘ জীবনেও এই আশা সফল হয় নাই। তাঁহার পুত্র-স্থানীয়দের জীবদ্দশায় এই সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে কি? শেষ দুটি স্তবকের ব্যঞ্জনায় কি আজিও অবসান ঘটিয়াছে? *

* পরিচয়, শারদীয় সংখ্যা ১৩৫৩, পৃ. ১২৫-৩৭। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

'নূতন সাহিত্য'-প্রসঙ্গে / হিরণকুমার সান্যাল

"কয়েকজন শিল্পী ধার-করা বিদ্যা নিয়ে প্রগতিশীল হয়ে উঠবার চেষ্টায় ছিলেন। দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করেও যেমন কুলীন হতে পারল না, শ্লোগানের জয়গান গেয়েও লেখকরা তেমনি প্রগতিশীল হতে পারে না। তাঁদের লেখার ভেতর নূতনত্ব অনেক কিছুই পাওয়া গেল কিন্তু প্রাণ পাওয়া গেল না।" এই মত ব্যক্ত করেছেন সুবোধ দাশগুপ্ত, পাটনা থেকে ছাপা 'প্রভাতী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'নূতন সাহিত্য' প্রবন্ধে।

কেন ঐ জাতীয় লেখকেরা সত্যিকারের প্রগতিশীল হয়ে উঠিত পারেন নি তার কারণ, সুবোধবাবুর মতে—"প্রগতির জন্য ফরমাইশী লেখা হতে পারে না, প্রগতির নোটবুক মুখস্থ করে একটা জাতি প্রগতিশীল হয়ে উঠতে পারে কিনা সন্দেহ। এই সন্দেহ বদ্ধমূল হয়েছে আর একটা কারণে। লেখকরা নিজে কেউ প্রগতিশীল নন, কারণ প্রগতিকে তাঁরা দেখবার চেষ্টা করেন দূর থেকে···কিন্তু নিজেরা প্রগতিশীল হয়ে উঠতে পারেন নি। কারণ লেখকরা কেউ বিপ্লবী নন।"

অতঃপর প্রগতি ও বিপ্লবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের উল্লেখ করে সুবোধবাবু বলেছেন যে, সহজ বিজ্ঞান আমাদের শুধু এই আশ্বাস দিতে পারে যে প্রগতি অবশ্যম্ভাবী নয় কিন্তু সম্ভব ও বিপ্লবের প্রয়োজন এই সম্ভাবনাকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলা। এই বিষয়ে আমাদের দেশের লেখকরা যথেষ্ট সচেতন নন বলেই প্রচারের বিরুদ্ধে তাঁদের ঘোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাঁরা ফ্যাশিস্তবাদকে সমর্থন করে গেছেন।

আমাদের দেশের অনেক লেখক, হয়তো বেশির ভাগ লেখক সম্বন্ধে এই বিশ্লেষণ খাটে, কিন্তু যারা অত্যন্ত সচেতন ও সক্রিয়ভাবে প্রগতি সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করছেন তাঁরাও যে সুবোধবাবুর মতে প্রগতির পরিপন্থী, তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিচের এই উদ্ধৃতিতে:

"আমাদের দেশের আবহাওয়া ফ্যাশিস্তবাদের অনুকূলেই বইছে। বর্তমানে কংগ্রেস সাহিত্যসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই কারণেই আমাদের সন্দেহ আরো বদ্ধমূল হয়েছে। কারণ কংগ্রেস সাহিত্যসংঘ প্রগতিশীল

লেখক ও শিল্পী সংঘেরই পাল্টা জবাব। কিন্তু এ ধরনের পাল্টা জবাবে আমরা বিচলিত হই নি। আমাদের বিচলিত করেছে 'প্রগতি'র ছাপমারা সাহিত্যিকরা। কারণ তাঁরা প্রগতির নামে যে সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে চলেছেন তার সঙ্গে প্রগতিবিরোধী সাহিত্যের মূলত প্রভেদ কোথাও নেই। সুতরাং প্রগতির ছদ্মবেশে তাঁরাও ফ্যাশিস্তবাদকে সমর্থন করে যাচ্ছেন।"

অর্থাৎ, ব্যাপারটা দাঁড়ালো ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। আর গাঁ-ই যদি উজাড় হয়, তাহলে সাহিত্যরচনাই বা কে করবে, আর কেই বা তা পড়বে? আসল কথা সুবোধবাবু তথাকথিত প্রগতিবাদীদের অবাস্তবতার প্রতিবাদে নিজেও অবাস্তবতার মোহে ভারসাম্য হারিয়েছেন। 'যাঁরা প্রগতিশীল নন তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল হতেই হবে'—একথা সত্য হতে পারে কিন্তু একেবারে সরাসরি-ভাবে নয়। সরল রেখা টেনে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াকে কি আলাদা করা সম্ভব?

অথচ সুবোধবাবু স্বীকার করেন, "নূতন সাহিত্য-রচনার আন্দোলনের আজ প্রয়োজন আছে। পাঠক-সমাজের রুচি বদলে গেলে নূতন সাহিত্য সৃষ্টির বিস্তৃত ক্ষেত্র তৈরী হবে এবং সেই সঙ্গে নূতন সাহিত্যিকও তৈরী হবেন। শুধু তাই নয়, আজ যাঁরা অচেতন আছেন তাঁরাও সচেতন হবার সুযোগ ও সুবিধা পাবেন।" যদি তাই হয় তাহলে 'প্রগতির' ছাপমারা সাহিত্যিকরা, অর্থাৎ ধরে নিতে হবে, প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘের সঙ্গেই যাঁরা সংশ্লিষ্ট, তাঁরা এমন কি অপরাধ করেছেন? তাঁদের সকলের—এমন কি বেশির ভাগের—রচনাতেই কি প্রগতিবিরোধী সাহিত্যের সঙ্গে 'মূলগত' ঐক্য দেখা যায়? যদি এই অভিযোগ সত্য হয়, তাহলে নিশ্চয়ই বিচলিত হবার কারণ আছে। কিন্তু যদি ঐ সংঘভুক্ত দু-চারজন লেখক এখনো সত্যি মনেপ্রাণে প্রগতিশীল না হয়ে থাকেন—তার প্রতিকার কি? আমি বলব, তার প্রতিকার 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' মন্ত্র গ্রহণ। এবং যেহেতু সুবোধবাবুও আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়েছেন, অতএব ধরে নিতে পারি তিনিও আমাদের সঙ্গে একমত হবেন।

একবার সুবোধবাবু পরামর্শ দিয়েছেন সাহিত্য-সমালোচনা দিয়ে আন্দোলন শুরু করতে। (তাহলে কি আন্দোলন শুরু হয় নি?) যাই হোক, "সাহিত্যে রুচি পরিবর্তন করবার জন্ত সাহিত্য-সমালোচনা দরকার" একথা খুবই সমীচীন। "আমরা যদি নামকরা লেখকদের নামকরা বই নিয়ে এই সমালোচনা আরম্ভ করতে পারি তাহলে আমরা অল্প কয়েক দিনের ভেতরই এত বিরোধের

সৃষ্টি করতে পারবো যে আমাদের এই প্রচেষ্টা ক্ষীণ হলেও আন্দোলনের মর্যাদা পাবে।"

কী ভাবে সাহিত্য-সমালোচনা করা দরকার সুবোধবাবু তার দুটি নীতির নির্দেশ করেছেন। "সমালোচনার প্রথম নীতি হবে এই যে আমরা বস্তুবাদকে চরম সত্য বলে মেনে নেব। এটা মেনে নেওয়া দরকার এই জন্য যে তাহলে মানুষকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করা যায়।...যে সাহিত্যে ভগবানকে সৃষ্টিকর্তা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে আমরা সেসব সাহিত্যের তীব্র সমালোচনা করব।"

সুবোধবাবু পরিষ্কার করে বলেন নি যে, এই নির্মম মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে হবে শুধু এ যুগের না, বিগত যুগের সাহিত্যিকদেরও। ভগবানকে মেনে নেওয়ার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা বাতিল করব, না করব না ?

সুবোধবাবুর দ্বিতীয় নীতির অর্থও খুব পরিষ্কার নয়। "আমরা কোনো প্রভুত্ব মানব না। আইনের প্রভুত্ব বা নীতির প্রভুত্ব বা ধর্মের প্রভুত্ব। কারণ প্রভুত্ব মেনে নিলেই আইন, নীতি বা ধর্ম এগুলো যে ভালো তাও মেনে নিতে হবে এবং এগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করলেই তাকে অন্যায় বলতে হবে এবং শাস্তি পেতে হবে। তা থেকে দাঁড়াবে যে সমাজটা মোটামুটি ভালোই শুধু কতকগুলি খারাপ লোক তাকে খারাপ করে তুলেছে।" সুবোধবাবু বলতে চেয়েছেন যে প্রগতিশীল সাহিত্য হবে প্রতিবাদের সাহিত্য ও এই প্রতিবাদ কতকগুলি খারাপ লোকের নয়—গোটা সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কিন্তু কোনো নীতিকেই না মানা কি এই প্রতিবাদের সেরা উপায় ? নির্জলা ব্যক্তিবাদও তো কোনো নীতিকেই মানতে চায় না।

সুবোধবাবুর মতামত বিস্তারিতভাবে উদ্ধার করেছি এই জন্য যে, তাঁর প্রবন্ধটি সত্যিই আলোচনার যোগ্য বলে মনে করি ও যদিও অনেক জায়গায় তাঁর মতামত সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য করেছি, তবু, মোটের ওপর, তাঁর মত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণীয়। সুবোধবাবুর মূল বক্তব্য এই যে, প্রগতি অবশ্যম্ভাবী নয়, দর্শকের মতন উপভোগ করবার জিনিস নয়—কিন্তু তা সম্ভব,ও এই সম্ভাবনাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার ব্রত সকল মানুষকে গ্রহণ করতে হবে, সাহিত্যিককেও। এ কথা সার কথা। কিন্তু সুবোধবাবু প্রসঙ্গত আরো যেসব কথা বলেছেন সেগুলির আলোচনা হওয়া দরকার, বিশেষভাবে সমালোচনার যে দুটি মূলনীতি তিনি

নির্দেশ করেছেন তা গ্রহণীয় কিনা এই বিষয়ে এই পত্রিকার পাতায় আমরা তীব্র বিতর্ক আহ্বান করছি।

* * *

"আমরা প্রচারক নই এই আত্মাভিমান সাহিত্যিকদের খাটে না" সুবোধবাবুর এই কথার সমর্থন পেলাম ঢাকা থেকে প্রকাশিত বার্ষিকী 'ক্রান্তি'র প্রথম পাতাতেই। লীলাময় রায় 'সৈনিক' কবিতায় লিখেছেন :

ইজমে কী আসে যায়। আমি চাই একাগ্র সৈনিক।
লক্ষ্য যদি এক হয় উপলক্ষ্য হোক না শতেক।
একই হৃদয়ে মেলে শিরা আর ধমনী যতেক।
দেশ যদি অন্তরেই দ্বেষ কেন হবে আন্তরিক।
হে অশান্ত, করো মনঃস্থির। আগে আপনার মনে
জয়ী হও নীতি আর মত্ততার নিত্যন্তন রণে।

এই জন্যেই কি নীতির বিরুদ্ধে সুবোধবাবুর এত আপত্তি? লীলাময় রায়ের এই কবিতা সত্ত্বেও 'ক্রান্তি' অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবেই প্রগতিবাদী। এর সম্পাদকদ্বয়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অমৃতকুমার দত্ত নামকরা লেখক এবং প্রগতিশীল লেখক। এই সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে নামকরা 'প্রগতির ছাপমারা' লেখক আরো অনেক আছেন : বিষ্ণু দে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, সুকান্ত ভট্টাচার্য, গোপাল ভৌমিক, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। লীলাময়ের গোষ্ঠীর লেখক—অর্থাৎ যাঁরা গোষ্ঠী মানতে চান না—আছেন অমিয় চক্রবর্তী। এঁদের সকলের লেখার সমাবেশে যে পত্রিকা গ্রথিত হয়েছে তাতে বৈচিত্র্য থাকবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই—কিন্তু তারিফ করবার জিনিস এই পত্রিকাটির সাহিত্যিক অখণ্ডতা। এই বিষয়ে 'ক্রান্তি'র সাফল্য বিরল। পুজোর বাজারে যেসব বিপুল বহরের রঙচঙে কাগজ ছেলেভুলোনো খেলনার মতন পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে তাদের সঙ্গে 'ক্রান্তি'র তফাৎ একেবারে মূলগত! প্রগতিশীল সাহিত্যিক আন্দোলন যে সার্থকভাবে করা যেতে পারে, ও এই আন্দোলনে যাঁরা প্রচার-সাহিত্যকে এড়িয়ে চলতে চান তাঁদেরও যে স্থান হতে পারে—'ক্রান্তি' তার প্রমাণ।*

* পরিচয়, পৌষ ১৩৫৩, পৃ. ৪৪৮-৫০। মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার সম্পাদিত ও পাটনা থেকে প্রকাশিত 'প্রভাতী' পত্রিকার একটি বিতর্কিত রচনা সম্পর্কে এই আলোচনাটি 'পরিচয়'-এর 'পত্রিকা-প্রসঙ্গ' বিভাগে প্রকাশিত হয়। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজনমতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

'নূতন সাহিত্য'-প্রসঙ্গে / পাঠকগোষ্ঠী

শ্রদ্ধাস্পদ 'পরিচয়'-সম্পাদক সমীপে

মহাশয়,

পৌষের 'পরিচয়ে' আপনি 'প্রভাতী' পত্রিকায় লিখিত শ্রীসুবোধ দাশগুপ্তের "নূতন সাহিত্য" প্রবন্ধে নির্ণীত দু'টি নীতি সম্বন্ধে আলোচনা আহ্বান করেছেন।

সুবোধবাবু সাহিত্য থেকে ঈশ্বরকে বাদ দিতে ঠিকই বলেছেন এবং ভগবানকে মেনে নেবার জন্যে রবীন্দ্রনাথকেও বাতিল করতে হবে। বিপ্লব ভেঙে ফেলতে চায় বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকে, সংস্কার করতে নয়। যা আছে, তাতে ভালোমন্দ দুই-ই আছে। ভালোকে রেখে মন্দকে বিনাশ করার প্রয়াসকে সংস্কার-পন্থীরা মানতে পারেন, কিন্তু বিপ্লবী জানে একটাকে রেখে আর একটাকে ভাঙা যায় না—দুটোই যে অবিচ্ছেদ্য—অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে—জট ছাড়ানো শক্ত। এতে ভয়ের (কিছু) নেই এই জন্যে, যেটা সত্যিকারের ভালো এবং সেই হিসেবে মানুষকে অনেকখানি গ্রাস করে রেখেছে, নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় সেটা প্রকাশ পাবেই—নতুনতর রূপে। সুতরাং রবিঠাকুরকে বাতিল করতে আপত্তি কেন? তাছাড়া, একটা নিয়ম বেঁধে দিলে—সেটা যদি 'স্টিম-রোলার'-এর মতো না চলে, ব্যক্তি-বিশেষকে অব্যাহতি দেয় তো—কায়েমীস্বার্থ বা vested interestকে প্রকারান্তরে জীইয়ে রাখা হলো। রবিবাবুর শিল্পী হিসেবে দাম কমছে না, তাঁরই কথিত—

> "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
> তব ক্রোধ তারে যেন তৃণসম দহে"১

বাণীর প্রয়োগটা তাঁরই বেলায় খাটাবো না কোন্ যুক্তিতে? যে 'সেন্টিমেন্ট' আপনার আহত হচ্ছে, তার জেরে দেখবেন শেষ পর্যন্ত গাঁয়ের একটি ঠাকুরকেও বাছা চলবে না। অথচ নির্মূল করার ব্রত নেওয়া হলো।

---

১. উদ্ধৃতিটি এইভাবেই মুদ্রিত হয়েছে। শেষ পংক্তিটি হবে—"তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে"।—সম্পাদক

এখানে আপনার ভয় আরও একটু ভাঙা দরকার। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্র-পরিষদের সভা তাঁরই 'বিচিত্রা' গৃহে তিনি ডাকেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো সাহিত্যে শাশ্বত মানদণ্ড আছে কি না যাতে কোন সাহিত্য চিরকাল থাকবে বলে দেওয়া যাবে। তিনি বললেন, তা অসম্ভব। জীবন গতিশীল, সে এক বস্তুকে একই ভাবে চিরকাল আঁকড়ে থাকতে পারে না। আজ পর্যন্ত কালিদাস, শেক্‌স্‌পীয়র বেঁচে আছেন বলা যায়, অথচ কত পরে এসে কিপলিং কত দ্রুত মারা গেলেন। সুতরাং দেখতেই পাচ্ছেন, তিনিও জানতেন, চিরকাল তাঁর সাহিত্য থাকবে না, তিনি বলেছিলেন তা। আমি উপস্থিত ছিলাম সে সভায়।

সুবোধবাবুর দ্বিতীয় নীতিটিও নির্ভুল। 'নেতি' দিয়ে বিপ্লবের শুরু। 'এগু' তো অনেক দূরে। সুতরাং ভাঙার পরে একথা ভাববার দরকার নেই যে, কোন্ নীতিটা মানবো। নীতি যদি কিছু থাকে তো সে পুরনোকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া। অর্থাৎ ভাঙার কাজটাই হবে নীতি।

"নির্জলা ব্যক্তিবাদ" কথায় কি বোঝাতে চেয়েছেন জানি না। তবে এটুকু জানি, বর্তমান ইনস্টিটিউশনগুলো ভেঙে নিঃশেষ করে দিলে যা বেঁচে থাকে তা হচ্ছে ব্যক্তি। নূতন সৌধ গড়ে উঠবে তাদের নিয়ে নূতন করে। ঐ ব্যক্তিটি চাপা পড়ে আছে আজ ইনস্টিটিউশন-এর চাপে। তাকে খুঁজে মুক্তি দেওয়াই গোড়ার কথা। গড়বার কথায় সুবোধবাবু আসেন নি এখনো, কারণ সে কাজটা দরকার হবে ভাঙা শেষ হলে। তার ঢের সময় পাওয়া যাবে। তার নেতা জন্মাবে ভাঙার কাজে যারা মাতবে তাদের ভেতর থেকেই।

এখানে একটা কথা বলে শেষ করি। 'প্রগতিশীল' কথাটা সংস্কারগন্ধী—সুতরাং বর্জনীয়। 'প্রগতিশীল' সাহিত্যিকের কর্ম নয় ঈশ্বর বা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার শ্মশান যাত্রা করা। তাঁরা 'ঈশ্বর', 'ভালো', 'নীতি'—সবই মানবেন। খালি, তাঁদের মাঝে যেটুকু মন্দ তাকে বাদ দিয়ে। সুবোধবাবু বোধহয় চেয়েছেন বিপ্লবী সাহিত্যের সূচনা।

ধীরেন্দ্রনাথ রায়

শ্রদ্ধেয় 'পরিচয়' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

পৌষের 'পরিচয়ে' আপনার পত্রিকা-প্রসঙ্গ আলোচনা পড়লাম। আধুনিক সাহিত্যের যে ধারাটি বহু তর্কের পর অনেকেই গ্রহণ করেছেন তা নিয়ে তর্কের

পুনঃপ্রবর্তন করায় সত্যই বিস্মিত হয়েছি। সে যাহোক, বিশেষ করে সুবোধ-বাবুর কথা-বার্তার অন্ধতামসিকতা আমাকে হতবুদ্ধি করেছে। এর চেয়ে তাঁর কথায় আমল না দেওয়াই হয়তো ভালো ছিল। কিন্তু আপনারা যখন আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেছেন এবং সাহিত্য-সমালোচনা সম্পর্কে সুবোধবাবু যে-ত্রুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তা নিয়ে বিচারের ক্ষেত্র থাকায় আমি কিছু মন্তব্য প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছি।

বাংলা সাহিত্যে প্রগতিশীল আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের উদ্ভব ও তার প্রকৃত স্থান সম্বন্ধে সুবোধবাবু বোধহয় পূর্ণমাত্রায় সচেতন নন। এই সঙ্ঘ যখন গঠিত হয় তখন তার নাম ছিল ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ। কারণ তখন পৃথিবীতে মানবসভ্যতার প্রধান শত্রু হিসাবে ফ্যাশিজম্ তার কুটিল ফণা বিস্তার করেছিল। সভ্যতা ও সংস্কৃতির, এককথায় মানুষের সুষ্ঠু আধ্যাত্মিক জীবনের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে ফ্যাশিজম্। সুতরাং উক্ত সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকে, বিশেষ করে সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার ফ্যাশিস্টসুলভ মনোবৃত্তিকে ধ্বংস করা। এদের কাজ কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ফ্যাশিজম্‌কে প্রতিরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যুগোপযোগী প্রগতিশীল সংস্কৃতি বিকাশের কাজেও অগ্রণী হন। এ থেকে বোঝা যায় যে বাংলার সংস্কৃতিতে বিশেষ করে সাহিত্যে পুরাতনী মনোবৃত্তিকে কাটিয়ে তাকে নূতনতর অভিজ্ঞতার পথে চালনা করা এবং এক সুস্থ সবল সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করার পথেই এই প্রচেষ্টা রূপায়িত হয়ে ওঠে। এর ফলে আধুনিক বাংলা সাহিত্য অতীতকে উত্তরাধিকার হিসাবে নিয়ে ভবিষ্যৎ-এর নব সার্থকতার পথে পা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সমাজ-জীবনের গণমুখী ধারাটিরও পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভব হয়েছে। ফ্যাশিজম্-এর প্রধান আক্রোশ—শোষিত জনগণের উপর। সুতরাং এই শক্তির প্রতিরোধে জনগণের স্বার্থকেই সফল করে তোলা হয়েছে এবং একমাত্র তাদেরই অন্তর্নিহিত ক্ষমতার উপর নির্ভর করা হয়েছে। অতএব, রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে অপূর্ণতার আক্ষেপ প্রকাশ করে অখ্যাতজনের যে-কবিকে আহ্বান করে গিয়েছিলেন তারই সাক্ষাৎ মেলে ফ্যাশিজম্-এর পরে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে।

আজকাল কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের প্রচেষ্টাকে বাংলা সাহিত্যে প্রগতিশীল আন্দোলন হিসাবে কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন। এবং এরই জন্য প্রগতি লেখক ও

শিল্পী সঙ্ঘের নামে কুৎসা রটানো হচ্ছে। আমার মনে হয়, সুবোধবাবু এই দলেরই প্রতিভূ। তাঁর প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ সম্বন্ধেও যেমন কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই, তেমনি কংগ্রেস সাহিত্য সম্বন্ধেও তিনি বিনাবিচারে গ্রহণ করেছেন। সাহিত্য—প্রগতি সাহিত্য হতে পারে কিন্তু কংগ্রেসী সাহিত্য বলে কোনো জিনিস নেই। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের পেছনে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ও আধুনিক যুগের জীবনবোধের কড়া তাগিদ কাজ করছে। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলা সাহিত্যকে যুগোপযোগী পর্যায়ে এনে তার গতিধর্ম বজায় রাখা, তাকে সজীব করে তোলা। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে কংগ্রেসী সাহিত্য কথাটি নিছক সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছু নয়। রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেসী মতবাদের পূর্ণ সার্থকতা থাকলেও সাহিত্যে তা অচল।

সুবোধবাবু বলেছেন যে, সাহিত্যের প্রগতিশীল সম্ভাবনাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে হলে বিপ্লবের প্রয়োজন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের প্রচেষ্টার পেছনে কি বিপ্লবী প্রয়োজন বা তাগিদ নেই? সুবোধবাবু হয়তো না বলতে পারেন, কিন্তু সকলের পক্ষে ও-কথা বলার মতো বুদ্ধির ধৃষ্টতা এখনও হয় নি। প্রগতিশীল সাহিত্য যাঁরা সৃষ্টি করেছেন বা করছেন তাঁদের কেবলমাত্র এক বিশেষ সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে, তা নয়। আসলে তাঁদের জিজ্ঞাসা হচ্ছে আধুনিক সমাজজীবনের মূলে। ধনী-দরিদ্রের এই বৈষম্যমূলক অবস্থায় সাধারণ মানুষের অপমান তাঁদের পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব নয়। এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে তাঁরা এই বিভেদের কৃত্রিমতা সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে উঠেছেন। সুতরাং আধুনিক প্রগতিবাদী লেখকরা যখন প্রচলিত সমাজব্যবস্থার রীতিনীতিকে কাটিয়ে নূতন পথের নূতনতর অভিজ্ঞতার সন্ধানী হচ্ছেন তখন তাঁদের এই প্রচেষ্টার পেছনে বিপ্লবী প্রয়োজন বা তাগিদ যে নেই তা কি করে বলা সম্ভব?

এর পর সুবোধবাবু উপরোক্ত বিষয়েরই সুর টেনে কতকগুলি কথা বলেছেন। সেগুলি যথাক্রমে ধার করা বিদ্যে নিয়ে প্রগতিশীল হওয়ার প্রহসন, সাহিত্যের স্লোগানসর্বস্বতা ও দলবিশেষের প্রোপাগ্যাণ্ডা। এই অভিযোগগুলি পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত। তাই উত্তরও আমি একসঙ্গে দেবার চেষ্টা করব। আজকে যে-সমস্ত লেখক প্রগতিশীল আন্দোলনে যোগদান করেছেন তাঁদের পেছনে নিশ্চয়ই সমাজ-

সচেতন মনের সক্রিয় সমর্থন রয়েছে। এখন এই সমাজ-সচেতনতা শুধুমাত্র একটা মতবাদ নয়। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করতে হলে যাঁদের মঙ্গলের জন্য আমরা আগামী দিনের সমাজকে রূপায়িত করতে চাইছি সেই সমস্ত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে হবে, তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও অভিজ্ঞতার ভাগীদার হতে হবে। এরই ফলে সমাজ-সচেতনতা শুধুমাত্র মতবাদ হিসাবে থেকে তার সঙ্গে আন্তরিকতার সংযোগ হবে। আর উপলব্ধির ক্ষেত্রে এই আন্তরিকতাকে সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করতে পারলে প্রগতিশীল আন্দোলন সত্যই সার্থক হবে। অন্যথায় প্রত্যক্ষ সংযোগ ও উপরোক্ত আন্তরিকতার অভাবে সুবোধবাবু যে দোষগুলি দেখিয়েছেন সেগুলি দেখা দেবে।

তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ এবং সর্বাধুনিক ননী ভৌমিকের গল্প উপন্যাসে আমরা এই আন্তরিকতার অভাব দেখি না। এই সমস্ত লেখক সব সময়ই আধুনিক জীবনের মূল সুরের সন্ধান করে চলেছেন এবং এই পরীক্ষার পথে তাঁরা সব পরিশ্রমই স্বীকার করেছেন। আমরা কি সত্যই বলতে পারি যে, এঁদের হাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রগতিশীলতার প্রহসন, শ্লোগানসর্বস্বতা ও দলবিশেষের প্রোপাগ্যাণ্ডা প্রভৃতি দোষে দুষ্ট? এঁরা প্রত্যেকেই নিপীড়িত মানুষের হৃদস্পন্দন অনুভব করে তাকে অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন এবং এদের মুক্তিকে সর্বমানবের মুক্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ যদি দলবিশেষের প্রোপাগ্যাণ্ডা হয় তো হোক। প্রগতিশীলতার প্রহসন এঁরা করছেন না, করছেন তাঁরা—যাঁরা এই নূতন আবহাওয়ায় পুরাতনকে পরিত্যাগ না করে মুখরক্ষার খাতিরে প্রগতির মুখোশ পরে জনসমক্ষে উপস্থিত হচ্ছেন। এঁদের সাহিত্যে সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে সহমর্মিতার কোনো বালাই নেই। নিজেদের অস্তিত্ব আজ সংকটাপন্ন হওয়ায় এঁরা কতকগুলি মেকি জিগির তুলেছেন।

এখন সুবোধবাবু সমালোচনার যে দুটি ধারার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলি বিচার করা যাক। প্রথমে তিনি বলছেন সমালোচনার নীতি হিসাবে বস্তুবাদকে চরম সত্য হিসাবে মেনে নিতে হবে। বিংশ শতাব্দীতে বাস করে আমরা প্রগতির প্রথম লক্ষণ হিসাবে মার্কসীয় মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছি। আর মার্কসীয় মতবাদে বস্তুকে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আধুনিক

সাহিত্যে সমালোচনার ভিত্তি হিসাবে বস্তুবাদকে গ্রহণ করায় কোনো বাধার সৃষ্টি হয় না। আসল বাধা দেখা দেয় এই নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে। সাহিত্যে বাস্তবতা বলতে আমরা লেখকের কাছে কোনো মতাবলম্বিতার দাবী করতে পারি না। সাহিত্যিকের রচনা কেবলমাত্র তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদের তালিকা হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত নয়। এজন্যই এঙ্গেল্‌স্ বলেছিলেন: "The more the views of the author remains hidden, the better for art", তাঁর মতে বালজাকের রচনাই বাস্তবতার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন, কারণ এখানে লেখকের ব্যক্তিগত মতবাদ চরম জয়লাভ করে নি।

এঙ্গেলস আরো বলেছেন: "but even socialist novelist, did not have to propound their views in novels. It is enough for them to depict real conditions faithfully and thus destroy the conventional illusions and at the same time arouse doubts concerning the eternal validity of the existing order. This aim could be attained without directly presenting the reader with a solution of these problems and, in certain cases, even without indicating where the sympathy of the author lay." সুতরাং বস্তুবাদী সমালোচনার নীতিকে গ্রহণ করে সব সময়েই উপরোক্ত দোষগুলিকে কাটিয়ে চলতে হবে। অন্যথায় বস্তুবাদ আমাদের কাছে হাতিয়ার হিসাবে না থেকে আমাদেরই ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

সুবোধবাবুর মতে সমালোচনার দ্বিতীয় মাপকাঠি হচ্ছে কোনোরকম প্রভুত্ব না মানা। একথা একেবারেই অসত্য। কোনো কিছুকে না মানা একমাত্র এ্যানার্কিস্টদের পক্ষেই সাজে। কিন্তু এ্যানার্কিজমকে তো আজ প্রগতিশীল মতবাদের ক্ষেত্রে স্থান দেওয়া হয় না। কথাটা অবিশ্যি খুব রোমান্টিক—কোনো প্রভুত্ব না মানা। আসলে কিন্তু ঐ স্বাধীনতার কোনো মূল্য নেই। সমাজ-বিবর্তনের ধারা হিসাবে ভবিষ্যৎ-এর আদর্শসমাজ সাম্যবাদীসমাজ রূপেই গঠিত হবে। সুতরাং আজকের সাহিত্যিক যখন সর্বপ্রকার নিপীড়ন ও দুঃখ-কষ্টের অবসান চাইছেন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বমানবের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থা তখন তাঁকে এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর আনুগত্য মেনে নিতেই হবে। আর এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর সাহিত্য রূপায়িত হবে। সমালোচনার ক্ষেত্রে ঠিক

এই কথা খাটে। এখানে নীতিকে না মানার কোনো প্রশ্নই ওঠা সম্ভব নয়। বিশেষত, যখন আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু এখনও নাগালের বাইরে থেকে গেছে।

আলোচনা শেষ করতে গিয়ে একটি কথা বলব। অপ্রীতিকর হলেও আশা কবি সুবোধবাবু বোঝবার চেষ্টা করবেন। আধুনিক সাহিত্যের প্রগতিশীলতা সম্পর্কে ঝপ্ করে কোনো মত প্রকাশ একমাত্র নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। মত প্রকাশের শুরুতে বহু বিষয় ভাববার রয়েছে, বহু পঠনপাঠন ও আলোচনার ক্ষেত্র রয়েছে। সুবোধবাবু যদি একেবারেই পুরোপুরি রায় না দিয়ে এগুলি বোঝবার চেষ্টা করতেন তাহলে হয়তো তিনি এভাবে আত্মপ্রকাশ করতেন না, আর আত্ম-প্রকাশ করলেও, তাঁর মতবাদে এতটা যুক্তিহীনতা ও অপরিণত চিন্তার পরিচয় পাওয়া যেত না। ইতি। ২৮শে পৌষ, ১৩৫৩

বিনীত

প্রভাতকুমার দত্ত*

---

* পরিচয়, পাঠকগোষ্ঠী, ফাল্গুন ১৩৫৩, পৃ ৬১২-১৬। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজনমতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

নূতন সাহিত্য / অনিলা গোস্বামী

কিছুদিন পূর্বে আমাদের জানানোর মতো একটা খবর রয়টার খুঁজে পেয়েছিল সোভিয়েট দেশ থেকে, তার সহজ অর্থ দাঁড়ায়, "সোভিয়েট লেখক সংঘ" থেকে জশ্‌চেঙ্কোর মতো জাঁদরেল লেখক বিতাড়িত হয়েছেন। বাস ঐ পর্যন্ত। বিশ্ববার্তা প্রতিষ্ঠানটির সত্যনিষ্ঠার কল্যাণে এই ঘটনা-বিজড়িত সম্পূর্ণ রহস্য জানবার সুযোগ আমাদের হয় নি। তা হয়েছে অবশ্য অনেক পরে অন্যজাতীয় উৎস থেকে—ব্যাপারটি এমন কিছুই নয় যার ভিতরে কোনো ব্যক্তিঘটিত "অবিচার" বা পূর্বপরিকল্পিত রাষ্ট্রিক স্বৈরাচার ফুটে উঠেছে। সমর অবসানে ওদেশে যেন পুনর্গঠনের হিড়িক পড়ে গেছে প্রতিটি ক্ষেত্রে, এমন কি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও; বহুদিন ধরে সমগ্র দেশব্যাপী লেখক ও পাঠকদের যে অবিরাম আলোচনা চলেছে তার অন্যতম ফল হিসেবে এই বহিষ্কারের ঘটনাটি দেখা চলে। লেনিন-গ্রাডের লেখকদের দ্বারা বিগত ২২শে আগস্ট তারিখে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে জশ্‌চেঙ্কো তাঁর লেখাগুলিতে সোভিয়েট জনগণকে বিদ্রূপ করতে শুরু করেছিলেন; "একটি বানরের দুঃসাহসিক কার্যকলাপে" তিনি লেনিন-গ্রাডের যুদ্ধকালীন ঐতিহাসিক প্রতিরোধের উপরেও এক হাত নিয়েছেন এই প্রতিপন্ন করে যে, পশুশালার একটি বানরের পেটে যতটুকু বুদ্ধি আছে তাও না থাকার দরুন ঐ মহানগরীর বাসিন্দারা শুধু বোকার মতো দুর্ধর্ষ নাৎসী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে অহেতুকভাবে জান দিয়েছে। তাঁর কলম এজাতীয় আরও কিছু কিছু প্রসব করেছে যার পক্ষে নৈতিক বোধ-শোধ একেবারে বিসর্জন না দিয়ে কেউ সুপারিশ করতে পারেন না, এ সত্ত্বেও লেখক সঙ্ঘের একটি দায়িত্বশীল পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন অনেকদিন ধরে, কিন্তু সাম্প্রতিক আলোচনার পর এরূপ প্রহসনের সত্যিই অবসান ঘটেছে। হাস্যরস সৃষ্টি করতে গিয়ে যে প্রতিক্রিয়া-শীলতার দিকে একবার বাড়িয়ে দেওয়া যায় না এ-মত বর্তমানে সোভিয়েট দেশস্থ সব লেখকই পোষণ করেন, আমাদেরও কাজে লাগতে পারে এমন কয়েকটি সিদ্ধান্তে এসে তাঁরা পৌঁছেছেন, যেমন,

১) সমরকালীন কোনো কোনো রুশ লেখায় পশ্চিম ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ডিকাডেন্ট স্বরটি ধ্বনিত হয়েছে, তা মোটেই সজীবতার লক্ষণ নয়। যে সামাজিক ব্যবস্থাকে পিছনে ফেলে রেখে আসা হয়েছে তার পতনধর্মী আদর্শ অনুসরণের প্রশ্ন একটি এগিয়ে যাওয়া সমাজতান্ত্রিক দেশের শিল্পীদের বেলায় উঠতে পারে না। মহিলা কবি আখমাটোভা, খাজিন, জশ্‌চেঙ্কো প্রভৃতি কিন্তু এই অবাঞ্ছনীয় প্রভাব বরণ করে নিয়েছেন, তাঁরা যেন স্বদেশের ভালো কোনো কিছুই দেখতে ভুলে গিয়েছেন এবং আর্টকে সমাজ বিরোধীরূপে কল্পনা করতে তাঁদের বাধে নি। এই সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে কোনো প্রকারেই আমল দেওয়া চলতে পারে না।

২) পিটার পাঞ্চ নামে ইউক্রেনীয় লেখকটি যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছেন যে লেখকদের "ভুল করবার অধিকার" থাকা সঙ্গত, তা মানা চলতে পারে না; কারণ ভুল করবার ওজুহাত মারাত্মক; তা যদি সচেতনভাবে করবার দুর্বুদ্ধি কাউকে পেয়ে বসে, যেমন অনেককে পেয়ে বসেছে।

৩) প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি বর্তমানকালে হতে পারে না, তার জন্য ভাবীকালের মুখ চেয়ে থাকতে হবে এরূপ ধারণা পোষণ করলে সমসাময়িক লেখকরা প্রকৃত সৃষ্টির তাগিদ হারিয়ে ফেলবেন।

৪) সমগ্র সোভিয়েটের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন পরিকল্পনাকে এবং সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে সহায়তা করা যে সাহিত্যিক কর্তব্য এ ভুলে থাকা চলবে না। আরও ভুলে থাকা চলবে না যে, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার যুদ্ধ দ্বিতীয় মহাসমর অবসানের সঙ্গে শেষ হয়ে যায় নি, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ খুলে ফেলবার এবং জনগণের অগ্রগমনকে ত্বরান্বিত করবার মহৎ দায়িত্ব থেকে কোনো একেলে লেখক নিষ্কৃতি পেতে পারেন না।

এই সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে আর একটি ঐতিহ্য-ভারাক্রান্ত দেশের আর্ট ও সাহিত্য-সংক্রান্ত আলোচনা মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। সম্প্রতি ফরাসী দেশে যে আর্ট সম্বন্ধীয় বিতর্ক হয়ে গেছে, তার মধ্যে প্রধানত তিনজন অংশগ্রহণ করেছেন। তিনজনই মার্ক্সবাদী এবং কমিউনিস্ট হলেও বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করেছেন।

ক) রজের গারোদি বলেছেন যে, "রসতত্ত্বে কমিউনিস্ট পার্টির লাইন বলে

কোনো জিনিস নেই", উক্তি পরে কোনো কমিউনিস্ট শিল্পী আত্মপরিচয় দিতে পারে না; তাঁর মতে কোনো শিল্পীর পক্ষে কোনো লাইন মেনে না চলে নিজের মতো চলাই সঙ্গত, তবে কোনো অনুপযুক্ত পদ্ধতির সাহায্যে যেন তিনি সৃষ্টি করতে না বসেন, তাহলে তাঁর পরিকল্পিত আদর্শকে রূপ দিতে পারা দূরে থাকুক, তাকে মাটি করতে বসবেন।

খ) পিয়ের এর্ভে বলেছেন যে, কমিউনিস্ট রসতত্ত্ব বলে কিছু নেই, আর্টের ক্ষেত্রে সমালোচক রসতাত্ত্বিক দিক দিয়ে নিছক ব্যক্তি হিসেবেই বিচার করতে পারেন।

গ) লুই আরাগঁ রসতত্ত্বে কমিউনিস্ট পার্টির নিরপেক্ষতা অস্বীকার করেছেন, তাঁর মতে রসতত্ত্বকেও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মাপকাঠিতে যাচাই করে নিতে হবে এবং তা না মানার মানে হলো এই যে শ্রেণীসংগ্রামে শিল্পের দায়িত্বকেই এক-রকম প্রায় না মেনে নেওয়া।

প্রথম দুজনের কথামতো রুশ সাহিত্যক্ষেত্রে তদ্দেশীয় কমিউনিস্ট পার্টির গায়ে পড়ে কোনো কথা বলাই উচিত হয় নি হয়তো, যদিও এজাতীয় ব্যাপার সেখানে একাধিকবার ঘটেছে, যখনি কোনো সংকট-মুহূর্ত দেখা দিয়েছে। অবিশ্যি কোনো পাকাপোক্ত ছক কেটে রুশ সাহিত্যিকদের তা অনুসরণ করতে কোনোকালেই বলা হয় নি, সে ধরনের অপবাদ নানা আকারে-ইঙ্গিতে বহু তরফ থেকে উক্ত দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চললেও। যে বিষয়ের উপর সাধারণত জোর দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, একটি দলবিশেষ (অপর দেশীয় বুর্জোয়া-সমাজের চক্ষুশূল হলেও) ওদেশের সামাজিক অগ্রগতিকে পথ দেখিয়ে চলেছে, তার কার্যক্রম সম্বন্ধে কোনো সাক্ষাৎ জ্ঞান না থাকলে ওদেশের কোনো আন্দোলন বা অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সংগঠনমূলক ব্যাপারকে ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, আর তা না করতে পারলে লেখকের পক্ষে সমসাময়িক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া অস্বাভাবিক নয়। তা প্রগতিবাদীদের পক্ষে সাম্য হতে পারে না। চোখের সামনে যা ঘটছে তার অর্থ বুঝে তার রসরূপ দানই হচ্ছে তাঁর কাজ, তার জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গী সম্মুখে রেখে তাঁকে চলতে হবে তার উপরে উক্ত দলবিশেষের অঙ্গুলিসংকেত অন্তত অতি সাধারণভাবে কাজ করতে পারে। লুই আরাগঁ বোধহয় নিজের দেশের পটভূমিকায় এ কথার সত্যতা না মেনে পারেন নি। নিরপেক্ষতার নামে লেখক যা-খুশি সৃষ্টি করতে আত্মিক নির্দেশ পেয়ে হয়তো

সচেতনভাবে "ভুল করবার অধিকার" দাবী করে বলতে পারেন, তার ফলে "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের" সূত্রটিকে প্রসারিত করতে করতে তিনি এমন পথ ধরতে পারেন যাতে প্রতিক্রিয়াশীলতাকে মুখোমুখী রুখবার কথা বিস্মৃত হয়ে যেতে পারেন—এতে প্রগতির দুশমনদেরই (যাঁরা "চিন্তার স্বাধীনতার" শ্রেষ্ঠ শত্রু) খুশি হয়ে ওঠার কথা ! বর্তমান পৃথিবীতে জনগণের লড়াই শেষ হয়ে যায় নি, বরঞ্চ সঙ্কট-কালের মধ্য দিয়ে সব দেশ চলেছে—এ সময় আরও গুরুত্বপূর্ণ এইজন্যে যে দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র কায়েমীস্বার্থ রক্ষার শেষ চেষ্টা করছে এবং ছদ্মবেশী ফ্যাশিবাদ নিজেকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। তাই যুদ্ধ-সময়ের মতো দুইটি পক্ষ আমাদের সামনে ভাসছে, এর একপক্ষ গ্রহণ করতে হবে এবং নিরপেক্ষতার কোনো পথ আর খোলা নেই (যাঁরাই এর জন্য মায়াকান্না করুন)—আজকের জনযুদ্ধ লড়বে যারা তাদের জন্যে শিল্পীর কিছুই করবার নেই কি ? এরূপ বিচার থেকেই লেখনীর অবাধ গতিকে বাধা দেওয়ার কথা ওঠে, যেমন হিটলার-আতঙ্কের সময়ে রাশ দৃঢ় করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। যে হিটলারবাদের ভূত আজও বেঁচে রয়েছে বিভিন্ন দেশের কায়েমীস্বার্থকে আগলে—কি ভূমিব্যবস্থার মধ্যে, কি শিল্প-উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে, তার সম্বন্ধে প্রগতিকামী লেখকদের তরফ থেকে নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্যের কোনো অবকাশই নেই—একথাই যেন লুই আরাগঁ বলতে চেয়েছেন।

এতখানি উদ্ধৃতির প্রয়োজন হলো আর একটি সাহিত্য-সম্পর্কিত আলোচনাকে যথার্থভাবে যাচাই করতে। বলা বাহুল্য, সে হচ্ছে বাংলা সাহিত্যে প্রগতি আন্দোলনকে উপলক্ষ করে একটি সাম্প্রতিক আলোচনা, এর সূত্রপাত করেছেন শ্রীযুক্ত সুবোধ দাশগুপ্ত "প্রভাতী" পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর "নূতন সাহিত্য" প্রবন্ধে। তাঁর স্বপক্ষে-বিপক্ষে নানা কথা উঠেছে। 'প্রভাতী'তেই অশোক মিত্র, অরুণকুমার সরকার প্রভৃতি তাঁদের মতামত পেশ করেছেন, এমনকি 'পরিচয়ে' হিরণবাবুর মতো কম লিখিয়ে লেখক, যিনি সচরাচর নানা বিষয়ে চুপ করে থাকতে ভালোবাসেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে কোন পক্ষ অবলম্বন করতে হবে লেখককে, সে বিষয়ে সকলেরই উক্তি প্রায় এক প্রকারের, অর্থাৎ সকলের মতেই দেউলিয়া পুঁজিবাদ-ফ্যাশিবাদের স্তাবক সাজতে পারেন না কোনো বিবেকবান লেখকই। সমাজ-প্রগতি যে আপনা থেকেই সম্ভব হয়ে উঠবে তা নয়, তার

সম্ভাবনাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার বিষয়ে দাশগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে হিরণবাবুর কোনো মতানৈক্য নেই।

সুবোধবাবু তাঁর মন্তব্যগুলিকে যথাসাধ্য বেশী শাণিত করবার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তার দরুন কিছু অহেতুকভাবে রূঢ় হতে হয়েছে তাঁকে। আজকের দিনে আক্রমণাত্মক সমালোচনার চেয়ে যা বেশী দরকার—তা হচ্ছে constructive criticism বা পথনির্দেশক আলোচনা, যা সাহিত্যিককে তাঁর ভুল বুঝিয়ে দিতে অধিকতর কার্যকরী হতে পারে। এরূপ আলোচনা নিছক নেতিমূলক (negative) না হলেই ভালো হয়; অথচ এদিকে অনেকেই কেন যেন ঝোঁকেন না। প্রগতিশীল নামধারীদের লক্ষ্য করে—"ধার-করা বিদ্যে" এঁদের সম্বল, প্রগতির ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করেও সাহিত্য-ক্ষেত্রে এঁরা দাঁড়কাকই হয়ে রইলেন, দলবিশেষের ফরমাইস অনুসারে এঁরা লেখেন ইত্যাদি—একটির পর একটি চোখা চোখা বাক্যবাণ সুবোধবাবু তাঁর তূণ থেকে নিক্ষেপ করেছেন। তাঁদের সম্পূর্ণ দোষ-গুণ ভালো করে বিবেচনা না করেই প্রায় এক কথায় তাঁদের বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁরা ফ্যাশিবাদকে অপরোক্ষভাবে সহায়তা করা ছাড়া আর কিছুই এ কয়েক বছর ধরে করেন নি। বোধ হয় তাঁর বক্তব্য এই যে, সত্যকার বিপ্লবী মন নিয়ে যেসব সাহিত্যিক দেখা দেবেন তাঁরা এঁদের থেকে স্বতন্ত্র জাতের, তাঁরা বাস করছেন ভবিষ্যতের জঠরে। একথা বলা মানে সমসাময়িকদের সৃষ্টিক্ষমতাকে উৎসাহ না দিয়ে স্পষ্ট বলে দেওয়া যে, সাহিত্যের আসর থেকে এই বেলা তোমরা বিদায় নিতে পার। এরূপ কথায় সাহিত্যান্দোলনকে সাহায্য না করে প্রকারান্তরে ব্যঙ্গ করাই হয়। এর দ্বারা সুবোধবাবু যে নয়া আন্দোলন সৃষ্টি করতে চান তা সম্ভব হয়ে উঠবে না। আমার মনে হয় সাহিত্যালোচনার মাপকাঠিকে প্রগতিশীল করতে গিয়ে এমন একটি সঙ্কীর্ণ ছকে রূপান্তরিত করে ফেলা উচিত নয় যা অনুসরণ করতে গিয়ে হিরণবাবুর ভাষায় ঠগ বাছতে গ্রাম উজাড় হয়ে যায়।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোনো প্রগতিবাদী সাহিত্যিক যদি ঠগ সেজে থাকেন তাঁর ভুল দেখিয়ে দেওয়া অসঙ্গত নয়, কিন্তু গাল দিয়ে ঠিক সেই কাজটি সাধিত হতে পারে না। দাশগুপ্ত মহাশয়ের মাপকাঠিতে একালের সকলেই মারা পড়েন, পূর্ববর্তীরাও মারা পড়েন, যেমন—মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সকলেই। তাঁরা ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন নি, অতএব তাঁরা তাঁদের সময়ে যে প্রগতিশীল

দায়িত্ব পালন করেছেন সে কথাও অস্বীকৃত হয়ে পড়ে। তাঁর পথানুবর্তী অরুণ-বাবু বলেছেন, "সাম্প্রদায়িক বঙ্কিম আমাদের মনেও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন, এখানেই তাঁর সফলতা ও শক্তি।" একথাও অযথার্থ উক্তির সামিল, কারণ বঙ্কিমের যুগ দিয়ে তাঁকে বিচার করা হচ্ছে না; তিনি যে সময়ে জাতীয়তাবাদের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন সে সময়ে এদেশী মুসলমানেরা অনেকে নিজেদের বিদেশী বলে মনে করতেন এবং তা থেকে তখনকার নবজাগ্রত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের বাদ দিয়েই নিজেকে ঘোষণা করেছে, এ একটা ত্রুটি সন্দেহ নেই, কিন্তু এর জন্যে প্রতিক্রিয়াশীলদের দলে বঙ্কিম পড়েন না (একথা গোপাল হালদারও স্বীকার করেছেন)। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের আনাচে-কানাচে বহু ডিকাডেণ্ট সুর ধ্বনিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও তিনি অন্তত এদেশী সমস্ত মানসকে যে অনবরত আঘাত হেনেছেন এদিক দিয়ে যুগপ্রগতিকে তিনি রীতিমতো প্রেরণা দান করেছেন। ধর্মবিশ্বাস সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র নারীর মূল্য নূতন করে বিশ্লেষণ করে আঘাত করেছেন দেশের জবুথবু অনড়-অচল সনাতন সমস্ত বিশ্বাসগুলিকে। (মধুসূদন-বঙ্কিমও বহুপ্রকারের সামন্ততান্ত্রিক বিশ্বাস-গুলিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন)। অবশ্য ত্রুটি থেকে তাঁরা কেউ মুক্ত নন এবং বালজাক অথবা সারভেন্টিসের কাজ কেউ করতে সক্ষম হন নি, তার কারণ এদেশীয় বুর্জোয়া-মানস পরদেশী সাহিত্য ও সংস্কৃতির আওতায় অস্বাভাবিক-ভাবে গড়ে উঠেছে এবং সেজন্যে সামন্ত জীবনধারাকে চরম আঘাত হানবার যে দায়িত্ব পালনে বুর্জোয়াধর্মী দিক্‌পাল সাহিত্যরথীরা অক্ষমতা দেখিয়েছেন তা ভালোভাবে সুষ্ঠুভাবে শেষ করবার দায়িত্ব পড়েছে বর্তমানের শিল্পীদের উপরে। তাঁরা কতখানি সে কাজে এগিয়ে গিয়েছেন তা বিচার করেই তাদের সম্বন্ধে রায় দান সঙ্গত। বিপ্লবী কর্তব্যের দুটি দিক রয়েছে; Negative বা নেতিমূলক এবং Positive বা গঠনমূলক। দুদিকেই প্রগতিশীল শিল্পীদের নজর দিতে হবে, বোধহয় হালের সাহিত্যিকরা কম-বেশী নেতিমূলকভাবেই দৃষ্টিভঙ্গীকে সৃষ্টির কাজে সঞ্চালিত করেছেন। তাই দেখতে পাই বিপ্লবী চরিত্র তাঁরা কেউ আঁকতে পারেন নি বা পারছেন না (এমন কি মধুসূদন যেমন রাবণকে এঁকেছেন অথবা বঙ্কিম যেমন আনন্দমঠের কর্মীদের এঁকেছেন অথবা শরৎচন্দ্র যেমন বলিষ্ঠ মানস-শক্তিসম্পন্ন সংস্কারকামী যুবকের চরিত্র এঁকেছেন, ঠিক তেমনি করেও কোনো আধুনিক শিল্পী কোনো চরিত্রাঙ্কনের কেরামতি দেখান নি, তার অর্থ বিপ্লবের

াতি চিত্রণে তাঁরা উৎসাহী নন অথবা অনিচ্ছুক যাই বলুন)। তাঁদের লেখায় সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ফুটে ওঠে না, কিন্তু সেহেতু তাঁরা কি সবাই ফ্যাশি-বাদের দোহাররূপে কাজ করছেন? তাঁরা অন্তত বর্তমান সামাজিক পরিবেশের যথার্থ রূপ আঁকতে সমর্থ হয়েছেন, তার নোংরামী, তার দুঃখ-দৈন্য, দারিদ্র্য-দুর্দশা, দুর্বলতাকে নানাভাবে ফুটিয়েছেন, সে সাফল্যকে সাময়িক প্রয়োজনানুগ বলব না তো কি? যেমন তারাশঙ্কর আগে গ্রাম্য সামন্ত-সমাজের ছবি আঁকতেন রোমান্টিক মন দিয়ে, কিন্তু 'গণদেবতা'-'পঞ্চগ্রামে'র আলেখ্য গ্রাম্য শোষকদের পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো কোনো গল্পে শোষকচরিত্রের ভণ্ডামি-বেয়াদপিকে রূপ দিয়েছেন; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এখনও রোমান্টিক ধাঁধা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, বোধ হয় পারবেন না যদি না কাব্য-ঘেঁষা আঙ্গিক, ভঙ্গী এবং দৃষ্টিকোণকে তাড়াতাড়ি সময় থাকতে বদলে ফেলেন, সকল কুলের মনোরঞ্জনের বাহাদুরীর মোহ বর্জন করেন; প্রবীণ শিল্পী পরিমল গোস্বামীর নাম প্রগতি সাহিত্য-প্রসঙ্গে উচ্চারিত হতে বড় দেখি না, কিন্তু অন্তত কতকগুলি গল্পে যুদ্ধোত্তর অথবা যুদ্ধকালীন কদর্যতার যে ব্যঙ্গরূপ অঙ্কন করেছেন তার মূল্য কম করে দেখা উচিত নয়; সুশীল জানাও দুর্ভিক্ষ-চোরাবাজার-বিধ্বস্ত গরীব সমাজের চিত্রাঙ্কনে প্রথম শ্রেণীর না হলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর দক্ষতা দেখিয়েছেন; গণনাট্যের দু-একটি নমুনায় ভেঙ্গেপড়া জীবনযাত্রার ছবিই ফুটে উঠেছে, তেমন সাফল্যপূর্ণভাবে না হলেও; ভাষার জোর এবং অদ্ভুত মানসিক সংসাহস থাকা সত্ত্বেও বিনয় ঘোষ ছোট গল্পে সফল হতে পারেন নি বোধ হয় প্রাবন্ধিক মানসিক গঠনের দরুন, তবু তাঁর "শ্রীবংসের নানাপ্রসঙ্গ" চোরাবাজারীয় সভ্যতার উপর চমৎকার ব্যঙ্গরচনা-সমষ্টি রূপে বর্ণিত হতে পারে; এমনি আরও অনেকের সম্বন্ধে বলা চলতে পারে। এঁদের সকলের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বর্তমান ব্যবস্থার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন হয়েছে, সমগ্র ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য এরও প্রয়োজন উপেক্ষিত হতে পারে না। এঁদের যে ত্রুটিগুলির কথা আমাদের মনে হয়ে থাকে তা হচ্ছে—এঁরা (এক পরিমল গোস্বামীকে বাদ দিয়ে বললে) গল্পাংশের উৎকর্ষের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সচেষ্ট নন, কতকটা যেন এঁরা ফটোগ্রাফিক মনোবৃত্তি দেখিয়ে থাকেন, তাই এঁদের হুবহু বাস্তবের অনুকৃতিরূপে অঙ্কিত চিত্রগুলি কখনো কখনো morbid অথবা নীরস হয়ে পড়ে, সজীব ও সবল কল্পনার আশ্রয় এঁরা কখনোই প্রায় নেন না; এমন কি তারাশঙ্করের মতো

শক্তিশালী শিল্পীও অনাবশ্যক আড়ম্বর সৃষ্টি করে প্রায়শ নীরস হয়ে পড়েন পাঠকের কাছে। মানিকের তো কথাই নেই। এছাড়া অনেকেই অনবরত লেখার তাগিদে নির্বাচিত ঘটনাগুলিকে ভালো করে স্বীয় মানসে সাজিয়ে না নিয়ে শিল্পরূপ দিতে বসেন, তার ফলে অনেক অবাঞ্ছিত বাহুল্য এঁদের রচনায় অনিবার্য হয়ে পড়ে যা পাঠকের পক্ষে ক্লান্তিকর। আর একটি কথা, এঁদের লেখায় উইট্ কি হিউমার নামীয় বস্তুটির অভাব বড চোখে পড়ে, অর্থাৎ হাস্য-রসের বালাই এঁদের লেখায় নেই—দুই-একজনের ক্ষেত্রে ছাড়া, এঁরা যেন পণ করে পাঠকের চোখে ধারা বইয়ে দিতে অথবা পাঠকমনকে ভারাক্রান্ত করতে লেখনী ধারণ করেছেন। বর্তমান জীবনের গলদ নিয়ে কাঁদুনীর চেয়ে তার উপরে ব্যঙ্গচিত্রের দাম বেশী। এঁদের সম্বন্ধে সুবোধবাবুর কড়া মন্তব্যগুলি সম্পূর্ণরূপে সত্যি না হলেও এঁদের আত্মসন্তুষ্টি সর্বতোভাবে সমালোচনা করা কর্তব্য। তিনি একটি কথা যথার্থই বলেছেন যে, বিপ্লব সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা এঁদের নেই, ধারণা থাকলেও অন্তত লেখায় তা ফুটে ওঠে না। সেজন্য বর্তমান শ্রমিক-কিষাণ আন্দোলনগুলি সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত থাকাও এঁদের বেলায় আবশ্যক হয়ে পড়েছে, অবশ্য সে পরিচিতি একেবারে নেই সেকথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। কত বড় মহৎ কাজ এঁদের সামনে রয়েছে! বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক কর্তব্যগুলি বর্তমানে আর বুর্জোয়া শিল্পীদের দ্বারা সাধিত হতে পারে না, তা বোঝা যাচ্ছে বিপরীত ভাবাপন্ন লেখকদের ধরন-ধারণ লক্ষ্য করে, সে কাজগুলি এবং গ্রাম্য-শহুরে সর্বহারাদের পথনির্দেশক চিত্রাঙ্কনের কাজগুলি একসঙ্গে করে যাওয়ার দায়িত্ব ঘাড় পেতে এঁদের নিতে হবে, নইলে প্রগতির যথার্থ বাহক এঁরা হতে পারবেন না। যদি কেউ বলেন যে এঁদের দ্বারা তা সম্ভব হবে না, তাহলে তিনি সাহিত্যান্দোলনের শ্রেষ্ঠ ক্যাডারদের বাদ দিয়ে তা সফল করতে সংকল্প করেছেন, যা হতে পারে না। শুধু খুঁত দেখে দেখে সাফল্যের দিকটা একেবারে না দেখতে পারার মধ্যে বুদ্ধির জলুস থাকতে পারে, কিন্তু কৃতিত্ব নেই। ছদ্মবেশী দেশী-বিদেশী ফ্যাশিবাদের যে কোনো রকমের গণ-আন্দোলনের উপর আক্রমণ থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, তার মরণ-কামড়ের পালা শুরু হয়েছে, প্রগতিকামীদের বর্তমানে তার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের পালা, সে লড়াইয়ে তাঁরা অক্ষমতা প্রমাণ করেছেন অথবা করবেন এমন কথা বলে তাঁদের এক পা এগিয়ে যাওয়াকেই যেন রুখে দেওয়া হয়।

এভাবে সুবোধবাবু-পরিকল্পিত নূতন রেনেসাঁ আন্দোলন শক্তিলাভ করবে না।

সুবোধবাবু ধর্ম বা নীতি না মেনে চলবার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁর কল্পিত আন্দোলনকারীদের। সারবস্তুকে এড়িয়ে গিয়ে তার উপরে যে খোলস রয়েছে তাকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগার মতো কথা এ যেন। যে ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজে টিকে রয়েছে, তার কলেবরে সনাতনের অস্থিকঙ্কাল অনেক কিছুই রয়েছে ওতপ্রোত হয়ে, সামন্ততান্ত্রিক এমন কি গোত্রতান্ত্রিক, পুরুষতান্ত্রিক বিশুদ্ধ শোণিতের ব্যবস্থাগুলিও গোপনে তার মধ্যে ধুক ধুক করছে, তার পরিচয় এযুগের অনুসৃত বিধিনিষেধগুলির মধ্যেও পাওয়া যায়, কিন্তু তার সব কিছুর মধ্যে বড় সত্য হয়ে রয়েছে আধা-সামন্ত আধা-বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট শোষণ-ব্যবস্থা, তার উপরেই আর সব কিছু দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে বনিয়াদ ভেঙে পড়লে উপরের যাবতীয় নির্মাণ-কার্য ধূলিতে লুটিয়ে পড়বে। আজকের শিল্পীর দৃষ্টি বিশেষ করে পড়া দরকার সেই বনিয়াদটির উপরে, তার দুর্বলতা ও একালের সহিত সামঞ্জস্য-হীনতাকে লোকমানসের গোচর করাই হবে তার সবচেয়ে বড় করণীয়। ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদের চেয়েও ভণ্ড ধার্মিকদের প্রকৃত সামাজিক রূপ উন্মোচন জনসাধারণের আত্মসম্বিৎলাভের পথে অধিকতর কাজে লাগবে। "ঈশ্বরকে না মেনে চল"—এ ধরনের বৈজ্ঞানিক-দ্বান্দ্বিক সদুপদেশ হয়তো শ্রেণীসংগ্রামের মূলে আঘাত করতে পারে, কারণ নিপীড়িত শ্রেণীমানসে ধর্মের ধোঁকাটা এমনভাবে রয়েছে যে উপদেশ দ্বারা তার উৎপাটন সহজ না হওয়াই স্বাভাবিক, তার চেয়ে সেই সংগ্রামের গতিবেগ বৃদ্ধির পক্ষে অনুপ্রেরণা দিতে পারে এমনতরো সাহিত্যিক সৃষ্টি বেশী কার্যকরী হবে। অর্থাৎ, সুবোধবাবু সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রাকৃটিক্যাল দিকটা তলিয়ে দেখছেন না, গালভরা বড় বড় কথার মধ্যে প্রগতির স্বরূপ অনুসন্ধান করছেন। "কিছু মানব না" অথবা "যে বিধিনিষেধ টিঁকে রয়েছে তা একবাক্যে অস্বীকার কর"—এ জাতীয় উক্তির মধ্যে লেনিন-বর্ণিত বামপন্থী বিচ্যুতি (Left deviation) ধরা পড়ছে, যা আজকের সংগ্রাম-সাফল্যকে এগিয়ে না দিয়ে বরং পিছিয়ে দেবে, শিল্পীর পক্ষে তো ঐ বিচ্যুতি তাঁকে ধর্মান্ধ জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার দিকেই সাহায্য করবে। অর্থাৎ, গণশিল্পী জনগণ থেকেই বেশী উগ্র আক্রমণকারী হতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। তাছাড়া যেসব লেখকদের মনে সংস্কার বেঁচে রয়েছে তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা অসম্ভব হয়ে

পড়বে। তাঁদের সঙ্গে একত্র সম্মিলিত ফ্রণ্টে থেকে যে লড়াই কায়েমীস্বার্থের বিরুদ্ধে করা চলছে, তাকেও এক আঘাতে দু-টুকরো করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, সর্বতোভাবে জেহাদ—অর্থের চেয়ে অনর্থই অধিক প্রসব করবে, যা সুবোধবাবুও আকাঙ্ক্ষা করেন না। প্রগতি-শিল্পীদের বরঞ্চ দলকেন্দ্রিকতা (sectionalism) কিছু বেশী পরিমাণে রয়েছে, যা একটা বড় রকমের ত্রুটি, তা থেকে অব্যাহতির আবশ্যকতা ফ্যাশিবিরোধী সংঘ গড়তে গিয়ে এই সেদিন তাঁরা অনুভব করেছিলেন, কিন্তু সে ত্রুটি ক্ষালন হয়ে যায় নি। সম্মিলিত ফ্রন্টকে টিকিয়ে রাখার ইচ্ছা কখনোই প্রতিক্রিয়া-শীলতার সঙ্গে আপস প্রবৃত্তিরূপে নির্ণীত হতে পারে না। আরও সুবোধবাবু যেন ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছেন যে, পূর্ববর্তী শিল্পীদের থেকে গা বাঁচিয়ে থাকলেই যেন আজকের সাংস্কৃতিক আদর্শকে অক্ষত রাখা যায়। কিন্তু পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে কিছুই শিক্ষণীয় নেই কি ? তাঁদের নানারকমের লেখায় যে আবেগ, প্রাণচাঞ্চল্য ও সৃজনীশক্তি ছড়িয়ে রয়েছে, তার অভাব বেশী করে চোখে পড়ে একালের লেখায়—শরৎচন্দ্রের পরবর্তী সাহিত্যে প্রাণের আবেগ যেন অন্তর্ধান করেছে ! আধুনিক শিল্পীমন যে অভাবের সাক্ষ্য দিচ্ছে তা পূরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে পূর্ববর্তী সাহিত্যের ঋণ অসঙ্কোচে স্বীকার করে নেওয়া। মাইকেল-বঙ্কিম-যুগের জীবন্ত শিল্পসাধন একালের সাধনাকে যথেষ্ট প্রেরণা দিতে পারে। সে যুগে সামন্ত-সংস্কারগুলি কাটিয়ে ওঠা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব হয় নি এবং ধর্মবিশ্বাসকেও ছিন্ন করবার প্রশ্নও ওঠে নি, শুধু সমাজগত ও ধর্মগত ব্যবস্থাকে সংস্কার করবার প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে, তবু তার মধ্যে দিয়েও প্রচলিত বিধি-বিধান প্রচুর আঘাত লাভ করেছে, সময়ের তুলনায় সে কম কথা নয়। আরও লক্ষণীয় এই যে, সে যুগের শিল্পী যা প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছেন তারই শিল্পরূপ দিয়ে গেছেন, সেই অনুভূতির প্রাবল্য একালের বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্যের অন্তরালে হারিয়ে যেতে বসেছে, এ কিন্তু আমার কথা নয়। তাই বিগত যুগের নিকটে শিক্ষানবিসির প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া চলে না তাঁদের পক্ষেও যারা প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভেঙ্গেচুরে একেবারে নূতন সমাজ গড়বার জন্য লড়াই করবেন।

সুবোধবাবু সমসাময়িক প্রগতির ছাপমারা সাহিত্যে কোনো দলীয় ফরমাইসের গন্ধ অনুভব করে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁর মত অনুসারে এর কোনো মার্জনা নেই, যদিও প্রগতিশীল সাহিত্য প্রত্যক্ষভাবে না হলেও প্রচারমূলক হতে বাধ্য। সোজা

কথায়, প্রচারমূলকতায় দোষ নেই, দলীয় হুকুমনামার দ্বারা যেন সাহিত্যের গতি নির্ধারিত না হয়। একথা অনেকাংশে সত্যি। কিন্তু বঙ্গদেশীয় সাহিত্যান্দোলনে ঠিক এই জিনিসটি ঘটেছে কি না তার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল না কি? কোনো রাজনৈতিক দলবিশেষের প্রচারের একটা দিক থাকা নিন্দনীয় কিছু নয়, তার সৌকর্যার্থে কোনো কোনো শিল্পীর শিল্পপ্রচেষ্টার সামান্য অংশ হয়তো নিয়োজিত হতে পারে, তা থেকে প্রমাণ হয় না যে তাঁর সমস্ত সাধনাকে দলীয় কাজে লাগাতে ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন। যদি দলবিশেষের সাধারণ চিন্তাধারা, যেমন মজুর-ধর্মঘট, কি কিষাণের তে-ভাগা আন্দোলন বা জমি দখলের লড়াই অথবা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণ থেকে কেউ সৃষ্টির প্রেরণা পান তা কি একান্তই দোষের? প্রথমেই বিচার করে দেখা কর্তব্য যে সেই বিশ্লেষণ সামাজিক প্রগতির বিরোধী রূপ গ্রহণ করেছে কি না অথবা করতে পারে কি না। তার মধ্যে যদি এমন আন্দোলন সৃষ্টির ইঙ্গিত থাকে যা আজ অথবা আগামীকাল সামাজিক বিপ্লব সাধনে সহায়ক হবে, তবে তার প্রতি উদাসীন থেকেই কি বিপ্লবী সাহিত্য সৃষ্টির কাজ ভালো চলবে? সোভিয়েট দেশে যে সাম্প্রতিক সাহিত্যালোচনার পর্ব শেষ হয়েছে, যার কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তা থেকে এ প্রশ্নের একটা সহজ উত্তর সম্ভবত পাওয়া যেতে পারে। সৃষ্টির পশ্চাতে কোনো পরিকল্পনা থাকাই অপরাধ নয়, যদি না সেই পরিকল্পনা অকেজো অথবা প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিপোষক হয়ে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক সেরা সেরা সৃষ্টির পশ্চাতে ফরমাইসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আজ যদি কেউ ভালো একখানি শ্রেণীসংগ্রামের আলেখ্য অঙ্কন করেন, তা হয়তো দলীয় কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, তা বলে কি তার সাহিত্যিক মূল্য নষ্ট হয়ে গেল, তাহলে তো "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের স্রষ্টা বঙ্কিমের সাহিত্যিক মৃত্যু অনেক পূর্বেই ঘটে গেছে? অবশ্য একথা যে যথার্থ দলীয় বিধিনিষেধ কোনো সাহিত্যিকের ঘাড়ে চেপে বসলে সুফল ফলতে পারে না। সুবোধবাবু কি তার কোনো প্রমাণ বাংলার প্রগতিশীল নামধারী লেখকদের আচরণে পেয়েছেন? বোধহয় স্লোগান-মুখর দু-একটি গানের কলিতে তাঁর বিভ্রমের কারণ ঘটেছে। কিন্তু প্রগতিশীলদের সমগ্র প্রচেষ্টাগুলির সঙ্গে পরিচয় রেখে কি তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন? আজ দেশের বুকে যে ঝড় বয়ে চলেছে তার ঝাপটা শিল্পীমনকে কিছু পরিমাণে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে, কিন্তু তাকে দিশেহারা হতে দেওয়া চলবে না। তাই

শিল্পীকে মাঝে মাঝে কঠোর মন্তব্য শুনতে হবে বৈকি, কিন্তু অকারণ আক্রমণে তাঁকে ঘায়েল করবার প্রবৃত্তি ঠিক সমালোচকসুলভ নয়—একথা স্মরণে রেখে আমাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হবে, যার জন্য সুবোধবাবু ঠিক সাময়িক প্রয়োজনীয়তা হিসেব করেই আন্তরিক ব্যগ্রতা প্রকাশ করেছেন। এ ধরনের আলোচনার উপযোগিতা অনস্বীকার্য, এবং এর সূত্রপাত করে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

প্রগতি সাহিত্যান্দোলনকে সফল করবার কথা আজ সকলের মনে জেগেছে, এ আশার লক্ষণ। মাত্র কয়েক বছর পূর্বে আন্দোলন আমরা আরম্ভ হতে দেখেছি কয়েকজনের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে, যখন সুরেন গোস্বামী প্রভৃতি শ্রেণী-সংগ্রামের আদর্শ সামনে রেখে "প্রগতি লেখক সংঘ" গড়েছিলেন; তারপর যুদ্ধের হিড়িকে এ সংঘের নাম পাল্টায় এবং আকৃতি ও প্রকৃতিগত কিছু পরিবর্তনও দেখা দেয়; তারপর পূর্বের নামটিই পুনরায় গৃহীত হয়েছে। এর ভিতরে নূতন করে জীবন সঞ্চার করতে আন্তরিকভাবে কেউ যদি চান তাঁর কাছ থেকে আশা করা যায় যে মামুলী ধরনের পেশাদার হওয়া তার চলবে না, যেহেতু তাঁর কাজটি হচ্ছে সেই ধরনের যা বঙ্গীয় রেনেসাঁর সূচনার মুখে মাইকেল তাঁর সামনে দেখেছিলেন। এক যুগ তার সব কিছু দুর্বলতা বুকে করে শেষ হতে চলেছে, কিন্তু শেষ হয়ে যায় নি, তার সাহিত্যিক আদর্শও যেন শেষ করে ফেলেছে তার পরমায়ু—সে আদর্শ যেখানে জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারে নি অথবা আধা-সামন্ত বুর্জোয়া-ব্যবস্থার সঙ্গে রফা খুঁজতে চেয়েছে, সেখানে নূতন পথ কেটে চলবার সময় এসে গেছে। অর্থাৎ, প্রগতিশীল সাহিত্যিক নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করবেন যে প্রচলিত ব্যবস্থার বহু ক্লেদ-পঙ্ক-গলতি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি, এসবের নিখুঁত ছবি তিনি এঁকেছেন, তা হচ্ছে Negative vision বা নেতিমূলক পর্যবেক্ষণ—তাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয় এই যুগসন্ধিক্ষণে, এই জঘন্য সামাজিক জগৎ থেকে বেরিয়ে আসার পথ তিনি যেন তাঁর সম্মুখে দেখতে পান, তা নইলে ভাবী বিপ্লবের সাংস্কৃতিক ভূমিকাকে কি করে তাঁর সৃষ্টিগুলিতে রূপ দিতে পারবেন? প্রথম কাজটিতে দক্ষতা অনেকে দেখিয়ে চলেছেন তার পরিচয় নানাভাবে পাওয়া গেছে—কিন্তু শেষোক্ত কাজ, মানে যা ঠিক চিত্রকর বা ফটোগ্রাফারের দায়িত্ব থেকে কিছু স্বতন্ত্র, এড়িয়ে গিয়ে কেউ কি যথার্থভাবে নিজের কাছেই জবাবদিহি করতে পারেন? সুবোধবাবুর বেপরোয়া গাল-মন্দের

ভিতর দিয়েও এরূপ প্রশ্নই যেন ভাষালাভ করেছে, যেহেতু আন্তরিকভাবে তিনি একটি সৃষ্টিশীল সাহিত্য-যুগের জন্য সবল ইচ্ছাই প্রকাশ করেছেন, অন্তত এ জন্যেও তাঁকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছিনে।*

* পরিচয়, চৈত্র ১৩৫৩, পৃ. ৬৪৭-৫৫। অনিলা গোস্বামী বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যসমালোচক নৃপেন্দ্র গোস্বামীর ছদ্মনাম। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা / বিষ্ণু দে

সেকালের কথা মনে পড়ে। আমার নবীন বন্ধুদের পক্ষে সেকাল অবশ্য। এক ছোট চায়ের দোকানে, নামে হয়তো রেস্তোরাঁ, রেস্টুরেন্ট, নামেই সাবেকী কলকাতায় খ্যাত; একদিন গরম দুপুরে সেখানে লোহার চেয়ারে বসে আরো ঘেমে ঠাণ্ডা হবার জন্যে চা খাচ্ছি দুজনে। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, কবি ও ঔপন্যাসিক এবং আরেকজন এক আরো অল্পবয়স্ক লেখক, অখ্যাতনামা। দেখা হয়ে গেল আরেক সাহিত্যিকের সঙ্গে, তিনি আমাদের নজরুল ইসলামের বন্ধু, গণজাগরণের পুরোধা কর্মী। মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে সেদিন ছিলেন ঘর্মাক্তকলেবর এক বলিষ্ঠদেহ বন্ধু, তাঁর নাম ফিলিপ স্প্র্যাট। সাহিত্যের প্রেরণার কথা, দায়িত্বের কথা শুনলুম। অভিভূত হয়েছিলুম সেই চায়ের দোকানে গরমে গরম জামাপরা রুগ্নদেহ ভাস্বর প্রাণের বিনয়-শান্ত কথায়।

বস্তুত, বাংলা সাহিত্যে এঁরাই বলবার চেষ্টা করছিলেন বস্তিতে যাদের থাকতে হয় তাদের কথা। বাংলা সাহিত্যে কল্লোল-এর যুগ সেটা। শৈলজা মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, যুবনাশ্ব, সুকুমার ভাদুড়ী, এমন কি গোকুল নাগের মতো সুকুমার ব্রাহ্ম সামাজিক মানুষও এদিকে মন দিয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য, সব কিছুই মহৎ সাহিত্য হচ্ছিল না; কিন্তু সাহিত্যিকের নিজের পক্ষে মহাসত্য মা ফলেষু কদাচন; বড় কথা তাঁর সচেতনতা, তাঁর আলস্যহীন ও বিনীত প্রয়োগ, তাঁর সাহিত্যিক সততা।

এবং সে গুণ এঁদের কমবেশী ছিল বৈকি, তা না হলে এঁদের গল্পে উপন্যাসে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এত বিচলিত হবেন কেন তাঁর সৌখীন মার্জিত রুচির দিক থেকে? আর প্রতিক্রিয়াশীল হিঁদুয়ানিই বা ক্ষেপে যাবে কেন মাসের পর মাস অকথ্য গালিগালাজ করতে করতে? অথচ এঁদের শারীরিক ব্যাপারের স্পষ্টভাষিতায় যে মনোলৌল্য ও ইঙ্গিততৃপ্তি তা রবীন্দ্রনাথের "লেবরেটরি" বা "বাঁশরী"তে কি একই রূপে টসটস

করছে না? বা উল্টোদিকে, আকাশ থেকে পাতালে তাকালে, নীতিধ্বজদের নিজেদের লেখায়?

বিদ্রোহীদের জয় তখনই হয়ে গেছে কিন্তু। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকেও নতুন জানলা খুলতে হয়েছে। ঐতিহাসিক সে জয়। সাহিত্যে শ্রেণীবিচার উঠে গেল, অন্তত বিষয়ারোপের দিক থেকে, "ছোটলোকেরা" তখন সাহিত্যে ঢুকে পড়েছে আর তাদের বার করে কে? হয়তো একটু বিকারের ঘোরেই ঢুকেছে, হয়তো সে অধিকার-ঘোষণা কিঞ্চিৎ বেশি ভাববিলাসী অস্বাস্থ্যের দিকেই ঝুঁকেছে, ব্যক্তিগত সম্বন্ধনির্ণয়ের সামাজিক যুগে যেটা স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু ঘোষণাটা লাভই হয়ে রইল। আজ দেখা যায় বিকার অনেকটা কেটেছে আমাদের। 'বেদে'-র ছন্নছাড়া অতিরঞ্জনে তাই বলে কি তেতাল্লিশের কমিউনিস্ট লাইন খুঁজতে যাব?

সেকালে ব্রাত্যরা ব্যক্তি হয়েই এল, অস্তিত্বহীন সংঘের অংশ হিসাবে নয়। সে আসার সার্থকতা সাহিত্যে প্রায় প্যাবিস কম্যুনের সার্থকতা। উনিশ শো পাঁচের রুশ বিপ্লব বাদ দিয়ে কি ১৯১৭? তাছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের স্বচ্ছ করুণা, বুদ্ধদেবের বিদ্রোহী রবীন্দ্র-বিরোধী আবেগ, শৈলজানন্দের বীরভূমের নিসর্গের মতো ঋজুকঠিন কথকতা, অচিন্ত্যকুমারের ক্লান্তিহীন বিষয়-অনুসন্ধিৎসা ও রচনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এসবেরই কাছে বাংলাসাহিত্য ঋণী। লুই আরাগঁ ঠিকই বলেছেন, সাহিত্যের ইতিহাস, টেকনিকেরই ইতিহাস, অতীতের রাজনৈতিক প্যারালেলে তার সংজ্ঞা মেলে না।

অন্তত প্রারম্ভিকে এবং মুখ্যত। তারই নিকষে দেখি আজকে তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক প্রতিভার মহৎ ও নব নব প্রসার, মনস্তাত্ত্বিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূক্ষ্ম চিত্রাবলী। কারণ এঁরাও আরম্ভ করেন সেই সেকালে। ব্যক্তিগত খেয়ালের এবং ভেদাভেদের বাইরে যে বৃহত্তর সামাজিক বেদনা এবং সাহিত্যিক চৈতন্য কল্লোল-কালিকলমকে আসলে চালিত করেছিল, সেই বেদনা ও সেই সাহিত্যিক মানসই তাগিদ জুগিয়েছে 'সমুদ্রের স্বাদে'র তিক্ত করুণা ও নির্বিকার শিল্পশুদ্ধির, জুগিয়েছে 'পঞ্চগ্রাম' ও 'কালিন্দী'র কীর্তিময় গঠনের, 'অভিযান' বা 'হাঁসুলী বাঁকে'র গ্রামছাড়া জীবনের ভাঙন ও নবপত্তনের ছবির।

সেকালে যার মিশ্রসূচনা, আজ দেখা যায় তার বহুধা কিন্তু স্পষ্টতর পরিণতি। অবশ্য পরিণতি বলতে বাংলা সাহিত্যের পটে এবং বাংলার জীবনের

বাস্তব নিকষেই বিশ্বসাহিত্যের পুরুষার্থে সিদ্ধিলাভ বুঝি। তাছাড়া নিজের দেশের সীমায় নিজের সাহিত্য-শ্রদ্ধা না করে নঙর্থক সমালোচনায়, রুশ সাহিত্যের তুলনায় সবই নস্যাৎ করা সাহিত্য তথা রাজনীতি—দুদিক দিয়েই ভুল।

তাই মানিকবাবুর অস্থির কৌতূহল, জীবনের নানাস্তরের তথ্যজ্ঞান, থেকে থেকে তাঁর গভীর ও সংবেদ্য অন্তর্দৃষ্টির ঝলকানি, সেটাই আমাকে শ্রদ্ধানত করে। তাই তারাশঙ্করবাবুর কাঠামোর ব্যাপ্তি আমাকে অভিভূত করে—এমন কি যখন তিনি মশগুল হয়ে যান, যেমন 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'য়, শিল্পের নদীর তীর যখন জীবনের সমুদ্রে ডুবে যায়, তখনও। তাঁর একাধারে প্রসার ও জীবনের সত্যের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক কবিসত্য লাগে মাইকেল এঞ্জেলোর পাশে জ্যান্তোর মতো গীতিকবিতার স্বর্গচারী সারল্য এবং শরৎচন্দ্র মনে হয় বাঙালী গৃহিনীর মধ্যাহ্ন মনোরঞ্জনে দ্বিপ্রহরের ভোজান্তে পান্‌দোক্তার ভাববিলাসী ঘোর। প্রত্যক্ষ জীবন, ভূগোলে ইতিহাসে বিশিষ্ট যে বাস্তব জীবন, তারাশঙ্করের প্রতিভায় বাংলা উপন্যাসে তা আগন্তুক। এবং এমনি গভীর তার সংবেদন যে প্রাকৃত ভাষা তাঁর হাতে ছন্দের নির্ঝর হয়ে উঠেছে, অধিকন্তু সে সাবলীল ভাষার গতি একতারা নয়, চরিত্রে চরিত্রে-এবং চরিত্র তাঁর জগতে বহু, সে ছন্দ চারিত্র্য পায় সেতারের রাগমালার মতো। এটা যে কি মূল্যবান কীর্তি, তা য়ুরোপের উপন্যাসের ইতিহাস দেখলে সম্পূর্ণ উপলব্ধি হবে; তাছাড়া সত্যকার ঔপন্যাসিক সার্থকতা তো এইখানেই—প্রত্যক্ষ জীবনের স্থানকাল নির্ণীত রূপায়ণে, যে রূপায়ণের চরম প্রাণপরীক্ষা ঐ ছন্দউৎসারের সততায়। 'অভিযান' হয়তো তারাশঙ্করের 'কবি,' 'কালিন্দী' ও 'পঞ্চগ্রামে'র মতো আবশ্যিক মহত্ত্ব দাবি করে না, কিন্তু লেখকের জনপদসতর্ক চোখ ও কান তাঁর গল্পকার ও ঔপন্যাসিক প্রতিভাকে রাস-ড্রাইভারের উষর পথে জেলা থেকে জেলায় অবলীলায় পার করে দিয়েছে।

আমার এক নবীন বন্ধুর মতো আমি উপন্যাস মাত্রেই 'ওঅর এণ্ড্ পীস্'-এর সঙ্গে তুলনায় প্রলাপ বকব না, ডস্টএভ্স্কি ও শরৎচন্দ্রকে এক আসনে বসাব না, যেমন কবিমাত্রকেই তুলনা করব না শেক্স্পীয়রের সঙ্গে। কিন্তু এটুকু বলা যায় পণ্ডিত-মূর্খের হঠকারিতা না করেই যে তারাশঙ্করের গল্পোপন্যাসের জুড়ি য়ুরোপ আমেরিকায় আজও হাতে গোনা যায়—মোরিয়াক, মালরো, হেমিংওয়ে,

স্টাইন্‌বেক্‌, শোলকভ্‌, লিওনভ্‌—তবুতো অনেকের মতো তাঁর লেখার প্রাচুর্যে তাঁর সৃষ্টির কাঠামো চাপা পড়ার ভয় থাকে।

মানিকবাবুর বা অচিন্ত্যবাবুর বই পড়তে পড়তেও মনে হয় দেশবিদেশের গল্প-কারের কথা। 'পদ্মানদীর মাঝি', 'সহরতলী', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ইত্যাদি উপন্যাসে ও নানা গল্পে মানিকবাবুর যে চমকপ্রদ দক্ষতায় আমরা মুগ্ধ হয়েছি, সে কৃতিত্ব আজ সংহত দৃষ্টিতে সেই নবসম্ভাবনায় ঐশ্বর্যবান, যেখানে জীবনের ব্যাপ্তিতে লেখা হয়ে ওঠে নৈর্ব্যক্তিক, মহৎ।

কিন্তু বিশেষ করে আজ অচিন্ত্যকুমারের কথাই বলছি, কারণ বহুকাল পরে তাঁর লেখা একসঙ্গে পুস্তকাকারে পড়লুম। তাঁর পরিণতির স্বার্থকতা ঐতিহাসিক তুলনা জাগায় হেমিংওয়ের সঙ্গে। তাঁর ভাষার যে ব্যায়ামীর পেশল অভ্যাস বরাবরই চকিত করত, আজ সেই দৃঢ়বদ্ধ বিন্যাস পেয়েছে তার উপযুক্ত বিষয় এবং তার থেকে পেয়েছে সেই নৈর্ব্যক্তিক পরিমিতি, যা আসে মানবধর্মীর হৃদয়বত্তা থেকেই। হেমিংওয়ের রচনাবলীর ভয়াবহ মিতভাষিত্ব, স্বেচ্ছায় বেবাক্‌ মূর্খের বাক্যের ও শব্দের সীমাবদ্ধতা স্পার্টান্‌, ল্যাকনিক্‌ প্রচণ্ডতা পেল ট্রাজেডি-সার্থক বিষয়ে, স্পেনের ফ্যাশিস্ট যুদ্ধে। অনতি-কথনের প্রায় সেই সার্থকতা এসেছে অচিন্ত্যবাবুর সাম্প্রতিক গল্পের শব্দসম্পদে, বাংলার গ্রামের মফস্বলের মৃত্যু-উদ্‌গারে জীবনের প্রবল নাট্যের ধাক্কায়। সাহেবের মা, বিভা, সরবানু, ইমানদ্দি, ইজ্জত আলি ও সোনাউল্লা, বাহারণ, কাদেম ফকিরের কাফন-কাপড়-পরা তার বউ—দুর্গত সমাজ-ভাঙা বাংলার, অত্যাচারে-অনাচারে জর্জর বাংলার বহু মানুষ তাঁর চোখে অস্তিত্ব পেয়েছে করুণায় অবজ্ঞায়, ঘৃণায়, ক্রোধে রুদ্ধপ্রায় শাণিত ভাষায়। দেশজ শব্দ তাই বাস্তবের তীক্ষ্ণ মর্যাদা পেয়েছে তাঁর গল্পে। মর্মান্তিক তাঁর হিন্দু ও মুসলমান চাষীর দুর্বহ জীবনচিত্র, মর্মান্তিক তাঁর কথার মোচড়ে গোচড়ে প্রাকৃত জনের কথ্যভাষার আবেদন।

তাঁর ভাষার আতাতি অচিন্ত্যকুমারকে দিয়েছে সস্তা কারুণ্য থেকে মুক্তি। আবার তাঁর বিষয়ানুগ মানবিকতা তাঁকে দিয়েছে তথাকথিত সহজ মানুষের সুখ-দুঃখের সহজ সাধারণ রূপ থেকে না পালানোর সাহস। মনে হয় আমাদের এই সব লেখকেরা সিদ্ধির সেই স্তরে পৌঁছেছেন যেখানে সেন্টিমেণ্টালিসমের সহজ অভিযোগ বা ন্যাচারালিসমের অশ্লীলতার নালিশ তাদের শিল্পসমাধি তথা

জীবনদর্শন ব্যাহত করতে অপারগ। তাঁর গল্পের জীবন জীবনেরই মতো বিচিত্র, তিক্ত, মধুর বিস্ময়কর ও মিশ্রাবেগ।

তাছাড়া অচিন্ত্যকুমারের এই তিনটি বইয়ের আরেক আকর্ষণ হচ্ছে বাংলার গ্রাম্য মুসলমান জীবন, যা তাঁর মুখ্য পটভূমি। বাস্তবিকই এতো দরদ ও তথ্যজ্ঞান দিয়ে ঐ বিশেষ জীবন, যা অবশ্য মূলত বাংলার গরীবেরই জীবন-- হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—কংগ্রেসী বা লীগই হোক—আর কেউ চিত্রিত করেছেন কিনা সমান সাহিত্যিক সার্থকতায়, তা আমি জানি না। অচিন্ত্যবাবুর নিরলস কৌতূহল এবং তা চরিতার্থ করবার সুযোগ গ্রহণ এবং তাঁর অকুণ্ঠ মানবিকতাই তাঁর এই নতুন নির্মাণে সহায়। আর সহায় তাঁর শব্দের বাক্যের ছন্দের নিত্যনব প্রয়োগে শিল্পোৎসাহ।

বেশ কিছুকাল আগে 'বাংলাসাহিত্যে প্রগতি' নামক প্রবন্ধে আমি যে আশা করেছিলুম প্রায় তাই আমার সেকালের চেনা নমস্য এই তিনজন লেখকের লেখায় পেয়ে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আজ সাবালক বাংলা গল্প-উপন্যাসে মুক্ত বিহার দেখা যায়—রমেশচন্দ্র সেনের বিস্ময়কর কিন্তু পরিণত লেখায়, জ্যোতির্ময় রায়ের অসামান্য নৈপুণ্যে, ননী ভৌমিকের, বিজন ভট্টাচার্যের আশ্বাসে। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের করুণকোমল দরদের বিষাদ এবং শৈলজানন্দের তীক্ষ্ণ মোপাসাঁশোভন কথকতা কি আর পাব না আজকাল?

পুনশ্চ : সম্প্রতি পড়লুম তারাশঙ্করের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' এবং মানিকের 'চিহ্ন'। ভূগোলের একটি স্থান মুখ্যপাত্র হয়ে ফুটেছে এই উপন্যাসে সেই স্থানমাহাত্ম্যে, যা প্রাণ পায় বিশেষ প্রাকৃতিক স্বরূপে রূপায়িত মানুষের প্রাকৃতিক জীবনে এবং মানুষের জীবনযাত্রায় প্রকৃতির বিশেষ রূপে। জায়গাটার চেহারা যেমন তারাশঙ্করের চোখ ও আমাদেরও চোখ জুড়ে বসেছে, তেমনি মশগুল করেছে তাঁকে কাহারদের জীবন এবং তাই পাঠকের মনও অবলীলায় পার হয়ে যায় এত বড় উপন্যাস—বরং শেষ করে একটু হতাশই হয়—এই কি শেষ?

হয়তো শেষটা খুব স্বচ্ছ নয়, বিহ্বল শেষ। কিন্তু সে বিহ্বলতা তো আমাদের জীবনেরই, যুগেরই। তাই এই দুই যুগের মধ্যের বাঁকের গল্পে তিনি নাম দিয়েছেন উপকথা।

'চিহ্ন' পড়ে মানিকবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায় বহুগুণ। কলাকৌশলে যে

তার পরীক্ষার বিশ্রাম নেই, তার প্রমাণ 'চিহ্ন'। এই সিনেমাশোভন বহু ব্যক্তির জীবনে অবলম্বিত একটি কাহিনী এই রকম সামাজিক রূপ পায় নি ভার্জিনিয়া উলফে, বা হেনরি গ্রীনের চলন্ত গল্পে। তার কারণ অবশ্যই মানিকবাবুর সামাজিক অবহিতি এবং বাস্তব ঘটনার সুযোগ। বিপ্লবী রোমান্টিক দৃষ্টিতে কলকাতার একটি স্মরণীয় রূপ মূর্তি পেল কলকাতার কয়েকটি মানুষের জীবনের প্রবল আন্দোলনে, স্থির সমকোণে নয়, ঘূর্ণায়মান চক্রে প্রগতিতে। যার সূত্রপাত অক্ষয় চরিত্রে। এমনি সততা মানিকবাবুর শিল্পী মনের, এমনি পরিমিত তাঁর রোমান্টিক আবেগ যে তাঁর দরদ স্বভাবতই পড়ে এই চরিত্রে, তার মানবিক পরিবর্তনে। সে পরিবর্তনে যে চূড়ান্ত ক্রান্তির চিহ্ন নেই, সেই তাঁর সামাজিক সততার প্রমাণ। ফেব্রুয়ারি-জুলাই-মে-আগস্টে, সেই বর্ষভোগ্য আগস্টই তো মুক্তি পায় আরেক আগস্টে চোদ্দই পনেরোই অভূত আনন্দের চিহ্নে।*

* পরিচয়, শারদীয় সংখ্যা ১৩৫৪, পৃ. ২৭১-৭৫। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

শারদীয়া সাহিত্যে ছোট গল্প / নীহার দাশগুপ্ত

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান ধারা কি ?—কারও এই দুরূহ জটিল প্রশ্নের অতি সহজ উত্তর হবে বর্তমান বছরের শারদীয়া সংখ্যাগুলি তার কাছে হাজির করে দেওয়া। বাংলা শারদীয়া সংখ্যাগুলিকে অবলম্বন করে বছরে এই একবারের জন্য অন্তত বাংলার ছোট বড়, এমন কি একেবারে আনকোরা লেখকরা অজস্র লেখেন, সত্যি কথা বলতে কি ক্ষমতার অতিরিক্তই লেখেন। শারদীয়া সংখ্যাগুলিতে বাংলার প্রায় সমস্ত লেখক ও অলেখকদের একত্র সমাবেশ, তাদের সাহিত্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি. গুণাগুণ, ধারা-উপধারা প্রতিফলিত হয়। সেদিক থেকে বর্তমান সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি আলোচনার জন্য শারদীয়া সংখ্যাগুলির সমালোচনা একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমান আলোচনা শুধু শারদীয়া সংখ্যার গল্পগুলি নিয়ে। বলে রাখা ভালো, সমস্ত শারদীয়া সংখ্যাকে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হই নি। আনন্দবাজার, যুগান্তর, স্বাধীনতা, বসুমতী, স্বরাজ, কৃষক, অরণি, দেশ, পরিচয় ও অভ্যুদয়-এ প্রকাশিত গল্পগুলিই আমার আলোচ্য।

এবারকার গল্পগুলি পড়ে মোটামুটি আমার যা ধারণা হয়েছে তা হলো, বিশুদ্ধ আর্ট সৃষ্টির মোহ থেকে অধিকাংশ কথাশিল্পীই নিজেদের মুক্ত করেছেন, তাঁদের লেখার মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিষয়মুখীনতা, তাঁরা আজ বাস্তবজীবনকে তাঁদের কথাসাহিত্যের উপজীব্য হিসাবে স্বীকার করে নেবার প্রয়াস পেয়েছেন; সে প্রয়াস অনেকাংশেই হয়তো সার্থক হয়ে ওঠে নি, তবুও এ প্রয়াস বাংলাসাহিত্যে নতুন লক্ষণের স্বাক্ষর, বাংলার কথাসাহিত্যিকরা যে এক নতুন রসসত্যকে স্বীকার করে নিচ্ছেন, এ তারই লক্ষণ। সব চাইতে আশার কথা, বাংলার কথা-সাহিত্যিকরা নতুন মানুষের সন্ধান পেয়েছেন। এ মানুষ আত্মকেন্দ্রিক জীর্ণ ও বিভ্রান্ত মানুষ নয়; কলকারখানা, অফিস-আদালত, আর বাংলার আদিগন্ত মাঠে মাঠে যে মানুষ সর্বস্ব পণ করে সুন্দর ও বলিষ্ঠ ভবিষ্যৎ রচনায় অগ্রসর এ তারাই।

বর্তমান কথাশিল্পীদের মধ্যে সবার আগে যাঁদের নাম মনে হয়, তাঁরা হচ্ছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এ বছরের শারদীয়া সংখ্যাগুলিতে তারাশঙ্করবাবুর বিস্ময়কর অনুপস্থিতি পাঠক-সাধারণকে নিশ্চয়ই হতাশ করেছে। মানিকবাবুর তিনটি গল্প পড়েছি—'তথাকথিত' (দেশ), 'ধানের গোলার ধান' (স্বরাজ) ও 'গায়েন' (যুগান্তর)। কিছুদিন ধরে মানিক-বাবু নতুন পথে গল্প-উপন্যাসে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন, তা যে সার্থক হয়েছে তার প্রমাণ তাঁর পূর্বে লেখা গল্প 'শিল্পী', 'হারাণের নাতজামাই' ইত্যাদি ও আধুনিকতম উপন্যাস 'চিহ্ন'। এইবার সেই সার্থক পরীক্ষার স্পষ্টতর প্রমাণ তিনি উপস্থাপিত করেছেন তাঁর 'গায়েন' গল্পে। এক বৃদ্ধ কবিয়াল ও তার তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীর সংঘর্ষ 'গায়েন' গল্পের বিষয়বস্তু। বন্যা আর দুর্ভিক্ষের গান করে বৃদ্ধ কবিয়াল যশ কিনেছেন, হাজার হাজার শ্রোতার হৃদয়ে দুঃখের হতাশার ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই দুঃখের ও হতাশার গানের পরিবর্তে তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিল সংগ্রামের গান নিয়ে—দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে যারা, মানুষের জীবন নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলেছে, সেইসব সামাজিক শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। গল্পের শেষে বৃদ্ধ কবিয়াল উচ্ছ্বসিত আনন্দে তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেয়। সরল স্বচ্ছন্দ গতিতে অপূর্বভাবে গল্পটি গড়ে উঠেছে। আমার মনে হয়, মানিকবাবুর অধুনা লিখিত গল্পগুলির মধ্যে 'গায়েন' শ্রেষ্ঠ। কোথাও প্যাঁচ কষে, চমক লাগিয়ে তিনি গল্প জমাবার চেষ্টা করেন নি, প্রাণের আবেগে ও রসে এ-গল্প আপনিই তার গতি খুঁজে নিয়েছে। সেদিক দিয়ে 'শিল্পী' বা 'হারাণের নাতজামাই' থেকে 'গায়েন' বেশী সার্থক। কিন্তু মানিকবাবুর 'তথা-কথিত' ও 'ধানের গোলার ধান' সেদিক থেকে ততটা ভালো লাগবে না। 'তথা-কথিত' গল্পের পরিণতির জন্য পাঠকমনকে আগে থেকে মোটেই তৈরী করে নিতে পারেন নি মানিকবাবু। তাই শেষ অংশটুকু যেন জোর করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। 'ধানের গোলার ধান' পড়ে বক্তব্যটা মনে থাকে কিন্তু চরিত্রগুলি কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

মানিকবাবুর 'গায়েন' গল্পের সঙ্গে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'মুচিবায়েন' (বসুমতী) গল্পের তুলনা করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদে গল্পের গুণগত প্রভেদ কত বিরাট হতে পারে। দুই বাজনাদারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা 'মুচিবায়েন' গল্পের বিষয়বস্তু। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটে এক অভিনব উপায়ে। একরাত্রে প্রথম বাজনা-

দারের স্ত্রী দ্বিতীয় বাজনাদারের কাছে আত্মদান করে, পরিবর্তে দ্বিতীয় বাজনাদার প্রথম বাজনাদারের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়—সেই তল্লাট ছেড়ে চলে যায় সে। সাধারণ মানুষ গল্পের ভেতর ভিড় করে এলেই গল্প বাস্তব ও প্রগতিশীল হয়ে ওঠে না, দৃষ্টিভঙ্গীর অপরিচ্ছন্নতায় ও দরদের অভাবে সে গল্প প্রতিক্রিয়াশীলতার পর্যায়েও পৌছতে পারে। অচিন্ত্যবাবুর 'মুচিবায়েন' গল্প পড়ে এ কথা খুব বেশী করে মনে হয়। অচিন্ত্যবাবু তাঁর গল্পগুলির চরিত্র খুঁজে নিয়েছেন 'হাড়িহাজরা' (দেশ), 'মুচিবায়েন' (বসুমতী) ও 'হাট-বাজারে'র (স্বরাজ) লোকজনের ভেতর থেকে। বাংলার গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ আর তাদের গ্রামীণ কথ্যভাষা অচিন্ত্যবাবুর প্রায় প্রতিটি গল্পেরই অবলম্বন। তাদের সুখ-দুঃখ অত্যাচার-অবিচারের কথাও তিনি বলে থাকেন। কিন্তু আমার তো মনে হয়, তাঁর গল্পে চাষাভুষো, হাড়িহাজরা, মুচিবায়েন, আর একেবারে অতি সাধারণ মানুষের বেশে, অবিকল তাদের ভঙ্গীতে যারা কথা বলে, সেই সব চরিত্রের সঙ্গে অচিন্ত্যবাবুর যেন আন্তরিক পরিচয় নেই। আদালতের নথিপত্রের কাহিনী থেকে কতকগুলি নির্জীব নিস্প্রাণ মানুষ যেন কথা বলে ওঠে। অচিন্ত্যবাবুর তীক্ষ্ণধার ভাষা ও গল্প বলার কায়দার জোরে গল্পগুলি সুপাঠ্য হয়ে উঠলেও কোনো এক কবি-সমালোচকের মতো তাঁকে হেমিংওয়ের সঙ্গে তুলনা করতে পারব না। বলতে পারব না, "তাঁর গল্পের জীবন, জীবনেরই মতো বিচিত্র, তিক্ত, মধুর, বিস্ময়কর মিশ্রাবেগ।"[১]

অচিন্ত্য সেনগুপ্তের গল্পের সঙ্গে রমেশচন্দ্র সেনের গল্পের পার্থক্য সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশের মাটি আর সাধারণ মানুষের সঙ্গে রমেশবাবুর আন্তরিক যোগাযোগ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর গল্পের চরিত্রে, অপূর্ব প্রাণাবেগে তাই তাঁর প্রতিটি গল্প উচ্ছল; যদিও অচিন্ত্য সেনগুপ্তের গল্পের বাঁধুনি বা মুন্সিয়ানা রমেশবাবুর গল্পে দুর্লভ, যদিও ব্যালান্স বা পরিমিতির যথেষ্ট অভাব থাকে তাঁর গল্পে। কিন্তু শারদীয়া সংখ্যায় এবার রমেশবাবুর লেখা একটি মাত্র গল্প 'রাঙা ঠানদি' (অভ্যুদয়) রীতিমতো হতাশ করেছে। অত্যন্ত শ্লথ, অসংলগ্ন এক কাহিনী, কোনোমতেই যাকে গল্পের মর্যাদা দেওয়া যায় না। এ পর্যন্ত রমেশবাবুর যতগুলো গল্প পড়েছি, তার মধ্যে 'রাঙা ঠানদি' গল্প বোধ হয় সব চাইতে দুর্বল ও অসার্থক।

১. দ্র. বিষ্ণু দে,'গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা', বর্তমান খণ্ড, পৃ.৩৩৪। সম্পাদক

এই ব্যালান্স বা পরিমিতির অভাব আর একজন শক্তিশালী লেখকের লেখায় লক্ষ্যণীয়। নবেন্দু ঘোষের কথাই বলছি। কিন্তু এই ত্রুটি সত্বেও নবেন্দুবাবুর এবারকার দুটি গল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—'ধানচোর' (দেশ) ও 'ছিন্নমস্তা' (স্বাধীনতা) ; একটু সতর্ক ও সংযত হলে 'ছিন্নমস্তা' নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর গল্প হতে পারত। নবেন্দুবাবুর কাছে একটি কথা নিবেদন করতে চাই। সাহিত্যে মানবিকতা চিরন্তন স্বীকার করি। কিন্তু বিভিন্ন যুগে সাহিত্যে সে মানবিকতা প্রকাশের রীতি বদলায়, পরিবেশ বদলায়, পাত্র-পাত্রী বদলায়। ভিক্টর হুগোর 'লে মিজেরাবেলে'র মানবিকতার হুবহু রূপ আজকের দিনে অচল। নবেন্দুবাবুর 'চোর ও সাধু' (যুগান্তর) গল্প সম্বন্ধে কথাগুলি প্রযোজ্য।

'জাগরী'-খ্যাত সতীনাথ ভাদুড়ীর 'গণনায়ক' (কৃষক) ও 'আণ্টাবাংলা' (দেশ) গল্প দুটিতে গভীর ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার নিদর্শন মেলে। 'আণ্টাবাংলা'য় যে পরিবেশের সৃষ্টি তিনি করেছেন তা বিস্ময়কর—সেই নীলকর যুগের পরিবেশ, যে যুগে বন্য প্রকৃতির নিরীহ মানুষেরা "সমুদ্রের নীল রং দেখবার সুযোগ পায় নি, আকাশের নীলের দিকে কোনোদিন তাকিয়ে দেখে নি, কিন্তু কুঠির বড় বড় চৌবাচ্চায় দেখেছে গোলা-নীলের সমুদ্র, বহু পরিচিত আত্মীয়-স্বজনের দেহে দেখেছে নীল কালশিরার দাগ।" কিন্তু এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বিস্ময়কর পরিবেশ সত্বেও গল্প দুটি 'ছোট গল্প' হয়ে উঠতে পারে নি, ছোট গল্পের আকারে দুটি উপন্যাস যেন।

সতীনাথবাবুর 'গণনায়ক' গল্পের সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইজ্জত' (যুগান্তর) গল্পের তুলনা করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত কম ও সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা নিয়েও কেমন করে 'ছোট গল্প' গড়ে তোলা যায়। —হয়তো সে গল্প পাঠকের মনে তেমন সুগভীর রেখাপাত করে না। এবারকার শারদীয়া সংখ্যায় বোধহয় সব চাইতে বেশী গল্প লিখেছেন নারায়ণবাবু—এবং সব চাইতে বেশী অসার্থক গল্প। 'আমার দেশ' (কৃষক) গল্পটি যেন গল্পাকারে একটি সরস ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা। 'টোপ' (স্বাধীনতা) গল্পে অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক চমক লাগিয়ে যে ভয়াবহতা ও নৃশংসতার রূপ তিনি দিতে চেয়েছেন, আমার মতে তা ব্যর্থ হয়েছে। শুনেছি গল্পটি একটি সত্য ঘটনার যথাযথ বর্ণনা। স্বভাবতই একটি প্রশ্ন জাগে। জীবনে যে ঘটনা ঘটে, তাকে অবলম্বন করে সাহিত্য-সৃষ্টি মাত্রেই কি বাস্তব ও স্বাভাবিক সাহিত্য হতে বাধ্য? ঘটনা যত সত্যিই হোক, কাহিনীর

পরিবেশ ও চরিত্রগুলি গল্পের মাধ্যমে যদি পাঠক-সাধারণের কাছে পরিচিত ও স্বাভাবিক না হয়ে ওঠে তাহলে সে গল্প রোমাঞ্চকর হলেও বাস্তব হয়ে ওঠে কি না নারায়ণবাবুর কাছে তা আমার জিজ্ঞাস্য। 'ঘাসবন' (আনন্দবাজার) গল্পের মতো এই রকম এক তৃতীয় শ্রেণীর রোমান্টিক গল্প নারায়ণবাবু লিখলেন কি করে? সেই রাখাল ও মেষ পালিকার আদিম বন্য প্রেম আর তার বন্য প্রতিহিংসার কাহিনী দশ বছর আগে আমরা শুনতে রাজী ছিলাম, কিন্তু আজ নয়। নারায়ণবাবুর সমস্ত গল্পের মধ্যে 'ইজ্জত' আর 'উস্তাদ মেহের খাঁ' (দেশ) বোধহয় সব চাইতে ভালো গল্প। 'উস্তাদ মেহের খাঁ' হয়তো একটু বেশী রোমান্টিক। তা হোক, তবুও ভাষার মাদকতায় আর আন্তরিকতায় 'উস্তাদ মেহের খাঁ' আমাদের মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

এই রোমান্টিকতা সত্ত্বেও যে প্রথম শ্রেণীর গল্প সৃষ্টি করা যায়, তার প্রমাণ সুশীল জানার 'সাঙাৎ' (স্বাধীনতা)। সরল অনাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গী আর পরিবেশ সৃষ্টির কৃতিত্বে 'সাঙাৎ' সুশীলবাবুর পূর্বের সমস্ত গল্প থেকে বিশিষ্ট ও ভিন্ন মর্যাদা-সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। কিন্তু সুশীলবাবুর 'স্বপ্নসম্ভবা'র (যুগান্তর) সার্থকতার পথে এই রোমান্টিকতাই প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'স্বপ্নসম্ভবা' বড় বেশী অবাস্তব। অপরিচয়ের আবরণ ভেদ করে তার চাষী আর চাষী-বৌদের আমরা ঠিক চিনে উঠতে পারি না।

মনোজ বসুর 'মদন মাস্টার' (যুগান্তর) 'পতাকা' (আনন্দবাজার) ও '১৫ই আগস্ট' (বসুমতী) আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার পটভূমিতে লেখা। গল্পগুলির একমাত্র গুণ গভীর আন্তরিকতা। সারাজীবন প্রবঞ্চিত মদন মাস্টার স্বাধীনতা-দিবসে প্রবীরকে যখন প্রশ্ন করেন—"সত্যি তো বাবা? যারা সৎ আর পরিশ্রমী, সমাজকে ফাঁকি দেয় না—অন্নের অভাব হয় না তাদের কখনো, ছোট মন ইতর লোকদের তোয়াজ করে বেড়াতে হবে না, অপমানিত হতে হবে না পদে পদে?"—সে প্রশ্ন আমাদের সেদিনের সকলের প্রশ্ন। আজ সে প্রশ্ন আরও উদগ্র, আরও তীক্ষ্ণ। 'পতাকা' গল্পের সেই সব ওমরাহের দল—'বাসাংসি জীর্ণানি' পরিত্যাগ করে নতুন বেশের অন্তরালে আত্মগোপন করেছে যাঁরা? আর গাঁয়ের শৈলী, তার ছেলে—আধপেটা খেয়ে দিন কাটে যাদের—সত্যিই কি আর তাদের পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়তে হবে না?

মনোজবাবুর এই গল্পগুলি গল্প হিসাবে সার্থক সৃষ্টি না হবার অন্যতম প্রধান

কারণ হয়তো, ১৫ই আগস্টের এই নতুন উপলব্ধি আত্মস্থ করার, সংহত করার জন্য অবকাশের অভাব। হয়তো এত দ্রুত এই নতুন উপলব্ধিকে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টিতে রূপায়িত করা সম্ভব নয়। কিন্তু একেবারেই যে অসম্ভব নয়, ননী ভৌমিকের 'অহল্যা' (স্বাধীনতা) তার প্রমাণ। 'অহল্যা' গল্পের নায়িকা 'অমিদি' অতি সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের এক মেয়ে; কিশোরী জীবনে সে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে, গুলি-গোলার সন্ত্রাসবাদী কাজে যথাসাধ্য সাহায্যও করেছে। কিন্তু ১৪ই আগস্টে সারা কলকাতা শহর যখন অভূতপূর্ব আবেগ আর উত্তেজনায় ফেটে পড়ল, অমিদির হৃদয়ে কিন্তু বিন্দুমাত্র আলোড়নের সৃষ্টি হলো না, কোনো অনুভূতি জাগল না—লক্ষফণা নিম্নমধ্যবিত্তের সংসারের নিষ্পেষণে আর নির্যাতনে স্টিলট্রাঙ্কের দোকানের বৌ-ঠেঙানো কর্মচারীর স্ত্রী অমিদি পাষাণ হয়ে গিয়েছে, সে অহল্যাহৃদয়ে আর কোনো অনুভূতি জাগে না, কোনো আলোড়নের সৃষ্টি হয় না। গল্পটির বোবা প্রাণময় বেদনা পাঠক-হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ ও অভিভূত করে রাখে। আন্তরিকতায় ও দরদে ননীবাবুর স্বভাবসিদ্ধ চোখাচোখা আঁটসাঁট ভাষা কেমন যেন কোমল, স্পর্শাতুর।

ননীবাবুর পূর্বের সমস্ত গল্প থেকে এ গল্পের জাত আলাদা, আবেদন আলাদা। এই গল্পে যে ত্রুটি আমার চোখে পড়েছে, তা অসতর্কতার ত্রুটি। পনেরো বছরের অমিদির স্বদেশী কার্যকলাপের ছবি এঁকেছেন তিনি বিশদভাবে, কিন্তু যে নিষ্পেষণে আর অত্যাচারে অমিদি পাষাণ হয়ে গেলেন, মরে গেলেন—তার রূপ আরও স্পষ্ট, আরও গভীর ও তীক্ষ্ণ হওয়া উচিত ছিল—তা যেন একটু ভাসাভাসা, একটু মামুলি ধরনে বলা। অবশ্য গল্পের সার্থকতার তুলনায় এ ত্রুটি কিছুই না। কিন্তু 'অহল্যা'-লেখক আমাদের হতাশ ও বিস্মিত করেছেন 'বড়বাবু ছোটবাবু' (পরিচয়) গল্প লিখে। 'ভুঁড়ির ওপর কড়া চামড়ার বেল্ট লাগান' বড় দারোগা, 'কেয়ারী করা লম্বা একফালি লনের মত মোলায়েম জুল্পী-ওয়ালা' ছোট দারোগা, বড় দারোগার বার তিনেক ম্যাট্রিক ফেল করা ছেলে আর চোরাকারবারী জটাধারীকে নিয়ে থানার বেশ একটা 'ভিশিয়াস অ্যাটমস-ফেয়ার' তৈরী করে তুলেছিলেন ননীবাবু। কিন্তু শেষের দিকে হঠাৎ গল্প শেষ করার তাগিদে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ও অর্থহীনভাবে দারোগার ছেলেকে দিয়ে বন্দুক চুরি করিয়ে গল্পটাই মাটি করিয়ে দিলেন। ননীবাবুর অতিসতর্ক ও সংযত কলম থেকে এরকম জোলো ও সস্তা প্যাঁচ বের হতে এর আগে কখনও দেখি

নি। ননীবাবুর আর একটি গল্প 'তিন পুরুষ'-এর (যুগান্তর) বিষয়বস্তু উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু সেই বিষয়বস্তু যোগ্য ও রসোত্তীর্ণ করে ফুটিয়ে তোলার জন্য আরও বেশী পরিসরের প্রয়োজন ছিল, চরিত্রগুলির বিকাশের জন্য আরও বেশী সুযোগ দেবার দরকার ছিল। যেন কোনো অপটু অভিনেতার অভিনয়ের মতো আড়ষ্ট হয়ে আছে গল্পটি আর তার চরিত্রগুলি।

তরুণতর কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে 'শাহেরবানু'র লেখক আবুলকালাম সামসুদ্দীন এবং গত বছরে 'আদাব' গল্পের সমরেশ বসু সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এ-বছরের একটি মাত্র গল্পেও আবুলকালাম সামসুদ্দীন সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। আবুলকালামের 'মৌসুম' (অরণি) ও 'বান' (যুগান্তর) গল্প পড়ে মনে হয়েছে, পুরনো পুঁজি ভাঙিয়ে তার ওপর মধ্যবিত্ত মনের স্বপ্নময় জোলো রোমান্টিকতার রঙ চড়িয়ে কোনোমতে তিনি টিকে থাকবার চেষ্টা করছেন। তাঁর 'একটি নিদারুণ ঘটনা' (স্বরাজ) নিদারুণ দেউলিয়াপনারই অশুভ ইঙ্গিত। সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পে পরিণত সম্ভাবনার যে ইঙ্গিত ছিল, তাঁর পরবর্তী কোনো গল্পে সে ইঙ্গিত স্পষ্টতর হয়ে ওঠে নি। এবারকার 'মানত' (অরণি) গল্পে 'আদাব'-এরই মালমশলা দিয়ে নিকৃষ্টতর ব্যঞ্জন পরিবেশন করেছেন তিনি।

বাংলা সাহিত্যের মার্কামারা রস-সাহিত্যিক বিভূতি মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী প্রভৃতি অন্যান্য বারের মতোই যথারীতি প্রচুর লিখেছেন। কিন্তু বছরের পর বছর একই ধরনের রসিকতায় পাঠকসাধারণ আর যাই করুক হাসতে চায় না। তবে এবারকার লেখাগুলির মধ্যে কালিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'অপরাধী'র (যুগান্তর) সংযত ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ উল্লেখযোগ্য। লেখক হয়তো নবীন—তাই তাঁর কাছে ভবিষ্যতে আমাদের অনেক আশা করার রইল।

বাংলা সাহিত্যের 'জি-বি-এস্' প্র-না-বি এবার কিছু জন্তু-জানোয়ারের আড়াল থেকে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাঁড়ামি করেছেন। এই ভাঁড়ামিরই একটি নিদর্শন 'লালবর্ণ শৃগালকথা' (কৃষক)। বিদ্বেষ আর নীচতা সাহিত্যিককে স্বধর্মচ্যুত করে ইতরতার কোন স্তরে নিয়ে যেতে পারে, তার সব চাইতে ভালো উদাহরণ এই গল্পটি।*

* পরিচয়, 'পত্রিকা-প্রসঙ্গ', অগ্রহায়ণ ১৩৫৪, পৃ. ৪৮৪-৪৮৯। বানান ও যতি-চিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

শারদীয়া সাহিত্যে ছোটগল্প / বিষ্ণু দে

'পরিচয়' সম্পাদক মহাশয়,

অগ্রহায়ণের 'পরিচয়'-পত্রে নীহার দাশগুপ্ত মহাশয় যে পূজাসাহিত্যের আলোচনা করেছেন, তাতে একটি ভ্রান্তিবিলাস চোখে পড়ল। তাঁর বিলাসের উপলক্ষ্য হচ্ছে শারদীয়া 'পরিচয়ে' প্রকাশিত আমার একটি পুস্তকালোচনায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কাঠ-খড়-কেরোসিন', 'কালোরক্ত' ও 'আসমান-জমিন' নামক বই-গুলির বিষয়ে প্রশংসাসূচক উক্তি। সম্প্রতি আমাদের আরেক অনামরক্ষিত বন্ধু এক ইংরেজী কাগজে তারাশঙ্কর-কে মার্শালী আক্রমণ করতে গিয়ে প্রসঙ্গত আমাকে গঞ্জিত করেছেন প্রায় একই মৌল কারণে, তাঁর আপত্তি উঠেছে তারাশঙ্করের উপন্যাসের অনেকগুলি গুণে মুগ্ধ হয়ে আমি তাঁকে ভারতীয় ও জীবিত হলেও বড় লেখক বলেছি বলে।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য খানিকটা প্রতিনিধিত্ব দাবী করে বলেই এ পত্র প্রেরণ। সাহিত্যে অনুরাগী পাঠক হিসাবে আমিও এক জনসাধারণের একজন, যদিও সে জনসাধারণ হয়তো নীহারবাবুর পকেটস্থ বা পকেটবরোর জনসাধারণ নয়। আপনারা হয়তো জানেন না, জনসাধারণের বিশ্বাস যে সৃষ্ট-সাহিত্যের বিষয়ে সমালোচকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন সংস্কৃত অর্থে শ্রদ্ধা, অর্থাৎ প্রাথমিক অঙ্গীকার বা গ্রহণ। বিনীত গ্রহণের পরে আসে বিচার—সাহিত্যিক বিচার, সামাজিক বিচার, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিচার। এই বিচারেও মত্তহস্তীর সার্থকতা নেই, এই বিচারেও প্রয়োজন দলীয়তাহীন বুদ্ধির চর্চা এবং কিছুটা জ্ঞান। একথা সত্য যে বুদ্ধির চর্চা ধৈর্যসহ ব্যাপার এবং জ্ঞান পদে পদে আয়াসসাধ্য—বিশেষত মার্কসিস্ট দৃষ্টিতে। কিন্তু সৎপ্রচেষ্টারও তো মূল্য আছে?

আপনারাও এ মত অন্তত পোষণ করেন—এই আমরা 'পরিচয়ে'র পাঠকরা এবং লেখকরাও আশা করি। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় আশা দুর্মর।

নীহারবাবুর প্রবন্ধে ঐ প্রচেষ্টার অভাব তাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দৃষ্টিভঙ্গীর অপরিচ্ছন্নতা ও দরদের অভাবে তাঁর সমালোচনা বামপন্থী বিধর্মে, অর্থাৎ লেডুক

যাকে বলেছেন ট্রট্স্কি-মার্কা প্রতিক্রিয়াশীলতা, তারই পর্যায়ে পৌঁছেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অচিন্ত্যকুমারের মধ্যে যে তিনি তুলনা করেছেন, তার মধ্যে মূলত আছে ঐ সাহিত্য সৃষ্টির বিষয়ে অজ্ঞান, না হলে তিনি শিককাবাব যে সন্দেশ নয় এ তত্ত্ব আবিষ্কারে অচিন্ত্যকুমারকে ভূমিসাৎ করে পুলকিত হতেন না। কিন্তু তার চেয়ে বেশী পীড়িত করে তাঁর ফৌজদারী-শোভন সাক্ষ্য ব্যবহারের সদরালা রীতি। অচিন্ত্যকুমারের 'মুচি বায়েন'-এর তিনি যে দুর্নীতিব্যঞ্জক পটচ্যুত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সে ব্যাখ্যা আমাদের অনেকের কাছেই স্বকপোলরঞ্জিত বলে মনে হয়েছে। গুরুদাসবাবুও নাকি এই রকম আপত্তি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'-র বিরুদ্ধে, অনাথপিণ্ডদসুতা একমাত্র বস্ত্রদানে অশ্লীল কাণ্ডই করেন বলে। শোলোকভের প্রথম উপন্যাস কম্যুনিস্ট ও কসাক্‌দের দুর্বলতা বা যৌন আত্মদানেই শেষ—এই অভিযোগে অপ্রকাশ্য হয়ে পড়েছিল, তখন সে বই ছাপাতে গিয়ে গোর্কি কি প্রতিক্রিয়াশীলতার পর্যায়ে গিয়েছিলেন? "মনে হয়" নীহারবাবু "যেন" তাই বলেছেন।

এই অর্ধসত্যের বিস্তার যে নীহারবাবুর হোমরীয় গ্রীবানমন নয়, তার প্রমাণ তাঁর আরেকটি মন্তব্য। তিনি বলেছেন যে, অচিন্ত্যকুমার নাকি আদালতের নথিপত্র ব্যবহার করেন গল্পে। অচিন্ত্যকুমার হাকিম কিনা তা জানবার প্রয়োজন গল্প-সমালোচনায় নেই, তিনি কৃষকসভার রিপোর্ট থেকে গল্প লেখেন কিনা তাও জানবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মন্তব্যটি অবান্তর হলেও এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে নীহারবাবু ভালো সমালোচক নন, তা হলে গোয়েন্দা-গিরি করতে দ্বিধা হতো।

কিন্তু এই কি প্রগতিশীল সমালোচনা? সংগ্রামী বাঙালীর এই কি সংস্কৃতির লাল রাস্তা? নাকি রাস্তা তৈরী এ নয়, এ শুধু তরল দীপ্তির চটুল আগুনে সমাজচেতনার ফুলঝুরি? কিম্বা এক সাহিত্যিক স্পেশ্যাল পাওয়ার্সের খেলা?

না হলে কোনো স্ত্রীলোকের চলন দেখে কৃত্তিদীপ্তিকাব্যে যে বলত গজেন্দ্র-গামিনী, সে যে মহিলাটিকে হাতি বলে ডাকা নয়, সে কথা কি নীহারবাবুর মতো বাজিকর সমালোচক বোঝেন না? হেমিংওয়ের বিশেষ পরিণতির সঙ্গে আমি তুলনা করেছিলুম অচিন্ত্যকুমারের বিশেষ পরিণতির। নীহারবাবু আমাকে "কবি-সমালোচক" ব্যঙ্গাভিধায় অধোবদন করে দিয়ে বলেছেন যে, তিনি আমার

মতো হেমিংওয়ের সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের তুলনা করতে অক্ষম। কথাটা কি সত্যই যুগান্তকারীভাবে বলা দরকার ছিল? হেমিংওয়ে-অচিন্ত্যকুমারের তুলনা ছেড়ে তাঁদের রচনাবলী যে পড়তেই হবে, সকলের পক্ষে তারই বা কি বাধ্যবাধকতা? তবু দুঃখ প্রকাশ করতে পারি এ অনর্থক অক্ষমতায়। নীহারবাবুর মতো আমার প্রগতিবিলাসী বন্ধুদের সঙ্গে সাহিত্যপাঠের সহক্ষমতা থাকলে খুশিই হতুম।

এ ক্ষেত্রে শুধু আশা করতে পারি যে শ্রদ্ধা ও বিনয় আর সততা এবং অনলস অধ্যয়নের দ্বারা আমরা সবাই যেন সাহিত্যের প্রগতি প্রসারেই সাহায্য করতে পারি, দলগত মনোভাবের নয়। এই স্বজাতিপ্রীতিমূলক মনোভাবের আরেকটি প্রমাণ নীহারবাবু দিয়েছেন সুশীল জানার 'স্বপ্নসম্ভবা' আলোচনায়, ঐ গল্পের সঙ্গে 'পরিচয়ে' প্রকাশিত সমরেশ বসুর 'প্রতিরোধ' গল্পটির তুলনা তাই কি তিনি চেপে গিয়েছেন?

ইতিমধ্যে অচিন্ত্যকুমারের আরো দুটি বই পড়ে আমার সন্দেহ নেই যে তার গল্পের ধারা আরো পরিণত হচ্ছে। বাস্তবতায় ও দরদে, প্রগতি সাহিত্যের বহু লক্ষণেই—'চাষাভূষা' বা 'যতনবিবি'-র অনেক গল্পই অপূর্ব। সাধারণভাবে এই স্বীকার করে অবশ্যই নীহারবাবু দেখাতে পারতেন অচিন্ত্যকুমারের কাছে আমরা আরো কি প্রত্যাশা করি, কিংবা তাঁরই এ গল্পে এই ত্রুটি ও গল্পে যা নেই। কিন্তু প্রায়ই দেখি আমাদের স্বাধিকারপ্রমত্ত সাহিত্য-সমালোচনার আসনে অধিষ্ঠিত বামপন্থীরাও ঠিক দক্ষিণপন্থীদের মতোই সৃষ্ট সাহিত্যের প্যারাসাইট্ সমালোচনার এ প্রথম নিয়ম মানেন না। গল্পের উপজীব্য যে সাধারণ মানুষ আমাদের মনোনীত মহত্ত্ব অর্জন করে, যেমন মানিকবাবুর 'গায়েন' করেছে—তারই মতো মানুষ অন্য গল্প-চরিত্রে দুরবস্থার চাপে যে মনুষ্যত্বের ট্রাজিক বা করুণ রূপ প্রকাশ সম্ভব এ সত্য যেন আমরা না ভুলি। তেভাগার বীরত্বে আমাদের লেখকরা যেন ভবিষ্যৎ দেখেন এ আশা সঙ্গত, কিন্তু অন্যপক্ষে পাঠকেরা যেন কোনো গল্পে তেভাগা বা ঐরকম কোনো আন্দোলনের ছক না দেখতে পেলে তার লেখককে সরাসরি প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যায় উড়িয়ে না দেন। এ ছুতমার্গে প্রগতি-সাহিত্যের ব্রহ্মণ্যেরই ক্ষতি। তাছাড়া অচিন্ত্যকুমারের গল্প সম্বন্ধে যেটা দ্রষ্টব্য বিষয়, সেটা হচ্ছে গল্প-চরিত্রদের সঙ্গে লেখকের যে সম্বন্ধপাতে সাহিত্যিক প্রথম অঙ্গীকার, সে সম্বন্ধপাত স্পষ্ট। তাতে রাজনৈতিক কাঠামো

হয়তো নেই, কিন্তু করুণা বা সমানুভূতিতে তা মানিক বা তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে তুলনীয়। এবং যেহেতু সে সমানুভূতির কোনো বিশেষ মতবাদে সূত্রপাত নেই, সেইহেতু তাঁর গল্পে—অর্থাৎ বহু উত্তীর্ণ গল্পে, লেখক-চরিত্রের সাযুজ্য নেই, এমনে করা নেহাৎই মতবিকার। বরং এক হিসাবে অনেক বামপন্থী লেখকের চেয়ে তাঁর এই সম্বন্ধপাত বেশি সাক্ষাৎ, তাঁর সাযুজ্য স্বচ্ছতর। বলাই বাহুল্য, এতে মতবাদের দোষগুণের কথা ওঠে না, বামপন্থী বিশেষ লেখকের ত্রুটি বা অতি-উৎসাহ তাঁর বামপন্থাকে দায়ী করে না, দায়ী করে তাঁর যান্ত্রিকতাকে, তাঁর স্বকীয় অধৈর্যকেই।

অচিন্ত্যকুমারের এই সাযুজ্যবোধ যে আকস্মিক বা অসৎ নয়, তার একটা প্রমাণ তাঁর এইরকম গল্পের সংখ্যা, তার বৈচিত্র্য, তার ব্যাপ্তি। আরেকটা বড় প্রমাণ হচ্ছে তাঁর এই সব গল্পের সঙ্গেই তাঁর মধ্যবিত্ত বা চাকুরিয়াদের নিয়ে লেখা গল্প, সেখানে তাঁর করুণা হয়ে উঠেছে—বিষয়ানুগভাবে ও বামপন্থী মতানুসারে ঠিকভাবেই—প্রখর ব্যঙ্গ, প্রায় নেতিবাচক অবজ্ঞা। অথচ এই লেখকেরই চাষীজীবনের গল্প সম্পূর্ণ ভিন্ন ঠাটে বাঁধা। এই যে লেখক-মনের সজীব সক্রিয় পরিবর্তনীয় বিন্যাস, তাতে বর্তমান সামাজিক অবস্থার স্ববিরোধে সচেতন ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বই সূচিত। তার জন্য অচিন্ত্যবাবুর কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ নিছক সহানুভূতি দিয়ে তিনি মন ভোলান নি, অবান্তর আশার দ্বারা উত্তেজিত তিনি করেন নি, কিন্তু বাংলাদেশের চাষী-গরিবদের, বিশেষ করে মুসলমান চাষীর জীবন তিনি আমাদের কাছে সাহিত্যভাত করেছেন। তাঁর অক্লান্ত কৌতূহল, হৃদয়বত্তা ও পরিশ্রমী চারিত্র্যে তাঁর আরো এবং উত্তরোত্তর পরিণতি আশাতীত নয় এবং সে আশা বাংলা সাহিত্যেরও আশা।*

* পরিচয়, 'পাঠকগোষ্ঠী', পৌষ ১৩৪৪, পৃ. ৬০১-৬০৪। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

শারদীয়া সাহিত্যে ছোটগল্প / নীহার দাশগুপ্ত

'পরিচয়' সম্পাদক সমীপেষু

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'পরিচয়ে' 'শারদীয়া সাহিত্যে ছোটগল্প' শীর্ষক আলোচনায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্প সম্বন্ধে যে উক্তি করেছিলাম, তারই প্রতিবাদে গত সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে এক পত্রাঘাত করেছেন। এ আঘাত যে আমার অধৈর্য, অজ্ঞান ও স্বজাতিপ্রীতিমূলক সমালোচনাকেই লক্ষ্য করে, বিষ্ণুবাবু তা অকপটেই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এই অকপটতা প্রশংসনীয়! 'মার্শালী আক্রমণ', 'স্পেশ্যাল পাওয়ার্সের খেলা' ইত্যাদি বামপন্থী শ্লোগানের আড়ালে থেকে তাঁর সুকৌশল আক্রমণ উপভোগ্য, কিন্তু এ বিষয়ে কোথাও তিনি এতটুকু সন্দেহের অবকাশ রাখেন নি যে তাঁর আক্রমণের আসল লক্ষ্য কি?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গায়েন' গল্পের সঙ্গে আমি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'মুচিবায়েন' গল্পের তুলনা করেছিলাম। আলোচ্য দুটি গল্পই দুই লোক-শিল্পীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ভিত্তি করে লেখা। দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদে গল্পের গুণগত প্রভেদ কত বিরাট হতে পারে, এই তুলনামূলক সমালোচনায় আমার বক্তব্য ছিল তাই। এই দুটি গল্পের হুবহু একই রকম পরিণতি বা একই রকম 'ট্রিটমেন্টের' প্রত্যাশা আমি করি নি', দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতার দরুন একটি গল্প হয়ে উঠল, আর সেই স্বচ্ছতার অভাবে আর একটি গল্প প্রতিক্রিয়াশীলতার পর্যায়ে গিয়ে পৌছল, তাই-ই আমি বলতে চেয়েছিলাম এবং বিষ্ণুবাবুর তা না বোঝাবার কথা নয়। তাই তাঁর শিক্কাবাব ও সন্দেশের পার্থক্য বোঝবার প্রচেষ্টা এ ক্ষেত্রে নিতান্তই নিরর্থক। 'মুচিবায়েন' গল্পে কোন "মনুষ্যত্বের করুণ ট্র্যাজিক রূপের" প্রকাশ বিষ্ণুবাবু দেখতে পেলেন? স্বামীর পসার-প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য এক পতিপ্রাণা নারীর মহান যৌন আত্মদানের ট্র্যাজিডি? প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে সেই আত্মদান পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে ভোগ দখল করে গ্রহীতা সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিসর্জন দিয়ে সে তল্লাট ত্যাগ করে চলে গেল কিসের প্রেরণায়? কিংবা এ শুধু নেহাতই কৃতজ্ঞতা? যৌন-আত্মদান নিয়েও মহৎ গল্পের সৃষ্টি হতে

পারে, দেশী ও বিদেশী সাহিত্যে তার উদাহরণ যথেষ্ট। কিন্তু 'মুচিবায়েন'-এর প্রতিটি চরিত্রের এই কদর্য ও বিকৃত রূপায়ণে বিষ্ণুবাবু যদি মনুষ্যত্বের করুণ ও ট্র্যাজিক রূপের প্রকাশ আবিষ্কার করেন, তা নিশ্চিতভাবে তাঁর বন্ধুপ্রীতির গভীরতাকেই প্রমাণ করে। এই সূত্রে অনাথপিণ্ডদ-সুতার বস্ত্রদান কাহিনী ও গুরুদাসবাবু-প্রসঙ্গ নেহাতই অবান্তর। আশা করতে পারি বিষ্ণুবাবুর মতো ধৈর্যবান সাহিত্যিক তা বুঝবেন।

অচিন্ত্যবাবুর গল্পের নিষ্প্রাণতার সঙ্গে আদালতের নথিপত্রের কাহিনীর নিষ্প্রাণতার তুলনা করেছিলাম। বিষ্ণুবাবু আমায় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবেই গোয়েন্দাগিরির অপবাদ দিয়ে বলেছেন যে, অচিন্ত্যকুমার হাকিম কি না তা জানবার প্রয়োজন গল্প-সমালোচনায় নেই। তিনি হাকিম কি না তা জানবার প্রয়োজন গল্প-সমালোচনায় নিশ্চয়ই আছে, যদি তাঁর হাকিমী তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে প্রভাবান্বিত করে। 'আনন্দমঠে'র শেষ পরিচ্ছেদে যেমন জানবার প্রয়োজন আছে বঙ্কিমচন্দ্র হাকিম ছিলেন কি না। সাহিত্যকার কোন শ্রেণীর সঙ্গে আত্মসমীকরণ করেছেন তা না জানলে তাঁর সাহিত্যকেও সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যায় না। এ সম্বন্ধে লেড়ুক কিছু বলেছেন কি না জানি না, কিন্তু লেনিন নিশ্চিতভাবেই বলেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাহিনীর এই নিষ্প্রাণতা তাঁর 'কাঠ-খড়-কেরোসিন' থেকে শুরু করে অধুনা প্রকাশিতে 'সারেঙ' বইয়ের অধিকাংশ গল্পেই লক্ষ্যণীয়। অচিন্ত্যবাবু বুদ্ধিমান সাহিত্যিক। এতদিন ধরে যে সমাজ, যে মানুষ আর তাদের যে সমস্যাকে তাঁর গল্পের উপজীব্য করে তিনি আসর মাৎ করে রেখেছিলেন, এবার তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে এই সমাজ, এই মানুষ আর তাদের এই সমস্যা দিয়ে আর আসর মাৎ করা যায় না; তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য অধিকাংশ সাহিত্যিকের মতো অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি মানুষ বদলালেন, তার পরিবেশ বদলালেন এবং নতুন যুগোপযোগী সমস্যাকেও উত্থাপন করলেন। অচিন্ত্যবাবু বুঝেছিলেন ঠিকই। কিন্তু হৃদয় দিয়ে আন্তরিকতা দিয়ে তাকে তিনি "সাহিত্যভাত" করতে পারেন নি। তার জন্য যে নিষ্ঠা, যে আদর্শের প্রয়োজন, হয়তো তাঁর সে নিষ্ঠা, সে আদর্শের অভাব। তাই বুদ্ধি দিয়ে আর তাঁর অপূর্ব ভাষা ও আঙ্গিকের দক্ষতা দিয়ে সাধারণ মানুষের যে কাহিনী তিনি রচনা করেন, তাতে থাকে হয়ত সব কিছু, কিন্তু প্রাণসংযোগ

হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, 'যতনবিবি'তে প্রকাশিত কয়েকটি গল্পে দুঃস্থ ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষদের নিয়ে যে ভাববিলাসিতা তিনি করেছেন, তা মনকে রীতিমতো পীড়িত করে। "বাস্তবতায় ও দরদে, প্রগতি সাহিত্যের বহু লক্ষণে" সে গল্প আমাদের কাছে অপূর্ব হয়ে ওঠে না।

শুনেছি বিষ্ণুবাবুর বন্ধু-মহলে তাঁর "সততা ও অনলস অধ্যয়নে"র প্রতি সকলেরই খুব শ্রদ্ধা আছে। সুতরাং তাঁর মতো পাণ্ডিত্যবিলাসীর নিশ্চয়ই জানবার কথা যে, রাজনৈতিক দৃষ্টি বা বিচার ছাড়া সাধারণ মানুষের প্রতি "সমানুভূতি" গড়ে উঠতে পারে না। "সমানুভূতি" তখনই গড়ে ওঠে যখন সাধারণ মানুষকে আর তার সুখ-দুঃখকে তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক বিচার করা হয়। এ বিচার রাজনৈতিক বিচার। প্রগতিশীল গল্পে প্রত্যক্ষে হোক, পরোক্ষে হোক, তাই রাজনৈতিক কাঠামো থাকতে বাধ্য। বিষ্ণুবাবু ঠিকই ধরেছেন। রাজনৈতিক কাঠামো অচিন্ত্যবাবুর গল্পে নেই। তাঁর গল্পে নেই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরই সৃষ্ট সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের বিচার ও বিশ্লেষণ। নিছক মানবপ্রেমে "সমানুভূতি" জন্মে না, জন্মে দয়া। নিছক দয়া বা করুণায় প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।

সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে গল্পচরিত্রের এই বিচার ও বিশ্লেষণের অভাব একদিকে অচিন্ত্যকুমারের সৃষ্ট গল্পচরিত্রকে যেমন নিষ্প্রাণ ও সেইহেতু অবাস্তব করে তুলেছে, অন্যদিকে তাঁর এই "অ-জ্ঞান" তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বচ্ছতা দান করতে পারে নি, তাঁর গল্পচরিত্রকে যথার্থ ও সুষ্ঠু পরিণতিতে টেনে নিয়ে যেতে দেয় নি। এক এক সময় তাঁর এই আবিল দৃষ্টিভঙ্গী রীতিমতো শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষ্ণুবাবুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপ্রাপ্ত "কাঠ-খড়-কেরোসিন"-এর 'কাঠ', 'খড়' বা 'কেরোসিন' গল্পে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হতে বাধ্য। শঙ্কার কারণ শুধুমাত্র তাঁর বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী বা অসৎ উদ্দেশ্যের জন্য নয়, পাঠক-সাধারণকে বিভ্রান্ত করার সুকৌশলের জন্য। মঙ্গল চাপরাশী, রমজান বা হাস্নুবিবির মতো নিপীড়িত সাধারণ মানুষকে শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করিয়ে সমস্ত সমস্যাকে তিনি বিকৃত ও অসৎভাবে চিত্রিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই আশ্চর্য হই যখন দেখি যে এই ধরনের গল্পকেও বিষ্ণুবাবু প্রথম শ্রেণীর প্রগতিশীল গল্পের লেবেল এঁটে বাজারে চালাবার মহৎ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এর থেকে হয়তো বোঝা যাবে—সাহিত্য-সমালোচনায় ব্যক্তিগত 'সম্বন্ধপাত' সমালোচককে

কতখানি "স্বাধিকার প্রমত্ত" করে তোলে।

বিষ্ণুবাবুর মতে মধ্যবিত্ত বা চাকুরিয়াদের নিয়ে লেখা অচিন্ত্যবাবুর গল্পে নাকি 'তাঁর করুণা বিষয়ানুগভাবে ও বামপন্থী মতানুসারে ঠিকভাবেই প্রখর ব্যঙ্গ, প্রায় নেতিবাচক অবজ্ঞা।' বামপন্থী মতবাদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বের দাবী বিষ্ণুবাবু নিশ্চয়ই করেন না। মধ্যবিত্ত বা চাকুরিয়াদের নিয়ে লেখা গল্পের সংকলন 'ইনি আর উনি'র গল্পগুলি উপভোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু বিষ্ণুবাবুর এত বাড়াবাড়ি করার কারণ কি? গল্পগুলির হাল্কা হাস্যরস মনে আনন্দ জোগায়—একথা ঠিক। কিন্তু 'ইনি আর উনি'র যেসব গল্পচরিত্র নিয়ে অচিন্ত্যবাবু এই হাল্কা উপভোগ্য হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন, চাকুরিয়া বা মধ্যবিত্তদের মধ্যে তারা মোটেই স্বাভাবিক চরিত্র হিসাবে পরিচিত নয়, তাদের নিয়ে লেখা রসসাহিত্য অবসর সময়ে উপভোগ করা যায় সন্দেহ নেই, কিন্তু 'বিষয়ানুগভাবে ও বামপন্থী মতানুসারে প্রখর ব্যঙ্গ বা নেতিবাচক অবজ্ঞা'র পাত্র-পাত্রী এরা নয়।

বিষ্ণুবাবু আমার বিদ্যাবুদ্ধির ওপর অজস্র ব্যক্তিগত কটাক্ষ করেছেন। 'পরিচয়'-এর সম্পাদকরাও বাদ যান নি। বুদ্ধিবিলাসীর আত্মাভিমানে যখন আঘাত লাগে, তখন তাঁর তথাকথিত ভদ্রতার মুখোশ খুলে পড়ে, প্রতিপক্ষের গায়ে কাদা ছিটানো ছাড়া তাঁর আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। আমি যে হেমিংওয়ে-অচিন্ত্যকুমারের রচনাবলী পড়ি নি, "আশা করি" এ-তথ্য সংগ্রহের জন্য বিষ্ণুবাবুকে গোয়েন্দাগিরি করতে হয় নি, কারণ "আশা" যে "দুর্মর"—সে কথা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সত্যিই "যুগান্তকারী" ভাবেই বলেছেন!

বিষ্ণুবাবু যে বিনীত গ্রহণের কথা বলেছেন, তা কি নির্বিচার গ্রহণ? গত শারদীয়া সংখ্যা 'পরিচয়'-এ তাঁরই এক প্রবন্ধে বিষ্ণুবাবু যখন তারাশঙ্করের সঙ্গে তুলনায় শরৎচন্দ্রকে "বাঙালী গৃহিণীর মধ্যাহ্ন মনোরঞ্জনে দ্বিপ্রহরের ভোজান্তে পানদোক্তার ভাববিলাসী ঘোর" বলে নস্যাৎ করে দেন, তখন একে বিষ্ণুবাবুর "সংস্কৃত" শ্রদ্ধার চূড়ান্ত উদাহরণ হিসাবেই কি গ্রহণ করব?

"বাজিকর সমালোচক"-এর সাধনায় বিষ্ণুবাবুর এতদিনেও সিদ্ধিলাভ হয়েছে কিনা জানি না। তবে মনে হয় বাজি ধরেছেন তিনি; এবং সে বাজি ভুল ঘোড়ার ওপর।*

* পরিচয়, মাঘ ১৩৫৪, পৃ. ১১২-১৫। 'পরিচয়'-এর 'পাঠকগোষ্ঠী' বিভাগে পত্রখানি সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ প্রকাশিত হয়। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন-মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

শারদীয়া সাহিত্যে ছোটগল্প / অনিলকুমার সিংহ

'পরিচয়' সম্পাদক সমীপেষু

অগ্রহায়ণ মাসের 'পরিচয়' পত্রিকায় নীহার দাশগুপ্ত শারদীয়া সাহিত্যে ছোট গল্পের আলোচনায় যে আপাত-অপ্রিয় কথাগুলি বলেছেন, স্বভাবতই তা 'পরিচয়'-এর পাঠক মহলে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তারই প্রমাণ পাই, পৌষ সংখ্যায় বিষ্ণু দে-র পত্রাঘাতে—ক্রোধ, ব্যঙ্গ, করুণা ও অসংযত ভাবাবেগে যার প্রতিটি ছত্র ভারাক্রান্ত। নীহারবাবুকে আক্রমণ করতে গিয়ে বিষ্ণুবাবু অনেকগুলি মারাত্মক কথার অবতারণা করেছেন যা নেহাৎই 'ভ্রান্তিবিলাস' বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বাংলা সাহিত্য—বিশেষ করে প্রগতি সাহিত্য—আজ এমন একটা অবস্থার মধ্যে অগ্রসর হচ্ছে যে এ সময়ে নানারকম সংশয়, দ্বিধা, ভ্রান্তি ও মোহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়েই সত্যিকার প্রগতি সাহিত্যের রাস্তার নিশানা মিলবে। বিষ্ণুবাবু বা নীহারবাবুর বিবৃতিতেই তার চরম সমাধান হবে না।

গোড়াতেই বলে রাখা ভালো যে, নীহারবাবুর সঙ্গে আমি একমত নই। বরং তাঁর সমালোচনায় কতকগুলি ভ্রান্তি আমার চোখে পড়েছে, সেগুলি এখানে আলোচনা করব। বিষ্ণুবাবুর বক্তব্য ওস্তাদী মারপ্যাঁচের গোলকধাঁধার মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও বুঝে ওঠা নেহাৎ কঠিন নয়। সুতরাং উভয়ের বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই আমার এই চিঠির সূত্রপাত।

গত কয়েক বছর থেকে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের ছোটগল্পে যে বিষয়বস্তুগত ও আঙ্গিকগত পরিবর্তন এসেছে তা প্রত্যেকটি কৌতূহলী পাঠকই লক্ষ্য করেছে। অত্যন্ত গভীরভাবেই লক্ষ্য করেছে যে, জরাগ্রস্ত মধ্যবিত্ত জীবনের কাল্পনিক ও অবাস্তব চরিত্র-চিত্রণের মনগড়া গণ্ডী ভেঙেচুরে তাঁর সাহিত্য ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে সাধারণ মানুষের দরবারে যেখানে সে অতি রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে ঘর করে বেঁচে আছে। অচিন্ত্যবাবু বদলেছেন ঠিকই। আর না বদলেই বা

উপায় কি ? যুগ পালটাচ্ছে। তার সঙ্গে তাল রাখতে হলে তাঁকেও পালটাতে হবে। আসলে রূপান্তরিত অচিন্ত্যকুমারকে যাচাই করতে গিয়েই, যত মতবিরোধ।

অচিন্ত্যবাবুর গল্পের বিষয়বস্তু পালটেছে একথা একশোবার ঠিক। তেমনি একশোবার ঠিক তাঁর প্রকাশভঙ্গীর বিন্যাসের পরিবর্তন ও সমৃদ্ধি। তাঁর ভাষার জৌলুস ও স্বচ্ছতা মনকে আকর্ষণ করে না—একথা বললে নেহাৎই মিথ্যা কথা বলা হবে। তাঁর অধিকাংশ গল্পের চরিত্র মুসলমান চাষী ও সাধারণ নির্যাতিত ও অবহেলিত মানুষ—একথাও সত্যি। তাহলে আসলে গোল বাধল কোথায় ? গোল বাধিয়েছেন অচিন্ত্যবাবু নিজেই। তিনি তাঁর গল্পে যেসব মানুষকে স্থান দিচ্ছেন তারা যখন কথার উর্দি পরে এসে পাঠকদের সামনে উপস্থিত হয়, তখন তাদের চিনতে যে খুব কষ্ট হয় তা নয়, কিন্তু আসলে তাদের মনই পাওয়া যায় না। বুদ্ধি দিয়ে বুঝি—ও লোকটা চাষী, ঐ লোকটা মুচি, হাঁড়ি বা ডোম, কিন্তু হৃদয় দিয়ে একাত্মীয়তা অর্জন করা যায় না। কেন যায় না ? যায় না তারা নথিপত্রের পশ্চাৎপটে ও আদালতের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা মানুষ—শ্রেণীবিন্যাসের পশ্চাৎপটে ও বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা পুরোপুরি রক্ত-মাংসের মানুষ তারা নয়। তাই অনেক সময়ে তারা দোকানে সাজানো পুতুলের মতো চোখকে আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু মনকে টানে না। এতে বিষ্ণুবাবু হয়তো চট্ করে আপত্তি করবেন—বলবেন, গোয়েন্দাগিরি সমালোচকদের জন্যে বে-আইনী। আমি কিষাণসভার রিপোর্ট পড়েই গল্প লিখি আর আদালতের নথিপত্র ঘেঁটেই গল্প লিখি তাতে আপনার কি মশাই ? এর উত্তরে আমি বলব—সাহিত্যিককে পুরোপুরি ছেঁটে ফেলে তাঁর সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ সমালোচনা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ বা গোর্কীর সাহিত্যকে বিচার করতে হলে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে সাহিত্যের উৎস কোথায়—এ তো সর্বাগ্রেই জানতে হবে। সাহিত্য-সমালোচনায় 'হোমরীয় গ্রীবানমন'-এর স্থান নেই। প্রয়োজন হলে 'গোয়েন্দাগিরি' করতে হবে বৈকি !

অচিন্ত্যবাবুর গল্পের চরিত্রগুলি সাধারণ মানুষ—এ কথা অবলীলাক্রমেই মেনে নিয়েছি। কিন্তু সেই সব সাধারণ মানুষকে যখন ছাপার অক্ষরে দেখতে পাই তখন তারা সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষ। তার পেছনে যে ছক-কাটা ঘুণ-ধরা সমাজ মানুষকে তিলে তিলে ক্ষয় করে ফেলছে—সে সম্পর্কে অচিন্ত্যবাবু

কতখানি সজাগ? তাঁর গল্পের সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন সংগ্রামের (তেভাগা-রূপী সংগ্রামই যে সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য, এ মূল্যবান খবরটা বিষ্ণুবাবু কোথায় পেলেন?) মধ্যে দিয়ে যে অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে তার কোনো আভাসই অচিন্ত্যবাবুর গল্পে মেলে না। সুতরাং তাঁর কিছু কিছু ছোটগল্পকে ততখানিই বিষয়মুখ (objective) বলব যতখানি বিষয়-মুখীনতার মর্যাদা ফটোগ্রাফারের প্রাপ্য। ভালো ফটোগ্রাফ তুলতে হলে দরদ ও দক্ষতা থাকা দরকার ঠিকই, কিন্তু ভালো ছবি আঁকতে হলে চিত্রকরের যে মর্মবেদনা, আবেগ ও সৃষ্টির দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা থাকা অপরিহার্য, অচিন্ত্যবাবুর আপাত-বিষয়ানুগ ছোটগল্পে তার দৈন্য চোখে পড়ে। অচিন্ত্যবাবুর কোনো উৎসাহী পাঠক যদি বলে যে তাঁর হালের গল্প থেকে কোনো পরিণতির আভাস মেলে না, ঐতিহাসিক পরিণতি তো নয়ই, তাহলে বিষ্ণুবাবু তার কী উত্তর দেবেন? রূপান্তর আর পরিণতি যে এক জিনিস নয়, তা কি বিষ্ণুবাবুর মতো চতুরঙ্গ সমালোচক বোঝেন না?

তবু অচিন্ত্যকুমারের হালের সাহিত্যকে সরাসরি প্রতিক্রিয়াশীল বলব—এ দুঃসাহস আমার নেই। অচিন্ত্যবাবু প্রগতিশীল আন্দোলনের পরিপন্থী ডজনখানেক গল্প লিখেছেন বলেই তাঁর সাহিত্যকে চট করে প্রতিক্রিয়াশীল বলা চলে না, কারণ তাঁর সাহিত্য তো ঐটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়—আরও অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত তাঁর সাহিত্য। আসলে গোল বেধেছে বিষ্ণুবাবুর মহানুভবতার আধিক্য ও নীহারবাবুর কার্পণ্যের ফলে। বিষ্ণুবাবু অচিন্ত্যকুমারকে তাঁর প্রাপ্যের অনেক বেশী দেবার জন্যে ব্যগ্র, অন্যদিকে নীহারবাবু তাঁর প্রাপ্যটুকুও পুরোপুরি দিতে চান না। বিষ্ণুবাবু বলেছেন, 'অচিন্ত্যকুমারের এই সাযুজ্যবোধ (অর্থাৎ লেখক-চরিত্র সাযুজ্য—পত্রলেখক) যে আকস্মিক ও অসৎ নয়, তার একটা প্রমাণ পাই তাঁর এই রকম গল্পের সংখ্যা, তার বৈচিত্র্য, তার ব্যাপ্তি।' এই সংখ্যা, বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তিই বিষ্ণুবাবুকে বেসামাল করেছে। কারণ এই তিনটি গুণ থাকা সত্ত্বেও বিষ্ণুবাবুর রচনা তো আজও সাধারণ পাঠকের মনকে টানতে পারল না। অন্যদিকে নীহারবাবু বলেছেন, 'মানিকবাবুর 'গায়েন' গল্পের সঙ্গে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'মুচিবায়েন' গল্পের তুলনা করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদে গল্পের গুণগত প্রভেদ কত বিরাট হতে পারে।' দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদে গুণগত প্রভেদের বিরাটত্বের কথা মেনে নিয়েও এ কথা

বলতেই হয় যে, অচিন্ত্যকুমারের 'মুচিবায়েন' গল্পে প্রথম বাজনদারের স্ত্রী যদি তার স্বামীর মর্যাদা, পসার ও ভালোবাসা রক্ষার তাগিদে দ্বিতীয় বাজনদারের কাছে যৌন-আত্মদান করেই থাকে, তাতে নীহারবাবুর অকস্মাৎ প্রতিক্রিয়া আবিষ্কারের যুক্তিটা কোথায়? মানিকবাবুর 'গায়েন'-এর সঙ্গে এর তুলনা চলে না; কারণ অচিন্ত্যবাবুর গল্প সম্পূর্ণ ভিন্ন ঠাটে বাঁধা। অতএব দুটি গল্পের একই পরিণতি কি করে সম্ভব? অবিশ্যি 'মুচিবায়েন' সম্পর্কে আমার নিজস্ব মত হলো যে গল্পটি সম্পূর্ণ অসার্থক—অচিন্ত্যবাবুর মুন্সিয়ানার কোনো চিহ্নই তাতে নেই। কারণ গল্পটি আগাগোড়া লেখকের লজিক মতো অগ্রসর হয়েছে—গল্পের নিজস্ব লজিক উপেক্ষা করে। নীহারবাবু আর এক জায়গায় বলেছেন, 'বাংলার গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ আর তাদের গ্রামীণ কথ্যভাষা অচিন্ত্যবাবুর প্রায় প্রতিটি গল্পের অবলম্বন। তাদের সুখ-দুঃখ, অত্যাচার অবিচারের কথাও তিনি বলে থাকেন।' নীহারবাবু অচিন্ত্যকুমারের প্রতি অবিচার করেছেন, কারণ তিনি তাঁর অনেক ছোটগল্পেই সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, অত্যাচার-অবিচারের 'কথাও' নয়—কথাই বলে থাকেন। অবশ্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ নয় বলে তাঁর বক্তব্যও অত্যন্ত ম্রিয়মাণ।

পরিশেষে একটা কথা না বলে পারছি না। বিষ্ণুবাবু নীহার দাশগুপ্তের সমালোচনাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—এই কি প্রগতিশীল সমালোচনা? ভাববার মতো প্রশ্ন বটে। কারণ নীহারবাবু তাঁর সমালোচনায় উপযুক্ত যুক্তি না জুগিয়ে বিবৃতি দিয়েই খালাস হয়েছেন। কিন্তু বিষ্ণুবাবুর সমালোচনাকে আদর্শ সমালোচনা হিসেবে মেনে নিয়েই যদি প্রগতিশীল সমালোচনার প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপিত হয়, তাহলে বলতে হবে—বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ এইখানেই সমাধিস্থ হলো।*

---

* পরিচয়, 'পাঠকগোষ্ঠী', মাঘ ১৩৫৪, পৃ. ১১৫-১৭। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

শারদীয়া সাহিত্যে ছোটগল্প / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

'পরিচয়'-সম্পাদক সমীপেষু,

পৌষের 'পরিচয়ে' প্রকাশিত বিষ্ণু দে মহাশয়ের পত্রখানির অকারণ তিক্ততা ও অসংযম সীমা ছাড়িয়ে গেছে। মার্কসীয় সাহিত্য-বিচার সম্পর্কে তার ভুল ধারণার মতো এই তির্যক অবিনয়ও প্রতিবাদযোগ্য। শারদীয়া সংখ্যা পত্রিকাগুলির কয়েকটি ছোটগল্প সম্পর্কে নীহার দাশগুপ্তের যে নিবন্ধের বিরুদ্ধে তাঁর পত্রাঘাত, বিষ্ণুবাবুকে এতখানি বিচলিত করার মতো কিছুই তাতে খুঁজে পেলাম না। নীহারবাবু কেবল একস্থানে লিখেছেন: "অচিন্ত্যকুমারের তীক্ষ্ণধার ভাষা ও গল্প বলার কায়দার জোরে গল্পগুলি সুখপাঠ্য হয়ে উঠলেও কোনো এক কবি-সমালোচকের মতো তাঁকে হেমিংওয়ের সঙ্গে তুলনা করতে পারব না। বলতে পারব না, 'তার গল্পের জীবন, জীবনেরই মতো বিচিত্র, তিক্ত, মধুর, বিস্ময়কর মিশ্রাবেগ'।"

বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে মতের পার্থক্য ঘোষণা করা ছাড়া এর মধ্যে আর কি আছে, বিষ্ণুবাবুর কাছে যা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে গঞ্জিত করার মতো আপত্তিকর হতে পারে?

নীহারবাবুর নিবন্ধটি ঠিক সমালোচনাও নয়, আলোচনা মাত্র। শারদীয়া সংখ্যার কতগুলি গল্প পড়ে তিনি সংক্ষেপে তাঁর সাহিত্যিক মতামত ও পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতেই গল্পগুলির মোটামুটি বিচার-'পরিচয়ে' দশজনের সামনে ধরেছেন—দশজনেও যাতে আলোচনা করেন। এটা সাহিত্যিক সৎ প্রচেষ্টা।

বিষ্ণুবাবুর মার্কসিস্ট দৃষ্টি বিকৃত না হলে নীহারবাবুর প্রবন্ধের মূল ত্রুটি তাঁর চোখে উল্টো প্রতিভাত হতো না, সমালোচনাটির দক্ষিণঘেঁষা দুর্বলতাকে ট্রটস্কি-মার্কা প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে ভুল করতেন না। আমাদের সকল প্রগতিপন্থী সাহিত্যসৃষ্টি ও সমালোচনা প্রচেষ্টার মধ্যে এই বামপন্থী বিষমের পরিচয়, নিজ শ্রেণী-মূলগত মোহ ও ভ্রান্তির নাগপাশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবার অক্ষমতার প্রমাণ কমবেশি আছে—কিন্তু সেটা কোনোমতেই উগ্র বামত্বের ট্রটস্কিমার্কা

প্রতিক্রিয়াশীলতা হয়ে উঠতে পারে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অচিন্ত্যকুমার প্রসঙ্গে নীহারবাবু শিককাবাব ও সন্দেশে গুলিয়ে ফেলেন নি, তিনি যে মূল কথাটা ধরতে পারেন নি তা হলো এই যে মানিক বা অচিন্ত্য একজনও ভালো শিককাবাব বা ভালো সন্দেশ বানাচ্ছেন না। নীহারবাবুর মার্কসিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী কাঁচা বলেই 'গায়েন' ও 'মুচিবায়েন'-এর তুলনামূলক পার্থক্যটাই তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে, আজকের দিনের জীবনের গতির সঙ্গে বাস্তব ও সত্যধর্মী সামঞ্জস্য রাখার যে প্রগতিশীল 'সৎ প্রচেষ্টা'টুকু 'গায়েন' গল্পে তাঁর চোখে পড়েছে তাতেই তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। সেই পুরাতন ফাঁকি রসসৃষ্টির খাতিরে 'মুচিবায়েন'-এ আজকের দিনে চাষাভূষো সবার জীবনের প্রথম ও প্রধান সত্য আড়ালে রয়ে গেছে বলে তাঁর কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'গায়েন'-এর আপেক্ষিক সাহিত্যিক সার্থকতা। এবং এ হিসাবে কথাটা সত্যই। প্রগতির প্রচেষ্টাতেই খুশি হওয়া বরং ভালো, প্রচেষ্টার অভাবকে বরণ করার প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মচ্যুতির চেয়ে। চাষাভূষো নিয়ে গল্প লিখব বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্য যারা দেহরক্ষার ব্যাপার অনেকটা সহজ করে মন নিয়ে কারবার করার অবসর পায় এবং ওই অবসর-সোহাগী মনের খাতিরে একেবারে চেপে যাব চাষাভূষো পুরুষটা ও নারীটার অবসরহীন অকথ্য কঠোর দেহরক্ষার সংগ্রাম, অথচ রসসৃষ্টি করব একমাত্র ওই দুটি ভুখা দেহের যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে—সাহিত্য সৃষ্টির এ ফাঁকি আজ অচল না হয়ে গেলেও ধরা পড়ে গেছে। চাষী-মজুরদের দেহ নিয়ে সাহিত্যের হাটে এ ব্যবসা চালানোর সহজ সরল মানেই হলো পশু-পাখির প্রেমলীলা দর্শনে যে মনের বিকার তৃপ্ত হয়, সাহিত্যের পর্যায়ে তুলে সেই মনের সেই বিকারকেই তৃপ্তিদান। 'মুচিবায়েন' সত্যই তাই অশ্লীল। সত্যই অবাস্তর। অনাথপিণ্ডদসুতার একমাত্র বস্ত্রদানের ফলে যে অশ্লীলতা গুরুদাসবাবু কল্পনা করেছিলেন সেটা গুরুদাসবাবুরই শ্লীলতা-অশ্লীলতার সম্পর্কে চেতনার প্রশ্ন—চাষী-মজুর মেয়ে-বৌয়ের গা থেকে একমাত্র ছেঁড়া কাপড়খানা কেড়ে নেওয়ার অশ্লীলতার সঙ্গে তার আকাশ-পাতাল তফাৎ। দেহ তো আর অশ্লীল নয়, দেহের চেতনাও নয়—ওই চেতনার বিকৃতিই শুধু অশ্লীলতা। গোর্কি বেঁচে থাকলে আচমকা তাঁকে টেনে মামাদের চমক সামনে বসিয়ে বিষ্ণুবাবুকে এই দৃষ্টিতে আরেকবার শোলোকভের উপন্যাসটি পড়বার অনুরোধ জানাতেন নিশ্চয়। 'কম্যুনিস্ট ও কসাকদের দুর্বলতা যৌন-আহ্লাদেই শেষ'—কিন্তু

এই শেষটাই আসল বা বইখানার শেষ কথা নয়। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার যৌন-সম্পর্কের বিপর্যয় সম্পর্কে 'হিউম্যানিটি আপরুটেড' বইখানার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা পড়ে দেখলেও বিষ্ণুবাবুর সাহায্য হতে পারে, বোঝা হতে পারে যে যৌন বিপর্যয়েরও একটা বিপ্লবাত্মক সত্য থাকে—বিপ্লবটা বাদ দিলে যা অর্থহীন। কম্যুনিস্ট ও কসাকদের যৌন-আত্মদানই শোলোকভের উপন্যাসটার প্রধান কথা বা মর্মকথা নয়—যদিও বিষ্ণুবাবু তাই ধরে নিয়েছেন। এবং ধরে নেওয়ার ফলে তিনিই গোর্কিকে প্রতিক্রিয়াশীলতার পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছেন, নীহারবাবু নন। তাই কি দাঁড়ায় না কথাটা?—শোলোকভের উপন্যাসে কম্যুনিস্ট ও কসাকদের দুর্বলতা বা যৌন-আত্মদান ছাড়া আর কিছুই ছিল না—তবু শুধু আর্টের খাতিরে গোর্কি বইখানা ছাপিয়েছিলেন! এই যদি 'আর্ট' এবং একেই যদি এতটা খাতির গোর্কি করে থাকেন, তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বলতেই হবে। 'একটা মানুষ জন্মালো' গল্পে অস্রাতার দ্বারপথে পুঁজ-রক্তের সঙ্গে মানুষের জন্মলাভের বর্ণনাটাই "মনে হয়" বিষ্ণুবাবুর মতে "যেন" গোর্কির গল্পটার একমাত্র সার্থকতা—আর্টত্ব।

বিষ্ণুবাবুর মার্কসিস্ট জ্ঞান যে কতদূর অপরিচ্ছন্ন তার আরেক প্রমাণ লেখা থেকে লেখককে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার যুক্তির মধ্যে পাই। "অচিন্ত্যকুমার হাকিম কি না তা জানবার প্রয়োজন গল্প-সমালোচনায় নেই, তিনি কৃষকসভার রিপোর্ট থেকে গল্প লেখেন কি না তাও জানবার প্রয়োজন নেই।" অর্থাৎ, শুধু লেখার বিচার কর, লেখককে বাদ দিয়ে। লেখা যেন আকাশ থেকে পড়ে—লেখক সম্পর্কে কিছুই না জেনে যেন লেখার সমালোচনা সম্ভব। শোলোকভ বা গোর্কির জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়, না বাংলাদেশে, তা যেন না জানলেও চলে সমালোচকের। অচিন্ত্যকুমারের কলম কেন অনেকদিন থেমে ছিল, কেন আবার পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষীদের নিয়ে বিশেষ ধরনের গল্পের ফসলের আশ্চর্য ফলন শুরু হলো, কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে দু-তিন খানা গল্পের বই দান করলেন, বাংলা সাহিত্যে যা সম্পূর্ণ নতুন প্রচেষ্টা, কোন্ সূত্রে এই নতুন উপাদানের সন্ধান তিনি পেলেন, আইন-আদালত তাঁর সাম্প্রতিক গল্পে কেন এতটা প্রাধান্য পেল, এসব না জেনেই যেন তাঁর গল্পের সঠিক সমালোচনা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে, বিষ্ণুবাবু এখানে 'আর্টের জন্যই আর্ট'-এর পক্ষেই একটু ঘুরিয়ে ওকালতি করেছেন। মার্কসবাদের

মূলকথা উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, লেখকের শ্রেণীগত চেতনার হিসাব না ধরেও লেখার বিচার চলে, লেখক কোন শ্রেণীর দৃষ্টিতে চাষীশ্রেণীর জীবনকে দেখছেন গল্পের সমালোচনায় তার খোঁজ করা গোয়েন্দাগিরির সামিল।

কিন্তু প্রগতিশীল-সমালোচনা গালাগালি বা দুর্নামের ভয়ে লেখককে ছেড়ে কথা কইতে রাজী নয়, সংগ্রামী বাঙালীর সংস্কৃতির লাল রাস্তা কে তৈরি করেছে আর কিসে তৈরি করেছে সে বিষয়ে উদাসীন থেকে তরল দীপ্তির চটুল আগুনে সমাজচেতনার ফুলঝুরির মোহে সাহিত্যিক স্পেশ্যাল পাওয়ার্সের খেলা চলতে দিতে রাজী নয়। কৃষক সভার রিপোর্ট থেকে যিনি গল্প লেখেন তাঁকেও নয়, কলকাতায় বসে যিনি 'গায়েন' লেখেন, হাকিমের আসনে বসে যিনি 'মুচিবায়েন' লেখেন, মার্কসবাদ নিয়ে যিনি ঘরে বসে ক ব্য করেন—তাঁদেরও নয়।

সংগ্রামী বাঙালীর সংস্কৃতির লাল রাস্তা তৈরি করতে হলে সংগ্রামী সমালোচনা ছাড়া চলবে কেন? পুরনো সংস্কৃতির ধাঁধাকে সাদরে বজায় রেখে নতুন সংস্কৃতি গড়া যায় না।

হেমিংওয়ের বিশেষ পরিণতির সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের বিশেষ পরিণতির তুলনাকে হেমিংওয়ের সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের তুলনা বলে ভুল করে নীহারবাবু গজেন্দ্রগামিনী মহিলাকে হাতি মনে করার মতো 'বাজিকর সমালোচকে' পরিণত হয়েছেন। নীহারবাবুর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে বোঝা অসম্ভব 'পার্থক্য'টা তাঁর জানা ছিল কি না, তিনিই সেটা জানেন। তবে তাঁর মন্তব্য থেকে ধরে নিলে বোধহয় অন্যায় হবে না যে, এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন না। হেমিংওয়ের সঙ্গেই তিনি অচিন্ত্যকুমারের তুলনা করার অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু এতই কি ভুল একটা কথা তিনি বলে ফেলেছেন? বিশেষ পরিণতি কি এমনই একটা ছাঁকা জিনিস যা বিচ্ছিন্ন করে এনে তুলনা করা যায়? হেমিংওয়ের এবং অচিন্ত্যকুমারের মধ্যে আর সমস্ত তুলনা বাদ দিয়ে শুধু তুলনা করা যায় তাঁদের বিশেষ পরিণতির? কিসের ভিত্তিতে সে তুলনা হবে? নির্গুণ নিরপেক্ষ তুলনা, 'abstract'-এর অঙ্গীকার যে মার্কসীয় ধারণা প্রণালীতে অর্থহীন, বিষ্ণুবাবু নিজেই তার পরিচয় দিয়েছেন হেমিংওয়ের বিশেষ পরিণতির সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের বিশেষ পরিণতির তুলনা করতে গিয়েই। 'ভয়াবহ মিতভাষিতের' প্রচণ্ড সার্থকতা লাভ, স্পেনের ফ্যাসিস্ট যুদ্ধ, দুর্গত সমাজ-ছাড়া অত্যাচারে-অনাচারে জর্জরিত বাঙলা, দেশজ শব্দের তীক্ষ্ণ মর্যাদালাভ, সস্তা কারুণ্য থেকে মুক্তি, বিষয়াসুগ

মানবিকতা ইত্যাদি ফর্ম ও কণ্টেণ্টগত সর্বাঙ্গীণতার মধ্যেই তাঁকে পরিণতির ভিত্তি খুঁজতে হয়েছে। দু'জনের পরিণতির তুলনার অর্থই তাই দু'জনের রচনাবলীর তুলনা এবং চেতনা ও দৃষ্টির পরিবর্তনের তুলনাও।

শেষ কথাটা মনে রাখেন না বলেই সাহিত্যিকের বিশেষ পরিণতি সম্পর্কে বিষ্ণুবাবুর ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, অচিন্ত্যকুমারের চাকুরিয়া বা মধ্যবিত্তকে নিয়ে লেখা গল্প ও চাষী-জীবনের গল্পের স্টাইলের পার্থক্যের ভুল ব্যাখ্যা দিতে হয়, এবং এই পার্থক্যের মধ্যেই বিশেষ পরিণতি আবিষ্কার করে উৎফুল্ল হন। মধ্যবিত্ত বা চাকুরিয়াদের নিয়ে লেখা গল্পের 'প্রখর ব্যঙ্গ ও প্রায় নেতিবাচক অবজ্ঞা' ওই শ্রেণীরই আত্মবিরোধের প্রকাশ, অচিন্ত্যবাবু নিজেও যে আত্মবিরোধের অংশীদার। চাষী-জীবনের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ নেই, চাষী-জীবন তাঁর কাছে শুধু দর্শনীয় ও বুদ্ধি-মননীয় ব্যাপার, সুতরাং চাষী জীবনের গল্পে ব্যঙ্গ ও অবজ্ঞার সেই তীব্র করুণ প্রকাশ ঘটবে কি করে? এ ক্ষেত্রে ব্যঙ্গের চেহারা চাষী জীবনকে বিকৃত করায়, অবজ্ঞার স্ফূর্তি চাষী-জীবনের দীনতাকে হীন করায়। তেভাগা আন্দোলনটা নাই বা এল গল্পে, একজন বাজনদারের বৌ দিলই বা তার দেহটা আর এক বাজনদারকে ঘুষ। কিন্তু তেভাগা আন্দোলনের মধ্যে সমস্ত চাষী-জীবনের যে সত্যটা প্রকাশ পেল, যে মুখ বুঁজে অত্যাচার সয়ে না গিয়ে চাষী মেয়ে-পুরুষ আজ সচেতনভাবে সংগ্রাম করে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, এই সত্যকে গল্পের মধ্যে কোন আর্টের ধাপ্পায় চাপা দেওয়া চলবে? এ তো শুধু তেভাগার প্রশ্ন নয়, এটাই চাষী-জীবন, এটাই তার চেতনা—এবং জীবনে তার সহস্র আত্মপ্রকাশ! গল্পে বাজনদারের বৌ শতবার দেহ ঘুষ দিক—বাংলার চাষা-ভূষোর শত শত বৌ বাস্তবে তা দিয়েছে এবং দিচ্ছে, কিন্তু গল্প কি হবে ওই-টুকুই? এ কি মধ্যবিত্তের ঘরের বৌয়ের দেহ ঘুষ দেওয়া যে শুধু নীতিবোধের ধর্ষণেই করুণ রস সৃষ্টি হবে? চাষী-বৌ নিজের দেহকে পণ্য করলে চাষীর জীবনের বাস্তবতাতেই খুঁজতে হবে তার মর্ম, তাতেই ফুটবে তার করুণ রূপ। নতুবা হবে অশ্লীলতা, ন্যাচারালিজম।

আমরা ভদ্রলোকেরা বলি: আহা, গরীবের বৌ অভাবের তাড়নায় দেহ বিক্রী করল। আমাদের ভাবখানা এই, যেন আমাদের আহা বলবার জন্যই সে এ কাজটা করেছে, অন্যথা কোনোই প্রয়োজন ছিল না।

এই জন্যই লেখা থেকে লেখককে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বিষ্ণুবাবু যদি এই

অমার্কসীয় দৃষ্টি বর্জন করতেন, তাহলে দেখতে পেতেন, অচিন্ত্যকুমারের যে বিশেষ পরিণতির কথা বলেছেন তার বিশেষত্ব নতুন দৃষ্টি, নতুন চেতনা, নতুন জীবনবোধ বা মানস-জগতের সমাজ-মানসগত মৌলিক কোনো পরিবর্তন নয় —পরিণতি শুধু এই যে তিনি নতুন বিষয়কে উপাদান করে আরও পাকা হাতে লিখছেন। তাঁর আগের স্টাইল আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে, তাঁর আগের দৃষ্টি আরও ব্যাপক, জীবনক্ষেত্রকে আরও পরিষ্কারভাবে দেখছে, অভিজ্ঞতার সাহিত্যিক রূপায়ণ আরও ঘন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছে, তাঁর চিন্তাজগতে বিপ্লবাত্মক কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। মধ্যবিত্তের জীবন একদিন ছিল তাঁর সাহিত্যের অবলম্বন। তারপর চাকরীর জীবনে চাষীর জীবন, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষীর জীবন, একভাবে তার সামনে এল, একদিকের উলঙ্গ বাস্তব রূপে। ত্রিশংকু শ্রেণীর স্বপ্ন ও বাস্তবে একাকার অর্থহীনতা, ভ্রান্তি, বিরোধ ও ব্যর্থতা, এক কথায় সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ মধ্যবিত্ত জীবনের আত্মবিচারগত বাস্তবতা যেভাবে তাঁর সাহিত্যে এসেছিল, তেমনিভাবেই এল চাষীর জীবনের বাস্তবতা। তফাৎ শুধু হলো এই যে, চাষীর রিক্ততা তাঁর চোখে মূল্য পেল মধ্যবিত্তের ব্যর্থতার, জমির ট্র্যাজেডি, অনাচার-অত্যাচারের মর্ম রূপান্তরিত হতে লাগল মানসিক দ্বন্দ্বে। তাদের সঙ্গে স্বভাবতই দেশজ শব্দ এল—এবং লাভ করল অচিন্ত্যকুমারেরই নিজস্ব তীক্ষ্ণতা।

হেমিংওয়ের পরিণতির সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের পরিণতির তুলনা করতে হলে আগে তাই দরকার হয় এই দৃষ্টিতে হেমিংওয়ের পরিণতি এবং অচিন্ত্যকুমারের পরিণতির বিচার। অচিন্ত্যকুমার ভালো গল্প লিখতেন, আজ আরও ভালো গল্প লিখছেন. তাঁর পূর্ণতর বিকাশ হয়েছে। বিকাশ পরিবর্তন নয়। ধারা পরিপুষ্ট হওয়া ধারাবাহিকতাই। সমাজ-ভাঙা জর্জর বাংলার চাষী-জীবনের আসল বাস্তবতা কোথায় তাঁর সাহিত্যে? কোথায় বাঁচার সংগ্রাম, যা তাদের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ, নীতি-দুর্নীতি, কলহ-বিবাদ, ঐক্য ও প্রতিরোধ—জীবনের সমস্ত অভিব্যক্তিকে প্রভাবান্বিত করেছে?

প্রগতিশীল সমালোচনা, কাঁচা সমালোচনা পর্যন্ত, আজ তাই প্রথমেই খোঁজ করে সৃষ্ট-সাহিত্য জীবনের এই সর্বাধিক সত্য, বাস্তবতার এই প্রধান শর্ত, সংগ্রামকে স্বীকার করেছে কি না। তার মানে এই নয় যে, সমালোচক সৃষ্ট-সাহিত্যের সার্থকতা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি বেঁধে দিয়েছেন রণভূমির সম্মুখ

যুদ্ধের প্রাথমিক অঙ্গীকার, চাষী লাঠি নিয়ে জমির জন্য লড়ছে মরছে—শুধু এই হবে চাষী-জীবনের গল্পের উপজীব্য এরকম হুকুম জারি করেছেন। প্রগতিবাদী এটুকু জানে যে তাতে সংগ্রামকেই মিথ্যা ঘোষণা করা হয়। চাষীর জীবনে, জনসাধারণের জীবনে, অত্যাচারী শক্তির সঙ্গে সামনাসামনি সংঘর্ষ ছাড়া সংগ্রামের আর কোনো রূপ নেই, অভিব্যক্তি নেই—এ তো সংগ্রামকেই অস্বীকার করা, সাময়িক একটা বিচ্ছিন্ন বিশেষ ঘটনায় পরিণত করা। জীবনে ও চেতনায় ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে বলেই সংগ্রাম সত্য। চাষী শুধু তেভাগা করে না আজ, সে নিজেই ভাবে আর বলে, আগের মতো বৌকে মারধোর করা আর চলবে না। মন্দির-মসজিদ পুরুত-মোল্লার কাছে আজও সে মাথা নোয়ায়, তেমন আর অভিভূত হয় না। কবিয়ালের মুখে রামায়ণের যুদ্ধ বা কুরুক্ষেত্রের গানের বদলে আজকের মানুষের মুক্তি-লড়াইয়ের গানে তার রোমাঞ্চ হয় বেশি। তার প্রেম, বাৎসল্য, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ আজ মাটির নরম সহিষ্ণুতায় গড়া নয়, তাতে কাস্তের কাঠিন্য ও ধার এসেছে।

বাংলার চাষী গরীবদের জীবন সাহিত্যভাত করার দায়িত্ব সোজা নয়। বিষ্ণুবাবু যদি তাঁর "প্রগতিবিলাসী বন্ধুদের" সঙ্গে এ দায়িত্ব পালনের সং প্রচেষ্টায় যোগ দিতেন তা হলে তাঁর কাছে ধরা পড়ত এ বিলাস কি কঠিন, কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সাহিত্যপাঠের সহক্ষমতা শুধু নয়, মিলেমিশে নিজেদের চেতনা পুনর্গঠনের, আত্মকেন্দ্রিকতা, ভ্রান্তি, সংস্কার, সংকীর্ণতা অপনোদনের এবং আরও অনেক কিছুর জন্য কী বিরামহীন অনলস সংঘবদ্ধ সাধনা চলছে। "শ্রদ্ধা বিনয় আর সততা এবং অনলস অধ্যয়নের দ্বারা আমরা সবাই যেন সাহিত্যের প্রগতি প্রসারেই সাহায্য করতে পারি, দলগত মনোভাবের নয়"—বিষ্ণুবাবু এ আশা করতে পারেন বলে আমাদের কম মুস্কিল নয়। কারণ তিনি আমাদের বন্ধুমানুষ। মুস্কিল একটা নয়। কী ও কাকে শ্রদ্ধা করব? জনসাধারণকে, না জনসাধারণ থেকে বিচ্যুত জনসাধরণের সংজ্ঞা-মূল্য নির্ধারণ-কারীকে ও তাঁর সংজ্ঞা-মূল্যকে? কোন বিনয় অভ্যাস করব? মানবতা-বিচ্যুত আধ্যাত্মিক বিনয় অথবা জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও উচ্চতা যা ঘুচিয়ে দেয় সেই বিনয়? কোন সততাকে মর্যাদা দেব? জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক আমার শ্রেণীর প্রতি সতত, অথবা আমাদের চেয়ে জনসাধরণ বড়—এই সততা? অনলস অধ্যয়ন চালাবো কিসের এবং কি

উদ্দেশ্যে? বই পড়ে পড়ে বিদ্যার জাহাজ হতে, না বই পড়তে পড়তে জনসাধারণের জীবনে নেমে গিয়ে জীবনকে জানতে?

সাধে কি আমরা শ্রদ্ধা, বিনয় আর সততা এবং অনলস অধ্যয়নের দুটো দুটো মানের মধ্যে ব্যক্তিগত মানে বাদ দিয়ে ব্যাপক জীবনের ব্যাপক মানে গ্রহণ করেছি! নইলে শুধু মানের ধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে প্রাণ যায়।

এই আমাদের দলগত মনোভাব, এই আমাদের স্বজাতিপ্রীতি। দুটো দল হয়ে গেছে, উপায় কি। ব্যক্তিগতদের ব্যক্তিপ্রীতির দল এবং জনসাধারণের নৈর্ব্যক্তিক স্বজাতিপ্রীতির দল। দ্বিতীয় দলে গত না হলে প্রগতি হয় না।*

---

* পরিচয়, 'পাঠকগোষ্ঠী', ফাল্গুন ১৩৫৪, পৃ. ১৯৭-২০১। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

'হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা'-প্রসঙ্গে / হিরণকুমার সান্যাল

বাংলাদেশের দুই বিপরীত প্রান্তের দুটি গ্রাম কুরপালা ও হাঁসুলী-বাঁক। নদীমাতৃক দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের গ্রাম কুরপালা। হাঁসুলী-বাঁকের অবস্থান বীরভূমের শুকনো ডাঙায় পাহাড়ে নদী কোপাই-র বাঁকে; ঠিক হাঁসুলীর মতন এখানকার নদীর চেহারা, তাই গ্রামটির এই আলঙ্কারিক নাম। গ্রাম দুটির মাটি ও মানুষ, জল ও বায়ু অবশ্য একেবারে আলাদা ছাঁচের—অন্তত বাহ্যত। কিন্তু বাংলার বিরাট পল্লীজীবনের এই দুটি বিচ্ছিন্ন খণ্ডকে ইতিহাসবিধাতা গেঁথেছেন যে ভাঙাগড়ার সূত্রে, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে, তাকেই অবলম্বন করে তারাশঙ্করবাবু ও রমেশবাবু তাঁদের উপন্যাসের আখ্যায়িকা রচনা করেছেন। তাই মনে হয় একই কাহিনীর রকমফের, যন্ত্রশিল্পের নির্মম আঘাতে পল্লীজীবন কিভাবে চুরমার হচ্ছে তারই মর্মভেদী ইতিহাস। তারাশঙ্করবাবু রচনা করেছেন শুধু এই বিয়োগান্ত কাহিনী। কুরপালাতেও আছে নতুন সমাজ গড়বার নিষ্ফল কিন্তু প্রাণবান আবেগ।

তারাশঙ্করের পাঠকদের অনেকেরই এই অভিযোগ যে জৌলুসহীন জীর্ণ জমিদারদের নিয়ে তিনি একটু বাড়াবাড়ি করেছেন। ফলে যাঁদের অজীর্ণ হয়েছে তাঁরা হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা পড়ে তৃপ্তি পাবেন। জমিদার এতেও আছে, না থেকে যাবে কোথায়? চিরস্থায়ী ব্যবস্থার কল্যাণে জমিদারী প্রথা যে-দেশের বুকে জগদ্দল পাথরের মতন বাঁধা, সে দেশের পল্লী-অঞ্চলের কাহিনী জমিদারকে বাদ দিয়ে রচনা করা অসম্ভব। কিন্তু জমিদার এখানে নিমিত্তমাত্র। হাঁসুলী-বাঁকের উপকথার আসল রচয়িতা কাহারপাড়ার বুড়ো-বুড়ী, যুবক-যুবতী, বাঁশঝাড়ের আধা-আলো আধা-অন্ধকারে এদের জমে মদের নেশা—স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে, আর জমে 'রং'—মনের সঙ্গে মনের, পুরুষের সঙ্গে নারীর, এবং এর স্বামীর সঙ্গে ওর স্ত্রীর, আর সেই সঙ্গে অদল-বদল হয় সামাজিক সম্বন্ধ। কারও ঘর ভাঙে, কারও হয় নতুন ঘর, মনের খেদে কোপাই-র দহে কেউ মরে ডুবে। এদিক দিয়ে এরা মুক্ত, নির্বিকার। কিন্তু তবু প হয়ে এরা শোনে কর্তাঠাকুরের মাহাত্ম্যের

কাহিনী, যাঁর বাস শ্যাওড়াবনে, মাথা ন্যাড়া, ধবধবে রং, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বুকজোড়া পৈতে, আর পরনে টকটকে লাল ধুতি ; খড়ম বাজিয়ে তিনি অবাধে হেঁটে যান বন্যার জলের ওপর দিয়ে।

এই হলো হাঁসুলী-বাঁকের উপকথার উপকরণ। আরো আছে। বাঁশঝাড়ের মধ্যে গভীর রাত্রে শোনা যায় তীব্র শিসের আওয়াজ। গোটা কাহারপাড়া ভয়ে কাঠ হয়ে শোনে কর্তাঠাকুরের রোষধ্বনি। শুধু করালী, বেপরোয়া বিদ্রোহের প্রতীক করালী, এসব গ্রাহ্য করে না। বাঁশঝাড়ে সে দিল আগুন লাগিয়ে। বাঁশের ডগা থেকে মাটিতে পড়ে ছটফট করে মরল প্রকাণ্ড চন্দ্রবোড়া সাপ। লৌকিক ও অলৌকিকের মিশ্র উপাদানে যে উপকথা দিনে দিনে সমৃদ্ধ হচ্ছিল তাতে চমক লাগাল অভাবিত নতুন সুর—উপেক্ষার, অবজ্ঞার, বিদ্রোহের।

এই যে সংঘর্ষের শুরু, প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের, মাতব্বর বনোয়ারির সঙ্গে উদ্ধত করালীর, তার নাটকীয় সমাপ্তি হলো পঞ্চম অঙ্কে—করালী ও বনোয়ারির সাক্ষাৎ দ্বন্দ্বযুদ্ধে। অবশ্য বনোয়ারী হারল, না হেরে উপায় কি? ইতিহাস তার বিপক্ষে। তাই ইতিহাস-সচেতন তারাশঙ্করবাবু করালীকে জিতালেন শুধু গায়ের জোরে নয়, খুঁটির জোরে। কাহারপাড়ার মুখের উপর তুড়ি মেরে একঘরে করালী কাজ নিয়েছিল যুদ্ধের হুড়িকে স্থাপিত কারখানায়। সুতরাং করালীর সহায় হলেন, dues ex machina, অর্থাৎ যন্ত্রাৎ ভগবান নয়, সাক্ষাৎ যন্ত্র-ভগবান। এর পরে কাহারপাড়ায় টিঁকে থাকার আর ছুতো রইল না ; যে-যুদ্ধে সারা পৃথিবী টলমল করে উঠল, হাঁসুলী-বাঁকের সাধ্য কি তার ধাক্কা সামলায়! ইতিহাসের স্রোতে হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা গেল ভেসে। জমিদার-কুল আগেই ডুবেছিল—নিজগুণে, তারাশঙ্করবাবুকে তাদের জন্য বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। তারপর ডুবল কাহারপাড়া, কিন্তু সহজে নয়, সমস্ত শক্তি দিয়ে স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে অবসন্ন হবার পর। এর পরও বোধহয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রয়োজন ছিল, তাই শেষ পর্যন্ত কোপাই-র বন্যায় এই গোটা গ্রামকে নিশ্চিহ্ন না করে তার স্রষ্টা খুশি হতে পারেন নি। কিন্তু নিশ্চিহ্ন যে হলো তাতে আর সন্দেহ নাই।

হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা একেবারে ভানুমতির ভেলকি। এর ঘরবাড়ী যেন চলচ্চিত্রের ক্ষণস্থায়ী তোড়জোড়। কোপাইয়ের স্রোতে আলোছায়ার

আলপনার মতন এখানকার মেয়েপুরুষের হাসিকান্না। সবই অলীক—অবাস্তব। অসাধারণ মুন্সিয়ানার জোরে যে-উপকথা বিস্তৃত হয়েছে দীর্ঘ চারশো পাতা ধরে, শেষ পর্যন্ত তা উপকথাই থেকে গেল, জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি বহন করে তা উচ্চস্তরে কথাসাহিত্যে উত্তীর্ণ হতে পারল না। ঐ করালী আর ঐ বনোয়ারি—ইতিহাস তাদের মধ্যে মূর্ত হলো নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাদের মানুষ করতে পারল না, শুধু পুতুল-নাচ নেচে তারা দর্শকদের বাহবা লুটল।

তারাশঙ্করবাবু ওস্তাদ লেখক। তাঁর নিজের ভাষা দুর্বল, কিন্তু অসাধারণ কৌশলে তিনি কাহারদের কাহিনী বিস্তার করেছেন তাদেরই মুখের ভাষায়। রোমাঞ্চ ও কৌতুকের নিপুণ সংমিশ্রণে তাঁর প্লট এগিয়ে চলেছে অব্যাহত গতিতে। চারশ' পাতার বই পড়তেও পাঠকের আগ্রহ যে প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকে তা কম কৃতিত্বের কথা নয়। তবে শ'খানেক পাতা ছাঁটাই করলে বইটি আরও জমাট হতো সন্দেহ নাই। কিন্তু এত মেহনতের ফলে হলো কি? যে-আদিম অন্ধকার থেকে কাহারপল্লীর উদ্ভব, সেই অন্ধকারেই হলো তার বিলুপ্তি। তারাশঙ্করবাবু মাটির মানুষের ছবি আঁকলেন জমিদারি প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ থেকে। কিন্তু এ মাটিই যে দেশের মাটির থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানকার ইতিকথা মানিকবাবুর পুতুলনাচের-ইতিকথা'র মতন সত্যিকারের বাংলাদেশের মানুষের ইতিকথা নয়, এ হলো ঠাকুরমার ঝুলি থেকে বের করা ছেলেভোলানো রূপকথা। কিছুকাল আগে এই পত্রিকাতেই তারাশঙ্করবাবুর 'সন্দীপন পাঠশালা' সমালোচনা-প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলেছিলাম, শিল্পসৃষ্টির সার্থকতা বিষয় নির্বাচনের ওপর কতটা নির্ভর করে? দ্বিতীয়বার এই প্রশ্ন মনে জাগছে আলোচ্য বইটি পড়ে। এক্ষেত্রে তারাশঙ্করবাবু ইতিহাসকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন প্রাগৈতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করে। কাহারদের কাহিনী নৃতত্ত্ববিদের গবেষণার বিষয়; হাঁসুলীবাঁক গ্রামে কিছুদিন থাকলে ভেরিয়ার এলুইন হয়তো অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী বিরাট গ্রন্থ রচনা করতেন। দু'চারটি রোম্যান্টিক ছোট-গল্পের মালমশলা যোগানোর ক্ষমতা কাহারদের নিঃসন্দেহে আছে। কিন্তু যুগচেতনার বাহক হওয়া যে সাহিত্যের দাবী, তারই উপজীব্যের আশায় ঐ কাহারদের দ্বারস্থ হওয়া একাধারে কাহারদের ওপর অত্যাচার ও সাহিত্য সম্বন্ধে দারুণ অবিচার।

'হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা' ও 'কুরপালা'র তফাৎ এইখানে। তারাশঙ্করবাবুর তুলনায় রমেশবাবুর হাত কাঁচা। কিন্তু এই কাঁচা হাতে তিনি যাদের ছবি

এঁকেছেন, তারা হাঁসুলী-বাঁকের কাহারদের থেকে আমাদের মনকে নাড়া দেয় অনেক বেশী, কেননা তারা খাঁটি বাংলাদেশের মানুষ। কুরপালা পল্লীবাংলার ছোট্ট একটি টুকরো মাত্র, কিন্তু এই টুকরো জ্বল জ্বল করছে সারা বাঙালী জাতির প্রাণের দীপ্তিতে। কামার-কুমোর, চাষী-নাপিত এরা সবাই আছে কুরপালা আর খালের ওপারের গ্রাম রাণীডাঙা জুড়ে। তাছাড়া আছে এই দুই তরফের জমিদার, বড় রাজা ও ছোট রাজা, আর এদের ভাগ্যবিধাতা বঙ্কিম কুণ্ডু—সামান্য ব্যাপারী ছিল সে এক সময়ে, তারপর আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ—মহাজন ও কারখানার মালিক। গ্রামকে গ্রাম গ্রাস করল বঙ্কিম কুণ্ডুর কারখানা। তার এক কালের মনিব বড় রাজার ছেলে পর্যন্ত হলো তার বেতনভোগী ভৃত্য।

যে ঘটনাপরম্পরার ফলে এই অঘটন সম্ভব হলো 'কুরপালা'য় আছে তারই বৃত্তান্ত, আর আছে এই বৃত্তান্তের ঐতিহাসিক পটভূমি—স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব কীভাবে গ্রাম থেকে গ্রামে ব্যাপ্ত হলো তার বিবরণ। সুতরাং 'কুরপালা'র লেখককে গড়তে হয়েছে বিস্তৃত আসর, আর এই আসরে আমন্ত্রণ করতে হয়েছে অসংখ্য অতিথিকে। কিন্তু আমন্ত্রণে তাঁর যে রকম ঔদার্য, অতিথি-আপ্যায়নের ক্ষমতা তার তুলনায় সামান্য। মাত্র দুশ' চুরাশি পাতার মধ্যে তিনি রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন এমন এক বিরাট পরিকল্পনাকে যাকে সার্থক করতে হলে যুগান্তকারী প্রতিভার দরকার। তারাশঙ্করবাবুর মতন শেষ পর্যন্ত তিনি শরণাপন্ন হয়েছেন যন্ত্র-দেবতার, কিন্তু নভেলের কাঠামোতে এই দেবতাটিকে বাঁধবার মন্ত্র তাঁর আয়ত্তে নাই। এইখানে তারাশঙ্করবাবুর কাছে শিল্পী হিসাবে রমেশবাবুর হার। হাঁসুলী-বাঁক গ্রামের সঙ্গে করালীর কারখানার কোনো অসংগতি নাই, কিন্তু রূপমতীর ধারের কাপড়ের কল স্থাপিত হয়েছে শুধু বঙ্কিম কুণ্ডুর টাকার জোরে নয়, রমেশবাবুর গায়ের জোরে।

'কুরপালা'কে সার্থক শিল্পসৃষ্টি বলা যায় না এই কারণে যে, এর আরম্ভের প্রতিশ্রুতি এর পরিণতিতে সম্পূর্ণ রূপ পায় নি। লেখক তাঁর আখ্যায়িকার শেষ রক্ষা করেছেন গোঁজামিল দিয়ে। কিন্তু এই বিফলতার মধ্যে ফুটে উঠেছে অন্তত তিনটি মানুষের অপরূপ রূপ: ছোট রাজার ছেলে শঙ্কর, সংসার ত্যাগ করে সংগ্রামকে যে বরণ করেছে যুগচেতনার প্রভাবে। 'হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা'র করালীর মতন শঙ্করও বিদ্রোহের প্রতীক, কিন্তু করালীর মতন সহজ জয়লাভ তার কপালে জোটে নাই বলে পাঠকের ক্ষোভের কোনো কারণ নাই; করালীর

চেয়ে সে অনেক বেশী বাস্তব, তাই তার সমস্যা অনেক বেশী জটিল। শঙ্করের শক্তির ও উৎসাহের উৎস দুইটি প্রাণী : প্রবীণ ইন্দুপ্রকাশ—দৃঢ়চিত্ত, স্নিগ্ধস্বভাব, প্রজ্ঞার ও স্নেহের অপরিমিত আধার। আর চাষীর ঘরের মেয়ে জগু সর্দারের বৌ হাসু—নিষ্ঠার ও মাধুর্যের প্রতিমূর্তি। মামুলি হালে এদের জ.বন কাটত মঠে বা মন্দিরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বা সরকারী চাকরীর সম্মানিত আসনে, পল্লীর দীন কুটিরের আঙিনায় বা হেঁসেলের কোণে। কিন্তু জনসাধারণের সোনার কাঠির ছোঁয়াতে এরা জেগে উঠল প্রগতিশীল বাংলার প্রতিনিধি হয়ে। ইতিহাস সার্থক হলো এদের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায়,এদের নিষ্ফলতায় হলো যুগান্তরের সূচনা। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত এরা রইল রক্তে-মাংসে গড়া খাঁটি বাংলাদেশের মানুষ। 'কুরপালা'র এই চরম দান। এর জন্যে লেখককে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না। তাঁকে আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আদিগন্ত কাশে-ঢাকা বিলান জমি, খালের ধারের জংলি ঘাস ও মেঘনা-মধুমতীর দোসর রূপমতী গাঙের দুরন্ত স্রোতের অবিস্মরণীয় ছবির জন্য। বাংলার মাটির, বাংলার জলের এই চিরন্তন ছবি প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত কোনো বন্যায় বিলুপ্ত হবে না।*

* পরিচয়-এর 'পুস্তক-পরিচয়' বিভাগে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা' ও রমেশচন্দ্র সেনের 'কুরপালা' উপন্যাসের সমালোচনা-প্রসঙ্গে এই রচনাটি প্রকাশিত হয়। দ্র. পরিচয়, পৌষ ১৩৫৪, পৃ. ৫৭৩-৫৭৬। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

প্রতিবিপ্লবী সাহিত্য / নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

"Creative impulses rooted in feudalism, in the bourgeois class, the petty-bourgeois class, individualism, anarchism, art for-art's sake, lordism, defeatism and pessimism." এবং সামগ্রিক মানবতা তথা সর্বহারার স্বার্থে যা নিয়োজিত নয়, তাই প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্য—এই হলো মাও-সে-তুংয়ের অভিমত।

এই মতের প্রতিবাদী নয়, বরং পরিপূরক, অথবা আরো স্পষ্টভাবে এই সমস্ত নেতিবাচনের শেষ সিদ্ধান্তরূপে সাহিত্য ও শিল্পগত যে পরম সত্যটি অর্জিত হয়েছে, তার নাম "Socialist Realism"; সংক্ষেপে এইভাবে এর সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে: "Socialist content, national form and realistic representation."

প্রথম মতটি সাহিত্যের কী হওয়া উচিত নয় এবং দ্বিতীয়টি সাহিত্যের কী হওয়া উচিত তারই সুস্পষ্ট নির্দেশনা। সাম্যবাদী বস্তু, জাতীয়তাবাদী গঠন-কৌশল এবং বস্তুবাদী প্রকাশ—এই ত্রিসত্যই গণসাহিত্যের বীজমন্ত্র।

সোভিয়েট লেখকগোষ্ঠীর একটি নীতিতে একে আরও ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে: "Socialist Realism, being the fundamental method of Soviet artistic literature and literary criticism, it demands of the artists a truthful, historico-concrete portrayal of reality in its revolutionary development. In this connection, the truthfulness and the historical concreteness of the artistic portrayal must take into account the problem of ideological transformation and the education of the workers in the spirit of socialism." [George Reavy থেকে উদ্ধৃত]

এই 'Socialist Realism' বাংলায় যার অনুবাদ করতে পারি 'সাম্যতান্ত্রিক

বস্তুবাদ"—তার আর একটা উদ্দেশ্য কী? তার প্রতিরোধ হলো: "against any expressions or survivals of 'leftist', 'formalistic', or wilfully 'experimental trends"—এবং এই সঙ্গে "by way of contrast, to open the door for the revival of the national classics."

বিপ্লবী এবং গঠনশীল সাহিত্য সম্পর্কে এই হলো সবচেয়ে সুস্থ শিল্পদৃষ্টি। "যাহা মরণীয় যাক মরে"—মাও-সে-তুংয়ের কথায় তার মৃত্যুমন্ত্র ঘোষিত হয়েছে। যাকে বাঁচাতে হবে তা হলো সাম্যবাদী সত্যে বিশ্বাসী হয়ে জাতীয় জীবনের ভিত্তিতে বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যরচনা। হুঁশিয়ার থাকতে হবে ছদ্মবেশী শত্রু 'leftism' সম্পর্কে যা অতিবিপ্লবের বাণী আউড়ে বিপ্লবকে বিভ্রান্ত করে। পুনর্জীবন দিতে হবে সেই সব সাহিত্যের যা দীর্ঘকাল ধরে জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা বহন করে আসছে, এবং যে জন্যে সোভিয়েটে আজ নতুন করে আবিষ্কার করা হচ্ছে লারমণ্টভ্‌কে, পুশকিনকে, টলস্টয়কে, গোগোলকে।

আগামী দিনের সাহিত্য সম্পর্কে প্রগতিশীল সমস্ত চিন্তার যোগফল আমি উদ্ধৃত করে দিলাম।

বলা বাহুল্য, এই উনিশশো আটচল্লিশ সালের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রতিক্রিয়াশীলতাকে কেউ চায় না—আপনি নন, আমি নই, কেউই নয়। কিন্তু সজ্ঞানে না হলেও আমাদের অবচেতন স্রষ্টা (creative) এবং বিচারক (critic) সত্তায় কিছুটা পরিমাণে প্রতিক্রিয়ার বীজ রয়েই গেছে। মধ্যবিত্ত তথা বুদ্ধিজীবী মানস থেকে রাতারাতি এদের উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়, প্রস্তুতি চাই তার জন্যে, চাই সামাজিক বিপ্লবের আঘাত। যে আবহাওয়ায় আমাদের মন গড়ে ওঠে, যে শিক্ষা আমাদের রুচি-রীতি-চরিত্রকে রচনা করে এবং যে পরিবেশ আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে, তার ফলে বিদ্রোহ করতে গিয়ে আমরা হয়ে উঠি এনার্কিস্ট, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, 'art for art's sake'-এ আস্থাবান, আর এর পরিণামে আমরা ঘোষণা করি পরাভব ও দুঃখবাদ। জন্মবিদ্রোহী হয়েও তাই মধ্যবিত্ত অনেক সময়েই এই শোচনীয় ব্যর্থতার পথে পা বাড়িয়ে দেয়; এই কারণেই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বার্নার্ড শ আমাদের নিষ্ঠুরভাবে হতাশ করেন, ডি. এইচ. লরেন্সের মতো শক্তিমান লেখককেও পশ্চাদপসরণ করতে হয় এবং বাংলা-সাহিত্যে 'কল্লোল-গোষ্ঠী' বিপুল বিদ্রোহের প্রতিশ্রুতি এনে শেষ

পর্যন্ত স্থায়ী শিল্প হিসেবে কিছুই আমাদের দিয়ে যেতে পারেন না।

এই সমস্ত বাধা ও বিভ্রান্তি সত্ত্বেও একথা মানতেই হবে যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রসর হয়েছে। তার প্রমাণ "হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা", তার প্রমাণ "চিহ্ন"। আরো হচ্ছে, আরো হবে। এক পা যদি আমরা পিছিয়ে পড়ি, তা হলে তার পরের ধাপে আমরা তিন পা এগিয়ে যাবো—এই হলো ইতিহাসের নিয়ম। আর এই এগিয়ে চলার পথে প্রতিবিপ্লবী সাহিত্যকে চিহ্নিত করবারও একটা প্রয়াস মাথা তুলেছে দেখতে পাই। সেই সঙ্গে একটা জিজ্ঞাসা জাগে: প্রগতিশীল সাহিত্যকে ধিক্কার দিতে গিয়ে আমরা মুখোশ-আঁটা leftism-এর খপ্পরে গিয়ে পড়ছি না তো? প্রতিবিপ্লবকে ঠেকাতে গিয়ে পা দিচ্ছি না তো অতি-বিপ্লবের চোরাবালিতে? ঐতিহাসিক সত্যের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে বস্তুতান্ত্রিক বৈপ্লবিক অগ্রগমন—এই হলো আজকের সাহিত্যের মূলকথা; ইতিহাসের ধারাকে লক্ষ্য করে, শিল্প-নৈপুণ্যের মাধ্যমে কর্মী মানুষের আদর্শগত পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এই সৃষ্টি হবে সত্য এবং বাস্তবাশ্রয়ী—এর পরিণাম হবে সাম্যবাদ। জাতীয় ঐতিহ্য এবং বিশিষ্টতাকে বর্জন করলে চলবে না, কারণ তাহলে একে "চালানী বিপ্লব"-এ রূপান্তরিত করা হবে। নিছক পরীক্ষার খাতিরে অদ্ভুত টেকনিক এবং বিশেষ ব্যক্তিমানসের অসুস্থ তির্যকতা এ সাহিত্যে চলবে না, কারণ এ থেকেই মাথা তোলে উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। ভাষার স্বচ্ছতা চাই, ভাবের স্পষ্টতা দরকার। গোর্কী বলেছেন, সাহিত্যিককে শিক্ষক হতে হবে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তা বাস্তববর্জিত শিল্পহীন নিছক প্রচারণা মাত্র।

এই কথাগুলো মনে রাখলে অনেক সুস্থ ও সত্য দৃষ্টিতে আমরা সাহিত্যকে বিচার করতে পারব। প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্য সম্পর্কে ফতোয়া দেবার আগে অনেকখানি সতর্ক হতে পারব আমরা।

এ সত্যকে ভুললে চলবে না যে, এখনো আমরা দেশে মধ্যবিত্তই বিপ্লবের মশালচী। ঐতিহাসিকভাবে যেদিন তার প্রয়োজন থাকবে না ভারতবর্ষ সেদিনটি থেকে এখনো অনেক দূরে আছে। এই মধ্যবিত্ত শক্তির সীমা এখনো ভবিষ্যতে অনেকখানি পর্যন্ত প্রসারিত, গণবিপ্লবের সম্পূর্ণ ভূমিকা এখনো রচিত হয়নি এই শক্তির পূর্ণ-বিক্ষোভে। কিছুদিন আগেও বাংলা দেশের যে কৃষক-অভ্যুত্থান তার পূর্ণতা পেল না, তারও অন্যতম, হয়তো প্রধানতম কারণ এই

মধ্যবিত্তশ্রেণীর অনেকখানি বিরোধিতা। আজ কেন মধ্যে মধ্যে এমন এক একটা সিদ্ধান্তের আভাস পাই যে মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে লিখলেই তা গণবিমুখ হয়ে যাবে? বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত চাকরির যে সূক্ষ্ম সূত্রটিতে দোদুল্যমান, সেই সূত্রটি ছিঁড়ে গেলেই দেখি সে কত সহজে তার সামান্য জোত-জমা ক্ষেত-খামারের মধ্য দিয়ে বাঙালী কৃষকের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছে। মাও-সে-তুংয়ের 'নতুন গণতন্ত্র'কে যদি আমরা revis d outlook হিসেবে মেনে নিয়ে থাকি, তবে এই স্বল্পায়ী ভূমি-আশ্রয়ীদের নিশ্চয়ই আমরা 'কুলাক্' বলব না। বাঙালী সামান্য বৈতনিক কেরানী, সামান্য ভাড়া দিয়ে অন্ধকার একতলা ঘরে যার বসবাস এবং চাকরি গেলেই যাকে পথে দাঁড়াতে হয়, তার সঙ্গে প্রোলেটারিয়েটের তফাৎ কতখানি? মাসের শেষে যার আপিসের দারোয়ানের কাছে ধার করতে হয়, যার প্রভাতী-বৈতালিক কাবুলীওয়ালা—কী তার শিক্ষা এবং সংস্কৃতিগত আভিজাত্যের মূল্য? দুর্ভিক্ষে যারা মরেছে, যাদের স্ত্রী-কন্যা মিলিটারী আর কালোবাজারী দালালের কাছে এক মুঠো অন্নের জন্যে দেহের পণ্য সাজিয়েছে, তাদের মধ্য থেকে মধ্যবিত্ত আর কৃষককে খুব বেশী করে আমরা আলাদা করে নিতে পারি না। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেকে কলকারখানার মজুর হতে সামান্যই সময় লাগে।

শুধু ধরা যাক, শহরের বিশেষ করে কলকাতার মধ্যবিত্ত একটা আলাদা শ্রেণীর জীব—যাদের আমরা বলব 'পেতি-বুর্জোয়া'। কিন্তু যখন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট পর্যন্ত এসে আমরা পৌঁছুই, তখনো কি বিপ্লবে মধ্যবিত্তের ভূমিকাকে আমরা অস্বীকার করব? এই ধর্মঘট যারা করে, আবার স্বাভাবিক দুর্বলতার তাগিদে যখন সহকর্মীদের বিশ্বাসহন্তা হয়, তখন তার ভেতরে যে কোনো বিপ্লবের সংকেতই আমাদের কাছে ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে।

এ সত্ত্বেও কেন এমন কথা শোনা যায় যে, মধ্যবিত্ত জীবন আর গণসাহিত্যের আশ্রয় নয়? একথা বলার অর্থই বস্তুনিষ্ঠার বিরোধিতা করা—'সাম্যতান্ত্রিক বস্তুবাদে'র একটি প্রধান সত্যকে অস্বীকার করা।

নিশ্চয় মানি, মজ্‌দুর কৃষক আগামী দিনের স্রষ্টা, তার সাহিত্যই অনাগত কালের সাহিত্য। কিন্তু তাই বলে মধ্যবিত্তকে বাতিল করব কেন? একথা সত্য, মধ্যবিত্তের সংশয় বেশী, জটিলতা বেশী, তার চারদিকে বিভ্রান্তি বেশী। মজ্‌দুর-কৃষকের মতো তার দৃষ্টির স্বচ্ছতা নেই, বুর্জোয়া প্রচার এবং

ভেদসৃষ্টি তার মধ্যে ঢের বেশী সার্থক। সঙ্গে সঙ্গে এও সত্য যে তার দৃষ্টিকে পরিচ্ছন্ন করে না তুললে আত্মঘাতী বুদ্ধিতে সে গণবিপ্লবকে বারে বারে আঘাত দেবে। বরং এই কথাই তো বেশী করে মনে হয় আজ মধ্যবিত্ত সাহিত্যকেই আরো সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে—বোঝাতে হবে সর্বাত্মক বিপ্লব ছাড়া বুদ্ধিজীবীরও নিস্তার নেই।

তার জীবনে সর্বত্র আশাবাদ নেই? না রইল। এক পা এগিয়ে আর এক পা সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে যায় সে? তা যাক। কিন্তু এগোনো-পিছোনোর এই টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই যে বিপ্লবী শক্তি তিলে তিলে মাথা তুলছে তাকে অস্বীকার করবার সার্থকতা কোথায়? বস্তুনিষ্ঠা যদি আপাত-ব্যর্থতাকেই সাহিত্যে রূপায়িত করে তোলে, তার মানে এই নয় যে তা প্রতিবিপ্লবের ঘোষণা। দৃষ্টান্তস্বরূপ গোর্কীর 'থ্রী অব দেম' বইটিকে স্মরণ করা যাক—এটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে সম্মানিত। এই বইয়ের নায়ক জীবনে সম্পূর্ণ করে বাঁচতে গিয়েই চরম ব্যর্থতায় শেষ পর্যন্ত দেওয়ালে মাথা চুরমার করে আত্মহত্যা করেছে—এমন বীভৎস পরিণামকেও প্রতিক্রিয়া বলা হয় নি। বরং এর যে সত্যোপলব্ধি, তাই পরবর্তীকালে তাঁর 'মাদার' গ্রন্থে 'থ্রি অব দেম'-এর উত্তর দিয়েছে।

প্রশ্ন জাগে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের লেখক কারা, পাঠকই বা কে? উত্তর অত্যন্ত সহজ। লেখকেরা প্রায় সবাই মধ্যবিত্ত, পাঠকেরাও তাই। সুতরাং সাহিত্য যদি বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী না হয়, তাহলে তা সত্যনিষ্ঠ হবে না, বস্তুনিষ্ঠও হবে না। সর্বহারার মধ্যে শিক্ষার বিস্তার নেই, যদি সামান্য কিছু থাকেও তাহলে তা আজও আমাদের সাহিত্য পর্যন্ত পৌঁছোয় না। তা যদি হতো তাহলে সোভিয়েটের মতো আমাদের দেশেও কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একখানা বই পঞ্চাশ হাজার বিক্রী হয়ে যেত।

মধ্যবিত্ত লেখক লেখে, মধ্যবিত্ত পাঠক পড়ে। তাই বলে একথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে মজদুর-কিষাণকে বাদ দিয়ে আজ শুধু মধ্যবিত্তের জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি হোক। আমাদের লেখা হয়তো গণমানসের কাছে পৌঁছোয় না, হয়তো আমাদের ভাষা ও প্রকাশ তাদের কাছে দুর্বোধ্য—বিশেষ করে বাংলার অধিকাংশ শ্রমিকই যখন অবাঙালী। তবুও এদের আশ্রয় করে গণসাহিত্য আমাদের রচনা করে যেতেই হবে। সে সাহিত্য যাদের নিয়ে লেখা তাদের

কাছে কতটা পৌঁছবে সেজন্য বিচলিত হয়ে নয়, লিখতে হবে দেশের এই বিদ্রোহী সর্বহারা শক্তি সম্পর্কে মধ্যবিত্তকে সচেতন করে তোলবার জন্যই।

তার কারণও স্পষ্ট। আজ সর্বহারা-বিপ্লব ছাড়া মধ্যবিত্তের বাঁচবার কোনো পথ নেই। আজ এই একমাত্র আশার আলো যা তাকে বাঁচাতে পারে দুঃসহ বেকারি থেকে,ছাটাইয়ের বিভীষিকা থেকে,নামমাত্র মূল্য বিনিময়ে বুর্জোয়াতন্ত্রের কাছে তার সর্বাধিক শক্তি, মেধা ও প্রতিভা বিক্রয়ের মর্মান্তিক যন্ত্রণা থেকে, তার বুদ্ধিবিচারের দেউলিয়াপনা থেকে। তাই এ বিপ্লবের সত্যরূপটি তার জানা দরকার, তার মধ্যে এর সঞ্চার দরকার। সে চেষ্টা ঐকান্তিকভাবেই করতে হবে। মজদুর-কৃষকের সাহিত্যিক গড়ে না ওঠা পর্যন্ত যতটা সম্ভব আমরা তার পূর্বরঙ্গ রচনা করে দিয়ে যাই।

তবু অনেক সময় এ অভিযোগগুলো অর্থহীন মনে হয়, যখন শুনি অমুক সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গী গণমানসের অনুকূল নয়, তার ভাষা গণসাহিত্যের উপযোগী নয়। গণসাহিত্যের সত্যিকারের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা রমেশ শীল আর শেখ গোহমানী। আমরা আত্মতৃপ্তিতে চতুষ্কোণ হয়ে যাই বলি না কেন, আমাদের মধ্যে এমন কোনো লেখক কি আছেন যিনি জোর করে বলতে পারেন যে তাঁর রচনা জনগণকে অনুপ্রাণিত করে?

তাছাড়া গণসাহিত্যের মানে কি এই যে আমাদের national classic রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে একটা কৃত্রিম না-মধ্যবিত্ত, না-সর্বহারা experiment চালিয়ে যাব? classic-কে অপাংক্তেয় করে জনমানসকে তা থেকে বঞ্চিত করব আমরা আর তার বিনিময়ে তাদের কাছে একটা কৃত্রিম ফর্মুলা মার্কা জিনিস তুলে দেব—এ ইতিহাসবিরোধী, সত্যবিরোধী। এ কথা কেন আমাদের মনে থাকে না যে সাহিত্যকে টেনে নামানোর চাইতে জনমনকে classic সাহিত্যের কাছে তুলে ধরতে পারাই সত্যিকারের মার্কসিজম?

এককালের উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের কেউ কেউ এখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আশা এবং আনন্দের কথা। গণসাহিত্যিককে গড়ে তুলবার পথে এই মধ্যবিত্তদের রচনা উদ্বুদ্ধ হয়েছে, মুক্ত হয়েছে তার পারিপার্শ্বিকতার জাল থেকে। অত্যন্ত সুলক্ষণ—কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এঁদের কেউ কেউ, যাঁরা প্রবল কণ্ঠে বিশুদ্ধ মার্কসিজমের জয়গান গাইছেন, গণসাহিত্যের নামে যে রচনা পরিবেশন করেন তাকে গণসাহিত্য কেন, মধ্যবিত্ত-সাহিত্য বলাও

শক্ত। প্রথম সমরোত্তর জর্জীয় যুগের হতাশাবাদ, বুদ্ধি তথা আত্মকেন্দ্রিকতা, ফ্রয়েডীয় বিসর্পিল কুটৈষণা এবং জগৎকে ব্যঙ্গ করার যে বিকৃতদৃষ্টি বিশেষভাবে ইংরেজ লেখকদের কাছ থেকে এঁরা পেয়েছিলেন, সেই উত্তরাধিকারে বিশ্বাসী থেকে তির্যকতা এবং অস্পষ্টতাবাদকে প্রকাশের বাহন করে আজ এঁদের কেউ কেউ গণসাহিত্য লিখছেন। উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু একে গণসাহিত্য বলে স্বীকার করি কেমন করে? "Experimental trend"-এর পরিষ্কার নমুনা দেখি যখন মৃত শহীদের স্মৃতিতর্পণ করতে গিয়ে 'সন্দ্বীপ, নবদ্বীপ, উপদ্বীপে'র অর্থহীন মিলের মহড়া চলে; গণসাহিত্যের নমুনা দেখে শিউরে উঠি যখন ছদ্মবেশী perversion বারবণিতার দেহকে উলঙ্গ করে দেখিয়ে সাম্প্রদায়িক বিরোধ মেটাবার দাওয়াই বাতলায়। এ Socialist Humanism নয়, এ Inhuman Socialism

লুই আরাগঁ ভালো পড়ি নি, কিন্তু মায়াকোভস্কিকে জানি; এরেনবুর্গের আশ্চর্য উজ্জ্বল গল্পগুলির সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয় আছে; বিদ্রোহী চীনের সুস্থ বিপ্লবী রচনাগুলো অপ্রাপ্য নয়। এদের পাশে পাশে তুলনা করে জানতে ইচ্ছে করে কোন্ দিকে যাচ্ছি আমরা?

'Historico-concrete portrayal of reality in its revolutionary development'—এ হলো বিপ্লবী সাহিত্যের আর একটা উল্লেখযোগ্য দিক। ঐতিহাসিক সত্যতায় নির্ভরশীল থেকে বৈপ্লবিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলা—এ যুগের সাহিত্যিক-সমালোচকের এ-কথাটাও তো ভুললে চলবে না। কিন্তু প্রায়শই আমরা এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন থেকে এক একটা দায়িত্বহীন মন্তব্য করে বসি, ভুলে যাই বৈপ্লবিক সত্যের পরিমাণগত (Quantitative) বিবর্তনকে। আর এরই ফলে, বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত কখনো কখনো কারো কারো প্রতিক্রিয়াশীল বলতে বাধে না। National classics-এর সত্যমূল্য নির্ধারণ করা তো দূরে থাক, অজ্ঞান-অবুদ্ধির সাহায্যে বরং তার বিরোধিতাই করে চলে তারা।

অথচ এটা অত্যন্ত সাধারণ সত্য যে বঙ্কিম-মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের রচনা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ক্রমাগ্রসর ইতিহাস। আজকে বিপ্লব 'গুণগত পরিবর্তনে'র একেবারে উপান্তে এসে দাঁড়িয়েছে বলেই কি এঁদের সাধনাকে অস্বীকার করতে হবে? প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে কোনো অত্যুৎসাহী সাহিত্যিককে বলতে শুনেছি, শরৎচন্দ্র প্রতিবিপ্লবী! কিন্তু একথা যেন আমাদের মনে থাকে

না যে, কোনো শিল্পী-সাহিত্যিকের বৈপ্লবিক ভূমিকাকে তাঁর দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হয়? আজকের বিচারে মধুসূদনের কবিতা হয়তো অনেক দিক থেকেই অসম্পূর্ণ মনে হবে, মনে হবে তখনকার দিনের 'ইয়ংবেঙ্গল'-এর ইংরিজিয়ানাকেই তিনি সাহিত্যে চালু করতে চেষ্টা করেছেন—তাঁর বিদ্রোহের সীমা ঐ পর্যন্তই। কিন্তু সমকালিক ইতিহাসকে যদি আমরা পড়ে দেখি, তাহলে দেখতে পাব কি বিরাট বিরোধিতা এবং ব্যর্থতার সম্ভাবনাকে সামনে রেখে তিনি এই নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন! মধ্যবিত্ত জীবনের গ্লানি, সংশয় ও হতাশাকে সর্বপ্রথম শরৎচন্দ্রই সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। শক্ত মুঠিতে কত বড় ঘা তিনি দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের ধারাবাহী আত্মতৃপ্ত রোমান্টিকতায়, উনবিংশ শতাব্দীর teargas জাতীয় ইংরেজী উপন্যাসের অনুসরণকে। এঁদের সকলের সমবেত প্রয়াসই সত্য করে তুলেছে আজকের গণ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ। এঁদের রচনা তাদের বৈপ্লবিক ক্রমবিকাশের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আমাদের চিরকালের সম্পদ। পুশ্‌কিন থেকে গোর্কীর দূরত্ব অনেকখানি; অজস্র সংশয়, নানা বিভ্রান্তি এবং আচ্ছন্নতা সত্ত্বেও টলস্টয়কে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে সোভিয়েটের কোথাও সংকোচ নেই। কিন্তু এই নির্বোধ দুর্বিনয় কেন আমাদের? একেও কি বলব না অতিবিপ্লবী উৎসাহ?

আসলে জীবননিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যই প্রগতিশীল হতে পারে—যদি তার দৃষ্টি সাম্যবাদের আদর্শে নিবদ্ধ থাকে। আর সেই সঙ্গে যদি সে যথাযথ শ্রদ্ধা নিয়ে স্বীকার করতে পারে তার বৈপ্লবিক উত্তরাধিকারকে তাহলেই তার আদর্শ সার্থক হবে।

সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী মানেই কোনো নির্দিষ্ট ছক নয়, ব্যক্তিবিশেষ বা বস্তু-বিশেষকেই সাহিত্যের মাধ্যম করা নয়। শ্রমিক-জীবনকে অবলম্বন করে রোমান্টিক ফাঁকি দেওয়া শক্ত নয়, আবার মধ্যবিত্তকে উপজীব্য করে খাঁটি গণ-সাহিত্য রচনা করা সম্ভব। শুধু আপাত লক্ষণ অথবা বহিরঙ্গই সাহিত্যে গণ-মনের সত্যকে বয়ে আনে না। আশাবাদ সঞ্চার করতেই হবে, আদর্শের জয় ঘোষণা করতেই হবে। কিন্তু তার অর্থ কী এই যে মানুষের স্বাভাবিক প্রতি-ক্রিয়াগুলোকেও বস্তুনিষ্ঠভাবে স্বীকার করব না?

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। কিছুদিন আগে কোনো শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকের একটি আদর্শাত্মক গল্প বেতারে শুনেছিলাম। নিম্নবিত্ত স্বামী-স্ত্রী—তাদের কোনো

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নেই—নিতান্তই সাধারণ গৃহস্থ। কলকাতার ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার সময় স্বামী আপিস থেকে ফেরবার সময় গুণ্ডার ছোরায় প্রাণ দিল। খবর পেয়ে স্ত্রী পাগলের মতো ছুটল হাসপাতালের মর্গের দিকে। কিন্তু ঠিক সেই সময় সে দেখল পথ দিয়ে শান্তি-বাহিনীর মিছিল চলেছে। অমনি সঙ্গে সঙ্গে সে যেন মন্ত্রবলে বীতশোক হয়ে গেল, চোখ মুছে নিশ্চিন্ত চিত্তে ভিড়ে পড়ল সেই শান্তি-শোভাযাত্রায়।

এই যে রচনা এ কে কী বলব? কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মস্তিষ্কে শোকার্তা স্ত্রীর এই ভাববিবর্তনকে স্বীকার করে নেওয়া কি সম্ভব? এ আর যাই হোক—সাহিত্য নয়, এর প্রচার অবাস্তব শ্লোগান মাত্র। এ জাতীয় গল্প লেখবার কোনো সার্থকতাই নেই। এ বস্তুবিরোধী, সত্যবিরোধী। আবার এর পাশাপাশি আর একটি গল্প পড়লাম: স্বাধীনতা-দিবসে ম্লানমুখে ঘরের দরজায় একটি মধ্যবিত্ত মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে; এককালে সে রাজনৈতিক কর্মী ছিল; কিন্তু আজ সংসারের জটিল জালে জড়িয়ে আর তার বাইরে বেরুবার পথ নেই। স্বাধীনতা-দিবসে মিলনোৎসব তার কানে দূরাগত কল্লোলিত সাগর গর্জনের মতো—সে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বার আজকে আর শক্তি নেই তার। এ গল্প মধ্যবিত্তের, কিন্তু সার্থক জীবনশিল্প, সফল গণসাহিত্যের ভূমিকা।

আজ বিপ্লবী সাহিত্য আর প্রতিবিপ্লবী সাহিত্যের সংজ্ঞা নিরূপণে যেন অনেক বেশী সতর্ক হই আমরা। সাম্যবাদী শিক্ষায় মানুষকে দীক্ষিত করতে গিয়ে, আদর্শগত বিবর্তনের বাণীকে ঘোষণা করতে গিয়ে "historical concreteness of the artistic portrayal" সম্পর্কে যেন আমরা অবহিত থাকি। অত্যুগ্র বিপ্লবের বাণী শুনিয়ে সাহিত্যে যারা অ্যানার্কিজম বয়ে আনছে, মার্কসবাদের নামে আনছে উন্নাসিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—Socialist Realism-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে অবহিত থাকলে তাদের সম্পর্কে কোনো মোহই আমাদের থাকবে না। সাহিত্যে কে বিপ্লবী আর কে প্রতিবিপ্লবী নিঃসংশয়ে এ থেকেই তা প্রমাণিত হয়ে যাবে।*

---

* নতুন সাহিত্য, দ্বিতীয় সংকলন, বৈশাখ ১৩৫৫। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

বামপন্থা, না দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি ? / মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

এই সংখ্যায় "প্রতিবিপ্লবী সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমান বিপ্লবী সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে লেখকদের বিশেষভাবে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন 'অতিবিপ্লবী' তথা প্রতিবিপ্লবী বিভ্রান্তি সম্পর্কে: "হুঁশিয়ার থাকতে হবে ছদ্মবেশী শত্রু 'leftism' সম্পর্কে, যা অতিবিপ্লবের বাণী আউড়ে বিপ্লবকে বিভ্রান্ত করে।" জিজ্ঞাসা করেছেন, "প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যকে ধিক্কার দিতে গিয়ে আমরা মুখোশ-আঁটা leftism-এর খপ্পরে গিয়ে পড়ছি না তো ? প্রতিবিপ্লবকে ঠেকাতে গিয়ে পা দিচ্ছি না তো অতিবিপ্লবের চোরাবালিতে ?" নারায়ণবাবুর এ হুঁশিয়ারী সময়োপযোগী নিশ্চয়ই এবং এর গুরুত্ব লাঘব না করেই বলা চলে, এটা যদি তার সমগ্র প্রবন্ধের অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে হয়তো সাধারণভাবে এ সম্পর্কে আপত্তির কোনো কারণ ঘটতো না। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সমগ্র প্রবন্ধটিই বাংলা সাহিত্যে এই অতিবিপ্লবের বিভিন্ন লক্ষণের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বলে বাংলার প্রগতিপন্থী লেখকদের পক্ষ থেকে এ-সম্পর্কে কিছুটা বিতর্কমূলক এই আলোচনায় যোগদানের দায়িত্ব অনুভব করছি।

নারায়ণবাবু মোটামুটি তিনটি লক্ষণে বাংলা সাহিত্যের এই অতিবিপ্লবী ভাবধারাকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, যথা (১) ..."এমন কথা শোনা যায় যে মধ্যবিত্ত জীবন আর গণসাহিত্যের আশ্রেয় নয়..." (২) গণসাহিত্যের নামে wilfully experimental trends"-এর পরিষ্কার নমুনা এবং (৩) "আমাদের National classic রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে একটা কৃত্রিম না-মধ্যবিত্ত না-সর্বহারা experiment চালিয়ে"...যাওয়া। "মধ্যবিত্ত জীবন আর গণসাহিত্যের আশ্রেয় নয়..." আজকের দিনে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাসী কোনো প্রগতিবাদী লেখকের যদি এরকম মারাত্মক বিভ্রান্তি থেকে থাকে, তবে তা সর্বপ্রকারে অপনোদনের চেষ্টা করা অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু এর বিরুদ্ধে নারায়ণবাবুর যা যুক্তি, তা উল্টো দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিরই পরিচায়ক, ফলে তাও কম বিপজ্জনক নয় ! তিনি বলেছেন, "লেখকেরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত,

এর পাঠকেরাও তাই। সুতরাং সাহিত্য যদি বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী না হয়, তাহলে তা সত্যনিষ্ঠ হবে না, বস্তুনিষ্ঠও হবে না।" কারণ তাঁর মতে, "এ-সত্যকে ভুললে চলবে না যে এখনো আমাদের দেশে মধ্যবিত্তই বিপ্লবের মশালচী। ঐতিহাসিকভাবে যেদিন তার প্রয়োজন থাকবে না, ভারতবর্ষ সেদিনটি থেকে এখনো অনেক দূরে আছে।" অর্থাৎ এককথায় মধ্যবিত্ত জীবনই গণসাহিত্যের প্রধান আশ্রয়। আসলে মুশকিল এইখানে যে, নারায়ণবাবু যাকে "সত্য" বলে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন, "ঐতিহাসিক" কারণেই ভারতবর্ষে বা পৃথিবীর অন্য বহু দেশেই তা আজ "সত্য" নয়। অর্থাৎ, মধ্যবিত্তশ্রেণী আমাদের দেশে আজ আর বিপ্লবের মশালচী নয়। দেশে দেশে (এবং আমাদের দেশেও) শ্রমিকশ্রেণীই আজ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের (সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তো বটেই) মশালচী। দেশে দেশে সংগ্রামী কৃষক এবং মধ্যবিত্ত (নারায়ণবাবু সাধারণভাবে যাদের 'মধ্যবিত্ত' আখ্যা দিয়েছেন) শ্রেণী হিসেবে এই বিপ্লব সাধনে শ্রমিকশ্রেণীর সহযোদ্ধা, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব অনুসরণকারী। এর কারণও নারায়ণবাবুরই উক্ত প্রবন্ধের একাধিক জায়গায় স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। যেখানে তিনি বলছেন, "··· এ কথা সত্য, মধ্যবিত্তের সংশয় বেশী, জটিলতা বেশী, তার চারদিকে বিভ্রান্তি বেশী। মজদুর-কৃষকের মতো তার দৃষ্টির স্বচ্ছতা নেই, বুর্জোয়া প্রচার ও ভেদসৃষ্টি তার মধ্যে ঢের বেশী সার্থক।" যেখানে বলছেন, "আজ সর্বহারা-বিপ্লব ছাড়া মধ্যবিত্তের বাঁচবার কোনো পথ নেই।" তিনি আরও বলছেন, "···এও সত্য যে তার (মধ্যবিত্তের) দৃষ্টিকে পরিচ্ছন্ন না করে তুললে আত্মঘাতী বুদ্ধিতে সে গণবিপ্লবকে বারে বারে আঘাত দেবে। এবং এই কথাই তো বেশী করে মনে হয়, আজ মধ্যবিত্ত সাহিত্যকেই আরো সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে—বোঝাতে হবে সর্বাত্মক-বিপ্লব ছাড়া বুদ্ধিজীবীরও নিস্তার নেই।" কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু "মজদুর-কৃষক শুধু আগামী দিনের স্রষ্টা", বর্তমান দিনেরও নেতা নয়, তাই "তার সাহিত্য" শুধু "অনাগতকালের সাহিত্য" বর্তমান কালের সাহিত্য নয়। ফলে···"মধ্যবিত্ত-জীবন আর গণসাহিত্যের আশ্রয় নয়"—এই অতিবামপন্থার প্রতিবাদে লেখক, মধ্যবিত্ত-জীবনই গণ-সাহিত্যের একমাত্র কিংবা প্রধান আশ্রয়, এই দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন—মধ্যবিত্ত জীবনও গণসাহিত্যের আশ্রয়, এই খাঁটি বিষয়রূপ দৃষ্টি-ভঙ্গীর অবলম্বন না করে।

কিন্তু এ তো দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী বিচ্যুতি। কেননা, "লেখকেরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত, পাঠকেরাও তাই। সুতরাং সাহিত্য যদি বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী না হয়, তাহলে তা সত্যনিষ্ঠ হবে না, বস্তুনিষ্ঠও না।" "বর্তমান বাংলা সাহিত্যের লেখক কারা, পাঠকই বা কে ?"—এই প্রশ্নের উপরোক্ত "অত্যন্ত সহজ" জবাব আসলে মামুলি সহজিয়া নীতি ছাড়া আর কিছু নয়।

আজকের লেখক মধ্যবিত্ত-শ্রেণীসম্ভূত হতে পারেন কিন্তু যদি তিনি সচেতন বৈপ্লবিক কর্মপন্থার অনুসরণে ক্রমশ নিজের শ্রেণীচ্যুতি ঘটাতে না পারেন, গণ-তান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে যদি তিনি মূলত শ্রমিকশ্রেণীরই বৈপ্লবিক শক্তিকে রচনার মারফৎ উদ্বুদ্ধ করে তুলতে না পারেন তবে তাঁর ভবিষ্যৎ মধ্যবিত্ত লেখকের শ্রেণীগত সসীমতায়, অপমৃত্যুতেই ; গণবিপ্লবের অগ্রদূতের ভূমিকায় নয়। এই বিপ্লবী "সত্যনিষ্ঠা" ও "বস্তুনিষ্ঠা" অবশ্যই মধ্যবিত্ত লেখকের পক্ষে সহজাত ও সহজিয়া নয়, বহু কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষে অর্জিত, তবু এটাই পথ।

আর পাঠক। শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী অবশ্যই এই বিপ্লবী লেখকের পাঠক (বিপ্লবী লেখক যেমন অবশ্যই মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী সাহিত্যও রচনা করবেন) কিন্তু অশিক্ষিত শ্রমিক-কৃষকও ঠিক তেমনি এই বিপ্লবী লেখকের শ্রোতা। গণনাট্য, সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, রচনাপাঠ ও বক্তৃতামঞ্চের চারপাশে আজ তারা ভীড় জমিয়ে তুলেছে। আমাদের বিপ্লবী লেখকেরা এখনও এ-সম্বন্ধে অবহিত হয়ে যথেষ্ট বিপ্লবী চেতনার পরিচয় দিতে পেরেছেন কি ? অথচ এই বিপ্লবী চেতনার অভাব ঘটলে আজকের মধ্যবিত্ত লেখকের এমন কি "মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী" সাহিত্যও "সত্যনিষ্ঠ" ও "বস্তুনিষ্ঠ" হয় না।

প্রবন্ধলেখক এ-প্রসঙ্গে একটি জরুরী প্রশ্ন তুলেছেন : উপরোক্ত মধ্যবিত্ত লেখকের পক্ষে কোনোদিন গণসাহিত্য রচনা করা সম্ভব কিনা ! অর্থাৎ, মধ্যবিত্ত লেখকের পক্ষে তাঁর শ্রেণীসংকীর্ণতাকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব কিনা ! তাই যদিও তিনি বলেছেন, "তাই বলে একথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে মজদুর-কিষাণকে বাদ দিয়ে আজ শুধু মধ্যবিত্তের জন্যেই সাহিত্য-সৃষ্টি হোক," তবু তার পরমুহূর্তেই তিনি যখন বলেন, "সাহিত্য যাদের নিয়ে লেখা তাদের কাছে কতটা পৌঁছুবে সেজন্যে বিচলিত হয়ে নয় (!) লিখতে হবে দেশের এই বিদ্রোহী সর্বহারা শক্তি সম্পর্কে মধ্যবিত্তকে সচেতন করে তোলার জন্যেই" তখন বুঝতে বাকি থাকে না

যে, মধ্যবিত্ত লেখকের পক্ষে সত্যিকার গণসাহিত্য রচনা করা যে সম্ভব, একথা আসলে তিনি বিশ্বাসই করেন না।

তাছাড়া গণসাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ণয়েও তিনি ভুল করেছেন। এ-পর্যন্ত তাঁর প্রবন্ধটি পড়লে মনে হবে, গণসাহিত্য বলতে তিনি আজকের যুগের প্রতিনিধি-স্থানীয় বিপ্লবী সাহিত্য বা সত্যিকার প্রগতি-সাহিত্যকেই ("এমন কথা শোনা যায় যে মধ্যবিত্ত-জীবন আর গণসাহিত্যের আশ্রয় নয়" প্রভৃতি উক্তি দ্রষ্টব্য) বুঝেছেন, এবং সেটা ঠিকও। কিন্তু গণসাহিত্যের আঙ্গিক-সম্পর্কিত মন্তব্য প্রসঙ্গে (প্রকাশভঙ্গী, ভাষা সম্পর্কিত মন্তব্যে) হঠাৎ তিনি যখন বলেন, "গণ-সাহিত্যের সত্যিকারের যাঁরা কর্ণধার, তাঁরা রমেশ শীল আর শেখ গোহমানি"··· ইত্যাদি, তখন সন্দেহ হয় তিনি প্রচলিত লোকসাহিত্যের সঙ্গে আজকের যুগের বিপ্লবী গণসাহিত্যকে গুলিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু যেমন মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী সাহিত্যমাত্রেই সত্যনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ গণসাহিত্য নয়, তেমনি প্রচলিত লোক-সাহিত্য মাত্রেই আজকের যুগোপযোগী গণসাহিত্য নয়। আজকের দিনের বিপ্লবী গণসাহিত্য বৈপ্লবিক সাহিত্যচেষ্টার ফল; যেমন রমেশ শীল ও শেখ গোহমানি, তেমনি সুকান্ত ভট্টাচার্যও এই গণসাহিত্যের কর্ণধার।

নারায়ণবাবু আমাদের সাহিত্যে উগ্রবামপন্থার দ্বিতীয় যে লক্ষণটি নির্দেশ করেছেন, আসলে সেটি আমাদের দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিরই ফল। তিনি বলেছেন আমরা "গণসাহিত্যের ভান গ্রহণ করে অনেক সময়েই বুর্জোয়া-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরই প্রতিষ্ঠা" করেছি। কিন্তু এই "ভান গ্রহণ" দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলও নয়, সাহিত্যে কোনো নতুন কথাবস্তু বা কাব্যবস্তু আমদানীর ফল তো নয়ই, শুধুমাত্র মামুলি দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নতুন ধরনের বিষয়বস্তুর পালিশ। আমরা, যারা এই ভান গ্রহণ করেছি, তারা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও "মধ্যবিত্ত জীবন আর গণসাহিত্যের আশ্রয় নয়" এমন কথা মুখে উচ্চারণও করি নি, বরং আমাদের National classic-এরই নামে, আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যেরই দোহাই পেড়ে সযত্নে মধ্যবিত্ত মানসবিলাসকে নতুন বিষয়বস্তুর মোড়কে মুড়ে এক শ্রেণীচেতনাহীন, নিরালম্ব, পটচ্যুত 'প্রগতি'র ব্যাখ্যা দিয়েছি। উগ্র বাম-পন্থাও সমান দোষাবহ, কিন্তু অন্তত একে উগ্রবামপন্থা বলা চলে না।

উগ্রবামপন্থার তৃতীয় লক্ষণ, নারায়ণবাবুর মতে, আমাদের National classics-কে অস্বীকার করার মনোভাব। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি,

আমাদের মধ্যে আসলে ক-জন এই মনোভাবের পরিপোষক ? এটা খুবই সম্ভব যে, "প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে কোনো অত্যুৎসাহী সাহিত্যিককে বলতে শুনেছি, শরৎচন্দ্র প্রতিবিপ্লবী !" কিন্তু প্রবন্ধলেখক নিশ্চয়ই সেই সভাতেই সেই সাহিত্যিককে অসংখ্য প্রতিবাদে ও প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতেও দেখেছেন। অন্তত অপ্রকাশ্য প্রতিবাদ অনেকেই করেছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেউ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ না করে থাকলেও ক্রুদ্ধ হওয়া চলে, এতদূর আতঙ্কিত হওয়ার কারণ ঘটে কিনা সন্দেহ। কারণ এখনও এইসব অত্যুৎসাহীদের আঙুলে গোনা চলে ; অন্যপক্ষে আমাদের মধ্যে যে ভাবধারা আজ সবচেয়ে প্রবল, তা আমাদের এই National classic-কে নস্যাৎ করে না বরং এই সমস্ত এবং আমাদের সমসাময়িক প্রায় প্রত্যেকটি খ্যাতনামা লেখককে National classic-এর দোহাই পেড়ে নির্বিচারে গ্রহণ করে। আজ এই নির্বিচার গ্রহণের দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি সম্পর্কেই বরং অবহিত হওয়ার সময় এসেছে।

নারায়ণবাবু অবশ্য স্পষ্টত কোথাও এই নির্বিচার গ্রহণের কথা বলেন নি, classic-এর "সত্যমূল্য নির্ধারণ" করার কথাই বলেছেন। কিন্তু তবু তিনি যখন বলেন, "...আমাদের National classic রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে একটা কৃত্রিম না-মধ্যবিত্ত না-সর্বহারা experiment চালিয়ে যাব ?" ইত্যাদি, তখন কেমন যেন সন্দেহ হয় যে, তাঁর ঝোঁক নির্বিচার গ্রহণের দিকেই। আজকের দিনে খাঁটি সর্বহারা (বিপ্লবী) সাহিত্যসৃষ্টি যে শুধু National classic-কে স্বীকার করার ওপরই নয়, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের ওপরও সমানভাবে নির্ভরশীল—এ কথাটা ওই সঙ্গে বা প্রবন্ধের আর কোথাও স্পষ্ট করে বলা হয় নি। অথচ ঠিক ওই কথাটাই জোর করে না বললে—প্রত্যেক যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় সাহিত্যের বিশিষ্ট গুণাগুণের আলোচনার ভিত্তিতেই এ-যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় সাহিত্যের লক্ষণ সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত ধারণা গঠন করার কথাটাই না বললে—সঙ্গে সঙ্গে যে-কোনো খ্যাতনামা লেখকের যে-কোনো রচনাকে নির্বিচারে প্রগতিশীল বলে চালানোর মারাত্মক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ না করলে National classic-কে শুধু স্বীকার করাটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়, উপলব্ধি করাটা নয়।

আসলে গলদ গোড়ায়। নারায়ণবাবু যখন বলেন, "বলা বাহুল্য, এই উনিশশো আটচল্লিশ সালের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রতিক্রিয়াশীলতাকে কেউ চায়

না…" তখনই মনে প্রতিবাদ জাগে। মনে হয় এ ঠিক নয়। আজ যখন চারদিক থেকে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণে আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি চরম বিপন্ন, আমাদের প্রগতিপন্থী সাহিত্যিকদের মধ্যেই দৃঢ়মূল দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী বিচ্যুতি যখন আমাদের বৈপ্লবিক চেতনাকে পদে পদে বিভ্রান্ত করছে, তখন এই উনিশশো আটচল্লিশ সালে "প্রতিক্রিয়াশীলতাকে কেউ চায় না" বলে নিশ্চিন্ত থাকাটাই মারাত্মক দক্ষিণপন্থী বিভ্রান্তির লক্ষণ। উগ্র বামপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলতা নিশ্চয়ই বিপজ্জনক, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে তা সংখ্যাশক্তিতে বা মতবাদগতভাবে যথেষ্ট সংঘবদ্ধ নয়; এদিকে সংগঠিত ও সশস্ত্র দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলতা ইতিমধ্যেই মারাত্মক আক্রমণ শুরু করেছে। সে সম্বন্ধে আমরা কি এখনও যথেষ্ট সচেতন ?

শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শক্তিশালী লেখনী অবিলম্বে এই দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে উদ্যত হবে—তাঁর কাছে বাংলার প্রগতি-সাহিত্যের এই একান্ত দাবী।*

* নতুন সাহিত্য, দ্বিতীয় সংকলন, বৈশাখ ১৩৫৫। এই আলোচনাটি উক্ত পত্রিকার 'সাময়িকী' বিভাগে প্রকাশিত হয়। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

রাস্তায়-রাস্তায় / বিষ্ণু দে

রাস্তায় রাস্তায় লড়াইয়ে মুস্কিল হয়েছে সাধারণ সাহিত্যিক ও সাধারণ পাঠকের, জনসাধারণের রুচিতে হয়েছে সমুদ্র মন্থন। সাহিত্য-সমালোচনায় বিশেষ বিশেষ রাজনীতির স্বকপোলপ্রযুক্ত মতবাদের বা ব্যক্তিগত কোনো নীতির মানদণ্ড পরিচালনা দেখে আমরা কমবেশি বিমূঢ়। প্রথমত, মতবাদগুলিতে যথেষ্ট বিজ্ঞানমূলক স্বচ্ছতা নেই, দ্বিতীয়ত, না সমাজ না সাহিত্য-বিচারে বা উভয়তই এ বর্জন-নীতি ও অশ্রদ্ধা কোনো বিকাশের অনুকূল নয়। এবং যে সমালোচনায় সাহিত্য-রচনার ধারা বা পাঠকমনের কোনো বিকাশে সাহায্য নেই, সে সমালোচনার ধারাও পুনর্বিবেচ্য।

উদাহরণ স্বরূপে এবং একটি উদাহরণ স্বরূপে বুদ্ধদেব বসুর ইংরেজ পাঠকের জন্যে লেখা আধুনিক বাংলাসাহিত্য বিষয়ে মূল্যবান বইটি ধরা যেতে পারে। বুদ্ধদেববাবুর দীর্ঘ সাহিত্যিক নিষ্ঠা ও সাহিত্যসৃষ্টি আমাদের শ্রদ্ধার বস্তু, তাঁকে অসম্মান করতে আমি অক্ষম। কিন্তু দলীয়তা ও রাজনীতির কল্পিত বিকারে ও প্রতিবিকারে তাঁর 'শুদ্ধ' সাহিত্যবাদও যে কিরকম ভারাক্রান্ত, তার লক্ষণাভাস দেওয়া যে সাহিত্যিক কর্তব্য, সেই বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

রবীন্দ্রনাথেই বুদ্ধদেববাবুর 'এন একর অফ গ্রীন গ্রাস' আরম্ভ। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার আশ্চর্য সম্পূর্ণতার যে তিনি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন, তাতে যেমনি খুশি হয়েছি বুদ্ধদেববাবুর সাবেক ও পীড়াকর রবীন্দ্রবিরোধিতার প্রায়শ্চিত্তে, তেমনি খুশি হয়েছি স্বমতেরই সুষ্ঠু প্রকাশে। রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড প্রতিভা ও বিরাট বিকাশের সঙ্গে প্রাকৃতিক ঘটনা ছাড়া আর কিসের তুলনা করা যায়? কয়েক বছর আগে ভারতীয় প্রগতিলেখক সম্মেলনের জন্য আমিও তাই করেছিলুম। বুদ্ধদেববাবুর মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও উন্নাসিক লেখকও সেকথা বলায় আত্মপ্রসাদ স্বাভাবিক। ইংরেজ কবি চসরের তুলনাটিও রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক মুহূর্ত বুঝতে সাহায্য করে। ঐ প্রবন্ধে তার সংগে আমি অবশ্য জর্মান গয়টের উপমাও পাঠকদের কাছে প্রস্তাবিত করি।

বুদ্ধদেববাবু ঠিকই বলেছেন যে বাংলার স্বল্পকায়—কিন্তু হয়তো গভীর—ঐতিহ্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথের বিরাট আবির্ভাব একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। এ প্রচণ্ড আবিষ্কারে আমরা যদি দিশাহারা হই তো সে মার্জনীয়। আমার এ সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবে এ প্রতিভার পরিচয় দেওয়া অসাধ্য, যদিও সাতবছর কেটে গেল সে প্রচণ্ড গতির অবসান। অথচ তাঁর তুলনা অন্য সাহিত্যেও ঠিক পাওয়া যায় না। একদিকে চসার অন্যদিকে গয়টে বা হুগো মিলিয়ে হয়তো খানিকটা ঐতিহাসিক তুল্যাভাস দিতে পারেন। তাঁর কীর্তিতে বাংলা সংস্কৃতির অপরিসর কিন্তু তীব্র স্বরে এল অনেক বিন্যাস, তাঁর প্রতিটি বই টেকনিকের পদক্ষেপে স্পষ্ট প্রগতি ও বিষয়বস্তুর সীমান্ত বিস্তার। তাছাড়া তিনি আমাদের শেখালেন শালীনতা। মার্জিত রুচির এ উত্তরাধিকার অস্বীকার আর কোনো গোঁড়ামিতেই সম্ভব নয়। বাংলার প্রাদেশিকতায় তিনি আনলেন প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে বিশ্বের মানদণ্ড। কবি-রোমান্টিকের পরিবর্তন-অভীপ্সা ও রোমান্টিক বিদ্রোহের তেজ ও পুনর্নির্মাণের শক্তি, হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম সৌকুমার্য ও পেলবতা তাঁরই দান। সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রথম পরীক্ষাতেই প্রয়োজন যে নিছক সৌন্দর্যের চেতনা, সেই প্রাথমিক অঙ্গীকারও রবীন্দ্রনাথেই হলো প্রথম প্রতিভাত। ভিক্টোরীয় চরিত্রের বলিষ্ঠ সততা, শিল্পকর্মের দায়িত্ববোধ ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধও রবীন্দ্রনাথের রচনা। ব্যক্তির যে স্বকীয়তাবোধ, সেনস্ অফ প্রাইভেসি, তাও রবীন্দ্রোত্তর সমাজেই বাংলার মানসে স্পষ্টতর। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যই ছিল তাঁর ব্যাপক কর্মক্ষেত্র, তবু তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ ও কীর্তির তুলনা নদীর ক্ষেত-ভাসানো স্রোত নয়, সংহতসত্তা একক হিমালয়ের হ্রদেই তাঁর উপমা, যেখান থেকে অবশ্য খাল বয়ানো যায়, বিদ্যুতের নিয়ন্ত্রণঘর গড়া যায়।

বুদ্ধদেববাবু চমৎকার বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের তৃপ্তিহীন প্রাণময়তার অশীতিবর্ষব্যাপী সমগ্রতা। এই প্রাণময় অগ্নিতেই টেকনিকের নবনব বিকাশে বিষয়ের দুর্বার প্রসার, এই দীপ্তগীতে একা একা সে অগ্নিতে সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন—শেষটা তিনি চরম স্বচ্ছতায় তাঁর পটভূমি প্রায় পিছনে ফেলে আমাদের আধুনিক জীবনের মহত্তম কবি হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর নক্ষত্রবিহারী প্রতিভা বাংলার মাটিতে মানুষ আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতায় আপন মহত্ত্বে বারবার বাহু নামালেও মুলত তা বহু ঊর্ধ্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ—প্রায় যেন কোনো প্রাকৃতিক মাহাত্ম্যের মতো।

রবীন্দ্রনাথের কীর্তিবিবেচনায় তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য স্বীকারে তাই আসলে তাঁকে শ্রদ্ধাই হয় সম্পূর্ণ। বাংলার ঐতিহ্য ও তাঁর প্রতিভা দুইই এ সংজ্ঞাসম্পূরণে অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য হয়। বুদ্ধদেববাবু যে কবিত্বশোভন বাক্যে বলেছেন যে, 'তিনি সৃষ্টি করলেন ভাষা, গদ্য ও পদ্য দুইই।' সেটা নিশ্চয়ই তাঁর পৌরাণিক অসতর্কতা, যেমন তিনি বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চসর, শেক্সপীয়র, ড্রাইডেন, বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদকবৃন্দ, ওয়্যাট্‌, সারে, স্পেন্সর, মার্লো, শেলি, সুইনবর্ন থেকে তরুণ বয়সের এজ্‌রা পাউণ্ড অবধি। নিশ্চয়ই তিনি মার্লোর ও শেক্সপীয়রের দুর্ধর্ষ গ্লানি ও উল্লাসের ঝঞ্ঝামত্ত নাম অসাবধানেই জুড়ে দিয়েছেন? না হলে স্কটের সঙ্গে তুলনায় ক্ষান্ত না হয়ে তিনি কি করে রবীন্দ্রনাথের 'মোর অ্যাবানডান্‌ট' শিশুকাব্যে ব্লেকের ইনোসেন্‌স্‌—শুধু ইনোসেন্‌স্‌ নয়, ব্লেকের ইনোসেন্‌স্‌ মিশ্রিত পেলেন 'উইথ অ্যান অলমোস্‌ট্‌ সফিস্‌টিকেটেড হিউমর'-এ?

আসলে বুদ্ধদেববাবু সর্বদাই কাব্যরচনায় ন্যায্য অতিকথনের ভক্ত কিন্তু আজকাল ঐতিহাসিক তথ্য নিয়েও তিনি আকুল। তাইতো তিনি বঙ্কিমের নিজেরই গদ্যের ক্রমবিকাশের তথ্যটা চেপে গিয়ে বঙ্কিমের 'স্টিফ ফর্মালিজম্‌' বলে দুটি শব্দে তাঁর বিচার সারেন, রবীন্দ্রনাথের গদ্যকমেডিকে বলেন, 'আরলি শেক্‌সপীরিয়ন ইন টেম্পার' অথচ মাইকেল দীনবন্ধুর যে প্রাক-শেক্‌স্‌পীয়রীয় মেজাজ কমবেশি বাংলা নাটকে চলেছিল, সে বিষয়ে একবারও ভাবেন না। শুধু রবীন্দ্ররচনাবলীতেই তিনি পান এলিজাবিথান 'মাল্‌টিপ্লিসিটি—ইরাস্‌মস্‌, মুর্‌, ড্রেক, র‍্যলে, বেকন, হুকর-মুখর, সেনেকো, মনটেন, মাকিয়াভেলি, মিরাকল্‌, মরালিটি-আন্দোলিত; ব্যারন্‌ ব্যবসায়ী সমুদ্রযাত্রী এলিজাবিথানদের বহুধা বৈচিত্র্য। কিন্তু সেই নব্য ইয়োরোপের বহুমুখিতাকে আবার তিনি দেখেন রবীন্দ্ররচনাবলীতে 'ইউনিফায়েড' এবং কিসে একীকৃত? না ধর্মে। তাই কি তিনি পান রবীন্দ্রনাথে শুধু 'সুইট ওঅর্‌মথ্‌'? অবশ্য বুদ্ধদেববাবু মিষ্টির ভক্ত, তিনি আরনল্ডের গদ্যে পান 'সুইটনেস অফ্‌ স্টাইল' এবং মণীন্দ্রলাল বসুতে পান 'এ সুইট ল্যাঙ্গুইড অ্যাটমস্‌ফিয়র'।

কিন্তু এ ভুল শুধু বুদ্ধদেববাবুর একার স্বেচ্ছাচার ভাবলে ভুল করা হবে; হিস্টরিক্যালি, হি ইজ আওয়ার এলিজাবিথান রেনেসান্স', বুদ্ধদেববাবুর একথা তিনি যাদের সাহিত্যের কূলে প্রহ্লাদ মনে করেন, সেই বঙ্গীয় পার্শ্বপারীরা অনেকে

বলে থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, কোন জাগরণের পুনরুত্থান? কোন ঐতিহ্যের রেনেসাঁস? ইংরেজি শিক্ষা কতখানি জাগাল আমাদের কোন অতীতটিকে? কতখানি কিভাবে জাগাল আমাদের সভ্যতার ছকের ঐতিহাসিক উপলব্ধি? আমাদের মুষ্টিমেয় খণ্ডিত ও ত্বরাগ্রস্ত জীবনযাত্রায় যে মুখ্যত চাকরিঘটিত পরিবর্তন এল তা কি ইয়োরোপের সামুদ্রিক ব্যবসায় ও যন্ত্রশিল্পমূলক সভ্যতার তিন শতাব্দীব্যাপী বিকাশের সঙ্গে তুলনীয়?

এইসব প্রশ্নের সম্ভাবনাও যদি মনে না আসে তাহলে অবশ্য উত্তর পাবার জন্যে চিন্তাও ওঠে না। এবং ফলে বাংলা বিচার ও ঐতিহাসিক তথ্যসন্ধান অসম্পূর্ণ থেকে যায়,ফলে মনে হয় যে দশ-এগারো শতক থেকে অষ্টাদশ উনিশের অর্ধেক অবধি বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যও ছিল না, বাংলাদেশও ছিল কি না সন্দেহ। তাই বুদ্ধদেববাবু রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর একক প্রতিভায় দোসর খোঁজেন এবং ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল, দীনবন্ধু কিয়দংশ বঙ্কিমেরও লোকায়ত দান অস্বীকার করেন, শেষোক্ত তিনজনের সাহিত্যিক বিচার না হয় ছেড়েই দিলুম।

শুধু চসরের সঙ্গে তুলনাটিই যদি তিনি আরো মনোযোগ দিয়ে চর্চা করতেন, তাহলে হয়তো ইংরেজি সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটে অধিকতর সুলভ জ্ঞানে বাংলার পটেও তিনি কল্পিত আরোপ থেকে বিরত হতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চসরের মুক্তি যেমন ইংরেজি কাব্যে একান্ত সত্য, তেমনি সত্য সে মুক্তির ফরাসী ইতালীয় আকাশ,তেমনি সত্য তার নির্বিরোধ গতানুগতিকের পরিগ্রহণ। আবার অন্তর্লীন ইংরেজি মেজাজের—গাওয়েন এণ্ড্ দি গ্রীন্ নাইট ও পার্লের লেখক বা ল্যাংল্যাণ্ড যার ব্যর্থ অর্থাৎ আংশিক কিন্তু প্রকৃত উদাহরণ—পরিপাকও তখন পরিণতির পথে অর্থাৎ চসরের প্রতিভার পক্ষে অনুকূল ও অন্যোন্যসম্পূরক। বুদ্ধদেববাবু চসরের এই সার্থকতা ও সীমার উভয়মুখিতা বিষয়ে একচক্ষু। ফলে তিনি ভাষাতত্ত্বেরও পক্ষে হাস্যকর উক্তি করে বসেন—

'Rabindranath is the most metaphorical writer in a highly metaphorical language·· Bengali is partial to this habit of thought, but English, in spite of Shelley and Swinburne (!) is different ; it is a level language, moving in logical sequences.'

অথচ তিনিই স্বয়ং বাংলায় ক্রিয়ার দুর্বলতা ও [illegible] আলোচনা করেছেন।

তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে ইংরেজি ক্রিয়ার অফুরন্ত ঐশ্বর্যে ইংরেজিই উৎপ্রেক্ষাময় ভাষা, চসর্-পূর্ব ইংরেজিতে সন্ধির অভ্যাস, প্যারালেলিসম্ ইত্যাদির প্রাচুর্যের ধারাও ইংরেজির উৎপ্রেক্ষাময়তার একটা কারণ। সম্ভবত বুদ্ধদেববাবু উৎপ্রেক্ষা ও উপমায় প্রভেদ দেখেন না, তাছাড়া ইতিহাস তাঁর হাতে কলের পুতুল মাত্র। তাই বাংলা গদ্যের বিষয়ে যে গদ্য প্রথম পৃষ্ঠায় দেখি রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করলেন তার বিষয়ে তিনি কাল ও পাত্রের পূর্বাপরহীন এই মন্তব্য করেন—

'Midwifed by Rammohan Roy, nursed by Iswarchandra Vidyasagar, baptised so to say, by the morning-memorable (as we say in Bengali) Serampore missionaries…'

সেই জন্যেই বোধহয় অবনীন্দ্রনাথের শিশুগল্প ও অন্যজাতীয় রচনার অসামান্য প্রতিভা যে বাংলা গদ্যে কি ঐশ্বর্য দিয়েছে, সে বিষয়ে তিনি অতর্কিত। অথচ ঐতিহাসিক মনোভঙ্গী বুদ্ধদেববাবু প্রকাশ করেছেন বারবার। তিনি ইংলণ্ড ও বাংলার সম্বন্ধ নির্ণয়ে লেখেন—

'Bengal alone, not the whole of India, nor any other part of it… The rest of India, in those early days of disorder, was hostile, cold, crustaceous, only Bengal absorbed Europe with a speed and thoroughness that should be marked as a record in human relations.'

তিনি সাম্রাজ্যপত্তনের এই দশের মধ্যে একের গভীর প্রেমের কারণও দেখিয়েছেন :

'The truth of the matter seems to be that the Bengali and the English, severe strangers in appearance have an inner *congenital affinity*…the minds of the *two peoples*, the Bengali and the English, moved to the same rhythmic pattern'.

শেষের উক্তিটি বুদ্ধদেববাবু সজ্ঞানেই করেছেন নিশ্চয়ই ; হয়তো তাঁর মতবাদ তাঁকে এই ইঙ্গবঙ্গীয় বিলাপে, ইংলণ্ডস্ ওয়ার্ক ইন ইণ্ডিয়ার এই বিলম্বিত নবভাষ্যে প্রেরণা দিয়েছে। মতবাদের বিপদই এই, সেইজন্যেই তো মার্ক্স-এঙ্গেলস্ মতবাদের শুষ্ক-রিক্ততা বা যান্ত্রিকতার প্রবণতার বিষয়ে ছিলেন অতো তীক্ষ্ণদৃষ্টি।

মতবাদঘটিত এবংবিধ স্বপ্নপ্রয়াণ অন্যত্রও দেখা যায়। যেমন কিছুকাল আগে অসামান্য কুশলী শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দেন যে তাঁদের সঙ্গে যোগ না দিলে নাকি প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা অসম্ভব।১ মানিকবাবুদের কথাতেও দেখি এই স্বপ্নান্ত ধারণা, তফাৎ এই যে মানিকবাবুরা ভাবেন যে বাঙালী ও সোভিয়েট মন আজই একই ছন্দে চলেছে। ইতিহাস নিশ্চয়ই অন্য কথা বলে, মানিকবাবুও কি আর সজাগ মুহূর্তে জানেন না যে বাংলাদেশ ও সোভিয়েট ইউনিয়নে জীবন ঠিক এক নয় তথা সোভিয়েট সঙ্ঘ ও মানিকবাবুর সঙ্ঘও তুল্য-মূল্য নয়?

মতবাদের উগ্রতায় অবশ্য সত্যমিথ্যা হয়ে যায় একাকার, এঙ্গেলসের আন্টি-ডুএরিঙের শেষ কথায় বাকি থাকে 'মেনট্যাল ইনকম্‌প্টেনস্ ভিউ টু মেগালোম্যানিয়া'। এ আত্মসর্বস্ব উগ্রতায় সাহিত্যবিচার তো ব্যাহত হবেই,

'As for the aesthetic side of education, Herr Cuhring will have to fashion it all anew. The poetry of the past is worthless···Let him not tarry with it! The economic commune can achieve the conquest of the world only when it comes in at the double in Alexandrine rhythm, reconciled with reason'.

এবং এ উগ্রতার তাল কখনো ডাইনে কখনো বামে। মিলটা এখানে কম নয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত হাকিমের কাজ করেন এ নিয়ে মানিকবাবু যেমন তাঁর ডুএরিঙীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে যৌনবিকার বিষয়ে বহু অপ্রাসঙ্গিক ও অশোভন আলাপ করেছেন, তেমনি বুদ্ধদেববাবু লিখেছেন যে, অচিন্ত্যবাবুর সাহিত্য-বিচারে একটা ত্রুটি দ্রষ্টব্য—'দি ওব্‌লিগেশন্‌স্ অব এ গভর্নমেণ্ট অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট', যার জন্যে তাঁকে মফস্বলে থাকতে হয়। বুদ্ধদেববাবু মানিকবাবুর বিষয়েও লিখেছেন—স্বল্পকায় বইয়ের পক্ষে সমধিক মাত্রায়, পুরো দুপৃষ্ঠা ধরে—

'Like the great quantities of verse and fiction (if we must call them so,) being written in Bengal at the moment merely to illustrate some particular political doctrine'.

১. দ্র. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শারদীয়া সাহিত্যে ছোটগল্প', বর্তমান খণ্ড, পৃ. ৩৬২।—সম্পাদক

মানিকবাবুর গত কয়বছরের রচনাবলী নাকি ভীষণ বিকৃত! মানিকবাবু নাকি আজকাল নিউরটিক ও সেক্স্য়াল পারভার্টস ছাড়া আর লেখেনই না। এ ভাইরস মানিকবাবু প্রতিভাবলে দূর করবেন, বুদ্ধদেববাবু নাকি এ আশা করেছিলেন কিন্তু মানিকবাবু বোধহয় 'প্রিডিসপোসড্ টু দি ডিস্ইজ' ইত্যাদি এবং উপসংহারে

'Now it is a maniac instead of a moron, libertine instead of a lout, criminality instead of imbecility…'

যে উগ্রতায় মানিকবাবুর বিষয়ে এই নির্বিচার উষ্মা সেটা নিছক সাহিত্যিক ভাবতে বিশ্বাস হয় না। এই উগ্রতার জন্যেই বোধহয় বুদ্ধদেববাবুর নাতিহ্রস্ব কবিদের তালিকায় অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলা চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য বাতিল? যেমন গল্পের তালিকায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রমেশ সেন, নরেন্দ্র মিত্র, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা প্রভৃতি অপাংক্তেয় কিম্বা নাটকে বিজন ভট্টাচার্যের নাম অনুচ্চার্য। সেই জন্যেই কি জ্যোতির্ময় রায়ের গল্পের বিষয়ে তিনি দুটি শব্দ 'ব্লান্ট্ ভিগার' পেলেন এবং তাঁর হালকা প্রবন্ধের বিশিষ্ট স্থান উল্লেখই করলেন না? তাই কি বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামাবলীতে স্থান পান্ নি?

এই যে দলীয় বা রাজনীতিগত রোষদুষ্ট জাতিবিচার এ বুদ্ধদেববাবু কি করে তথাকথিত বামপন্থী সমালোচনার প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করেন? তবে তথ্যের উপরে অবজ্ঞা তাঁর মধ্যে মধ্যে মানিকবাবুর মতোই প্রবল। মানিকবাবুর পক্ষে লিখতে কোনোই দ্বিধা হয় নি যে অচিন্ত্যকুমারের কলম নাকি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল মধ্যে, তারপরে হাকিমীর আকস্মিকে পূর্ববঙ্গে গিয়েই নাকি তাঁর কলম গেল খুলে। বুদ্ধদেববাবুও অনুরূপ উদ্ভাবনীশক্তির নমুনা দিয়েছেন। মানিকবাবু যেমন তাঁর কল্পিত প্রতিপক্ষের গোর্কি-বিষয়ক বুর্জোয়াবাক্য সম্পূর্ণভাবে, দুর্নীতিমূলকভাবে বিকৃত করে তাকে উদ্ধৃতির চেহারা দিতে পারেন, বুদ্ধদেববাবুও প্রায় তেমনি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে আজকাল কবিতা লেখেন না, তার কারণ তাঁর বিশেষ রাজনীতি, একথা অম্লানমুখে লিখতে পারেন—যদিও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কয় বছরের নীরবতার বিষয়ে তিনি শোভনভাবেই নীরব।

এই দুই উগ্র মতবাদই সাহিত্যের স্বাধীনতার প্রতিকূল। হয়তো এসব

মতবাদ 'মতবাদ' মাত্র, ব্যক্তিগত রুচি-অভিরুচি বন্ধুত্ব বা দলাদলির ভাবকল্পলীলা বা পারলৌকিকতত্ত্ব। যে বৃহৎ অর্থে সমাজ সাহিত্যে বিবেচ্য সে সম্পূর্ণতা যেমন এসব লীলায় দুর্লভ, তেমনি ব্যক্তিগত খবরের চুটকি এখানে অহেতুক মূল্য পায়।

আশা করি বুদ্ধদেববাবু উপরের বিনীত নিবেদনে ভুল বুঝবেন না। আমি জানি তাঁর শিল্পপ্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা, তবু যে সামান্য বক্তব্য বলতে পারলুম, সে সাহসের কারণ তিনি আর প্রেরণায় বিশ্বাস করেন না। আমার ভরসা তাঁরই কথা :

'nothing remains for us but hard work, the discipline of selfconsciousness'.

বলাই বাহুল্য, এতদিন পরে বুদ্ধদেববাবুর এ কথায় বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী মাত্রেই আনন্দিতই হবেন, যেমন হবেন মানিকবাবুর মত পরিবর্তনেও। মানিকবাবুও সম্প্রতি মনে করেন না যে অন্যের বই পাঠে স্বকীয়তা নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য তাঁর এ ধারণাও হয়েছে যে আমাদের এই শতকরা পাঁচজন সাহিত্য-পাঠকের দেশে অসহায় জনগণ নামক এবস্ট্রাকশন শুধু তাঁর ও তাঁর সঙ্ঘবদ্ধ বন্ধুদের সম্পত্তি।

বুদ্ধদেববাবু কিন্তু এই বইয়ে কঠিন পরিশ্রম করেছেন বলে মনে হয় না; এবং যে আত্মসচেতনতায় তিনি অনন্যবোধে কাতর, সে আত্মসচেতনতার কথা নিশ্চয়ই মারিতাঁ পিকাসোর বিষয়ে বা এলিঅট আধুনিক কাব্যের প্রসঙ্গে বলেন নি। যে বয়সে অমিত রায়কে মনে হয় আদর্শ, এ আত্মসচেতনতা কি সেই বয়সেরই নয়? বুদ্ধদেববাবু তাই মনে হয় কৈশোরক কিন্তু অকপট উচ্ছ্বাসে অনেক সময়েই কষ্ট করে তথ্যসংগ্রহ না করে বা পাতা না উল্টেই তাঁর নিজের স্মৃতি-শক্তির উপরে নির্ভর করেছেন তথ্যোন্মোচনে। তাঁর বাক্যরচনা ও শব্দব্যবহারও সময়ে সময়ে অসতর্ক ও অস্পষ্ট।

ইংরেজি ও বাংলা গীতাঞ্জলির তফাৎ দেখিয়ে বুদ্ধদেববাবুর আলোচনা উৎকৃষ্ট তুলনামূলক সমালোচনা হতে হতেও তাই হলো না, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও বাংলার তফাৎ দেখাতে বুদ্ধদেববাবু নিজে আবার যথাযথ অনুবাদ দিয়েছেন। কিন্তু শ্রাবণ ঘন গহন-মোহে গানের 'মিলায় নীল', কি ঠিক 'ইমপোর্ট ব্লু'? নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে—কি

'Have hope, O my heart, hope day and night, for it will be, it will be?'

কিম্বা 'মাধুর্যের মালা' কি 'গার্ল্যাণ্ড অব সুইটনেস্'? তিনি মিষ্টির অনুরাগী কিন্তু মাধুর্য কি বরঞ্চ 'গ্রেস্'-এর আত্মীয় নয় বা মাধুর্যের মালা 'এ টেনডার গার্ল্যাণ্ড'। তাঁর মন্তব্যে বুদ্ধদেববাবু লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের নিজের অনুবাদে 'স্বর্ণথালা' হয়েছে 'গোল্ডেন বাসকেট' এবং এ উন্নতির বুদ্ধদেব-দত্ত কারণটি অদ্ভুত: 'Basket is a better visual image than the garland on the plate.'

—তাই কি? বাজারের বাস্কেট, টিফিনবাস্কেট, ফলের বাস্কেট, ফুলের বাস্কেট, কি সঠিক ইমেজ কিছু? তাছাড়া 'গার্ল্যাণ্ড অন্ দি প্লেট' এল কোথা থেকে?

'সেথা ঊষা ডান হাতে ধরি স্বর্ণথালা, নিয়ে আসে একখানি মাধুর্যের মালা' —ইমেজটিতো সোনার থালা ঊষার ডান হাতে। কিন্তু সবচেয়ে মজার বুদ্ধদেববাবুর ইংরেজি উৎকর্ষের বিষয়ে এই মন্তব্য: 'রাইটহ্যাণ্ড সাউণ্ডস বেটার দ্যান হ্যাট'—ইংরেজপ্রীতির এ মাত্রা কি এলিঅট কথিত 'আইসোলেটেড সুপিরি-অরিটি'-র এ দেশী সাধনার অঙ্গ?

তাছাড়া কেন যে বুদ্ধদেববাবু ইংরেজি মেঘকে, আষাঢ় বা আশ্বিন নয়, শুধু বাংলা শ্রাবণের মেঘের সঙ্গে তুলনা করে বলেন যে I wandered lonely as a cloud বা I bring fresh showers for thirsting flowers (the thirsting flowers নিশ্চয়ই?)—বাংলা বর্ষার কাব্য হতে পারে না, তাও বোঝা শক্ত। অনুবাদতত্ত্ব আলোচনায় তিনি ঠিকই বলেছেন যে মাইনর কবিতা অনুবাদ্য, দুঃখ করেছেন যে 'দি ইণ্ডিয়ান সেরিনেড' ও 'ল বেল দা স্যাঁ মেরসি'র বাংলা অনুবাদ বালালোল মাত্র, কিন্তু তারপরেই যখন তিনি এক নিশ্বাসে বলেন:

We have, however, very good translations from Heine, Hugo, Stevenson, D. H. Lawrence, from Noguchi and Chinese Anthology (!)

তখন নামগুলির অসম্বন্ধ পারম্পর্য, মাইনর কবি পংক্তিতে লরেন্স, হাইনে ও হুগোর নামগুলি অবাক করে।

কিন্তু এসব কথায় বুদ্ধদেববাবুর প্রাদেশিকতা প্রমাণ নয়, শুধু সমালোচকের

দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার উদ্দেশ্য। এখানে বুদ্ধদেববাবুর বইটি আমি উপস্থিত করেছি আমাদের সাহিত্যিক সমস্যার একটি উদাহরণ, একটি জলে-কুমীর হিসাবেই। বলা বাহুল্য, তাঁর সঙ্গে বহুবিষয়ে অন্যেও একমত হবেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও গদ্য বিষয়ে যে বুদ্ধদেববাবু এতকাল পরে যে কারণেই হোক তাঁর অনীহা ও অশ্রদ্ধা দূর করতে পেরেছেন, তাতে আমরা খুশি। বা ছকে ফেলে সাহিত্যরচনার মারাত্মক অভ্যাসের বিরুদ্ধে বা যান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সমালোচনার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদও আমাদের সশ্রদ্ধ বিবেচনার যোগ্য। কিন্তু তাঁরও মতবাদ আছে, প্রচ্ছন্ন রাজনীতি আছে—এবং সেইখানেই তাঁর সমালোচকদের ভাঙায় বাঘেদের তিনি সমর্থন জোগান। আঁদ্রে জিদের ভাষায়, বুদ্ধদেববাবু জিদের কথায় ক্ষুব্ধ হতে পারেন না বলেই, বলা যায়:

'Leon Blum's thought has lost all interest for me, it has merely become a subtle instrument that he lends to the demands of his cause'. (*Journals, I*)

অথচ বুদ্ধদেববাবু তাঁর কজ্, বা এই সট্‌ল্ ইনস্ট্রুমেণ্ট ব্যবহারেও যথেষ্ট অবহিত নন। নাগরিক উচ্চশিক্ষার অভিমানে তিনি উচ্চকিত। অচিন্ত্যকুমার চাকরি ব্যপদেশে কলকাতায় থাকতে পারেন না এই ভেবে তাঁর করুণা অশ্রুময়, নজরুল ইস্‌লাম নাকি অপরিণত চিরকিশোর এ আলোচনায় তাঁর কণ্ঠস্বরের পরকীয় গাম্ভীর্য প্রায় এলিঅটের চেয়েও বেশি ইংরেজি প্রাপ্তবয়স্ক। এবং তারাশঙ্কর যে কি পরিমাণে প্রাদেশিকতাদুষ্ট, নাগরিক বৈদগ্ধ্যহীন—কারণ তিনি বুদ্ধদেববাবুর মতো হয়তো কলকাতায় এসে কলকাতাকে উপজীব্য করেন না তাঁর গল্পোপন্যাসে, যদিচ তাঁর একটি সাধারণ উপন্যাস 'মন্বন্তরে'ই কলকাতার পাড়ার যে প্রত্যক্ষ আবহাওয়া ফুটেছে, তা কলকাতামার্কা সাহিত্যে দুর্লভ—সে বিজয়ী আবিষ্কারে বুদ্ধদেববাবু হিরণ সান্যালের মতোই মাত্রা হারান। তারাশঙ্করের কোনো সরল চরিত্র নাকি একবার কাসাবিয়াঙ্কার মতো গ্রাম্যকবিতা আবৃত্তি করে ফেলেছে! প্রথমত জীবনানুগতার দিক থেকে এটা খুবই যথাযথ, যে দেশে হাইনে হুগো স্টীভনশন্ নোগুচি সমোচ্চার্য সেই দেশে বিশেষ করে। তাছাড়া বুদ্ধদেববাবুর তুলনায় এ মতানুসারে রবীন্দ্রনাথও ঘোর অশিক্ষিত, কারণ 'গোরা'র তাঁর চরিত্র আবৃত্তি করেছে 'লাইফ ইজ রিয়াল' 'লাইফ ইজ আরনেস্ট' ইত্যাদি, এমনকি তার বাংলাও দেওয়া আছে। তার উপরে বুদ্ধদেববাবুর মৌল

আবিষ্কার হচ্ছে যে তারাশঙ্করের গল্পোপন্যাসে নাকি নরনারীর প্রেম একেবারেই নেই। তারাশঙ্করের ত্রুটি নিশ্চয়ই তাঁর রচনাশৈথিল্য, শিল্পের চেয়ে জীবনের স্রোতেই গা ভাসানোয়, কিন্তু তাঁর জীবনের একটা নির্বিচার হলেও বৃহৎ বোধ অনস্বীকার্য। অন্য সাহিত্যিকসাধারণের সঙ্গে সামান্য একাত্মবোধ থাকলেও বুদ্ধদেববাবু সেটা মানতেন। কিন্তু বুদ্ধদেববাবু মূলত একেশ্বরবাদী, সেই সোহং-হেগেলের গল্পের মতো, যদিচ তিনি থেকে থেকে দশাবতারকেও নামান— অন্তত নয়, সাড়ে নয় জনকে।

প্রত্যক্ষ জীবনের যে একাত্ম বিন্যাসে ও কিছুটা হয়তো রাশ্যান জীবন ধারায় স্টালিনের কথা রাশ্যায় সার্থক, সেই আত্মপক্ষে সমালোচনার রীতি যে মুক্তিরই এক পরিবর্তনীয় সীমান্ত, সে স্বাধীনতা বুদ্ধদেববাবুর আজ কল্পনাতীত, তাঁর সমালোচনা তাই বৈরী বিধর্মীকে ছায়াময় আক্রমণ মাত্র। সেইরকমই কয়েক বছর ধরে 'পরিচয়' ও কয়েকজন প্রগতি লেখকদের মধ্যে মাঝে মাঝে যে অসহিষ্ণু দলীয়তা দেখে এসেছি, তার যতোই দার্শনিক সমর্থন তাঁরা করে থাকুন সেও একটা লাসালী ভ্রম: তাঁরাই নাকি জনসাধারণ, তাঁরাই প্রগতি, আর সবাই এক বিরাট প্রতিক্রিয়াশীল পিণ্ড। গটা-প্রোগ্রামের সমালোচনায় এ ভ্রান্তি স্বচ্ছ হয়ে যায়। এঙ্গেলসও লেখেন:

"The real weakness is the childish notion of the coming revolution which is supposed to begin by the whole world dividing itself into armies ; we here, the 'one reactionary mass' there. That means that the revolution has to begin with the *fifth act* and not with the first'.

লেনিনের কথায়:

'To imagine that means repudiating social revolution··· whoever expects a "pure" social revolution will never live to see it. Such a person pays lipservice to revolution."

আমাদের কোনো কোনো বামপন্থী সমালোচনা পড়েই তাই মনে হয় মার্কসের কথা:

'For a theatrically vain nature like Lasalle it was a most tempting thought : an act directly on behalf of the

proletariat and executed by Ferdinand Lasalle.'

বিশেষ করে এ সতর্কবাণী প্রযোজ্য শিল্পসাহিত্যে, কারণ প্রধানত শিল্পসাহিত্যের নিজস্ব ইতিহাস একেবারে ভুলে বৃহত্তর ইতিহাসের নামে এক কল্পিত ছকে ফেলবার প্রবণতা আমাদের সহজ। আর দ্বিতীয়ত আমরা ভুলে যাই যে সাহিত্যশিল্পের বৈশিষ্ট্যই হলো যে স্তরে জীবনের রূপান্তর, সে রূপান্তরের স্তরে অনেক সময়ে এসে যায় আপাতবৈপরীত্য। বালজাকের প্রতিক্রিয়াশীল মতামত এবং তাঁরই সাহিত্যসৃষ্টিতে তার গভীরতর খণ্ডন তাই মার্কসিজমের পুরোধাই দেখান। ছোট ক্ষেত্রে নেমে এলেও আমরা এ সত্যের প্রমাণ পাই, যেমন এলিঅটের জীবনবিতৃষ্ণ অস্পষ্ট মতামত প্রকাশ পায় যে নিহিত ছন্দে, তা একরকম জীবনেরই অঙ্গীকারের স্পষ্ট ছন্দ। শেক্সপীয়রের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব কি মহত্ত্ব লাভ করেছিল, তার বিচার নানা দিক থেকে অনেক সমালোচক করেছেন; মধ্যযুগের দায়ভাগও তাঁর উপরে বড় কম ছিল না। চসরের কাব্যের প্রগতি ও জীবনদর্শনের প্রথাগত সামান্যতা এবং ল্যাংল্যাণ্ডের কাব্যের পশ্চাদগতি ও জীবনদর্শনের চাষীবিদ্রোহমূলক প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্বও এই রূপান্তরের স্তরপর্যায়েই বিবেচ্য। এইখানেই পরিশ্রমের, তথ্যানুসন্ধানের প্রশ্ন, এইজন্যেই শিল্পসাহিত্যের সমাজতান্ত্রিক বিচার জটিল। এ বিচারে সরলীকরণের চেষ্টা স্বাভাবিক, কল্পনাবিলাসের আশ্রয়ও হয়তো তাই নিতে হয়। টমাস মানের সঙ্গে রঁম্যা রলাঁর তুলনায় তাই বোধহয় বলতে ইচ্ছা করে রলাঁর (ব্যক্তিগত রুচিসাপেক্ষ) শ্রেষ্ঠতরতার কথা, এমনকি রলাঁকে কম্যুনিস্ট আখ্যা দেওয়া হয় তার প্রমাণ হিসাবে, যদিও রলাঁর বিষয়ে যে কথাটা সত্য নয়, তার সাক্ষ্য লা পসে-তে মর্ত্রাঁ-র ঐ বিষয়ে প্রবন্ধটি। গোর্কির বিষয়েও এই রকম, তিনি কম্যুনিস্ট এ বিশ্বাসঘটিত ভ্রান্ত ধারণা যুক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সাহিত্যের দিকে এরকম মতামতে ক্ষতিই হয়, রচনার ও পাঠের রুচির মান এতে নীচেই নামানো হয়। কারণ এ মনোভাব শুধু বিদেশী মহাজনেই আবদ্ধ থাকে না। সাহিত্য যে 'লেজিসলেটরস অব ম্যানকাইণ্ড' এ আদর্শবাদেরই জোরে এরাঁ মনে করেন যে সমালোচকরা লেজিসলেটরস অব লিটরেচর' এবং বাংলাসাহিত্যের ক্ষুদ্র কমলবনেও এঁরা হানা দিয়ে বেড়ান। এইদিক থেকেই সুকান্ত-কাব্য সম্বন্ধে সজ্জন অতিকথন অসর্ব-তুষ্ট, প্রায় প্রতিপক্ষ বুদ্ধদেববাবুর অতিকথনেরই মতো: সুকান্ত-কাব্যকে পাঁচ নম্বর না হয় ছয় নম্বর যেমন সে

বিষয়ে কবিতা-পত্রে বুদ্ধদেববাবু ঘোর দুশ্চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, এবং সে ঐশ্বরিক চিন্তায় শেষে তাঁর ইংরেজি বইটিতে তাই সুকান্তর উল্লেখই করেন নি। তারা-শঙ্করের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'র সমালোচনায় তাই নীতিসম্পন্ন নাক কুঞ্চিত হয়ে ওঠে 'রঙের' ব্যাপার দেখে; তারপরে সমালোচককে জাতীয় জীবন নামক বস্তুর মনগড়া ছবিতে সংখ্যাতত্ত্বের খেয়ালী ব্যাখ্যায় বলতে হয় যে কাহার-রা যেহেতু সংখ্যায় কম, সেহেতু তাদের গল্প জাতীয় সাহিত্য হতে পারে না, যেমনটি হতে পারে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (বলাই বাহুল্য, মানিকবাবুর চমৎকার সুলিখিত উপন্যাস)। কাহার-রা নাকি শুধু হতে পারে ভেরিয়র্ এলউইনের নৃতত্ত্বের রসালো বিষয়। ভারতবর্ষে এই জাতীয়বাদী সমালোচনা! যেখানে কোটি-কোটি লোকে ভদ্রলোক হতে পারে নি, ইংরেজি শেখে নি, ইংরেজিশিক্ষিতের সামাজিক বা ধর্ম-আন্দোলনে অংশ পায় নি! নৃতত্ত্ব-বিষয়ে ভ্রান্তিবিলাস না হয় মার্জনীয়ই মানলুম।

কিন্তু ব্যাপারটা ঠাট্টার বিষয় নয়। সমালোচনার মান-বিকার সাহিত্যের এবং কিছুটা জীবনের পরিধিতে ব্যাপ্ত। প্রেরণাবাদের অভ্যাসিকতা এই আলাদীনের ম্যাজিকযন্ত্রচালিত প্রদীপোজ্জ্বল স্বপ্নময় স্বর্গরাজ্যবাদেও বর্তমান। শেষোক্ত ধর্মও 'সমাজের ভাবী গঠন বিষয়ে একরকমের কল্পনার খেলা'—কারণ

'Naturally Utopianism, which before the time of materialist critical socialism concealed the germs of the latter within itself, coming now after the event can only be silly; *silly*, *stale* and basically reactionary'. (Engels)'

অর্গ্যানিক প্রকৃতির প্রক্রিয়াবিশেষের উপরে যন্ত্রবিজ্ঞানের পদ্ধতির প্রয়োগে কি বিপদ, 'রুয়েরবাখে' তা সুস্পষ্ট দেখানো হয়েছে। অথচ আমাদের সমালোচকেরা প্রায়ই উদোর পিণ্ডি চাপান বুদোর ঘাড়ে, কবিতায় চান গল্প, গল্পে চান সংবাদ, রাজনীতির কর্মক্ষেত্রের বিবেচ্য করেন প্রাথমিক দাবি গল্প-বিচারে, অর্থনীতির তত্ত্বের বর্ষফল খোঁজেন কাব্যের মিলে, আমাদের সমাজের জীবনের মনোলোল্যে খোঁজেন সোভিয়েট সমাজের প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা। বলাই বাহুল্য মার্কসবাদে এই সহজপথের সমর্থন নেই,

'because no philosophy recognises the emergence of levels of organisation better than dialectical materialism,

and the individuals of which the human social collectivity is built up are themselves the most complicated organisms in the living world.'

শিল্পসাহিত্য রচনায় আজও তাই ব্যক্তিরচয়িতাই প্রাথমিক, এই অনেক মানুষের পথে তাই আজও ওআন-ওয়ে-ট্রাফিকের নিয়ম চলে না—কি দক্ষিণে, কি বামে।

অধিকন্তু, শিল্পসাহিত্যে—যেখানে মানসজীবন মূলত আর্থিক সামাজিক ও জৈব অবস্থানিচয়ের রূপান্তর হলেও খানিকটা আবার স্বতই নিয়ন্ত্রণ ও চালনা-শক্তি পায় (গারোদি : সমাজতন্ত্রবাদ ও মানসনীতি : organisateur et moteur), সেখানে তাই স্তরগত সত্তাকে অস্বীকার শিল্পসৃষ্টি বা রচনার পরিপন্থী। মানিকবাবু যদি বলেন, তাঁর সত্ত্বের বাইরে এই নিয়ন্ত্রণের স্তর অগোচর, তাহলে তাঁর পুনর্বাদ হয়ে দাঁড়ায় বিজ্ঞানবহির্ভূত, মরমীয়া।

'of an ooscurantist character, since it was supposed that the organising relations were themselves the anima and as such inscrutable to scientific analysis.'

বিশেষত বিজ্ঞান তথা সমালোচনার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ঐ বিশেষ স্তরের প্রক্রিয়ায় যে বিশেষ ফর্ম, তাই পর্যবেক্ষণ করা। অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্যে আছে বৃহত্তর সম্বন্ধের ঐক্য কিন্তু তার প্রকাশ হয়

'in qualitatively diffeient forms of whose distinctive characters one should never lose sight of.'

এবং ফর্ম ও ম্যাটার সমতুল্য বা অভিন্ন (ডায়ালেক্‌টিক্স অফ নেচার)। এই পর্যবেক্ষণে, এই অভিন্নতার বিচারে অবশ্যই ফর্ম বাধ্যত খানিকটা পরোক্ষ নিদান হয়ে দাঁড়ায়, কারণ ফর্মের পরিবর্তনের জ্ঞান সম্ভব ফর্মের প্রাথমিক জ্ঞানে এবং তার উৎসের জ্ঞানেই। এবং এ পরিবর্তন তো নিত্য ও সর্বব্যাপী, পুরাতন ও নতুনের, জীর্ণ ও নবজাতকের দোহারই বিবর্তনের প্রক্রিয়ার অন্তর্লীন আতত বিষয়বস্তু। এঙ্গেলস তাই লেখেন :

'We all, that is to say, laid and were bound to lay the main emphasis at frist on the derivation of political, juridical and other ideological notions from fasic economic facts. But

in so doing we neglected the formal side—*the way in which these notions come about*, for the sake of the content'.

নন্দনতত্ত্বে বা শিল্পসাহিত্য বিচারে শেষোক্তটিই মুখ্য বিচার।

'It is the old story: form is always neglected at first for content. As I say, I have done that too, and the mistake has always struck me later'.

এই স্থায়বিশ্বের আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসন বা এই স্তরের ভিন্নতার উপরে নজর দেবার প্রয়োজন মার্কস তাই বিবৃত করেন ক্রিটিক্ অফ্ পলিটিক্যাল ইকনমি-র ভূমিকায়। আইডিওলজিক্যাল কর্মগুলিকে উৎপাদনের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন তিনি বলেন নি, বলেন 'রূপান্তর'। তিনি বলেন যে, আমাদের ভাবজগৎ, চিন্তাজগতের সূত্রপাত 'প্রথমে' বাস্তব কর্মপদ্ধতি ও মানুষের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে জড়িত (জর্মান আইডিওলজি)। আবার

'From the start the "spirit" afflicted with the curse of being "burdened" with matter which here makes its appearance in the form of agitated layers of air, sounds, in short, of language.'

কর্মের তাগিদে বা কর্মীর আত্মপ্রসাদে আমরা ভাষার এই উভয়মুখিতা ছাঁটাই করি, ভাষাকে সঙ্ঘবদ্ধ হাতুড়ি ভেবে ফেলি কিম্বা ঐ 'আত্মা'কে বা মানসকে হুকুম দিই প্রত্যক্ষ বাস্তবতাকে মাটিতে ফেলে সাম্যবাদী সমাজের রিয়ালিজমের আকাশে উড্ডীন হতে। শিল্পসাহিত্যেরও যে একটা ইতিহাস আছে, একটা বেগতত্ত্বও আছে, তা আদর্শবাদীর আবেগে ভোলা স্বাভাবিক নিশ্চয়ই। কিন্তু স্রষ্টাশিল্পের কর্ম ঠিক সিস্টেম বা মেটাফিসিকস্ তো নয়, প্রতিষ্ঠান বা যন্ত্রও নয়—শিল্পীদের সঙ্ঘ অবশ্যই তা হতে পারে। নৈঃসঙ্গ্যের অসংলগ্ন চর্চাও সমানই অসহিষ্ণুতার লক্ষণ। কারণ তাতেও সরলীকরণ, তাতেও ব্যক্তিসমাজের প্রাণময় আততি অস্বীকৃত—অধিকন্তু অবশ্য তাতে আশুপ্রয়োজন সামাজিক উন্নতি অস্বীকৃত।

তাছাড়া শিল্পকর্ম যে এখনও কিছুটা আদিম, সে কথা ভুললে চলে কি করে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিল্পগুলি এবং বিশেষ করে আমাদের সমাজ-জীবনে।

সিনেমা বাদে, নাট্যমঞ্চ ও পোস্টার ছাড়া যৌথ শিল্প কৈ আর? অধিকাংশ আদিম শিল্প যথা সাহিত্য বা স্টুডিওচিত্র আজও ব্যক্তির হাতে গড়া,

and therefore of necessity, small, dwarfish, circumscribed. But for this very reason, they belonged as a rule to the producer himself.

তাই এখনো শিল্পকে, এই ইন্দ্রিয়-গত মানবিক কর্মপ্রক্রিয়াকে শুধুই যৌথ সামাজিক পণ্যদ্রব্য ভাবাটা মার্কসবাদের পরিপন্থী। সেই জন্যেই ফরাসী কম্যুনিস্ট নেতা এরভে ও গারোদি বলেন যে শিল্পবিচারে কোনো পার্টি-লাইন বা মার্কসীয় নিয়মকানুন প্রযোজ্য নয়। মার্কস কারুশিল্প বিষয়ে যা লেখেন, তাও এ প্রসঙ্গে তুলনায় চিন্তনীয়—

'There is found with mediaeval craftsmen an interest in their special work and in their proficiency in it which was capable of rising to a narrow artistic sense. For this very reason, howevr, every mediaeval craftsman was completely absorbed in his work...and to which he was subjected to a far greater extent than the modern worker, whose work is a matter of indifference to him.'

এই দৃষ্টিতে একদিকে বুদ্ধদেবের 'ইন্‌কোরাপ্‌টিবল রোল্‌ অব দি পোয়েট'এর বিলাস অর্থহীন, অন্যদিকে স্বয়ম্ভর তথাকথিত মার্কস্‌বাদীর ফাঁকিও মারাত্মক হয়ে উঠে। তাঁরা কেউ দ্রুত সমাধানের তাগিদে আরম্ভ করেন বর্জননীতি। সামাজিক সম্বন্ধপাতে এবং উৎপাদন শক্তিসমূহে বিরোধিতা লক্ষ্য করে তাঁরা আধুনিক শিল্পসাহিত্যকে বিসর্জন দিয়ে একবার কাঁদেন মানবসমাজের প্রথম সারল্যের দিকে ফিরে, একবার হাহুতাশ করেন ভাবীস্বপ্নের সুখময় কোলে—

'this antagonism between the productive forces and the social relations of our epoch is a fact. Some may wail over it; others may wish to get rid of modern arts, in order to get rid of modern conflicts.' (Engels)

মার্কসও মন্তব্য করেন এই অসমতার বিষয়ে তাঁর ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমির ভূমিকায়। অধিকন্তু,

'As to the realms of ideology which soar still higher in the air, religion, philosophy etc..., these have a prehistoric stock.'

সুতরাং—'All one can reasonably do, however, is (1) to try to discover the method of division to be used *at the beginning* and (2) to try to find *the general tendency in* which the further development will proceed.'

এবং তার জন্যে

'all history must be studied *afresh*, the conditions of existence of the different formations of society must be individually examined.'

এবং সাহিত্যবিচারে তাই যেমন সাহিত্যবস্তুই প্রধান বিবেচ্য—কে হাকিম বা হাকিমপুত্র, কার চরিত্র কি রকম সে শুধু পরে এবং জীবনীর স্তরেই বিবেচ্য—তেমনি ঐ ব্যাপক ও গভীর সমাজেতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেতিহাসও গ্রাহ্য—সাহিত্যবিচারে।

অবশ্য এসব কথার জবাবও তিনি সহজেই দিতে পারেন তথাকথিত মার্ক্সিসমের যাদুকাঠি যাঁর হাতে। চরম সত্য এবং একমাত্র নিখুঁত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিশক্তি যাঁদের বিশ্বাস, তাঁদের পক্ষে অবজ্ঞা ও বর্জননীতি স্বাভাবিক—হের ডুএরিঙের মতোই। তাছাড়া

'as in economics it is assumed that every consumer is a real specialist on all the commodities he has occasion to buy for his maintenance—so similar assumptions are now to be made in science.'

এঙ্গেলস্ এই মনোবৃত্তিকে বলেছেন শিশুরোগ। হাঁ-বা-না মার্কা ধর্মপরায়ণ এই ব্যক্তিদের কাছে স্বকীয় ইতি-ও-নেতির বাইরে সব কিছুই মন্দ, পাপবিদ্ধ, প্রতিক্রিয়াশীল, এমনকি 'ফ্যাসিবাদী'ও। তাঁরা ভুলে যান তাঁদের একেশ্বরাবেগে [illegible] [illegible] ও [illegible] বিভেদগুলির মূল্য আপেক্ষিক, যে তাঁদের কল্পিত ভাগাভাগির [illegible] এবং এক ও অদ্বিতীয় পুরুষার্থ তাঁদেরই মানসিক দান এবং একথা ভুললে [illegible] অচল।

এরকম বিস্মরণে বিপদ খুব বেশি, [illegible] [illegible] তাই বিবেচ্য, [illegible]

সাহিত্যে। রীতিমতো ধর্মেতিহাসেও দেখা যায় যে ঈশ্বরকে আত্মা বা সর্বস্বদানের চরম পরিণতি হচ্ছে অবাঙ্‌মনসোগোচরে যে অতীন্দ্রিয়তা, তাতে শিল্পসাহিত্যে যে গোচরেরই জয়গান তা বিধর্মের নামান্তর। যে পরিমাণে গির্জা বা মন্দির শিল্প ঐহিক, যে পরিমাণে কৈবল্যে আত্মদান অসম্পূর্ণ, সেই পরিমাণেই সেই শিল্পের প্রাণৈশ্বর্য, সেই সাহিত্যের প্রত্যক্ষ জীবনের উৎসে বারংবার প্রাণসংগ্রহ। রবীন্দ্ররচনাবলীতে আমরা দ্বৈতাদ্বৈতের আশ্চর্য সুন্দর প্রকাশ পাই।

পরোক্ষ মার্গে জীবনাভিজ্ঞাঘটিত কোনো ইস্‌থেটিক বা সংবেদ্য কর্মচর্চা ঐতিহাসিক বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়,এমনকি শিল্পবস্তু-বিশেষের উৎকর্ষও হয়তো তাতে তুলনায় ক্ষতিগ্রস্ত। তাই তো এঙ্গেলস্‌ লেখেন যে যবের চারা ও আনস্তিক কলন দুই-ই নেতির নেতিকরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এ জ্ঞান থাকলেও যবের চাষ বা অঙ্কের উত্তর সঠিক হয় না, তারের স্থূলতার পরিমাণে শব্দের ওজন কি তা জানলেও হয় না বেহালা বাজাবার ক্ষমতা। তাছাড়া চিরসত্য হয়তো অঙ্কে প্রযোজ্য কিন্তু ইতিহাসে বা জীবনের অভিজ্ঞায় সত্যকে হতে হয় বারবার আবিষ্কারে প্রত্যক্ষে প্রতিভাত। মানুষের ইতিহাসে যেমন কয়েকটা মোটা পুরুষার্থ প্রায় চরম মূল্য পেয়ে গেছে তেমনি আবার সে পুরুষার্থের বিশেষ রূপ ও প্রয়োগ কালনির্ভর—যদিও মানবিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান জীববিদ্যার চেয়েও পিছিয়ে আছে (এঙ্গেলস)।

সাহিত্যের পক্ষে আর একটা গৌণ বিপদ হচ্ছে এই জীবনে পুরুষার্থজড়িত ভাববিলাস। ভাববিলাস সর্বদাই বিপজ্জনক, অসংহৃত কল্পিত নৈঃসঙ্গ্যে বা শিল্পরচনার প্রয়োজনীয় অবকাশ বা নৈঃসঙ্গ্যহীন সঙ্ঘে যেখানেই হোক, কিন্তু তার বিপদ আরো বেশি, যখন তার পিছনে বিজ্ঞানের ছাপমারা সমর্থনের রং চড়ে। উদাহরণত সাহিতের একটা বড় উপজীব্য প্রেমই ধরা যাক। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর আলোচনা মনে পড়ছে। শ্রেণীহীন সমাজে শুনেছি সে গৌরবশশীর জন্যে কাতর কবিকে প্রলাপ কইতে হবে না, যেন শ্রেণীর বন্ধন উন্মোচিত হলেই বিশেষ নর-নারীর সম্বন্ধ-সমস্যা জলবৎ সহজ হয়ে যাবে, বা উঠবেই না। এই ধারণারই পরিণতি সেই প্রমাদ লেনিন যাকে বলেছিলেন জলের গ্লাসের মতবাদ। এই দৃষ্টিতেই বলা হয় যে ভবিষ্যৎ সমাজে বিবাহ বা বর্তমান বিপ্লবীর বিবাহ যৌনবিবাহ নয়, বৈপ্লবিক বিবাহ! কারণ ডুএরিঙের নির্দেশে প্রেমিককে হতে হবে অমানুষিক—

'The first thing that he must do is to cast off brutality and stupidity now rife in the sphere of sexual union and selection.'

এই একই কারণে তো শিল্পসাহিত্যজগতে এঁদের বর্জননীতির এত দৌরাত্ম্য, ডুএরিঙের মতোই। এদিকে মনে মনে ডুএরিঙের মতোই আছে বাক্‌প্রধান কবিগৌরব। অবশ্য মানিকবাবুরা বলতে পারেন যে তিনি শ্রেণীমুক্ত মানব-সমাজের কথাই ভাবেন ও বলেন, যেমন বুদ্ধদেববাবু শ্রেণীহীন ও সমাজহীন মানুষের কথা। কিন্তু শ্রেণীসমাজেও—

'there has been on the whole progress in morality, as in all other branches of human knowledge...we have not yet passed beyond class morality. A really human morality which transcends class antagonisms and their legacies in thought becomes possible only at a stage of society which has not only overcome class contradictions but has even forgotten them in practical life.'

তাছাড়া, প্রগতিবিচারেও রুচির ব্যক্তিগত সমস্যা থেকেই যায়, মায়াক-ফস্কির সেই উটের আর ঘোড়ার মতো :

উটের দিকে তাকায় ঘোড়া,
চেঁচিয়ে বলে, একি বেয়াড়া বাপমাছাড়া ঘোড়ারে !
উট এদিকে জানায়, তুমি তো ঘোড়া নও হে
তুমি চিম্‌সে উট বটে।

এক ঈশ্বর ছাড়া কেউই
নক্ষত্রখচিত এই বিরাট ভুবনে জানে না
যে এরা দুটি
স্বতন্ত্র ধরনের দুটি জীব।*

---

* দ্র. 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ', সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৫৯, পৃ.৫১-৬৫। এই প্রবন্ধটি চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাহিত্যপত্র'-র 'পুস্তক-পরিচয়' বিভাগে ১৩৫৫ সালের শ্রাবণ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়।—সম্পাদক

মার্কসবাদের নয়া ভাষ্য / নরহরি কবিরাজ

মার্কসবাদের শক্তি যতই বেড়েছে, মার্কসবাদের শত্রুরা ততই আক্রমণের নতুন নতুন কায়দা আবিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের সর্বশেষ কায়দা হলো মার্কসবাদের শিবিরে প্রবেশ করে মার্কসবাদের পুনর্বিচার বা সংশোধনের নামে মার্কসবাদ-বিরোধী অপ্রচার চালিয়ে যাওয়া। এদের ভূমিকা সম্পর্কে লেনিন বলেছেন—"এমনি ইতিহাসের ডায়লেকটিক্স যে মার্কসবাদের তত্ত্বগত শ্রেষ্ঠত্ব যতই স্পষ্ট হয়েছে, ততই এর শত্রুরা মার্কসবাদের নামাবলী গায়ে দিয়ে আত্ম-গোপন করেছে। .... এই সমাজতন্ত্র-নামধারী সুবিধাবাদের ভক্ত হয়েছে অনেক আইনসভার সভ্য, শ্রমিক-আন্দোলনের অনেক কর্মকর্তা এবং অনেক 'সহানুভূতিশীল' বুদ্ধিজীবী।" [Lenin : *The Historical Destiny of the Doctrin of Karl Marx*, Selected Works of Karl Marx, vol.1, P. 60-61.]

লেনিন শুধু এদের শ্রেণীচরিত্র ধরিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হন নি। তিনি বৈজ্ঞানিকের ভবিষ্যৎদৃষ্টি থেকে বলেছেন—যতই শ্রমিক-বিপ্লব আসন্ন হয়ে উঠবে, যতই সমস্যাগুলি আসন্ন বিপ্লবের মুহূর্তে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠবে, ততই এই তথাকথিত 'মার্কসবাদী'রা সক্রিয় হতে থাকবে এবং যুদ্ধের তীব্রতা যতই বাড়বে, ততই প্রয়োজন হবে বেছে নেওয়া—কে শত্রু, কে মিত্র, প্রয়োজন হবে তাদের বাদ দেওয়া—যারা কপট বন্ধু। শত্রুকে যদি অনিবার্য আঘাত হানতে হয়, তবে এই কাজগুলো একোবারে জরুরী। [Lenin : *Marxism & Revitionism*, Selected Works of Karl Marx, vol. 1, P. 57-58]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ধনতন্ত্রের সব চেয়ে সংকটময় মুহূর্ত সমাগত। শ্রমিক-বিপ্লবের বিজয়ভেরী আজ কেবল ইয়োরোপেই শোনা যায় না। শোনা যায় বর্মায়, মালয়ে, চীনে, ভারতেও। তাই আমাদের দেশেও আজ তথাকথিত 'মার্কসবাদী'রা সজাগ। শ্রমিক-আন্দোলনে, কৃষক-আন্দোলনে, সংস্কৃতি-আন্দোলনে সর্বত্রই তারা সক্রিয়। যুদ্ধক্ষেত্রের অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্ত যতই এগিয়ে

আসছে, ততই উপরোক্ত লেনিন-কথিত "সহানুভূতিশীল" বুদ্ধিজীবীরা কথার বাহুল্য ও তথাকথিত 'মার্কসবাদের' বাগাড়ম্বরকে শেষ সম্বল হিসাবে গ্রহণ করে সমাজতন্ত্র-নামধারী সুবিধাবাদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে।

মুখে মার্কসবাদের রামনাম অবিরত উচ্চারিত হতে থাকলেও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গা বাঁচাবার আগ্রহ ও বন্ধু-নির্বাচনের কৌশল থেকেই এই সব 'মার্কসবাদী'র শ্রেণীচরিত্র আজ অত্যন্ত প্রকট। 'না-বুর্জোয়া না-কমিউনিস্ট' তৃতীয়পক্ষ-সুলভ নিরপেক্ষতা হলো এই সব 'মার্কসবাদী'র ট্রেড-মার্ক। মার্কসবাদের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা বা মার্কসবাদের সংশোধন এই নিরপেক্ষতার তত্ত্বগত কৈফিয়ৎ। তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই তৃতীয়পক্ষ-নীতির প্রধান তত্ত্ববাগীশ ব্লুম বলেন—তিনি যে-সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, মার্কস ও জোরের ভাবধারার সমন্বয়ে তার উৎপত্তি। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই তৃতীয়পক্ষ-নীতির একজন প্রধান পাণ্ডা জাঁ পল সার্ত্র্ লেখেন —'মার্কসের মানুষ-সম্পর্কিত ধারণা' তাঁর ধারণারই সমগোত্রীয়, তাঁর আকাঙ্ক্ষা হলো—"আত্মকেন্দ্রিকতার দিক থেকে মার্কসবাদকে সম্পূর্ণ করে তোলা।"

ধনতন্ত্রের সংকট যেমন আজ এক আন্তর্জাতিক সংকট, তেমনি তার পরিত্রাণের এই তৃতীয়পক্ষ-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গীও আজ এক আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী। আমাদের দেশে সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই "তৃতীয়পক্ষ-নীতির" প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন 'সাহিত্যপত্র'। (তবে 'সাহিত্যপত্র' একেবারে একা নন, শ্রেণীগতভাবে তাঁদের স্বজন-মহল থেকে ক্রমশই ধ্বনিত হচ্ছে 'সাহিত্যপত্র'-র 'থিওরেটিসিয়ান'কে ধন্যবাদের আড়ম্বর ঘোষণা—'ক্রান্তি', শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫, ত্রিদিব চৌধুরী লিখিত 'সাহিত্য-বিচারে মার্কসবাদ' দ্রষ্টব্য)। 'সাহিত্যপত্র' একদিকে বুর্জোয়া ভাববাদী বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে, আর একদিকে 'পরিচয়' ও 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের' "যান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর" বিরুদ্ধে। উপরোক্ত ব্লুম বা সার্ত্র-এর পথকে অনুসরণ করে 'সাহিত্যপত্র'-র 'থিওরেটিসিয়ান'ও তাই মার্কস ও এলিয়টের দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ে বাংলা সাহিত্যের সমাজতান্ত্রিক সমালোচনার উৎস খোঁজেন! তাই 'সাহিত্যপত্র'-র যুগান্তকারী আবিষ্কার—"এলিয়টের কাব্যের মুক্তিতে সাম্যবাদীর আরম্ভ যদিও হয়তো সে সত্য তিনি জানেন না বা মানেন না, অজ্ঞাতসারেই এলিয়টের সমালোচনার মার্কস অঙ্গীকৃত" ('সাহিত্যপত্র', শারদীয়া সংখ্যা, 'টি.এস. এলিয়ট' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। মার্কস ও এলিয়টের জীবনদর্শনের বৈপ্লবিক সম্পর্ক আবিষ্কারের পর

এঙ্গেলসের বিষয়বস্তু-সর্বস্বতা বা আঙ্গিক-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে সতর্কবাণীকে বিকৃত করে 'সাহিত্যপত্র' নতুন "মার্কসীয়" কানুন পত্তন করেন—নন্দনতত্ত্বে বা শিল্প-সাহিত্য বিচারে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর মধ্যে আঙ্গিকের প্রাধান্যই হলো মুখ্য বিচার। অর্থাৎ এই বিধানকে স্বীকার করে নিলে দাঁড়ায়—এঙ্গেলসের নির্দেশ অনুসারে আমাদের হতে হবে আর্টের ক্ষেত্রে ফরম্যালিজম্-এ বিশ্বাসী, 'বিশুদ্ধ সাহিত্যের' দরদী। এইভাবেই তৃতীয়পক্ষাভিমানী বুদ্ধিজীবীরা আজ মার্কসবাদকে 'সংশোধন' করে তাদের কলুষিত জীবনবোধের হাতিয়ার হিসাবে একে ব্যবহারের চেষ্টা করে।

শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ে 'সাহিত্যপত্র'-র অবশ্যই একটা বক্তব্য থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের আপত্তি সেইখানে যেখানে তাঁরা ফতোয়া জারি করেন—'শিল্প-বিচারে কোনো পার্টি-লাইন বা মার্কসীয় নিয়মকানুন প্রযোজ্য নয়।' এইভাবে মনগড়া থিওরি দিয়ে তাঁরা একদিকে মার্কসবাদের মুখ বন্ধ করতে চান, অপর দিকে সাহিত্যে নিজেদের শ্রেণীগত স্বেচ্ছাচারের অনধিকারকে অব্যাহত রাখতে চান।

বলাই বাহুল্য, 'সাহিত্যপত্র'-র এই 'মার্কসবাদ' বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর মনগড়া মার্কসবাদ, এই মার্কসবাদ লেনিন-স্টালিন, জ্দানভ বা কডওয়েলের মার্কসবাদ নয়। মার্কসবাদ সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপরোক্ত শ্রেণীগত স্বেচ্ছাচারকে বরদাস্ত করে না, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে পার্টি-লাইনের নির্দেশে সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করে। কিন্তু তাই বলে মার্কসবাদ শিল্প ও সাহিত্যকে রাজনৈতিক প্রচারপত্রে পরিণত করার ঘোর বিরোধী। মার্কসবাদী চান শিল্প ও রাজনীতি, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের ঐক্য। সেইজন্যই মার্কসবাদ মনে করে —ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সাহিত্যের দারিদ্র্য যেমন তার আঙ্গিক-সর্বস্বতায়, তেমনি আঙ্গিককে একেবারে অবহেলা করে কেবল মাত্র বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপকে মার্কসবাদ যান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টি ব'লে নিন্দা করে (আঙ্গিক-বিষয়বস্তুর সম্পর্ক সম্বন্ধে এঙ্গেলসের বক্তব্য এই দৃষ্টিতে বিচার্য)। এক কথায় মার্কসবাদীরা নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেন না। তবে তাঁরা মনে করেন—রসসৃষ্টি ও রাজনৈতির কাজের মধ্যে কোনো কৃত্রিম ব্যবধান নেই। শিল্পী ও জনসাধারণের একই শিল্প-সৃষ্টি দ্বারা অভিভূত হওয়ার শক্তি ও সম্ভাবনা আছে।

(এই প্রসঙ্গে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ কংগ্রেসে লোরঁ কাসানভা কর্তৃক উপস্থাপিত শিল্প-বিষয়ক রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।

'সাহিত্যপত্র'-র স্বেচ্ছাচারপ্রিয়তার কয়েকটি নমুনা দিলেই তাঁদের উদ্দেশ্য বোঝা যাবে। দেখা যাবে—ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সাহিত্যের নেতাদের মুখে মুখে আজ আত্মপক্ষ সমর্থনের যেসব বাঁধা বুলি, সেই বুলিই 'সাহিত্যপত্রে'-র ঠোঁটেও। প্রথমেই চোখে পড়ে 'সাহিত্যপত্রে'-র রাজনীতি ও মতবাদের প্রতি বিতৃষ্ণা। এবং এই দিক থেকে'সাহিত্যপত্র'শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু-র 'কবিতা'-র সঙ্গে একেবারে সমগোত্রীয়। 'সাহিত্যপত্র' বলেন—"সাহিত্য সমালোচনায় বিশেষ বিশেষ রাজনীতির স্বকপোলপ্রযুক্ত মতবাদের……মানদণ্ড পরিচালনা দেখে (তাঁরা) কমবেশী বিমূঢ়।" তাছাড়া তাঁরা মনে করেন—মতবাদের উগ্রতা "সাহিত্যের স্বাধীনতার প্রতিকূল।" 'কবিতা' ও অভিযোগ করেন—"দেশের সবকটি পোলিটিক্যাল পার্টি সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক একটি ফ্রণ্ট খুলেছে" এবং আক্ষেপ করেন—"কোনো মতবাদের দাসত্ব স্বীকার করলে শক্তিশালী কবিরও অপমৃত্যু ঘটে।" উদাহরণ হিসাবে তাঁরা দেখিয়েছেন সুকান্তকে ('কবিতা', আষাঢ়, ১৩৫৪)। 'সাহিত্যপত্র' ও 'কবিতা'য় এই আলিঙ্গন আকস্মিক নয়, প্রায় প্রতিটি মূলসূত্রেই রয়েছে এই মিলন-মন্ত্রের মায়াজাল। নন্দনতত্ত্বের দিক থেকেও এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে আছে অদ্ভুত মিল। 'কবিতা' অনেকদিন থেকে প্রচার করেন—আর্টের জন্য আর্ট বা সৌন্দর্যের জন্য সৌন্দর্য। 'সাহিত্যপত্র'ও বলেন—"সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রথম পরীক্ষাতেই প্রয়োজন ···· নিছক সৌন্দর্যের চেতনা।" সংঘ বা সমষ্টির প্রতি বৈরাগ্য-বিষয়েও উভয়ের সাহিত্যিক নিষ্ঠা একেবারেই তুল্যমূল্য। 'কবিতা' আক্ষেপ করেন কিভাবে"যুগের কাছে ব্যক্তির সর্বস্ব সমর্পণের সমীকরণে" কবিত্বের কুঁড়ি ধরেই ঝরে যাচ্ছে অথবা "একটি কঠিন, সংকীর্ণ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ" কিভাবে সাহিত্যিকের "হৃদয়ের স্বাভাবিক উন্মুখতার সঙ্গে পদে পদে দাঙ্গা বাধিয়ে" ফিরছে। 'কবিতা'-র নির্ভুল প্রেমিস থেকে 'সাহিত্যপত্র' তাই মন্তব্য করেন—"শিল্প-সাহিত্য রচনায় আজও……ব্যক্তিরচয়িতাই প্রাথমিক।" এবং কাজে কাজেই "শিল্প-রচনার প্রয়োজনীয় অবকাশ বা নৈঃসঙ্গ্যহীন সঙ্ঘে··· বিজ্ঞানের ছাপমার সত্ত্বেও" শিল্প-সাহিত্যের অপমৃত্যু অনিবার্য। কাজেই দেখা যাচ্ছে 'সাহিত্যপত্রে'-র মার্কসবাদ 'কবিতা'-র বিশুদ্ধ সাহিত্যবাদেরই এক গিল্টি করা সংস্করণ।

বলাই বাহুল্য, লেনিনের মার্কসবাদ বা জ্‌দানভের মার্কসবাদ, সাহিত্য-বিষয়ে 'সাহিত্যপত্রে'-র এই সুবিধাবাদী 'মার্কসবাদে'র চেহারা নগ্নভাবে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় সাহিত্যিক পঞ্চম বাহিনীরা কিছুদিন আগে একটু সক্রিয় হয়ে ওঠে। এদের পুরোধা ছিলেন জসচেঙ্কো ও তাঁর সমধর্মীরা। জসচেঙ্কো বল্লেন—"আজকাল বলা হয় লেখকের একটা মতবাদ থাকার প্রয়োজন। কথাটা আমার কাছে মনে হয় একটা অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে—আমি কোন রাজনৈতিক দলের লোক, তাহলে আমি বলব—আমি রাজনীতির ঊর্ধ্বে।" [Zdhanov : *Tasks of S viet Writers* নামক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৪]।

সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি 'সাহিত্যের স্বাধীনতার' জন্য এই আক্ষেপকে মানবতা-বিরোধী, সোভিয়েট-বিরোধী ও মার্কসবাদ-বিরোধী বলে রায় দিয়েছে। জসচেঙ্কো ও তাঁর বন্ধুদের সমালোচনার প্রসঙ্গে জ্‌দানভ মন্তব্য করেন—মতবাদের শূন্যচারিতা বা দারিদ্র্য সোভিয়েট সাহিত্যের পরিপন্থী; বিষয়-বস্তুকে অবহেলা করে সুন্দর থেকে সুন্দরতর আঙ্গিকের পিছনে ছুটে চলা এবং বিশুদ্ধ সাহিত্যের নামে উদ্দেশ্যহীনতার প্রশ্রয় দেওয়া ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সাহিত্যের লক্ষণ। এই প্রসঙ্গে লেনিনের বিখ্যাত 'পার্টিগত সাহিত্যের' নীতি উদ্ধৃত করে তিনি দেখান—"সাহিত্য শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের ঊর্ধ্বে কোনো ব্যক্তিবিশেষের বা কোনো উপদলের লাভের যন্ত্র হতে পারে না অথবা শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থের হাতিয়ার হতে পারে না।" [ঐ বই]। লেনিনের এই পার্টিগত সাহিত্যের নীতিকে আরও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মাও সে-তুঙ লিখেছেন—"আজকের দুনিয়ায় সর্বপ্রকার সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্যই বিশেষ বিশেষ সামাজিক শ্রেণী এবং বিশেষ বিশেষ দলের সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক ধারা ওরা অনুসরণ করে চলে। আর্টের জন্যই আর্ট, সামাজিক শ্রেণী-নিরপেক্ষ আর্ট, রাজনীতির সঙ্গে সমান্তরাল অথবা রাজনীতি-শূন্য আর্ট বলে আসলে কিছু নেই, এবং যে কারণে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে—যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বর্তমান—আর্ট শ্রেণীস্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য, ঠিক সেই কারণেই যে বিশেষ শ্রেণী ও দলের বিপ্লবকালে একটি বিশিষ্ট দলের বৈপ্লবিক ভূমিকা রয়েছে, আর্টকে অবশ্যই সেই শ্রেণী ও সেই দলের রাজনৈতিক দাবী দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে হবে।" [মাও সে-তুঙ, 'সাহিত্য-কথা,' পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৫৫]।

বস্তুত 'সাহিত্যপত্রে'রও রাজনীতি আছে এবং এই রাজনীতির আবেগে মার্কস-এঙ্গেলসের বড় বড় উদ্ধৃতি বুকে বেঁধে তাঁদের যেমন সোভিয়েটের সর্ব-শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী নেতৃত্বের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করতে একটুও বাধে না, তেমনি বাধে না অস্বীকার করতে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাহিত্য-বিষয়ক নির্দেশকে। কিছুদিন আগে ফ্রান্সে মার্কসবাদে বিশ্বাসী সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মধ্যে সাহিত্য ও শিল্প-বিষয়ে মার্কসীয় নীতি সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দেয়। কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী গারোদি বা এরভের নেতৃত্বে সাহিত্যকে পার্টি 'ডিক্টেশন' থেকে উর্ধ্বে রাখার দাবী জানান। ফরাসী দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মার্কস-বাদী নেতৃত্ব এই মতবাদকে বুর্জোয়া চিন্তাধারার জের ব'লে অভিহিত করেন এবং এই ধারণাকে মার্কসবাদ-বিরোধী বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 'সাহিত্যপত্র' ও তাঁদের বুর্জোয়া প্রভুরা হয়তো খুশি হতেন যদি গারোদি ও এরভে টিটোর পথ বেছে নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করতেন, কিন্তু তাঁরা ঐ নির্দেশকে অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 'সাহিত্যপত্র' এরভে ও গারোদির এই মত-পরিবর্তনকে সযত্নে চেপে গিয়ে তাঁদের পূর্বমতকে প্রচার করতে কেন এত উৎসাহী, তা দুর্নীতিপরায়ণ বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের যাঁরা চেনেন তাঁদের বুঝতে কষ্ট হবে না।

বুর্জোয়া সাহিত্যিক ও শিল্পীরা সাহিত্যের শ্রেণীচরিত্রে বিশ্বাস করেন না। এইজন্যই তাঁদের চোখে "দ্বন্দ্ব ও সুরের বিভেদগুলির মূল্য আপেক্ষিক।" একই কারণে শ্রেণী ও সংগ্রামের বৃহত্তর ইতিহাস থেকে সম্পর্কচ্যুত করে শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসকে এক শ্রেণী-নিরপেক্ষ রূপদান করার প্রবণতা এঁদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সাহিত্যের একজন প্রধান পাণ্ডা সার্ত্র এইজন্যই তাঁর সৃষ্ট মানুষকে ইতিহাস থেকে বিশ্লিষ্ট করে দেখতে চান। এঁরা মার্কসবাদের অপব্যাখ্যা করে প্রচার করেন—মার্কসবাদীরা ইতিহাসের নামে শ্রেণীসংগ্রামের হাতুড়ি দিয়ে সাহিত্যকে বিচার করে, তারা তার মধ্যে খোঁজে তাদের রাজনীতি ও অর্থনীতির পার্টি-নির্দিষ্ট ফরমূলা, মানুষকে পরিণত করে কতকগুলো অন্ধ যান্ত্রিক শক্তির ক্রীড়নকে। বুদ্ধদেব বসু একবার সুকান্তের কবিতা নিয়ে সমা-লোচনায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁদের সাগর পারের মনিবদের এই ধারণার প্রতিধ্বনি করেন। তিনি অভিযোগ করেন, সুকান্তের কবিতাগুলি "যেন (কমিউনিস্ট) মতবাদের চিত্রণ মাত্র, জোর গলায় চেঁচিয়ে বলা, কবিতা না হয়ে খবরের কাগজের

প্যারাগ্রাফ হলেই যেন মানাতো" ('কবিতা', আশ্বিন, ১৩৫৪)। সুকান্ত যেভাবে "ললিত পদাবলীতে গদ্যের হাতুড়িকে আহ্বান" করত, তাতেই তাঁরা দেখতেন রাজনীতির ফরমাস। 'সাহিত্যপত্র'ও এই শ্রেণী-নির্দিষ্ট "কল্পিত ভাগাভাগির কাঠিন্যে" রীতিমতো ক্ষুব্ধ, তাই তাঁরাও মার্কসবাদী সাহিত্য-বিচারের বিরুদ্ধে কুৎসার তুবড়ি ছোটান। তাঁরা প্রচার করেন—মার্কসবাদী সমালোচকরা "কবিতায় চান গল্প, গল্পে চান সংবাদ, রাজনীতির কর্মক্ষেত্রের বিবেচ্য করেন প্রাথমিক দাবি গল্প-বিচারে, অর্থনীতির তত্ত্বের বর্ষফল খোঁজেন কাব্যের মিলে, আমাদের সমাজের জীবনের মনোলৌল্যে খোঁজেন সোভিয়েট সমাজের প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা।"১ এইভাবেই মিথ্যার জাল বুনে অথবা সত্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের আপ্রাণ প্রয়াস। এটাই হলো কোয়েস্লারী রীতি।

'সাহিত্যপত্র' গারোদি-ভক্ত। কিন্তু 'স্বদেশের' সামাজিক জীবনের মনোলৌল্যে গারোদি তাঁর 'ভক্ত'দের মতো দিশেহারা নন। তিনি এই মনোলৌল্যের ছবি এঁকেছেন তাঁর 'কবরখানার সাহিত্য' নামক পুস্তিকায় এবং সজোরে ঘোষণা করেছেন এই মনোলৌল্যে ফ্রান্সের পরিচয় নয়।

"ফ্রান্সে আছে আর এক ফ্রান্স"—যে ফ্রান্স ব্যারিকেডের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করে চলেছে বুর্জোয়া দস্যুর বিরুদ্ধে কারখানার মেশিন-টুল হাতে নিয়ে, ল্যাবরেটরিতে ফরমূলার সাহায্যে এবং ক্ষেত-খামারে হাতে লাঙল ধরে। তিনি আরও বলেন—সংগ্রামী মানুষের এই জীবনধারা থেকে লেখক ও শিল্পী নির্বাচন করবেন তাঁদের রচনার নতুন উপাদান। এই প্রসঙ্গে তিনি উপস্থাপিত করেন শিল্প-বিষয়ে মার্কসবাদীর দৃষ্টিভঙ্গীকে। তিনি লেখেন—"The artist's choice has a class significance, it is not determined by literary or technical reasons"—লেখক বাস্তব অবস্থার কোনো একটি দিককে তাঁর রচনায় রূপায়িত করেন, তিনি হয় বিশ্বাস করেন সেই বাস্তবতাকে যা কলুষিত ও মরণশীল, অথবা সেই বাস্তবতা যা জীবন-মুখর ও বিকাশোন্মুখ। [Roger Garaudy : *Literature of the Graveyard*. P. 60-66]

'সাহিত্যপত্র' ভুলে যান যে ভারতবর্ষেও আছে আর এক ভারতবর্ষ, যেখানে

১. দ্র. বিষ্ণু দে, 'রাজায়-রাজায়', বর্তমান খণ্ড, পৃ. ৩৯৫।—সম্পাদক

মানুষ সোভিয়েটের আদর্শে নতুন জীবন রচনার স্পন্দনে প্রাণচঞ্চল। বুর্জোয়াদের বাঁশ-বনে 'সাহিত্যপত্র' ডোম-কানা। কাজেই তাঁদের কাছে 'ভারতীয়' জীবনের মনোলৌল্যই একমাত্র বাস্তবতা।

বুর্জোয়া সাহিত্যিকরা আজ তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর দেউলিয়াপনা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। এই জন্যই তাঁদের মার্কস-এঙ্গেলস্ ভক্তির শপথ নিতে হয় বারবার। তাঁদের বুর্জোয়া দাসত্ববৃত্তির তাঁরা সমর্থন খোঁজেন মার্কস-এঙ্গেলসের উদ্ধৃতির বিকৃত বিচারে। এঙ্গেলস বালজাকের সাহিত্য-সৃষ্টির বিচার প্রসঙ্গে একবার মন্তব্য করেন—বালজাক রাজনীতিক্ষেত্রে ফরাসী রাজতন্ত্রের সমর্থক হলেও তাঁর কাব্য-সৃষ্টিতে নিজেরই সহানুভূতি ও রাজনৈতিক পক্ষপাতের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, ভবিষ্যতের প্রকৃত মানুষ যারা, তারা যে তখন কোথায়, তা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। এইজন্যই এই সাহিত্যকে এঙ্গেলস বস্তুনিষ্ঠার এক বিরাট গৌরবমণ্ডিত নিদর্শন বলে অভিনন্দন জানান। 'সাহিত্যপত্র' এঙ্গেলসের এই উক্তির কদর্থ করে আবদার জানান—তাঁদের কাব্যের যে আপাত-বৈপরীত্য তার প্রতি এঙ্গেলসের এই নির্দেশ অনুসারে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হোক। তাঁরা পণ্ডিতি ঢঙে ফতোয়া জারি করেন—"যে স্তরে জীবনের রূপান্তর,সে রূপান্তরের স্তরে অনেক সময় এসে যায় আপাত-বৈপরীত্য।" কিন্তু তাঁদের মূল প্রতিজ্ঞায় এক বিরাট ভুল রয়ে গেছে। আজ পৃথিবী জীবনের রূপান্তরের স্তরকে অতিক্রম করে অনেক দেশে নতুন জীবনের বনিয়াদ ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে এবং অন্যত্রও এই ভবিষ্যতাভাস এত স্পষ্ট যে আপাত-বৈপরীত্যের সুযোগ আজ আর নেই বললেই চলে। আজকে লেখকের যদি চোখ থাকে, তবে তার সামনে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত। দ্বিতীয়ত, এই আপাত-বৈপরীত্যের থিওরাকে সামনে রেখে 'সাহিত্যপত্র' যাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর অভিনন্দনযোগ্য ব'লে রায় দেন, তাঁরা হলেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এলিয়ট ও জাতীয় ক্ষেত্রে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। এলিয়টের ক্যাথলিক মতবাদ সত্ত্বেও এবং অচিন্ত্যকুমারের হাকিম হওয়া সত্ত্বেও যদি তাঁদের সাহিত্যে বিকাশোন্মুখ জীবনের অঙ্গীকার থাকত, তবে আমরা নিশ্চই তাঁদের অভিনন্দন জানাতাম। কিন্তু আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, অচিন্ত্যকুমারের কাব্যে শ্রমিক-কৃষকদের আমরা দেখেছি মৃত জীবনের মন্ত্র জপ করতে; অচিন্ত্যকুমারকে আমরা দেখেছি বুর্জোয়া আদালতের হাকিম-সুলভ উদ্দেশ্যহীনতা নিয়ে, শ্রমিক-কৃষকের

জীবন নিয়ে পুতুল নাচের আসর জমাতে। আর যে এলিয়টের মধ্যে 'সাহিত্য-পত্র' দেখেন "জীবনের অঙ্গীকারের স্পষ্ট ছন্দ", সেই এলিয়টকেই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদীরা আখ্যা দেন বুর্জোয়া ক্ষয়িষ্ণুতার চারণ-কবি বলে। সেই এলিয়টকেই ব্রাসলাভ-সম্মেলনের বেদী থেকে সোভিয়েট লেখকদের প্রতিনিধি ফাদাইয়েভ তুলনা করেন সাহিত্য-ক্ষেত্রে হায়েনা ও শৃগালের সঙ্গে। আসলে,অচিন্ত্য-এলিয়ট-'সাহিত্যপত্রে'র আপাত-বৈপরীত্যই শুধু আমাদের চোখে পড়ে না, তাঁরা রাজনীতির দিক থেকে ধনতন্ত্রবাদী, সাহিত্যের দিক থেকে বুর্জোয়া ক্ষয়িষ্ণুতারও উপাসক। আপাত-বৈপরীত্যের শ্লোগানটা সাহিত্যরসিক জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য 'সাহিত্যপত্রের' একটা কৌশল মাত্র।

এই জন্যই দেখি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাহিত্যের হায়েনা ও শৃগালের এদেশী দরদীরা কমিউনিস্ট-বিরোধী কুৎসা রটনায় এত বেশী পঞ্চমুখ। তাঁরা নেহেরু-সুলভ 'জাতীয়' শোভিনিস্টের দৃষ্টিতে বলেন—কমিউনিস্টরা ভাবে "বাঙালী ও সোভিয়েট মন একই ছন্দে চলেছে।" জয়প্রকাশ নারায়ণ থেকে সুবোধ ঘোষ, বনফুল, সজনী দাস, ঐ এক কথাই বলে। 'সাহিত্যপত্র'ও যে ওই বুলি ধরেছে, এর থেকে বোঝা যায় কাদের সঙ্গে তার আত্মিক যোগাযোগ। কমিউনিস্ট জীবনদৃষ্টিকে ব্যঙ্গ করে তাঁরা লেখেন—"শ্রেণীহীন সমাজে শুনেছি গৌরবশশীর জন্যে কাতর কবিকে প্রলাপ করতে হবে না।" কমিউনিস্টদের জীবনবোধকে উপহাস করে তাঁরা বলেন—"বর্তমান বিপ্লবীর বিবাহ যৌন-বিবাহ নয়, বৈপ্লবিক বিবাহ।" 'সাহিত্যপত্রে'র এই কুৎসিৎ স্থূল রসিকতা 'হোরাইজন' বা 'নিউ রাইটিং'-এর কমিউনিস্ট-বিরোধী সাহিত্য-সৃষ্টির যে তৃতীয়পক্ষ-সুলভ নিরপেক্ষ সংস্করণ—তা বুঝতে আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর আজ আর বাকি নেই।

আঁরি বারবুস একবার বলেছিলেন—"The golden mean is reaction hiding its face"—'সাহিত্যপত্রে'-র 'না-বুর্জোয়া না-কমিউনিস্ট' তৃতীয় পন্থাও যে বুর্জোয়া দক্ষিণপন্থারই এক ছদ্মবেশ তা উপরের বিভিন্ন উদাহরণ থেকেই পাঠকগোষ্ঠী অনুধাবন করতে পারবেন। শ্রেণী-সৌহার্দ্যে বিশ্বাস ও শ্রেণী-সংগ্রামে আতঙ্ক এই ছদ্মবেশী দক্ষিণপন্থী সহানুভূতির মূল পরিচয়। সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীর বলিষ্ঠ জীবনধারার চেতনা সুকান্ত-কাব্যকে যে বিপুল জনপ্রিয়তা দিয়েছে, তাতে 'সাহিত্যপত্র' 'কবিতা'র মতোই অসন্তুষ্ট। বুদ্ধদেব বসু-র মতোই 'সাহিত্যপত্র'ও ভাবেন—সুকান্তের এই

জনপ্রিয়তা "সঙ্ঘবদ্ধ অতিকথন"-এর অথবা পার্টি প্রোপ্যাগাণ্ডার ফল। বলাই বাহুল্য, 'সাহিত্যপত্রে'র জনসাধারণ সম্পর্কে ধারণা শ্রমিকশ্রেণীর ধারণা থেকে একেবারেই আলাদা। বুর্জোয়াশ্রেণীর 'People'-ই 'সাহিত্যপত্রে'র People, সেইজন্য 'সাহিত্যপত্রে'র 'থিওরিটিসিয়ান' নিবেদন করেন—"বুদ্ধদেবাবুর সাহিত্য-সৃষ্টি আমাদের শ্রদ্ধার বস্তু · আমি জানি তাঁর শিল্প-প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা।"অর্থাৎ বুদ্ধদেববাবুরা যে 'জনসাধারণের' মধ্যে জনপ্রিয়, সেই 'জনসাধারণ'ই হলো 'সাহিত্যপত্রের'ও ভরসাস্থল।

সাহিত্য-সৃষ্টির দিক থেকেও 'সাহিত্যপত্রে'র বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির 'শিল্প-প্রতিষ্ঠা'র প্রতি গভীর শ্রদ্ধাও মোটেই আকস্মিক নয়। শ্রেণী-সংগ্রামে বিতৃষ্ণা ও বিশুদ্ধ সাহিত্যে বিশ্বাস এঁদের ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সাহিত্যের "দীর্ঘ সাহিত্যিক নিষ্ঠা"র উপর দরদী করে তুলেছে। এবং এই দরদের সূত্র ধরেই 'সাহিত্যপত্র' বুদ্ধদেববাবুদের মার্কসবাদী সাহিত্যাদর্শকে সাহিত্যের যান্ত্রিক সমালোচনা ব'লে উপহাস করার অভ্যাসকে "সশ্রদ্ধ বিবেচনার যোগ্য' ব'লে বায় দেন। মার্কসবাদী সাহিত্যাদর্শের প্রতি 'সাহিত্যপত্রে'র এই আন্তরিক বিদ্বেষের কারণ খুবই অনুমেয়। এই বিতৃষ্ণা এইজন্য যে—জনস্বার্থ-বিরোধিতার জন্য কুখ্যাত "সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও গদ্য বিষয়ে বুদ্ধদেববাবু এতকাল পরে····· অনীহা ও অশ্রদ্ধা দূর করতে" পারলেও এদেশের মার্কসবাদীরা এখনও তা পারেন নি। এই বিতৃষ্ণা এইজন্য যে—শ্রেণী-সৌহার্দ্য ও প্রাচ্য অধ্যাত্ম-বাদের মূল গায়েন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃহৎ জীবনবোধ'কে 'সাহিত্য-পত্র' তারিফ করেন, কিন্তু তাঁরা করেন না। সাহিত্যে পার্টি-নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে অথবা সাহিত্যিকের স্বাধীনতার জন্য 'সাহিত্যপত্র' যখন ক্রন্দনের রোল তোলেন, তখন আসলে তাঁরা চান ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সাহিত্যের বিদেশী ও স্বদেশী পুরোধাদের পক্ষে ওকালতি করার স্বাধীনতা।

বলাই বাহুল্য, মার্কসবাদী সাহিত্য-সৃষ্টি স্বাধীনতার নামে সাহিত্যিকের এই শ্রেণী-নিরপেক্ষ, জনগণ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীকে কিছুতেই বরদাস্ত করে না। জনসাধারণের সংগ্রামী চেতনার প্রতি উদাসীন এই ধরনের সাহিত্যসেবীরা যে বিপ্লবের মুহূর্তে বিঘ্ন-স্বরূপ, তা মার্কসবাদীরা জানে। তাই তো মাও সে-তুঙ্ এই ধরনের লোকদের সম্পর্কে লেখেন—"বিশেষ এক ধরনের লোক আছে জনগণের স্বার্থ-বিষয়ে কোনো প্রকৃত আগ্রহ যাদের নাই, যারা জনগণের সংগ্রাম

ও বিজয়কে কেবলমাত্র উদাসীন দর্শকের দৃষ্টিতেই দেখে থাকে ; তারা শুধু নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। নিজেদের বা তাদের প্রিয়পাত্রদের অথবা নিজ নিজ মহলের কতিপয় ব্যক্তিবিশেষের হাজার জয়গান করেও তারা কখনও ক্লান্তি বোধ করে না। বিপ্লবী জনগণের গুণপনার জয়গান করবার কোনো অভিপ্রায়ই অবশ্য এ-হেন পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের নাই। এরা সব বিপ্লবীদের পরগাছা মাত্র। এদের বাদ দিলে বিপ্লবের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।" [মাও সে-তুঙ্, 'সাহিত্য-কথা', পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৫৫]।*

* পরিচয়, বৈশাখ ১৩৫৬, পৃ. ৬০৩-৬১৩। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজনমতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক।

প্রগতি-সাহিত্যের শিবিরে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রভাবের বিরুদ্ধে / অনিল কাঞ্জিলাল

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে দু'টি পরস্পরবিরোধী শ্রেণীর দ্বন্দ্বই ইতিহাসে গতির আবেগ। সমাজের ইতিহাস মানেই এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের ইতিহাস। 'সমগ্র লিখিত ইতিহাস' অর্থাৎ "আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গিয়েছে তাদের সকলেরই ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।"*

মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাসেও দুটো ধারা চলে আসছে প্রথমাবধি। একটি ধারা প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা; আর একটি ধারা প্রগতিশীল শ্রেণীর সংস্কৃতির ধারা। বাস্তব জীবনে যে-শ্রেণীসংগ্রাম, বাস্তব জীবনের আশ্রয়ে বিকশিত সংস্কৃতিলোকেও সেই শ্রেণীসংগ্রাম। প্রত্যেক যুগের সমাজেই যেমন দুটো বিভিন্ন শ্রেণীশক্তির সাক্ষাৎ মেলে, প্রত্যেক যুগের সংস্কৃতিতেও তেমনি দুটো বিভিন্ন ধারা দেখতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতির ইতিহাস তাই শ্রেণীসংগ্রামেব ইতিহাসের পটভূমিতেই বিচার করতে হয়।

আজকের প্রগতিশীল শ্রেণীর সংগ্রাম অতীতের প্রগতিশীল শ্রেণীর সংগ্রামেব উত্তরাধিকারী (কিন্তু পুনরাবর্তন মাত্র নয়)। সমগ্র অতীত সংস্কৃতির, অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর সংস্কৃতিরও উত্তরাধিকারী নয়। আজকের প্রগতিশীল শক্তিকে অগ্রসর হতে হবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এই নিরবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসংগ্রামের প্রক্রিয়ায় প্রগতিশীল সংস্কৃতির অভ্যুদয় হবে।

প্রগতিশীল সংস্কৃতির কারুকর্মী প্রগতির শিবিরের সৈনিক, শ্রেণীসংগ্রামের সৈনিক। ধনশক্তিশালী বুর্জোয়াশ্রেণীর ভাবাদর্শ বা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাকে অগ্রসর হতে হবে। সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সে খুঁজে পাবে অতীতের প্রগতিশীল সংস্কৃতির মধ্যে (সমগ্র অতীত সংস্কৃতির মধ্যে প্রগতিশীল যে-ধারা কেবল তার মধ্যে), আর নয়া সংস্কৃতি সৃষ্টির উপাদান সে খুঁজে পাবে বর্তমানের শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে। (এবং এই উপাদান, এই নির্ধারণ করবে তার নিজস্ব সুসংগত রূপ বা আধার)।

*'কমিউনিস্ট ইশতেহার', মস্কো সংস্করণ, পৃ. ৪০।

বিনা সংগ্রামে প্রগতি অসম্ভব, সৃষ্টি অসম্ভব। পথের বাধা নির্মূল করে এগিয়ে যেতে হবে। আগাছা-পরগাছার পুঞ্জিত জঞ্জালের শেষ জড় পর্যন্ত নিঃশেষে উপড়ে ফেলে নতুন সারে পরিপুষ্ট নিষ্কলুষ মাটিতে নতুন ফসল ফলাতে হবে। আগাছার শিকড় রেখে যতই বীজ ছড়ানো হোক না কেন জমিতে, শস্য ফলবে না কিছুতেই। অঙ্কুর যদিও-বা গজায়, আগাছার চাপে অকালেই তার অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। প্রতিক্রিয়ার ঐতিহ্যের জড় রেখে বিপ্লবী সংস্কৃতির ফসল ফলানো অসম্ভব। জমিতে ফসল ফলাবার প্রাথমিক প্রস্তুতিই হচ্ছে জমি চাষ করা, আগাছা নির্মূল করা। বর্তমানকালে বিপ্লবী সংস্কৃতি-রূপ নতুন ফসল সৃষ্টির প্রাথমিক প্রস্তুতি হচ্ছে বর্তমানকালের আগাছা-রূপ প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির (সংস্কৃতি নামে আসলে যা দুষ্কৃতি) জড় নির্মূল করা, ক্ষেত্র পরিষ্কার তৈরী করা। প্রগতির শিবিরের সৈনিককে, প্রগতিশীল লেখক-শিল্পীকে আজ জনস্বার্থদ্রোহী শত্রুশ্রেণীর ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। এই আক্রমণ চালাতে হবে যুগপৎ দুই দিকে—বাইরে ও ভিতরে। বাইরে সাক্ষাৎ শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ, আর ভিতরে নিজের শিবিরের মধ্যে শত্রুর গুপ্তচরের বিরুদ্ধে আক্রমণ।

ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশে এই শত্রু হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় বড় বড় বুর্জোয়া ও সামন্তশক্তির দুষ্টচক্র। সামন্ততান্ত্রিক সংস্কার ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ এই চক্রের প্রহরণ—বিশেষ করে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ আজ সাম্রাজ্যবাদের হাতে জাতীয় নির্যাতনের মুখ্য হাতিয়ার রূপে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত।

প্রগতির শিবিরে শত্রুর গুপ্তচর আত্মপ্রকাশ করে প্রধানত দুই রূপে—এক হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কারবাদ, আর এক হচ্ছে প্রতিবিপ্লবী অতি-বিপ্লববাদ। উভয়ই কিন্তু বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদেরই যথাক্রমে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী ঝোঁক। প্রগতির সৈনিককে শত্রুর এই দ্বৈতরূপী গুপ্তচরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হয় যুগপৎ—ঘোরতর। গুপ্তচরের আক্রমণকে চূর্ণ করতে না পারলে শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখী সংগ্রামে মজুরশ্রেণী হঠাৎ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, পিছন থেকে গুপ্ত ঘাতকের অতর্কিত ছোরায় তার শিরদাঁড়া ভেঙ্গে পড়ে। সংগ্রামে জয়লাভের উদ্দেশ্যে মজুরশ্রেণীকে, প্রগতির শিবিরের প্রত্যেকটি সৈনিককে তাই আক্রমণ চালাতে হয় যুগপৎ—বাইরে ও ভিতরে। শিবিরের বাইরে শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখী যে-সংগ্রাম,

শিবিরের ভিতরেও সেই একই সংগ্রাম অন্যরূপে। আবার শিবিরের প্রত্যেকটি সৈনিকের নিজের ভিতরেও সেই সংগ্রাম।

শ্রেণীগত শাসন শুধু রাষ্ট্রলোকেই সীমাবদ্ধ নয়, মানসলোকেও বিসর্পিত। প্রচণ্ড ও প্রবল শাসকশ্রেণীর ভাবাদর্শের প্রভাবও প্রচণ্ড প্রবল। শত্রু-শ্রেণীর ভাবাদর্শের এই প্রভাবের বিরুদ্ধেও মজুরশ্রেণীকে লড়াই করতে হয়। ভাবাদর্শের প্রভাব মানসলোকে; মজুরশ্রেণীকে তাই মানসিক ক্ষেত্রেও বুর্জোয়া প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়তে হয়। (জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টেও মজুরশ্রেণীর এই সংগ্রাম বন্ধ থাকে না, ফ্রন্টের ঐক্যের অজুহাতে শ্রেণীসংগ্রাম স্থগিত থাকতে পারে না।) প্রগতির শিবিরের প্রত্যেকটি সৈনিককে শ্রেণীগতভাবে যেমন প্রকাশ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হয়, তেমনি লড়তে হয় নিজের শিবিরের মধ্যে, নিজের মনের মধ্যে শত্রুর গুপ্তচর রূপ তার ভাবধারার প্রভাবের বিরুদ্ধেও। সংগ্রাম শুধু বাইরেই নয়, সংগ্রাম অভ্যন্তরীণও বটে—সংগ্রাম সর্বাঙ্গীণ, সর্বাত্মক। বাইরে ও ভিতরে এই দুই সংগ্রাম মিশিয়ে অখণ্ড পরিপূর্ণ শ্রেণীসংগ্রাম। শ্রেণী-সংগ্রামের ময়দান সর্বব্যাপী—বহিরঙ্গ থেকে অন্তরঙ্গ পর্যন্ত প্রসারিত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মজুরশ্রেণীর অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মজুরশ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকার অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তি দখল করার সংগ্রাম, নিজেকে শাসকশ্রেণী রূপে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম; আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে (বা দর্শনের, মতবাদের ক্ষেত্রে) খাঁটি বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম; সব মিলিয়ে এক অখণ্ড শ্রেণীসংগ্রাম।

শ্রেণীসংগ্রামের নেতা মজুরশ্রেণী। সুতরাং, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক—শ্রেণীসংগ্রামের সব ক্ষেত্রেরই নেতা মজুরশ্রেণী। প্রগতির সৈনিককে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই লড়াই চালাতে হয় মজুরশ্রেণীর মতবাদ নিয়ে, মজুরশ্রেণীর নিজস্ব হাতিয়ার নিয়ে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই একই হাতিয়ার। শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টি দিয়েই সংস্কৃতির বিচার করতে হয়। সংগ্রামের প্রতিটি ক্ষেত্রে, সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রামের চেতনা অপরিহার্য। শুধু শ্রেণীসংগ্রামের চেতনাই আবার যথেষ্ট নয়। শ্রেণীসংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মজুরশ্রেণীর একাধিপত্যের চেতনাই হচ্ছে আসল বিপ্লবী চেতনা—এরই নাম মার্কসবাদ:

> "সেই লোকই মার্কস্‌বাদী যে শ্রেণীসংগ্রামের স্বীকৃতি হইতে আরো অগ্রসর হইয়া মজুরশ্রেণীর একাধিপত্য পর্যন্ত স্বীকার করে।"

একজন মার্ক্সবাদী এবং একজন সাধারণ খুদে কিংবা বড় বুর্জোয়ার মধ্যে গভীর পার্থক্য এইখানেই।" ['রাষ্ট্র ও বিপ্লব', বাংলা সংস্করণ, পৃ. ৪১]

মজুরশ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে 'চূর্ণ চূর্ণ ধ্বংস করিয়া তাহার স্থানে নূতন এক যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা' (ঐ, পৃ. ১৩৭.)। শোষকশ্রেণীর যন্ত্রকে ধ্বংস করে তার জায়গাতে শোষিতশ্রেণীর নিজস্ব যন্ত্র, **সম্পূর্ণ নতুন** এক যন্ত্র গড়ে তোলার ধারণার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে—প্রয়োজন হয়েছে প্রগতির শিবিরে সাম্রাজ্যবাদের গুপ্তচর তথা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্যে। নতুন যন্ত্র মানে শুধু রূপের দিক থেকেই নতুন নয়, সারবস্তুর দিক থেকেও নতুন—আকৃতি ও প্রকৃতিতে নতুন। প্রশ্নটা নিছক 'রূপান্তরের' নয়, প্রশ্ন নবনির্মাণের—**নতুন রূপের নতুন** বস্তু নির্মাণের।

এখানে পরিষ্কার করে বলা দরকার যে, ঔপনিবেশিক দেশেও পুরনো রাষ্ট্রের রূপান্তর সাধনের বদলে নতুন রাষ্ট্র নির্মাণের প্রশ্নই আজ হাজির হয়েছে। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের বর্তমান স্তরের নেতা আজ মজুরশ্রেণী। মজুরশ্রেণীর নেতৃত্বে এই সংগ্রাম জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করছে। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্টের সৈনাপত্য মজুর-শ্রেণী গ্রহণ করেছে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নয়—নিজের নেতৃত্বে মেহনতী জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই। এই গণরাষ্ট্র বুর্জোয়া রাষ্ট্রের রূপান্তর নয়—নতুন আকৃতির ও নতুন প্রকৃতির রাষ্ট্র।

নিছক 'রূপান্তর' মানে বাইরের রূপটা বদলে ভিতরের মর্মবস্তুটিকে অক্ষত অবস্থায় বজায় রাখা। নতুন বোতলে পুরনো মদ রাখলেই তা নতুন হয়ে যায় না। বুর্জোয়াশ্রেণীর রাষ্ট্র অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি—এক কথায় বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে তৈরি গোটা যন্ত্রটিকে ধ্বংস করার বদলে তার ইতস্তত কিছু কিছু 'সংস্কার' করে চালু করার নামই 'রূপান্তর'। ভোল বদলে একই জিনিস চালাবার চেষ্টা—উদ্দেশ্য লোক ঠকানো। মার্ক্স্ শিক্ষা দিয়েছেন: মজুরশ্রেণী আগের তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে শুধু দখল করেই তাকে নিজের কাজে লাগাতে পারে না; এই যন্ত্রটিকে ধ্বংস করেই তার জায়গাতে নিজস্ব নতুন যন্ত্র কায়েম করে তবেই মজুরশ্রেণী নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে। সংস্কৃতি-বিচারে মার্ক্সবাদ প্রয়োগে করতে গিয়ে যখন কেউ বলেন:

"যখন এতদিনকার শ্রেণী-শাসিত সমাজ রূপান্তরিত হইয়া শ্রেণীহীন সমাজের রূপ পরিগ্রহ করিবে তখন এই শ্রেণীগত সংস্কৃতিরও শ্রেণীহীন সংস্কৃতিতে রূপান্তর অনিবার্য হইবে।"* [বড় হরফ আমার]

তখন তিনি আসলে সংস্কারবাদই প্রচার করেন। শ্রেণীশাসিত সমাজের প্রকৃতি ও আকৃতির পরিবর্তন ঘটে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। একটা শ্রেণীশাসিত সমাজের (বর্তমানে বুর্জোয়া সমাজ) জায়গাতে বিপ্লব আর একটা শ্রেণীশাসিত সমাজ (সোশ্যালিস্ট সমাজ—মজুরশ্রেণীর একাধিপত্য) কায়েম করে। এই সোশ্যালিস্ট সমাজই কালক্রমে শ্রেণীহীন সমাজে রূপান্তরিত হতে পারে। বর্তমান বুর্জোয়া সমাজই শ্রেণীহীন সমাজে রূপান্তরিত হতে পারে না। মধ্যবর্তী একটা পর্যায় অতিক্রম না করে একেবারে এক লাফে কমিউনিস্ট সমাজে পৌঁছানো যায় না। কমিউনিস্ট সমাজ কাল্পনিক রামরাজ্য নয়, বৈতরণীর পরপারে সেটা কেউ আগে থেকে গড়েও রাখে নি। সে রাজ্য বাস্তবে আয়ত্ত করতে হবে। তার একমাত্র উপায় বর্তমান শাসকশ্রেণীর নিজস্ব রাষ্ট্র ধ্বংস করে তার জায়গাতে মজুরশ্রেণীর রাষ্ট্র কায়েম করা (বলা বাহুল্য, নয়া গণতন্ত্রেও মজুরশ্রেণীর কর্তৃত্ব অনস্বীকার্য)। সমাজব্যবস্থার বেলাতে যদি তা-ই সত্যি হয়, তা হলে সংস্কৃতির বেলাতে তা মিথ্যা হবে কেন?

মজুরশ্রেণী যখন বুর্জোয়াশ্রেণীর আধিপত্যকে উচ্ছেদ করে তার নিজের আধিপত্য কায়েম করবে, তখন সে বুর্জোয়ার শ্রেণীগত সংস্কৃতির আধিপত্যকে মেনে চলবে কেন? একটা শ্রেণীগত সংস্কৃতির জায়গাতে আর একটি শ্রেণীগত সংস্কৃতির অভ্যুদয় হবে না কেন? সমাজবিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা যদি থাকে, তবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা কেন থাকবে না?

বুর্জোয়ার শ্রেণীগত সংস্কৃতিই শ্রেণীহীন সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয় না। একথা যাঁরা বলেন তাঁরা বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার ও বরণ করে নিতে পারেন না। তাঁরা শ্রেণীসংগ্রামকে এড়িয়ে শ্রেণীসমন্বয়ের পথে, বিপ্লবকে পরিহার করে সংস্কারের পথে শ্রেণীহীন সমাজে পৌঁছতে চান—অর্থাৎ তাঁরা কার্যত গান্ধী-বাদের প্রেরণায় রামরাজ্যের পক্ষে ওকালতি করেন। শোষকশ্রেণীর শ্রেণীগত সংস্কৃতি শোষণেরই হাতিয়ার। তাকে অক্ষুন্ন রেখে 'শ্রেণীগত সংস্কৃতির শ্রেণী-হীন সংস্কৃতিতে রূপান্তর অনিবার্য' যাঁরা কল্পনা করেন, তাঁরা (অজ্ঞাতসারে হলেও)

* গোপাল হালদার: 'সংস্কৃতির রূপান্তর', ৩য় সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৫৬, পৃ: ১৭।

আসলে নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদীর মতোই শ্রেণীসমন্বয়ের পথে সমাজের রূপান্তর কামনা করেন।

সংস্কারবাদ মূলত বিপ্লব-বিরোধী বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদেরই একটি ধারা; সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাই সংস্কারবাদের আসল কথা :

> "সংস্কৃতির অর্থ শুধুমাত্র সংস্কারে পুনরাবর্তন নয়;—**সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবর্তন**।"* [বড় হরফ আমার]

অনেক দিন আগে, ১৮৯৯ সালে, বের্নস্টাইন নামে বুর্জোয়াশ্রেণীর এক গুপ্তচর মজুরশ্রেণীর পিঠে এক ছোরা মারবার চেষ্টা করেছিল—ছোরাখানির নাম 'ক্রমবিবর্তনশীল সমাজতন্ত্র'। বিপ্লবের মারফত সমাজতন্ত্র নির্মাণের ধারণার বদলে সংস্কারের মারফত ক্রমে-ক্রমে একটু একটু করে সমাজতন্ত্র রচনার ধারণা বের্নস্টাইনের নিজস্ব অবদান নয়; কিন্তু ধারণাটিকে সে-ই বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে বাজারে হাজির করেছিল, এবং নামটি দিয়েছিল বুর্জোয়াদের পছন্দসই। সমাজ-তন্ত্রকে কায়েম করতে হয় না, সমাজতন্ত্র ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে ওঠে! এই ক্রমবিবর্তনশীল সমাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটছে আজ ব্রিটেনে ফ্রান্সে এবং চার্চিলের আস্থাভাজন মার্শাল টিটোর 'রিপাব্লিকে'। সত্যি, 'সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবর্তন' ঘটছে বেভিন-বিদো-টিটোর 'সমাজতন্ত্রে,' ঘটছে না শুধু বিপ্লব। আর অন্যদিকে নয়া গণতন্ত্রের দেশে (সোভিয়েট ইউনিয়নের বলিষ্ঠ প্রেরণায়) মজুরশ্রেণীর নেতৃত্বে চলেছে শত্রুশ্রেণীর মূল উৎপাটন, চলেছে অনলস বিপ্লবের প্রক্রিয়া, ঘটছে সংস্কৃতির নবনির্মাণ—পুঁজিতন্ত্রের 'রূপান্তর' নয়, 'সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবর্তন'। পুঁজিতন্ত্রের অর্থনীতি রাজনীতি সংস্কৃতি—এক কথায়, মজুর-শ্রেণীকে দমন ও শোষণ করবার যন্ত্রটি, বুর্জোয়াদের হাতের মারণযন্ত্রটি সেখানে অক্ষুণ্ণ নেই আর। বুর্জোয়াদের শ্রেণীগত সংস্কৃতি সেখানে শ্রেণীহীন সংস্কৃতিতে নব রূপ পরিগ্রহ করছে না। বুর্জোয়া আন্দোলনের 'বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে' (বিশ শতকের মাঝামাঝি ?) 'অধুনা জাগ্রত শ্রমিক-স্বার্থের সহযোগী শক্তিতে পরিণত করাই'** সেখানকার কমিউনিস্টদের লক্ষ্য নয়।

ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী সংগ্রামই

* ঐ, পৃ. ১৮।

** নরহরি কবিরাজ : "মধ্যবিত্ত কোন পথে ?" পৃ. ৭৯।

হচ্ছে সত্যকার জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম, যথার্থ প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রতি বৈরী বা উদাসীন যাঁরা ঔপনিবেশিক দাসত্বের কাঠামোর মধ্যে থেকেই, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণকে বরদাশ্‌ত করে এবং সাম্রাজ্য-বাদী শাসকশক্তির সঙ্গে 'ভদ্র' সম্পর্ক স্থাপন করে শুদ্ধ সমাজসংস্কারের মধ্যেই নিজেদের চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ রেখেছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে জাতীয় সংস্কারবাদের প্রতিনিধি। জাতীয় সংস্কারবাদ সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যেরই আনুকূল্য করে। যথার্থ প্রগতি-আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কহীন সমাজসংস্কারের যে-প্রয়াস, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিতে তার মধ্যে আবিষ্কার করা হয় সমাজের গণতান্ত্রিক রূপান্তর ও জাতীয় নবজাগরণ। প্রগতির শিবিরে বুর্জোয়া-জাতীয়তা-বাদী গুপ্তচর সংস্কারবাদের দৃষ্টিতেও তাই। "বাঙলার গৌরবময় জাতীয় ঐতিহ্যের গোড়া পত্তন উনিশ শতকের প্রথমে" "ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত"দের হাতে! (তার আগে বাংলার কোনো 'জাতীয় ঐতিহ্য' ছিল না, অথবা থাকলেও তা 'গৌরবময়' ছিল না। ক্লাইভকে ধন্যবাদ; ধন্যবাদ মীরজাফর-জগৎশেঠকে! তাদেরই দৌলতে না বাংলার 'গৌববময় জাতীয় ঐতিহ্যের গোড়া পত্তন' 'উনিশ শতকের প্রথমে'!) এই মধ্যবিত্তদের আদর্শ ছিল যদিও "**বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিকারে প্রশ্ন না করে** শাসনতান্ত্রিক উপায়ে আত্মনেতৃত্বে সরকার" গঠন করা,তবুও নীলবিদ্রোহ সিপাহী-বিদ্রোহ সাঁওতাল-বিদ্রোহের পটভূমিকায় সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে কার্যত সহযোগিতার সে-আদর্শ প্রগতিশীল এবং বিদ্রোহীদের বদলে আপসপন্থী মধ্যবিত্ত বাবুরাই প্রগতিবাদী! বিদ্রোহপরায়ণ জনসাধারণকে ভুল বুঝিয়ে আপসের পথে টানার চেষ্টা কার স্বার্থে?

বাংলার 'জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা' আলোচনা প্রসঙ্গে নরহরিবাবু বলছেন: "উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলন ছিল **জমিদার** ও **উচ্চ**-মধ্যবিত্তের **প্রগতিশীল** জাতীয় আন্দোলন।"* [বড় হরফ আমার]

সাম্রাজ্যবাদের পঞ্চম বাহিনী বাংলাদেশের আজন্ম-প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত জমিদারদের আন্দোলন হলো বাংলার জাতীয় আন্দোলন এবং প্রগতিশীল আন্দোলন! নরহরিবাবুর পরের কথা থেকেই বুঝতে পারা যায়, তিনি হিন্দু মেলা ও রামকৃষ্ণ মিশন জাতীয় হিন্দু রিভাইভালিস্ট আন্দোলনকেই প্রগতিশীল জাতীয় আন্দোলন বলে সাব্যস্ত করেছেন:

* ঐ, পৃ. ৬৪।

"দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই প্রগতি আন্দোলনের বিশিষ্ট পাণ্ডা। এই **জাতীয় সংস্কৃতির আন্দোলনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দান কম নয়।** হিন্দু মেলা এই জাতীয় সংস্কৃতি আন্দোলনের পরিণত ফল। জাতীয় সংস্কৃতি আন্দোলনে যাঁরা **নেতা রাজনীতিতেও তাঁরা প্রগতিপন্থী** ছিলেন।"* [বড় হরফ আমার]

মুষ্টিমেয় 'জমিদার ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত'ই হলো গোটা বাঙালী জাতি, তাদের আন্দোলনই হলো 'প্রগতিশীল জাতীয় আন্দোলন'! আর সেই 'প্রগতি আন্দোলনের', 'জাতীয় সংস্কৃতি আন্দোলনের' অ-রাজনৈতিক সংস্কারপন্থী নেতারা হলেন 'রাজনীতিতে প্রগতিপন্থী'!

উনবিংশ শতকে 'জমিদার ও উচ্চ-মধ্যবিত্তের' আন্দোলনই হলো প্রগতি-আন্দোলন! 'প্রগতিপন্থী' হলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভৃতি; আর 'নতুন সাহিত্যে নতুন স্বাদেশিকতা ও নতুন আত্মনিষ্ঠার' (পৃ. ২৯) পরিচয় যিনি দিয়েছেন সেই "মানুষের গুরু বঙ্কিম, মানুষের সৃষ্টি-প্রতিভার প্রতীক হয়ে বেঁচে রইবে" (পৃ. ১১৭)। উনিশ শতকের 'প্রগতিপন্থী' 'বঙ্কিম-ইকবাল-রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিচেতনাকে' ('বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের ঐতিহ্যকে'—বেচারা নজরুল!) 'শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের নতুনতর সৃষ্টির স্পর্শে' (পৃ. ১১৭) সজীব করে তোলাই প্রগতি-লেখক ও শিল্পীদের দায়িত্ব—বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিচারে নিশ্চয়ই।

নিশ্চয়ই এই নতুন সংস্কৃতি মানে পুরনো সংস্কৃতিরই রূপান্তর! সংস্কৃতিতে যাঁরা বিপ্লবের বদলে সংস্কার বা সমন্বয় চান, রাজনীতিতেও তাঁরা আসলে চান সমাজতন্ত্রের বদলে (বা সমাজতন্ত্রের নামে) পুঁজিতন্ত্রেরই রূপান্তর। ভারতবর্ষে এই জাতীয় লোকদের নাম গান্ধীবাদী। আর সত্যিসত্যিই বঙ্কিম-বিবেকানন্দের ঐতিহ্যের প্রগতিশীলতায় বিশ্বাসী সংস্কারবাদীরা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস-কারী ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়াদের মতাদর্শ গান্ধীবাদের মধ্যেও প্রগতি খুঁজে পান সহজেই! যথা—

"গান্ধীবাদের **প্রগতির দিকটি সম্বন্ধে কমিউনিস্টরা যেমন সজাগ, তেমনি তার প্রতিক্রিয়ার দিকটার সম্বন্ধে সমান সচেতন।"** [পৃ. ১৯]

টাটা-বিড়লা মর্গান-ফোর্ডের মধ্যে সবটাই প্রতিক্রিয়া নয়—প্রগতিও আছে! ওয়াল স্ট্রীটে আর বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রে প্রতিক্রিয়া আছে, প্রগতিও আছে!

* ঐ, পৃ. ৬৫।

ভালো ভালো কথা কি গান্ধীজী বলেন নি, পণ্ডিত নেহরু বলছেন না? সাম্যবাদ তো তাঁরাও কামনা করেন বলেছেন কতবার! তবে…তবে তাঁদের কেন অস্বীকার করব?

মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি। সুবিধাবাদ একদিকে 'বিপ্লবের খুঁত বেছে বেছে বের' করতে যেমন তৎপর, তেমনি আর একদিকে তৎপর প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও প্রগতি আবিষ্কার করতে। ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল লেখকের লেখার মধ্যেও ইতস্তত দু' একটা প্রগতিজ্ঞাপক উক্তি খুঁজে বার করা আদৌ কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু তাঁর মূল প্রকৃতি বিচার করতে হলে 'দেখতে হবে যে মোটের উপর তাঁর সমগ্র সৃষ্টির সমগ্র প্রভাবটা কি' 'বাংলা প্রগতি-সাহিত্যের আত্মসমালোচনা', রবীন্দ্র গুপ্ত, পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত, পৃ. ৩৫]* এবং সমসাময়িক শ্রেণীসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর স্থানটি কোথায় আর তার সৃষ্টির ভূমিকাই বা কী।

"এমন **কেউই নেই** যিনি কিছু-না-কিছু ভালো করেন নি; এমন **কেউ নেই** যিনি উল্লেখযোগ্য কিছুর প্রতিনিধিত্ব করেন না; এমন **কেউ নেই** যিনি সাহিত্যে কিছু না কিছু প্রগতির জন্যে দায়ী নন। …ব্যক্তিবিশেষ কারো যদি সামান্য প্রতিভা থেকেও থাকে, এখানে সেখানে তিনি যদি কিছু করেও থাকেন, কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে যদি তাঁর কোনো মূল্যই না থাকে, যদি তাঁর সাহিত্যিক প্রকৃতি এবং অবদান সমগ্রভাবে ধরলে দেখা যায় মূল্যহীন,—তবে সাহিত্যের কী আসে যায় তাতে? সাহিত্যে একজন ব্যক্তির মূল্য কেবল তাঁর নিজের জন্যেই নয়, সমগ্রের সঙ্গে সম্পর্কেই তাঁর মূল্য।"** [এঙ্গেলস্]

রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দকে উনবিংশ শতকের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে রেখে বিচার করতে হবে সমগ্রের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কটা কী। এই সম্পর্কের প্রকৃতি যেমন, তাঁদের সৃষ্টি ও চিন্তার সমগ্র প্রকৃতিও তেমনি। রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্পর্কে নিজে কি মনে করতেন, সেটা বিবেচ্য নয়। সমগ্রের সঙ্গে, সমসাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা কিরকম ছিল সেটাই বিবেচ্য।

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র ব্রাহ্মসংগীত (কবিতা হিসাবে যা নিকৃষ্ট) আর হাক্সলির যোগদর্শন এবং ক্যাথলিক গীর্জার আশ্রয়ে ইলিয়টের ধর্মপ্রশস্তি—প্রকৃতির দিক থেকে কি অভিন্ন নয়? রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সংস্কৃতির চুম্বক কি 'এবার

---

*দ্র. 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক', প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১২।—সম্পাদক

** 'লিটারেচার এ্যাণ্ড আর্ট', পৃ. ৯০।

ফিরাও মোরে', 'দূর হ'তে কি শুনিস...', 'উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ আলো', 'বিপুলা এ পৃথিবীর', 'রক্তমাখা দন্তপংক্তি ...' ইত্যাদি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কবিতার মধ্যে, না 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'নৈবেদ্য'-'সোনার তরী' ইত্যাদির মধ্যে? রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে থেকে মূল যে সুরটি কানে এসে বাজে, সেটা হচ্ছে আত্মসমর্পণের সুর, প্রবলের 'চরণধূলার তলে' দুর্বলের 'মাথা নত করে' 'সকল দেহ লুটিয়ে' পড়ার সুর। এই সুর তাঁর অন্য সুরকে ছাপিয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের এই সুর বাইরের হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল; কিন্তু তখনও তিনি উপনিষদের মন্ত্র জপছিলেন আগের মতোই। রবীন্দ্রনাথ 'ব্যথাময় অগ্নি-বাষ্পে পূর্ণ' গগনে 'একা একা সে অগ্নিতে দীপ্তগীতে সৃষ্টি' করেছেন 'স্বপ্নের ভুবন'। রবীন্দ্র-কাব্যের রসদিগ্ধ ললিতবাক্যের মোহে অভিভূত হয়ে প্রগতির অগ্রণী নায়ক যদি এই নিঃসঙ্গ স্বপ্নের ভুবনে তাঁর অগ্রগমনের প্রেরণা খোঁজেন, তবে তিনি অনিবার্যভাবেই ফ্রন্টের সব চেয়ে সামনের সারি থেকে নেমে যাবেন পিছনের সারিতে—শেষ পর্যন্ত চ'লে পড়বেন প্রতিক্রিয়ার শিবিরে।

রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের প্রচণ্ড প্রভাব পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের আচ্ছন্ন করে আছে। এই ঐতিহ্যের স্বরূপ কি?

সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিক দেশে সামন্তপ্রথাকে কখনো ধ্বংস করে না, শোষণ ও শাসনের স্বার্থে সামন্ততন্ত্রকে জীইয়ে রাখে এবং প্রশ্রয় দেয়। লোকের চেতনা ও মানসলোকে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কার ও ঐতিহ্যের জড় অক্ষুণ্ণ রাখতে সাম্রাজ্যবাদ সতত সচেষ্ট। উপনিবেশে কালক্রমে বড় বড় বুর্জোয়ার অভ্যুদয় হলেও তারা সমন্ততন্ত্রের সঙ্গে মিলে সামাজ্যবাদের তাঁবেদার-চক্র গঠন করে। পুরোপুরি সুসংযত বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা, জীবনযাত্রা ও ভাবাদর্শ উপনিবেশে গ'ড়ে উঠতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসেই যাদের স্বার্থ, সেই বৃহৎ বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া গণতন্ত্র কায়েম করতেও উদ্‌গ্রীব নয়: তা হলে যে সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষকে নির্মূল করতে হয়, সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করে যথার্থ জাতীয় স্বাধীনতা কায়েম করতে হয়; কিন্তু তা হলে বড় বড় বুর্জোয়াদের ক্ষমতার ভিত্তিই যে চূর্ণ হয়ে যায়; সুতরাং তারা এমনকি বুর্জোয়া-গণতন্ত্রেরও বিরোধিতা করে—বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ জাতীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়ে দেখা দেয়।

উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় তথাকথিত যে-জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, সেটা পুরো বুর্জোয়া সংস্কৃতি নয়; এবং উপনিবেশের নিপীড়িত জনজীবনের সঙ্গে তার দেহ ও আত্মার কোনো সম্পর্কই নেই। গোপালবাবুর কথায় সে-সংস্কৃতি আসলে 'বাবু কালচার'। এই 'বাবু কালচার' বাবু আধা-বুর্জোয়া আধা-সামন্তের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রেরণাও যেমন আছে তার মধ্যে, তেমনি আছে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কার ও ঐতিহ্যের ভগ্নাবশেষ। রবীন্দ্র-ঐতিহ্য এই সংমিশ্রণের মূর্ত রূপ। বুর্জোয়া ভাবধারার অনুপ্রেরণায় তিনি যখন ইয়োরোপীয় কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গাইছেন মুক্ত ছন্দে, তখনও কিন্তু উপনিষদের ব্রহ্মকে তিনি আঁকড়ে ধরে আছেন অন্তর্লোকে সযত্নেই। বেগের আবেগে উদ্দাম বলাকার পক্ষবিধূননের সঙ্গে তিনি উপনিষদের শান্ত-গম্ভীর ওঙ্কারধ্বনিকে মিলিয়ে দিয়েছেন সজ্ঞানে অসংকোচে। এমন কি, পরিণত বয়সে বাইরের প্রচণ্ড সংঘাতের প্রেরণায় বিচলিত হয়ে তিনি যখন স্বধর্মের গণ্ডি অতিক্রম করে বাইরে বেরিয়ে আসবার চেষ্টায় নিঃসন্দেহে প্রগতি-ধর্মী বলিষ্ঠ কাব্যে নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ করছেন, তখনও তিনি (তাঁর সমগ্র জীবনদর্শন) প্রাচীন ভারতের বৈদান্তিক বিগ্রহকে ধ্যান করছেন তাঁর মনের গভীরে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে প্রগতিশীলতার পরিচয় নেই, একথা অবশ্যই বলা হচ্ছে না। প্রগতির সুর তাঁর কাব্যে নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু শুধু এইটুকু বলে চুপ করে গেলে তাঁর ঐতিহ্যকে খণ্ডিতভাবে বিচার করা হয়। প্রত্যেক বড় শিল্পীকেই বিচার করতে হবে তাঁর সমগ্রতা দিয়ে। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের সমগ্রতা, রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুর প্রতিক্রিয়াশীল। সমগ্র সত্তার প্রতিক্রিয়াশীলতাকে গোপন করে শুধু খণ্ডিত সত্তার প্রগতিশীলতাকে প্রচার করলে প্রগতির শিবিরে প্রতিক্রিয়ার প্রভাবকেই জোরদার করা হয়। রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে প্রগতির প্রেরণা মিললে প্রগতির শিবিরে তা নিশ্চয়ই সাদরে গ্রাহ্য হবে; কিন্তু জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অগ্রগামী বাহিনীর শিবিরে প্রতিক্রিয়া-শীলতাকে আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের ঐতিহ্যকে ধিক্কার দিয়েছেন:

> মানুষের অসম্মান দুর্বিষহ দুখে
> উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে,

ছুটি নি করিতে প্রতিকার—

চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার। [নবজাতক : জয়ধ্বনি]

জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে (মৃত্যুর দুই বছর আগে, ১৯৩৯ সালে) বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠ কণ্ঠে আত্মসমালোচনার যে-সাহস দেখাতে পেরেছেন, প্রগতি-শিবিরে থেকেও রবীন্দ্রভক্ত যুবক প্রগতি-লেখকেরা তার কণামাত্র পরিচয় দেখাতে পেরেছেন কি ?

* * *

প্রগতি-সাহিত্যের শিবিরে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পেটিবুর্জোয়াদের ভিড়টা জমেছে বেশি ; আর তার ফলে সেখানে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রভাবও সমধিক—কখনো তার ঝোঁকটা দক্ষিণ দিকে, আবার কখনো-বা বাম দিকে। আধুনিক সমাজের শ্রেণীগত ভিত্তির মধ্যেই এই ঝোঁকের শিকড় রয়েছে ; এবং মজুর আন্দোলনের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দেয় কিভাবে সে সম্পর্কে লেনিনের উক্তি স্মরণীয় :

> "মজুরশ্রেণীর আন্দোলন বেড়ে ওঠার ফলে বেশ কিছু পেটিবুর্জোয়া আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরা বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রভাবের অধীন। এই আদর্শের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করা তাদের পক্ষে দুরূহ, বার বার তারা এই আদর্শের কবলে ঢ'লে পড়ে।" [মার্কস্-এঙ্গেল্স-মার্কসিজম্', পৃ. ২৬৫] আবার—

> "…মজুর-আন্দোলনের এমন সব সমর্থক দেখা দিতে থাকে যারা মার্কস্-বাদের মাত্র কয়েকটি অঙ্গ আয়ত্ত করে ; দুনিয়া সম্পর্কে এই নতুন ধারণার মাত্র কয়েকটি অংশ, কিংবা আলাদা আলাদা কোনো কোনো স্লোগান ও দাবি মাত্র তারা আয়ত্ত করে ; সাধারণভাবে দুনিয়া সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণার ঐতিহ্য, বিশেষভাবে দুনিয়া সম্পর্কে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ধারণার কবল থেকে তারা চূড়ান্তভাবে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে না।" [ঐ, পৃ. ২৫৩]

মজুর-আন্দোলনের এই সব সমর্থকদের মধ্যে 'খুদে-মালিক', 'ছোটখাটো উৎপাদনকারী' ছাড়া আছে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী (লেখক, শিক্ষক, শিল্পী)। বুর্জোয়াশ্রেণীর একচ্ছত্র শাসনের চাপে এরাও ক্রমশ অবলম্বনচ্যুত হয়ে নীচে নামতে থাকে, আর্থিক দিক থেকে নিঃস্বের পর্যায়ে প্রায় নেমে আসে। নিঃস্ব-

শ্রেণীর আন্দোলনের প্রতি এরা আকৃষ্ট হয় নিজেদের স্বার্থেই। কিন্তু সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে নিম্নস্তরে নেমে এলেও এরা উচ্চস্তরের (অর্থাৎ বুর্জোয়া-শ্রেণীর) ধ্যান-ধারণাকে একেবারে বর্জন করতে পারে না। এরা মুক্তির আগ্রহ পোষণ করে, কিন্তু বুর্জোয়া ভাবাদর্শের নাগপাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে না-পারার দরুন এরা মুক্তির শর্ত বোঝে ভুল। শ্রেণীসংগ্রামের অপরিহার্যতায় অবিশ্বাসী পেটি-বুর্জোয়া—

> "বিশ্বাস করে যে তার মুক্তির বিশেষ শর্তটিই হচ্ছে সাধারণ শর্ত, যে-শর্তে আধুনিক সমাজকে রক্ষা করা যেতে পারে ও শ্রেণীসংগ্রামকে এড়ানো চলতে পারে।" [কার্ল মার্কস্ : 'দি এইটিন্থ্ ব্রুমেয়ার অফ্ লুই বোনাপার্ট', তৃতীয় অধ্যায়]

সাধারণভাবে পেটি-বুর্জোয়ারা তাদের বাস্তব জীবনে একটা নির্দিষ্ট 'সীমার বাইরে আর অগ্রসর হয় না'। তাদের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক প্রতিনিধিরাও 'তাদের মানসলোকে' ঐ নির্দিষ্ট সীমা—

> "অতিক্রম করে অগ্রসর হয় না; এবং তার ফলে, বাস্তব স্বার্থ ও সামাজিক অবস্থান পেটি-বুর্জোয়াদের যে-সব কাজ ও সমাধানের দিকে চালিত করে", পেটি-বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরাও "তত্ত্বগতভাবে সেই একই কাজ ও সমাধানের দিকে চালিত হয়। একটি শ্রেণীর রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক প্রতিনিধিদের সেই শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক সাধারণভাবে এই।" [ঐ]

পেটি-বুর্জোয়ারা গণতান্ত্রিক-সাধারণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান দাবি করে; কিন্তু 'পুঁজি ও শ্রম এই চরম দুটিকেই উচ্ছেদ করবার উপায় হিসাবে' (ঐ) এ-দাবি করা হয় না, বরং 'তাদের বিরোধকে দুর্বল করবার ও সমন্বয়ে রূপান্তরিত করবার' (ঐ) উপায় হিসাবেই এ-দাবি করা হয়।

> "এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রস্তাবিত উপায় যত বিভিন্নই হোক না কেন, তার উপর অল্পবিস্তর বৈপ্লবিক ধারণার সাজপোশাক যতই না কেন পরানো হোক—মর্মবস্তু তার একই থেকে যায়। এই মর্মবস্তু হচ্ছে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজের রূপান্তর সাধন, কিন্তু সে-রূপান্তর পেটি-বুর্জোয়াদের গণ্ডীর মধ্যেই।" [ঐ]

পেটি-বুর্জোয়াদের গণ্ডীর মধ্যেই সমাজের রূপান্তর সাধন! পেটি-বুর্জোয়াদের

বিপ্লবের দৌড় এই পর্যন্ত। সংস্কৃতির বেলাতেও তাই বুর্জোয়াশ্রেণীর নিজস্ব সংস্কৃতিকেই সোশ্যালিস্ট সংস্কৃতিতে ক্রমবিকশিত করে তোলা তাঁদের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে জয়প্রকাশ নারায়ণের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংস্কারবাদী প্রগতি-সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যের মিল আছে।

বুর্জোয়া ভাবাদর্শ বর্জন না করে মার্কসবাদকে গ্রহণ করার চেষ্টা আসলে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সঙ্গে মার্কসবাদের সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা, মার্কসবাদকে সংশোধন ও সংস্কার করে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের ল্যাজে বেঁধে দেবার চেষ্টা, মজুরশ্রেণীকে বুর্জোয়াশ্রেণীর পদানত করে রাখবার চেষ্টা। প্রগতিসাহিত্যের শিবিরে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রভাব এতটা যে, এমন কথাও এক সময় উঠেছিল যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কসবাদীদের একটা সুনির্দিষ্ট 'লাইন' থাকলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের কোনো 'লাইন' থাকতে পারে না। অর্থাৎ, রাজনীতিতে মার্কস্-বাদকে স্বীকার ক'রে সংস্কৃতিতে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ আঁকড়ে থাকা চলে, মার্কসকে বিপ্লবী বলে স্বীকার করে সেই সঙ্গে 'কনসেশন' হিসাবে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-ইলিয়ট-পাউণ্ডকেও প্রগতিশীল ব'লে বরণ করার স্বাধীনতা থাকতে পারে! শিল্পীর স্বাধীনতা! Artists without Uniform! Art for Art's Sake!

একটা কথা মনে রাখা দরকার: বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সঙ্গে মজুরশ্রেণীর কোনো সম্পর্কই থাকতে পারে না, এবং রাজনীতি ও সংস্কৃতির মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান নেই। দুটো পরস্পরবিরোধী ভাবাদর্শের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে—রাজনীতিতে, সংস্কৃতিতেও:

> "হয় বুর্জোয়া ভাবাদর্শ, না হয় সোশ্যালিস্ট ভাবাদর্শ। মধ্যপন্থা কিছু নেই (কারণ,মানবসমাজ 'তৃতীয়'ভাবাদর্শ কিছু উদ্ভাবন করে নি; অধিকন্তু, শ্রেণীদ্বন্দ্বে দীর্ণ সমাজে অ-শ্রেণিক বা শ্রেণীর ঊর্ধ্বে কোনো ভাবাদর্শ থাকতে পারে না।" [লেনিন: 'হোয়াট ইজ টু বি ডান', ২য় অধ্যায়, ২য় অনুচ্ছেদ]

প্রগতি-শিবিরের অগ্রগামী বাহিনীতে যাঁরা যোগ দিয়েছেন, নতুন ভাবধারা যাঁরা গ্রহণ করেছেন—"নতুন ধারণার পক্ষে পুরনো ধারণার পাশাপাশি চলার স্বাধীনতাই" তাঁদের দাবি হবে না, তাঁদের দাবি হবে "পুরনো ধারণার জায়গাতে

নতুন ধারণাকে কায়েম করা" [ঐ, ১ম অধ্যায়, ১ম অনুচ্ছেদ]। তাঁদের আরো মনে রাখা দরকার, মার্কসবাদের শিবিরে তথাকথিত 'সমালোচনার স্বাধীনতা' মানে—

> "সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মধ্যে সুবিধাবাদী ঝোঁকের স্বাধীনতা, সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিকে একটা গণতান্ত্রিক সংস্কারপন্থী পার্টিতে পরিণত করার স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্রের মধ্যে বুর্জোয়া ধারণা ও বুর্জোয়া টুকরো (এলিমেণ্টস্) ঢুকিয়ে দেবার স্বাধীনতা।" [ঐ]

মজুরশ্রেণীর নিজস্ব শ্রেণীচিন্তার (অর্থাৎ মার্কসবাদের) কোনো সমালোচনা তার শিবিরে চলতে পারে না। মার্কসবাদ অভ্রান্ত। অভ্রান্ত মার্কসবাদী স্টালিনের শিক্ষা অভ্রান্ত।

মজুরশ্রেণী বুর্জোয়া-শাসনকে উচ্ছেদ করবে। বুর্জোয়া সংস্কৃতির কর্তৃত্বকে সে বরদাশ্‌ত্‌ করবে কোন যুক্তিতে? নিজের শিবিরে শত্রুশ্রেণীর প্রভাব তাকে নির্মূল করতেই হবে—রাজনীতির ক্ষেত্রেও, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। নিজের মনের মধ্যেও যদি শত্রুশ্রেণীর গুপ্তচর ঘুপ্‌টি মেরে থাকে, তাকেও সে উপড়ে ফেলবে অসংকোচে। সংস্কারবাদকে, সমালোচনার নামে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টাকে সে সহ্য করবে না। মজুরশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টে পরমতসহিষ্ণুতার নামে তার (মজুরশ্রেণীর) স্বমতের প্রতিকূলতাকে বরদাশ্‌ত্‌ করা মানে শত্রুশ্রেণীর মতের প্রাধান্যকে স্বীকার করে নেওয়া, বুর্জোয়া ভাবধারাকে আমল দেওয়া—নিজের হাতে নিজের গলা কাটা।

মার্কসবাদী প্রগতি-সাহিত্যিকের দায়িত্ব প্রগতি-শিবিরের অগ্রগামী বাহিনীর দায়িত্বেরই অনুরূপ। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, চিন্তায় ও মননে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারের জড় ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রতি 'আসক্তির কাঙাল শিকড়জাল' তাকে ছিঁড়ে ফেলতেই হবে। কিন্তু বিষ ঢুকেছে গিয়ে মনের গভীরে। মনের ভূতকে খুঁজে বার করে মেরে তাড়ানো বেশ কষ্টসাধ্য। গভীর ও জ্বলন্ত আত্মসচেতনতা থাকলে তবেই আত্মসমালোচনা সম্ভব। নির্মম আত্মসমালোচনার সংগ্রাম চালাতে পারলে তবেই মনের ভূতকে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংস্কারবাদকে তাড়ানো সম্ভব হতে পারে। নতুন সংস্কৃতি রচনার অপরিহার্য শর্তই এই আত্মসমালোচনা—সামন্ততান্ত্রিক সংস্কার ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই

শর্ত কায়মনোবাক্যে পালন করতে যে কুণ্ঠিত—আমিই হই আর আপনিই হোন—প্রগতি-শিবিরের অগ্রগামী বাহিনীতে তাঁর স্থান নেই।*

---

* ফতোয়া, বৈশাখ ১৩৫৭, পৃ. ২৪-৩৯। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজনমতো সংশোধন করা হয়েছে।

প্রবন্ধটির শেষে 'ফতোয়া' সম্পাদকের একটি মন্তব্য প্রকাশিত হয়। সেই মন্তব্য থেকে জানা যায়, প্রবন্ধকার ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত নরহরি কবিরাজ-এর 'মধ্যবিত্ত কোন পথে' নামক গ্রন্থটিকে যে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেছেন তা ছিল নরহরিবাবুর তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু ১৯৫০ সালে নরহরিবাবু সেই 'সংস্কারবাদী আবিলতা' কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করছেন, 'অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে'।—সম্পাদক

পরিশিষ্ট ১

THE CRISIS IN CULTURE / *Hiren Mukherjee*

A modern poet has felt and expressed the vile possibility, no longer very remote, of a breakdown of civilisation :

"......like history in Dark Ages where
"Truth lies in dungeons from which drifts no whisper :
"We hear of towers long broken off from sight
"And tortures and war in dark and smoky rumour,
"But on men's buried lives there falls no light."

—Stephen Spender : *Poems*

That culture is threatend, the intellectual pauperisation of Fascist countries and the organised revival of superstition and illusion and blood-lust, tells us only too dismally. From the point of view of Fascists who have plunged China and Spain into the cruellest of wars and are successfully blackmailing capitalist 'democracies' into helping them in their barbarian adventures, all thought to-day means what the Japanese war-lords picturesquely called "dangerous thoughts." The Nazi dramatist, Johst, echoing Goering, said exultantly, "when I hear the word 'culture', I cock my revolver." It is no wonder that writers in countries which are happily not yet under the Fascist whip, are being shocked into the realisation that they can no longer, if they care for their work, take refuge in a superior mood of cynical indifference or a sort of pathetic fatalism. They have found that even the mask of the "pure artist" did not help save the German writer from Nazi persecution, that German culture could be uprooted with something like impunity.

because it had no living and real contact with the people. They have little patience wih the scholastic and mystical nonsense which is the stock-in-trade of literature in Fascist countries to-day. Many of them are being painfully convinced that the promethean fire of enlightenment, meant, no doubt, for all mankind, is being used at present, as Day Lewis has lately put it, to stoke up the furnaces of private profit, that capitalism which at one time was a tremendous emancipatory force has now become static and reactionary, that the profit motive has so secured its stranglehold that capitalism can no longer utilise the new scientific, artistic and educative techniques created by itself. Capitalism, one is coming to feel, has no further use for culture.

This has not been an altogether sudden realisation, though of course barbarities of fascism and its blood-brother, imperialism, have come to many as a rather unlooked-for and painful shock. Premonition of this realisation had been vaguely reflected in the tendency in literature towards "decadence"—a much-hated term which might, I fear, still cause annoyance, but which refers to a quality in certain types of writing which any one with literary sensitiveness cannot fail to notice. Decadence of course, is not a term of abuse, but of definition; it has, besides, positive qualities of its own, for it produces degrees of analytic intelligence and sensitivity hardly to be matched in other and happier periods. Its colours are, as it were, the sunset colours of a civilisation—lovely, no doubt, but presaging the end to a chapter.

Quite sometime ago, Renan had said : "We live on the shadow of a shade, on the perfume of an empty flask. On what will they live who come after us ?" It was not before very long that writers had to worry over this question.

For a while, of course, it was roses, roses all the way ; but the rose lost its scent soon enough under the strain of constant crossing and variations. The unhappy poet began running away, as Auden has put it :

'To islands in your private seas
'Where thoughts like castaways find ease
'In endless petting.'

As things worsened, there were movements in literature, unfortunately too visible, "from irony to cynicism, from anger to exasperation, from wounds to nerves, from the love of living to the will to die." A sense of tragedy degenerated into a sense of despair which in its turn was succeeded by a mere sense of depression. Such was, generally, the mood of the writer when Fascism burst on his unhappy world, with its chronic civil war on the worker at home, and periodic cataclysms of international war. The "pure" artist, consent so long in his ivory tower, was reminded, rudely, of the relevance to present conditions of what Heraclitus had said more than two thousand years ago : "The waking have a common world, but the sleeping turn aside, each into a world of his own." They felt, with greater or less conviction, that he must wake up and fight to defend the cultural heritage which had begun already to decay and was now going to be destroyed by the Fascist barbarians who were menacingly seizing power in one country after another.

All these observations may seem irrelevant to conditions in our own counrty, but, in fact, they are not. We have come to look upon our country to-day as culturally almost a province of Europe. This is, surely, an exaggerated way of putting the thing ; but it is not just fictious. Problems that agitate the writer in the West are here with us, and in a much more intensified form. Writers in Europe,and especially poets, are found to-day to be panting for a public. Ours are

in a much worse predicament. The man whose 'metier' is the short story has often to write long novels for the doubtful delectation of middle-class housewives for whom novels serve much better as a kind of sleeping draught at midday. The late Sir Authur Quiller-Couch once computed that leading poets in England in the last hundred years or so have almost all been wealthy, Keats alone being not fairly well-to-do, and concluded that the poor child in England had as much hope as the son of an Athenian slave to be emancipated into that intellectual freedom of which great writings are born. One need not labour the point that in our country, with its multitudinous problems of poverty and ignorance, problems that our political subjection has fearfully accentuated, the position is a hundred times worse. Intellectual freedom is something of a luxury which we, in our base and practised submission to tyrants both at home and abroad, are hardly able to afford. In the West, again, the poet to-day finds he is no longer popular ; he is slowly but surely deprived of that feeling of writing for a wide audience which understood his language. He begins to write for a tiny circle and uses, inevitably, the private language of personal friends. More recently, there has been felt an urgent need of communicating to a larger audience, and also, sometimes, most hopefully, the imperativeness of a classless society which alone can gurantee the full exercise of the writer's powers. Something of the same process can be discerned here among our writers. On top of everything else, of course our writers are being increasingly reminded of the urgency, from their own standpoint, of fighting imperialism and all its obscurantist allies, for till that fight is won, their work is bound to reflect the anaemia of a society, inured to ages of passivity and servitude.

The writer or the artist who has found his kinship with the fight for a new society does not equate art with action, nor poetry which is something like hand-to-hand fighting with propaganda which is heavy artillery. Art, he knows, has its special function, the grasp and transmission of "experience." He should, however, be pardoned if he wonders why when one writes about spring and a girl's hair and "thirsting breasts", one is writing about "experience ;" but while writing about the struggle in China or a peasant rally or a Jute Mill Strike, one is not writing about "experience." Surely, avowal of marxism is not an automatic passport to artistic genius, but once you get the person with the specific sensibility and the gift of expression, you cannot look on him as a creature in a vacuum. The writer's social affiliation must inevitably condition the character and the flavour of his experience, and in a era of developing class struggle such as ours, collective actions and class purposes significantly enacted in real life may well become themselves "experiences"— so profound and so important that as experiences, they transcend, certainly, flirtations and south winds and stars and nightingales and getting drunk in low-down places.

A critic with a fondness for similes said lately that writers to-day have to switch from the smooth macadam of bourgeois culture which is however leading them obviously into a morass, to a new clay road, hardly yet rollered. Marxists, besides, would add, lest they be misunderstood, that they claim, with perfect honesty, that they are the heirs-apparent to all that is best in traditional culture. We in India also, I hope, have begun to feel it badly. We have adopted, largely, it seems, the worst of both worlds. From our own past, with fatal discrimination, we have taken the mystical-divotional obsession which has long scotched our cultural development ; from the West, we have tried, most disastrously, to borrow sentimental-aesthetic posturings. Our

literature will not acquire reality and vitality unless i broadens so as to include the consciousness of the workin masses of our country. The hard realities of their life, thei zeal and unselfconscious freshness, their innate prac.icalit and simple courage shall be our weapons to root ou: th anaemic tendencies in our cultural heritage which is surely not inconsiderable. For that, of course, a ra lical change in the political, economic and social structure of the country must be achieved. The chief hope for our li.era.u: is our fight for freedom and social justice.

The writers and artists who are on the s de of · he worke and peasant will, of necessity, dur ng the revo utiona y and near-revolutionary periods, find that they must forge their art a sword for use in the struggle which they can avoid. Not before the triumph of the cause can their wo be less concerned with pressing and desperate social issue Lamentations over the inadequacy of New Writing a thus, in reality, out of place. For there is indeed, no for despair, and we may well remind ourselves of wh Oliver St. John said in 1640 in quite another contex: "Have no fear, it must be worse before it is better.' *

* Read before the All India Progressive Writ Conference, Calcutta, 1938, Reprinted from *U nd r M Banner*', 1944, p. 68-74.—Editor.

গণনৃত্যে নতুন প্রচেষ্টা / দিলীপকুমার রায়

নানা দেশে পীপলস্ থিয়েটারের সূচনা হয়েছে। রুষদেশে আমি যাই নি, শুনেছি সে-দেশে এ-জাতীয় সঙ্ঘবদ্ধ সৃষ্টিচেতনা এক নবছন্দে জেগে উঠেছে। মানুষ ধীরে ধীরে নিজেকে উপলব্ধি করে নানা সৃষ্টিতে—এ কে না জানে? ইয়োরোপের দিকে তাকালে দেখা যায় মুষ্টিমেয় থেকেই সমষ্টির চেতনা ব্যাপক হয়ে এসেছে যুগে যুগে, দেশে দেশে। আমাদের দেশে প্রাক-উদয়শঙ্কর যুগের নৃত্যকলা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে লুপ্তপ্রায় হয়ে ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। আমার মনে আছে, দক্ষিণে বিশ বৎসর আগেও বহু চেষ্টা করে তবে তাঞ্জোরে দেবদাসীদের নৃত্য দেখেছিলাম। অথচ দক্ষিণে এ-যুগেও নৃত্যকলার আদর যে জীবন্ত, একথা নিশ্চিত। সুতরাং দক্ষিণেই যদি নৃত্যশিল্পের এই দশা তখন উত্তরের দশা কি, বেশি না বললেও চলবে।

একথা বলছি এই জন্যে যে নৃত্যের অপূর্ব রসরূপ আমাদের কাছে—প্রাক্-উদয়শঙ্কর যুগে—ঝাপসা হয়ে এসেছিল একথা স্মরণ না রাখলে উদয়শঙ্করের অবদানের যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না।

এখানে শান্তিনিকেতনের নৃত্যকলা সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ঘরোয়া ঢঙে ব্যক্তিগতভাবেই বলব—কারণ আমি এইভাবেই সহজ ঢঙে কথা বলতে পারি।

শান্তিনিকেতনের কাছে বাংলার নৃত্যরসিকদের ঋণ অনস্বীকার্য। যখন শান্তিনিকেতনের মণিপুরী নৃত্য প্রথম দেখি তখন মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু একটু নিরাশও যে হই নি এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। নৃত্যের একটি প্রধান রস ছন্দে—চরণাঘাতে। মণিপুরী নৃত্যে—অন্তত শান্তিনিকেতনে যে নৃত্যের চল প্রথম হয় সে নৃত্যে—এই ছন্দকারুর অভাব প্রথম দিকে ছিল; সে নৃত্যের গোড়াকার কথা ছিল যাকে নৃত্য-পরিভাষায় বলে "ভাও-বাৎলানো"। একথা নৃত্যনিপুণ স্বর্গত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও আমাকে বলতেন, তাই আরো সাহসী হচ্ছি এ মন্তব্য করতে।

এর পরেই দেখি উদয়শঙ্করের নৃত্য। সে নৃত্যে মন আমার সব প্রথম পুরোপুরি ভ'রে ওঠে। কারণ নৃত্যে ছন্দকারুর ঐশ্বর্য এখানে পেয়েছিলাম। (উত্তর-উদয়শঙ্কর যুগে শান্তিনিকেতনেও নৃত্যের এই ছন্দের দিকটা বিকাশ পায়, একথা নৃত্যাভিজ্ঞেরা জানেন। আমি নিজেও একথা কয়েক বৎসর আগে কোনো পত্রিকায় লিখেছিলাম)। বহু রেখায় বহু রঙ্গে চরণের বিবিধ প্রদক্ষিণ আমাদের নৃত্যপিপাসু মনের কাছে তেমনি তৃষ্ণার জল যেমন তৃষ্ণার জল সংগীতে সুরের ঐশ্বর্য—সুরবিহার (improvisation)। উদয়শঙ্কর প্রবর্তিত নবনৃত্যে প্রতি পদক্ষেপে চরণছন্দের নানা লাস্যের যে রূপায়ণ হয় তার চমক সে যুগে আমাদের মনে করিয়ে দিত কবি পো-র কথা : "It is a happiness to wonder."

কিন্তু উদয়শঙ্করের উত্তরাধিকারী কোথায়?—মন প্রশ্ন করত। একথা অপ্রতিবাদ্য যে বালা সরস্বতী, গোপীনাথ, রুক্মিণী দেবী প্রমুখ নৃত্যশিল্পীরা নৃত্যে তাঁদের স্বকীয় সৃষ্টিকলানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন—দক্ষিণদেশে। কিন্তু তবু যে-উদয়শঙ্কর নৃত্যে আধুনিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রদূত, সে-উদয়শঙ্করের আলোর ঐশ্বর্যের জের টেনে চলবে কে? এ প্রশ্নের উদয় আমার মনে প্রায়ই হতো, অথচ জবাব পাওয়া ভার হয়ে উঠত।

এই প্রশ্নের উত্তর পেলাম "অমর ভারত" প্রদর্শনীতে—রবিশঙ্কর, শান্তি বর্ধন প্রমুখ শিল্পীদের নবনৃত্য উদ্বোধনে। সেই আনন্দের সামান্য বিজ্ঞপ্তিই এ নিবন্ধের একমাত্র লক্ষ্য। কোনো পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা নয়—তার অধিকারীও আমি নই—সে কাজ স্বভাব নৃত্যশিল্পীর—আর কারুর নয়।

আমার আনন্দ এইখানে যে উদয়শঙ্করের প্রতিভাসূর্য অস্তমিত হলেও নৃত্যের মহানিশা আসবে না, এই ভরসা অবশেষে পেয়েছি। যাঁরা জীবনে সৌন্দর্যের আলো ছড়িয়ে যান তাঁদের দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সে আলোর অবসান নেই। কিন্তু সব সময়ে এ আলোকের বীজে তখনি তখনি নব আলোক বনস্পতি হয়ে প্রকাশ পায় না। তখন হয়তো একটু বিষাদ ছেয়ে আসে তাঁদের মনে যাঁরা স্বভাবতই আশাশীল—অপ্‌টিমিস্ট। কিন্তু এ-ও দেখা গেছে যে, বিস্মৃতপ্রায় প্রতিভার নব বিকাশ হয় অচিহ্নিত পথে, অজানা উপায়ে। একটা উদাহরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের দেশে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাংলা গানে নানা তানের নানা সুরবিহারের কথা মনে পড়ে আজো। সে সময়ে

মনে হতো কোথায় তাঁর উত্তরাধিকারী? কিন্তু যে সুরবিহারের পথ তিনি বাংলা গানে খুলে দিয়ে গেছেন তা থেকে আমি নানা বাঙালী গায়কের তথা তরুণ সুরকারের মধ্যে দেখেছি নব বিকাশ, যথা হিমাংশু দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ, কাজী নজরুল। স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদও এ দিক দিয়ে সুরেন্দ্রনাথের কাছে ঋণী। অথচ সুরেন্দ্রনাথের নাম আজ জানে কয়জন?

উদয়শঙ্করের কথা অবশ্য একটু আলাদা—বহ্নিমান মানুষ তিনি—অগোচর রাখা যায় না তাঁকে। তাঁর প্রতিভা বিশ্বের বিস্ময় একথা অকুতোভয়েই বলা চলে। তাঁর মূর্তি যখন প্রথম দেখি ইন্দ্র বা কার্তিকের বেশে তখন মনে হয়েছিল এক ইয়োরোপীয় মনীষীর কথা প্লেটোর গ্রীক ভাষা সম্বন্ধে: "যদি দেবতা কোনো মর্ত ভাষায় কথা কইতেন তবে সে হতো প্লেটোর ভাষা।' আমার মনে হতো যদি ইন্দ্র বা কার্তিক আমাদের রঙ্গমঞ্চে নরতনু ধরতেন তবে সে তনু হতো উদয়শঙ্করের।

কিন্তু প্রতিভার শুধু আলোর দিকই তো নয়—তার আছে একটা ছায়ারও দিক। উদয়শঙ্করের আবির্ভাব হলে আর কারুর দিকেই চোখ ফেরানো যেত না। এ-কথা খানিকটা হর্ষের বটে—কিন্তু খানিকটা বিষাদেরও বৈ কি। কারণ উচ্চ-বিকশিত নৃত্য—একক নৃত্য না হলে—মূলত একটি সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা—বিশেষ রঙ্গালয়ের নৃত্যগঠনে। কাজেই সেখানে প্রতি নটনটীর আবেদনের কিছু অন্তত মূল্য থাকা উচিত। কিন্তু উদয়শঙ্কর আমাদের সমগ্র চিত্ত এমনভাবে হরণ করতেন যে, আর কাউকে সব হারানো মনের কিছুটাও দিতে পারব কেমন করে?

"অমর ভারত" প্রদর্শনীতে উদয়শঙ্করের সমকক্ষ প্রতিভা চোখে পড়ে নি। সে হয়তো অসম্ভব। রোমাঁ রোলাঁ বলতেন প্রায়ই এই ধরনের একটি কথা—প্রতিভা কোনো দেশেই অপর্যাপ্তভাবে জন্মায় না। এও তিনি বলতেন—প্রতি শতাব্দীতে দু'একটি প্রতিভা এই তো যথেষ্ট—এর বেশী পেলেও কি আমরা আত্মসাৎ করতে পারি? পেলে কি হতো জানি না—তবে পাই না একথা সত্য। কিন্তু সে-তর্ক রেখে নিঃশঙ্কেই বলা যায় যে প্রতিভা মহান হলে আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে এমন গভীরভাবে যে সহজে সে প্রতিভার জুড়ি প্রতিভার দেখা না পেলে মন অভিভূত হতে পারে না। কাজেই আমরা সেই এক একটি মহান প্রতিভার অবদানের স্মৃতি নিয়েই করি রোমন্থন।

তাই "অমর ভারত" সম্প্রদায়ের নৃত্যশিল্প দেখতে যাবার সময় খুব বেশি

আশা নিয়ে যাই নি। বেশি ঠকলে আবার নাহক ঠকতে সাধ যায় কার?

কিন্তু গিয়ে তবু বিস্মিত হয়েছি। উদয়শঙ্কর তাহলে এখনো কিছুদিন অন্তত থাকবেন আমাদের মধ্যে—এঁদের মধ্য দিয়ে। এ-প্রশস্তি কম প্রশস্তি নয় আরো এই জন্যে যে এঁদের মধ্যে উদয়শঙ্করের জুড়ি কেউ নেই।

তবু এ প্রদর্শনীতে যে জীবন্ত শিল্পচাতুরী চোখে পড়ল তাতে ঠিক অভিভূত না হলেও বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। বিশেষ করে 'চতুরঙ্গ' নৃত্যে ও 'গাজনের' রূপায়ণে। বাঙালীর গাজন—তাতে হাসি-অশ্রুর আলোছায়া এভাবে ফোটাতে পারা কম কথা নয়। বিশেষ করে এর গানগুলির সঙ্গত আনন্দ দিয়েছে আমাকে। "হায় হায় কি হবে উপায়"! শুনলে মনটা এক বিচিত্র অনুভবরসে ভরে ওঠে। হর্ষ ও আবছা বেদনা—এই সর্বহারাদের জন্যে। এদের আছে আনন্দ, আছে সৃষ্টিপ্রতিভা, অথচ নেই শিল্পতপস্যার অবসর। তপস্যা বিনা শ্রেষ্ঠ শিল্পের স্বচ্ছন্দ-বিকাশ অসম্ভব। তাই গাজনের শ্রেণীর লোকসংগীত ও লোকনৃত্যকে রঙ্গমঞ্চে আধুনিক মনের কাছে তর্জমা করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ তর্জমা করা সহজ নয়। সস্তা জিনিস সস্তা আনন্দই দেয়। তার মধ্যে দিয়ে আনন্দের চমক-বিস্ফুরণ হতে পারে বড় জোর এক আধটা স্ফুলিঙ্গে। কিন্তু শিল্পের রূপায়ণে এসব ক্ষণিক স্ফুলিঙ্গ বেশি আলোর রসদ জোগায় না। এই জন্যে তথাকথিত folk-art, folk-song নিয়ে দু-চারজন ভাববিলাসী থিয়োরিস্ট জয়ধ্বনি করলেও লোকসংগীত, লোকনৃত্যে খুব গভীর রসের খোরাক কোনো দেশই কখনো জোগায় নি। রুষ লোকনৃত্য যাঁরা দেখেছেন তাঁরা একথার মর্ম সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। এ নৃত্য সুন্দর শোভন, কিন্তু রুষ রঙ্গমঞ্চে যখন এ নৃত্যের তর্জমা হয় তা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। আর মুগ্ধ হবার সময়ে এই আমার মনে হতো (বার্লিনে) যে মাটির প্রদীপে যে-শিখা সে-শিখা চঞ্চল ও ক্ষণজীবী হলেও ঝাড়লণ্ঠনের মধ্যে দিয়েই তার দীপ্তি সম্যক সংহত ও অচঞ্চল হয়ে উঠতে পারে। এর কারণ নির্দেশ করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ একটি পত্রে: "only perfection endures."

সব কিছুতেই। তাই বাউল ভাটিয়ালি মহৎ সংগীত হতে পারে নি অথচ সেই জাতীয়—কি না লোকসংগীতের—উপাদান নিয়েই ভারতের শ্রেষ্ঠ গুরুগম্ভীর সংগীত কীর্তনের সৃষ্টি। ঠিক তেমনি উদয়শঙ্কর নানা লোকনৃত্যকে রূপান্তরিত করেছেন তাঁর নৃত্যমঞ্চে। এ-রূপান্তরের শুধু যে প্রয়োজন আছে

তাই নয়, এ রূপান্তর বিনা কোনো দীর্ঘজীবী রসনিবিড় নৃত্যসৃষ্টি অসম্ভব। আজকাল একথা হয়তো থিওরির খাতিরে একদল লোকে মানবেন না, যাঁরা মনে করেন দারিদ্র্যের মধ্যেই শিল্পের চরম বিকাশ—অতএব (তাঁদের মতে) কৃষাণ নৃত্য, উদয়শঙ্কর বা আনা পাভলোভার নৃত্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নৃত্য, কিম্বা বাউল ভাটিয়ালি ধ্রুপদ খেয়ালের চেয়ে মহত্তর সংগীত। কিন্তু এ ধরনের দু-চারজন অতিবাদীর কথা ধর্তব্যের মধ্যে না নিয়ে বলা যেতে পারে শ্রেষ্ঠ শিল্প সিদ্ধ হয় বহু তপস্যায়। প্রেরণার বীজ বপন করা যায় মুহূর্তে কিন্তু সে বীজে নন্দনকানন রচনা বহু সাধনায় তবে সম্ভব।

এ কথার নব পরিচয় নৃত্যমঞ্চে যেন নতুন করে পেয়েছিলাম 'অমর ভারতে'র গাজন নৃত্যে। এখানে গাজন নৃত্যের নানা শোভন উপাদানই শুধু নির্বাচিত হয়েছে। বাকি হয়েছে বর্জিত। আর এই গ্রহণ-বর্জনের ফলেই এ নৃত্য এত তৃপ্তি দিয়েছে—শ্রবণরঞ্জন তথা নয়নমোহন হয়ে উঠেছে মূর্ত হয়ে।

'চতুরঙ্গ' নৃত্যটি সম্বন্ধেও এই কথা। চারটি নট-নটী মিলে তেওরা তালে দুর্গারাগে নৃত্যগীত—এ একটি অপরূপ রূপ-সৃষ্টি। তেওরায় এত ভালো নৃত্যানন্দ কখনো আমি তো অন্তত পাই নি আজ পযন্ত। তবে হয়তো আমার অগোচরে এখানে ওখানে অপর কেউ কেউ এ শ্রেণীর বিষমপদী তাল সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নেচেছেন বর্তমান দশকে। কিন্তু সে যাই হোক এ নৃত্যটির জন্যে নৃত্যরসিক মাত্রেই এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করবেন।

শেষ নৃত্যটি একটি বিস্তীর্ণ যুগের ক্রমবিকাশের ইতিহাস। সংক্ষিপ্ত লেখায় তার সমালোচনা হওয়া সম্ভব নয়। স্থলে স্থলে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নি। কিন্তু সব জড়িয়ে এঁদের এ-চেষ্টা দুরূহ সিদ্ধিতে উপনীত হবার সম্ভাবনা জ্ঞাপন করেছে—এটুকু বললে সেটার নাম হবে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা। এবং সেই প্রশংসা এঁদের প্রাপ্য—সব জড়িয়ে। এ হেন সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিভাবান নট-নটীদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে শুধু যে আমার আনন্দ তাই নয়—এঁদের গুণগ্রাহী না হতে পারলে এঁদের প্রতি অবিচার করা হতো। উত্তর-উদয়শঙ্কর যুগে উদয়শঙ্করের প্রেরণা যে ইতিমধ্যেই এভাবে নবরূপ গ্রহণ করতে পেরেছে তার জন্যেও তরুণ নট-নটীদের অতন্দ্র সাধনার জয় হোক—এই কথাই সব নৃত্যরসিকদের একান্ত কামনা।*

* পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৫২, পৃ. ৫৭২-৭৫। লেখকের নামের প্রথমে 'শ্রী' ব্যবহৃত হয়েছিল। আমরা 'শ্রী'টি বর্জন করলাম। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক

গণনাট্য সম্মেলন / হেমাঙ্গ বিশ্বাস

গত ৪ঠা থেকে ৯ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৯) এলাহাবাদে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গেল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রায় দেড়শত প্রতিনিধি যোগদান করেন। তাছাড়া দিল্লী, বোম্বে, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ থেকে সাংস্কৃতিক স্কোয়াড এসেছিল। এবারকার এলাহাবাদ সম্মেলন গণনাট্য তথা ভারতের গণসংস্কৃতির আন্দোলনে এক সম্পূর্ণ নতুন পথের সূচনা ও নিশানা। এই নতুন পথেরই প্রতীক হলেন এবারকার সম্মেলনের মূল সভাপতি এবং সংঘে নবনির্বাচিত সভাপতি, বোম্বের জঙ্গী মজুরসন্তান বিখ্যাত মারাঠী গীতিকার ও নাট্যকার আন্নাভাও শাঠে। ১৯৪৭-এর বড়দিনে আমেদাবাদে গণনাট্যের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হয়। তারপর এলাহাবাদ পর্যন্ত এক বৎসরের পথের ওপর অনেক রক্তাক্ত পদচিহ্ন আঁকা আছে যা গণনাট্যের শিল্পীদের মোহ-ভঙ্গেরও অকাট্য দলিল। ডিক্সন লেনে শহীদ সুশীল ও ভাবমাধবই প্রথম গণ-নাট্যকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে যায়।[1] তারপর বিভিন্ন প্রদেশে গণনাট্যের শিল্পীদের ওপর চলে দমননীতির ঝড। এবারকার সম্মেলনে গণনাট্যের সবচেয়ে শক্তিশালী শাখা অন্ধ্রের অনুপস্থিতি, এই পটভূমিকাকেই স্পষ্ট করে তুলেছিল। নির্যাতিত অন্ধ্রের গণনাট্যের নেতার চিঠি প্রতিনিধিদের চোখ সজল করে তুলেছিল এবং বুকে বুকে জাগিয়ে তুলেছিল কঠোর প্রতিজ্ঞা। সম্মেলনের প্রথম প্রস্তাব গণনাট্যের শহীদ সুশীল ও ভাবমাধবের ওপর নেওয়া হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, এই দুই শহীদ প্রথম বুকের রক্ত দিয়ে গণনাট্যের নতুন দৃশ্যপট এঁকে যান। আমাদের নতুন নাটকের এঁরাই প্রথম নাট্যকার।

---

১. ১৯৪৮ সালে কলকাতায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঐতিহাসিক যুব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে আগত যুব-প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা জানাবার প্রাক্কালে কমিউনিস্ট-বিরোধী রাজনৈতিক গুণ্ডাদের সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধ করার সময় শহীদের মৃত্যু বরণ করেন গণনাট্য আন্দোলনের তরুণ-প্রতিভা সুশীল ও ভাবমাধব।—সম্পাদক

দ্বিতীয় প্রস্তাবে ভারতের জনসাধারণের ওপর ব্যাপক দমননীতির তীব্র নিন্দা করা হয়, এবং সংগ্রামী জনতার পাশে দাঁড়িয়ে তাদের দুঃখ ও গৌরবের অংশীদার হিসাবে গণনাট্য সংঘ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। তৃতীয় প্রস্তাবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রগতিশীল শিল্পী, সাহিত্যিকদের ওপর যে হামলা চলেছে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় এবং সমগ্র প্রগতিশীল ও সাহিত্যিকদের এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে লড়াই করবার জন্য আহ্বান করা হয়। চতুর্থ প্রস্তাবে হাওয়ার্ড ফাস্ট, পাবলো নেরুদা প্রমুখ শিল্পীদের অভিনন্দন জানানো হয় এবং ব্রাসলাভে আন্তর্জাতিক শিল্পী-সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকদের মিলিত ঘোষণাকে সমর্থন জানিয়ে ডলার ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বিশ্বের প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে গণনাট্যের সহযোগিতা জানানো হয়। আর একটি প্রস্তাবে ভারতের সমস্ত প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যিকদের একটি সম্মেলন অনতিবিলম্বে আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—গণনাট্যের আদর্শগত মূলপ্রস্তাবটি দুইদিন গভীর আলোচনার পর গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে প্রথমত আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় ক্ষেত্রে শিল্প আজ কীভাবে দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তাই দেখানো হয়। অন্যান্য দেশের মতোই ভারতবর্ষেও শিল্পী ও শিল্পের ওপর নানাদিক থেকে কীভাবে মালিক-শাসকদের হামলা চলেছে তা দেখানো হয় অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা বিশ্লেষণ করে। অন্যদিকে রাশিয়া, চীন, পূর্ব-ইয়োরোপ ও অন্যান্য দেশের বিজয়ী অগ্রগামী জনতার সঙ্গে প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যিকদের দুর্দমনীয় শক্তি ও শিল্পের অভিযানকে দেখানো হয়। গণনাট্যের মূল প্রস্তাবে তাই বলা হয়—পৃথিবীর শিল্পসাহিত্যও আজ দুই শিবিরে বিভক্ত, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নিরপেক্ষ শিল্পসৃষ্টি অসম্ভব। গণনাট্য তাই এই সংগ্রামে শোষিতদের পক্ষ নিয়ে—অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক ও সংগ্রামী মধ্যবিত্তদের জন্য শিল্প সৃষ্টি করবে। তাই গণনাট্য সংঘ আজ দলীয় শিল্পী-সংগঠন, যদিও তা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলভুক্ত নয়। এই পথেই শিল্পের ও শিল্পীর মুক্তি। অন্যপক্ষে ধনিকের ধামাধরা শিল্প -তা যে-রূপ এবং যে-মতবাদের আশ্রয় গ্রহণই করুক না কেন—তা শোষিতদের বিরুদ্ধেই নিয়োজিত হচ্ছে এবং জনগণ থেকে বিচ্যুত, শোষক-আশ্রয়ী হয়ে দাসত্বের আত্মঘাতী পথে তা মরণোন্মুখ।

সাংগঠনিক প্রস্তাবে নতুন নীতিকেই কার্যকরী করার চেষ্টা হয়েছে। নীতি

হলো 'কনটেণ্ট' আর সংগঠন হলো 'ফর্ম' বা কাঠামো। তাই বিপ্লবী নীতি গ্রহণ করলেই চলবে না যদি সংগঠনকে তার উপযোগী না করা হয়। গণনাট্য শিল্পীরা এ বিষয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতাই নিয়ে এসেছিলেন। তাই নতুন সংগঠনী প্রস্তাবে চেষ্টা করা হয়েছে ওপরওয়ালা মধ্যবিত্ত শিল্পীদের মোড়লী থেকে গণনাট্যকে মুক্ত করা। এতদিন ওপর থেকেই গণনাট্য নিজেকে নীচের দিকে বিস্তার করে এসেছে; কিন্তু এখন নীচ থেকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের পথ নেওয়া হবে। জঙ্গী মজুর ও কৃষক-আন্দোলনের হাত ধরাধরি করে মৌলিক প্রাথমিক ইউনিটগুলি গড়ে উঠবে এবং তাদের থেকে প্রতিনিধি নিয়েই উচ্চতর কমিটিগুলি গড়ে উঠবে। অর্থাৎ, গণনাট্যে সত্যিকার মজুর ও কৃষক শিল্পীদের নেতৃত্বে গড়ে তোলার এই প্রথম সচেতন প্রচেষ্টা।

৫ তারিখ থেকে ৯ তারিখ প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বিভিন্ন স্কোয়াডের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। গণনাট্যের সত্যিকার পরিচয় হলো রঙ্গমঞ্চের উপর। এই রঙ্গমঞ্চই আমাদের লড়াইয়ের ময়দান। জনসাধারণও আমাদের এখানেই যাচাই করে। তাই এলাহাবাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই আমাদের নতুন মোড় ফেরার সবচেয়ে উজ্জ্বল আলেখ্য। নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব আমাদের প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে প্রকট হয়ে ওঠে। এলাহাবাদের 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'লিডার' প্রভৃতি দৈনিক কাগজে গণনাট্য সম্মেলনের খবর ফলাও করে ছাপানো হয়। কিন্তু আমাদের প্রথম অনুষ্ঠানের পরই সুর বদলে গেল। শেষ পর্যন্ত তা অসংযত গালাগালিতে দাঁড়ালো। এলাহাবাদের নাগরিক মধ্যবিত্ত যারা 'অমর ভারত'-এর মতো "বিশুদ্ধ" চোখ-ঝলসানো নাচ দেখবার জন্য এসেছিলেন, তাঁরা শাপান্ত এবং অনেকেই বাপান্ত শুরু করলেন—স্রেফ প্রপ্যাগাণ্ডা ব'লে। স্থানীয় কংগ্রেসের সভাপতি কাগজে হাঁক ছাড়লেন—এখনো সরকার কেন নীরবে এই 'সঙ' সহ্য করে যাচ্ছেন। হলঘরের আশেপাশে বিশেষ জীবদের আনাগোনা বেড়ে গেল। যে ছাত্র হোস্টেলের একটি ঘরে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেখানে কংগ্রেস এবং আর. এস. এস.-এর লোক গিয়ে ছাত্রদের একটি দলকে হাত করে আমাদের ওপর হামলা করার জন্য চক্রান্ত করলো। শহরে হৈ হৈ ব্যাপার। বুঝলাম সত্যি আমরা শিল্পেও মোড় ফিরেছি। এই স্বীকৃতি এসেছে প্রত্যেক খাঁটি দেশভক্ত ও বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিখ্যাত অধ্যাপক-

জাতীয়তাবাদী" পত্রিকা ও নেতাদের এই কুৎসার বিরুদ্ধে গণনাট্যের সাংস্কৃতিক-অনুষ্ঠানকে অভিনন্দন জানিয়ে এক বিবৃতি দেন। 'অমৃতবাজার' তাও ছাপতে বাধ্য হয়। তবে অনুরাগী ও দরদীরা আমাদের যে সমালোচনা করেন, আমরা সম্মেলনের শেষের দিন আমাদের আত্মসমালোচনায় আমাদের সেই সবলতা ও দুর্বলতা এবং অন্তর্দ্বন্দ্বকে মেনে নেই। একদিকে যেমন অমর শেখের ও বাংলার গান, বোম্বের 'যাদু কী কুসি' নাটক, বাংলার 'নয়ানপুর' নাটক, দিল্লীর 'বিভক্ত পাঞ্জাব' নৃত্যনাট্য, এলাহাবাদের 'প্যাণ্টোমাইম' প্রভৃতিতে নতুন পথের বলিষ্ঠ ইঙ্গিত, অন্যদিকে তেমনি 'অসিনৃত্য', 'লম্বাদি নৃত্য' প্রভৃতিতে পুরাতন "বিশুদ্ধ" শিল্পরূপের প্রতি টানও দেখতে পাই; আবার মাঝখানে মধ্যভারতের উদ্ধব-কুমারের গানে পুরাতন গণসংগীতের হুবহু পুনরুজ্জীবন দেখতে পাই; কিন্তু দেখতে পাই না নতুন জীবন-বেদের মন্ত্র গাইবার জন্য পল্লীসংগীতের রূপান্তর। কোনো কোনো সময়, যেমন কানপুর স্কোয়াডে, জনসংস্কৃতির বিকৃতিও দেখা যায়। তা প্রমাণ করে গণজীবনের গভীরে—অর্থাৎ আজকের শ্রেণীসংগ্রামের মর্মস্থলে—আমরা পৌছাতে পারি নি। আমাদের এই অনুষ্ঠানে গণশিল্পীর সংখ্যাল্পতাও এই একই বিষয় অন্য দিক দিয়ে প্রমাণ করে। এলাহাবাদ তার অকপট স্বীকৃতি; কিন্তু শুধু তা নয়—আগামী গণসংস্কৃতির অভ্রান্ত প্রতিশ্রুতিও বটে। আমাদের নবনির্বাচিত সভাপতি আন্নাভাওয়ের অনন্যকরণীয় ভাষায় বলি, "জনতার লড়াইয়ের মধ্যে আমাদের কলা এবং কলাকার দুই-ই জন্ম নেয়। এখন আমাদের শিল্পীরা উপরগামী—অর্থাৎ উপর থেকে জনতার মিছিল দেখেন আর গণশিল্প সৃষ্টি করেন—তাঁদের মনোমতো। কিন্তু আমরা জনতার মাঝখানে থাকব—আবার হবো তাদের পুরোগামী।"*

পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৫৫, পৃ. ৪৭৫-৭৮। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্র-বিরোধিতা প্রসঙ্গে

…"যে ক্ষুদ্রপ্রাণ বালখিল্যের চপলতায় তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বিচলিত হইয়াছেন, অনাগতকালের প্রতি দাবি জানাইয়া তাহার মধ্যবিত্ত স্বপ্নদর্শনকে তিনি উপেক্ষা করিলে পারিতেন। সুতরাং 'ঐ যে বলিস, বিছানা তোর ভুঁয়ে চেটাই পাতা,'১ * * প্রভৃতি মারাত্মক মারও বিলকুল বিফলে যাইবে। বঙ্গজ বুদ্ধদেবরা রসিকতা বুঝিলে অনেকদিন পূর্বেই স্বেচ্ছায় মহাপরিনির্বাণ লাভ করিতেন, কিন্তু Pachyderm is a pachyderm always! ইহার পরেও হয়তো কম্যুনিস্ট বুদ্ধদেব বাহান্ন-কাহার-বাহিত পালকির শব্দ শুনিবেন এবং অনাগত ভবিষ্যতে তাঁহারই উদ্দেশে রাজকন্যার সখীসহ আগমনের স্বপ্ন দেখিবেন। কিমাশ্চর্যং অতঃপরম্!"

[শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৪৫, পৃ. ৫৯৩-৯৫]

"শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু অতি সম্প্রতি বামপন্থী হয়েছেন। গল্পে তাঁর বামপন্থার উদাহরণ পেয়েছি আমরা—রিক্সাওয়ালা আরোহীকে রিক্সা থেকে ইচ্ছা ক'রে ফেলে দিচ্ছে, নয়তো কাপড়ের দোকানের কর্মচারীরা দোকানের কর্তাকে ধরে মারছে। প্রবন্ধে তিনি আক্ষেপ করেছেন, চড়বার জন্যে তাঁরও একটা মোটর থাকবে না কেন?…সোশ্যালিজ্‌ম'-এর 'ক খ' আওড়ে তিনি সোশ্যালিস্ট হয়ে উঠেছেন আপন স্বার্থ চরিতার্থ করবার আশায়।…প্রগতি সম্মেলনের বক্তৃতায়ও বুদ্ধদেববাবু সাহিত্যের দারিদ্র্য সম্বন্ধে অন্ধ থেকে এই আক্ষেপ করেছেন যে, তাঁদের সাহিত্য বহুল প্রচার লাভ করছে না।…যদি সাহিত্য জনসাধারণের মনোভাব লুণ্ঠন বা নির্দেশ না করতে পারে তবে তার অনাদর অবধারিত।… (বুদ্ধদেববাবুর) বইগুলি সংস্কারাচ্ছন্ন একজন পেটিবুর্জোয়া লেখকের বুর্জোয়া জীবনের স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। বুদ্ধদেববাবু প্রগতি আন্দোলনকে আপন সাহিত্যপ্রচারের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেই নিরস্ত নন। তাঁর 'কবিতা' পত্রিকাশ্রিত

---

১. প্রগতি লেখক সম্মেলনে বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্র-সমালোচনার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিবাদ। [দ্র. সময়হারা, প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৫]—সম্পাদক

একদল বন্ধুকেও তিনি সঙ্গে নিতে চান। এই বন্ধুদল নিজেদের সামান্য স্বাতন্ত্র্যকে প্রসারিত পথে চালিত করতে পারেন নি। যেখানে তাঁদের আরম্ভ সেখানেই তাঁদের সমাপ্তি হয়েছে। কাজেই অঙ্গারে ফুঁ দিয়ে আগুন বার করবার বৃথা চেষ্টা বুদ্ধদেববাবু যতই করুন না, বাঙ্গালী পাঠকশ্রেণী ওদিকে আর সহজে দৃষ্টিপাত করতে চাইবে না।···সময়ের মাপকাঠি হাতে নিয়ে যদি বুদ্ধদেববাবু 'রবীন্দ্রস্রষ্টাযুগ অতীত হয়েছে' বলে থাকেন, তবে তাঁর সেই শিশুসুলভ যথার্থ-বাদিতা উপহাসেরও অযোগ্য।"*

[পূর্বাশা, পৌষ ১৩৪৫, পৃ. ১১১-১২]

* ১৯৩৮ সালে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সারাভারত সম্মেলনে পঠিত বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধটি দেখার পর রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই 'শনিবারের চিঠি' ও 'পূর্বাশা' পত্রিকায় উপর্যুক্ত বক্তব্য প্রকাশিত হয়।—সম্পাদক

পরিশিষ্ট২

যুদ্ধ ও ফ্যাসি-বিরোধী সঙ্ঘ / নেপাল মজুমদার

ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণের (২রা অক্টোবর, ১৯৩৫) পর থেকে ইয়োরোপে প্রায় সর্বত্রই ফ্যাসিস্টরা সঙ্ঘবদ্ধ ও উগ্র মারমূর্তিতে দেখা দিতে থাকে। ৫ই মে (১৯৩৬), আবিসিনিয়ার পতন ঘটে। ঐ দিনই রোমে 'পিয়া ভেনেজিয়া' প্রাসাদ থেকে মুসোলিনী সদম্ভে ঘোষণা করে, 'আবিসিনিয়া ন্যায়ত ইতালিরই, কারণ ইতালি তার তরবারির জোরে ও সভ্যতার শক্তিতেই তা অধিকার করেছে। সভ্যতা ও বর্বরতার দ্বন্দ্বে, সভ্যতাই জয়লাভ করেছে।'

আবিসিনিয়ার পতনের পর বিশ্বপরিস্থিতির ক্রমেই অবনতি ঘটতে থাকে। বস্তুতপক্ষে ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশ 'শান্তি ও নিরপেক্ষতা' অজুহাতে ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলিকে বাধা না দিয়ে তোয়াজ করেই চলেছিল। ১ জুলাই (১৯৩৬) ইতালির বিরুদ্ধে 'স্যাংশন্' (যা নামে মাত্রই ছিল) প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ঐ দিনই 'রেডিও রোম' সংবাদ প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হয়েছিল। এই সংবাদে রোমে মহোল্লাস পড়ে যায়। তার দু-তিন দিন পরে —১৮ই জুলাই স্পেনে ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থান শুরু হয়। ঐ দিনই বিদ্রোহী ফ্যাসি নেতা জেনারেল ফ্রাঙ্কো তার মূর সৈন্যের সাহায্যে স্পেনের বৈধ রিপাবলিকান সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে বেশ কিছুকাল থেকেই এই অভ্যুত্থানের গোপন ষড়যন্ত্র চলেছিল এবং হিটলার ও মুসোলিনী তলেতলে এই বিদ্রোহের জন্য ফ্রাঙ্কোকে উস্কানি ও মদৎ যুগিয়ে যাচ্ছিল। ১ জুলাই অভ্যুত্থানের পর ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলি প্রকাশ্যেই একজোটে বিদ্রো ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করতে থাকে। ফলে, স্পেনের নগরে-বন্দরে-শহরে বিদ্রো ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে স্পেনের জনগণ ও সরকারপক্ষীয় সৈন্যদের তুমুল লড়াই চল থাকে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে এই ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংগ্রা চলে।

এদিকে স্পেনে ফ্যাসিস্টদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী তুমুল আলোড়ন ও আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ফ্যাসিস্ট বোমারু বিমান

রাত্রির অন্ধকারে মাদ্রিদ, বার্সিলোনা প্রভৃতি নগর ও শহরগুলিতে প্রবল বোমা বর্ষণ করে সব কিছু বিধ্বস্ত করতে শুরু করে। এমন কি বিদ্যালয়, হাসপাতাল এ্যাম্বুলেন্স্, রেড্ক্রস, শুশ্রূষাকেন্দ্র ও শিশু-আবাসগুলিও রেহাই পেল না। স্পেনে ফ্যাসিস্টদের এই বীভৎস নারকীয় তাণ্ডবলীলার বিরুদ্ধে জগতের গণতন্ত্রবাদী ও বিবেকী শিল্পীরা দলে দলে সশস্ত্র প্রতিরোধ-সংগ্রামে এগিয়ে আসেন। এই সময়ই তাঁদের অস্ত্রচালনা ও সামরিক শিক্ষা দিয়ে আন্তর্জাতিক বাহিনীতে সংগঠিত করা হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য, বিদ্রোহী ফ্যাসিস্ট নেতা ফ্রাঙ্কোর পক্ষে প্রায় ৫ হাজার ইতালীয় ও ৩০ হাজার জার্মান সৈন্য লড়াই করেছিল। তাছাড়া স্পেনে সমস্ত জলভাগে ও উপকূল ঘিরে জার্মান ও ইতালীয় যুদ্ধ-জাহাজগুলি স্পে সরকারকে বিচ্ছিন্ন ও পর্যুদস্ত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল।

অপরদিকে আন্তর্জাতিক বাহিনীতে শুরুতেই প্রায় ৪০ হাজার সৈন্য স্পেনে গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে যুদ্ধ করতে আসেন। প্রায় ৪০০০ ফরাসী, ৪০০ ইতালীয় ও জার্মানী, ৫০০ ইংরেজ ও অন্যান্য দেশের লোক ছিলেন। এ কথায় ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, স্পেন, চেক, সুইস্, হাঙ্গেরিয়ান, বুলগেরিয়া ইতালীয়ান, সার্ব, মেক্সিকান, মিশরী, আরবী, তুর্কী এমন কি ইন্দোচীনের কয়েকজন যোগদান করেন। বলা বাহুল্য, এই সব স্বেচ্ছাসৈনিকরা অধিকাংশ লেখক, শিল্পী, ভাস্কর, অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ, ছাত্র, যুবক ও শ্রমিক ছিলেন এ তাঁদের অধিকাংশেরই কোনো সামরিক শিক্ষা ছিল না। কিন্তু যখন শা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ফ্যাসিস্ট-বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রা ডাক এল, তখন কলম, রঙ-তুলি-ইজেল, পিয়ানো-ভায়োলিন-গীটার ফেলে দি রাইফেল ও সঙ্গীন হাতে দলে দলে তাঁরা ছুটে গেলেন স্পেনের রণাঙ্গনে। এক অপূর্ব মহিমময় দৃশ্য! রক্ত ও বারুদের গন্ধ ও ধোঁয়ার অন্ধকারে সব বিবেকী শিল্পীর প্রজ্বলিত মহান অন্তরাত্মার বিচ্ছুরিত আলোকে হ আলোকিত হয়ে উঠল।

স্পেনের বিখ্যাত কবি এবং আধুনিক ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্য ফ্রেডারিকো গার্সিয়া লোর্কা বিদ্রোহী ফ্যাসিস্টদের গুলিতে নিহত হন। স্পে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদক পাব্লো কসালস্ প্রক গণতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন করার জন্যও অনুরূপভাবে ফ্যাসিস্ট পক্ষ

হাতে নিহত হন। এমনিভাবে স্পেনের কত যে লেখক, শিল্পী ও বিবেকী বুদ্ধিজীবী এই যুদ্ধে নিহত হন তার আর ইয়ত্তা নেই।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে-সব লেখক-শিল্পীরা আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগ দেন, তাঁদের মধ্যে যে দুইজন প্রখ্যাত শিল্পী প্রথমেই প্রাণ দেন তাঁরা দুজনেই ছিলেন ইংরেজ। একজন নারী ও অপর জন পুরুষ—নাম, ফেলিসিয়া ব্রাউন ও র‍্যালফ্ ফক্স। ফেলিসিয়া ব্রাউন ছিলেন ইংলণ্ডের একজন প্রখ্যাত নারী ভাস্কর। তিনি অবকাশ-সম্ভোগের জন্য যখন স্পেনে যান তখন সেখানে বিদ্রোহ শুরু হয়। তিনি স্বয়ং আগ্রহী হয়ে সরকারপক্ষে যোগ দিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন এবং বিদ্রোহীদের গুলিতে রণক্ষেত্রেই প্রাণ দেন। ইতিমধ্যে পৃথিবীর দেশে দেশে স্পেনের ফ্যাসিস্ট আক্রমণ নিয়ে তুমুল আন্দোলন চলতে থাকে এবং আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য দলে দলে স্বেচ্ছা-সৈনিকেরা স্পেন অভিমুখে রওনা হন। 'শাকৃলতওয়ালা কলাম' নামে গঠিত ইংলণ্ডেরও একটি বাহিনী এই আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে স্পেনে যুদ্ধ করতে আসেন। প্রখ্যাত মার্কসবাদী তরুণ সাহিত্য-সমালোচক র‍্যালফ্ ফক্স ও ক্রীস্টোফার কড্‌ওয়েল্ প্রমুখ বহু কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী এই বাহিনীতে ছিলেন। কিছুদিন পর মাদ্রিদ আক্রমণকালে র‍্যালফ্ ফক্স লড়াই করবার সময় বিদ্রোহীদের গুলিতে নিহত হন। পরে অনুরূপভাবে কড্‌ওয়েলও (আসল নাম Christopher St. Jhon Sprigg) নিহত হন। উল্লেখযোগ্য, কড্‌ওয়েলের সুবিখ্যাত "*Illusion and Reality*" গ্রন্থটি তখন যন্ত্রস্থ ছিল। তাছাড়া ইংলণ্ডের প্রখ্যাত লেখক-শিল্পীদের মধ্যে এইচ. জি. ওয়েলস্, নর্মান এঞ্জেলস্, জি. ডি. এইচ. কোল্, ই. এম. ফরস্টার, ডেলাইল্ বার্নস্, জুলিয়ান হাক্স্‌লি, গিল্‌বার্ট মারে, ভার্জিনিয়া উলফ্, জন স্ট্র্যাচি এবং স্টিফেন্ স্পেণ্ডার প্রমুখ অনেকেই স্পেনের ফ্যাসিস্ট বর্বরতার তীব্র নিন্দা করে গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে লেখনী ধারণ করেন। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাহিনীতে বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে মাল্‌রো এবং আঁদ্রে মার্তি, জেনারেল লুকাস্ এবং বিখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে প্রমুখ বিস্তর খ্যাত-অখ্যাত লেখক-শিল্পীরাও যোগদান করেন।

পরাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে এই আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগদান করা সম্ভব-পর না হলেও স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জানিয়ে সারা

ভারতবর্ষ জুড়ে যে তীব্র ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল ভারত-বাসী মাত্রেই তার জন্য গৌরব অনুভব না করে পারবেন না।

স্মরণ রাখা দরকার, ফ্যাসিজমের সূচনাকাল থেকেই রোলাঁ ও বারবুসই ফ্যাসিজমের ভয়াবহ পরিণতি এবং তার ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী-নীতি ও সাম্রাজ্য-লালসা সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে সারা পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ ও ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্পেনে প্রতিবিপ্লব শুরু হলে অল্পকাল পরেই ফ্যাসিস্টদের পৈশাচিক তাণ্ডবলীলাকে প্রতিরোধ করার জন্য রোলাঁ এক আকুল আবেদন জানান (২০শে নভেম্বর, ১৯৩৬)। তাছাড়া ভারতবর্ষে এই আন্দোলনকে ব্যাপকতর করে তুলবার জন্য League Against Fascism and War-এর পক্ষে রোলাঁ ও পল্ লাঁজভাঁ উভয়েই ফৈয়জপুর কংগ্রেসে কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের উদ্দেশে এক আবেদনবাণী পাঠিয়ে-ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রোলাঁর পূর্ব আবেদনটি ভারতবর্ষে বহুল প্রচারের জন্য সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ফ্রান্সিস্ জুরদাঁ তা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে এক পত্র দেন (১লা ডিসেম্বর ১৯৩৬)। পত্রটি এই :

Dear friend,

We are enclosing herewith an eloquent appeal addressed to the conscience of the world by Romain Rolland.

We feel sure that you will associate yourself with this appeal and therefore we make so bold as to ask you to send us a few lines expressing your opinion on the terrible bombardment which the civilian population in Madrid has endured already for so many days.

We attach particularly great value to such a personal declaration from you. Its publication in the press and particularly in Spain will be an important testimony to world opinion and a mark of solidarity with the Spanish people.

Thanking you in anticipation

Yours sincerely,

For the World Committee Aganist War and Fascism

P. P Francis Jourdain

[দ্র. *Modern Review*, January 1937, pp. 120, 105]

রোলাঁর আবেদনটির (২০শে নভেম্বর, ১৯৩৬) মর্মার্থ ছিল এই :

"মাদ্রিদের ধূমায়িত প্রস্তরস্তূপ হইতে আর্তের ভয়ার্ত ক্রন্দন উঠিতেছে। যে গর্বিতা নগরী এককালে অর্ধ জগতের অধিশ্বরী ছিল এবং যাহা অধুনা পাশ্চত্য সভ্যতার এক আলোকোজ্জ্বল কেন্দ্র—আজ আফ্রিকার মূর এবং 'বিদেশী বাহিনী' আসিয়া তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিতেছে ও রক্তের প্লাবন বহাইতেছে। তাহাদের বিদ্রোহী নেতারা যে-স্পেনের হিতৈষী বলিয়া দাবি করিতেছে—সেই স্পেনকেই লুণ্ঠনে তাহারা রত হইয়াছে এবং স্পেনের সভ্যতা পদতলে দলিত করিতেছে।

"সহস্র সহস্র নারী ও শিশু নিহত, অঙ্গহীন এবং জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছে। শহরের সর্বাপেক্ষা জনবহুল অঞ্চলই বোমা-বর্ষণের লক্ষ্যস্থল। হাসপাতাল রেহাই পাইতেছে না। গৌরবময় সুরম্য অট্টালিকাগুলি অগ্নিশিখা লেহন করিতেছে; আজ ডিউক অব আলবার প্রাসাদ, কাল প্রাদো-র বহু শতাব্দীর কারুশিল্প বোমার আঘাতে ভাঙিয়া পড়িতেছে। সমগ্র অধিবাসীসহ ভাল্‌সকুইজ মৃত।

"যে বীর্যবতী নগরীর প্রাচীন রাজন্যবৃন্দ আরব অভিযান হইতে ইয়োরোপকে রক্ষা করিয়াছেন, আজ তাহার বেদনার দিনে, হিটলার ও মুসোলিনী আফ্রিকান ফ্রাঙ্কোর 'গবর্নমেণ্ট'কে সমর্থন করিতেছেন এবং ঐ ব্যক্তি ইতালি ও জার্মান ফ্যাসিস্টগণ প্রদত্ত অস্ত্রে স্পেনকে হত্যা করিতেছে। বিনিময়ে ফ্রাঙ্কো স্পেনের ঐশ্বর্য ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি তাহাদের হাতে তুলিয়া দিতেছে। এই উন্মাদেরা দেখিতেছে না, যে রক্তের মূল্যে তাহারা আজ যে পাপাভিসন্ধি চরিতার্থ করিতেছে, একদিন তাহা ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের অধিবাসীদের উপরই বর্ষিত হইবে; অগ্যকার উচ্ছৃঙ্খল বর্বরতা মাদ্রিদ ও বার্সিলোনার (কারণ কাল বার্সিলোনা ধ্বংস হইবে) পর রোম, বার্লিন, লণ্ডন এবং পারীর দিকে ধাবিত হইবে। ইয়োরোপের মহান জাতিগুলি—যাহারা সভ্যতার মাতৃভূমি, তাহারা আজ ক্ষুধিত শার্দুলের মতো পরস্পরকে পৈশাচিক আনন্দে ভক্ষণ করিতেছে; জাতির সুসন্তানগণ পরস্পরের গলায় ছুরি দিতেছে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, উপস্থিত ও অনাগত দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে।

"মনুষ্যত্ব! মনুষ্যত্ব! আজ তোমার দ্বারে আমি ভিখারী। এসো, স্পেনকে সাহায্য করো! আমাদের সাহায্য করো। তোমাদের সাহায্য করো! কেন না তুমি আমি সকলেই আজ বিপন্ন!

"এই সকল নর-নারী বালক-বালিকা এবং জগতের শিল্প ও ঐশ্বর্যসম্ভার নষ্ট হইতে দিও না। আজ যদি তুমি নীরব থাকো, কাল তোমার পুত্রকন্যা, তোমার স্ত্রী, তোমার জীবনের যাহা কিছু প্রিয় ও পবিত্র, তাহাও একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আজ যদি তোমরা হাসপাতাল, যাদুঘর, শিশুদের ক্রীড়া-উদ্যান, ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বোমাবর্ষণ বন্ধ না করো তাহা হইলে হে জগতের অধিবাসীবৃন্দ, শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক, তোমাদের ভাগ্যও অনুরূপ হইবে। এই সূচনায় তোমরা যদি ইহা নিভাইয়া না ফেলো, তাহা হইলে এই প্রলয়ানলের ধ্বংসের গতি আর কে সংযত করিবে? সমগ্র জগৎ ইহার কবলে পড়িবে।

"সময় নাই! অতি দ্রুত প্রস্তুত হও! উঠো, জাগো, কথা বলো, চীৎকার করো, কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও! আমরা যদি যুদ্ধ বন্ধ না-ও করিতে পারি, তথাপি যাহাতে আন্তর্জাতিক বিধি-ব্যবস্থা সকলে সমান করিতে বাধ্য হয়, সে ব্যবস্থা করিতে তো পারি। এসো আমরা নির্দোষ ও নিরুপায়কে রক্ষা করি! জাতি দল বা ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সর্বজনীন কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সকল মানব একযোগে পীড়িতের সাহায্যে ও সেবায় হস্ত প্রসারিত করুক। ভয়াবহ রণক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া সকল শ্রেণীর পীড়িত, সকল শ্রেণীর জীবিত মানবের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে হইবে।"

[দ্র. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ঠা মাঘ, ১৩৪৩, ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৭]

রোলাঁর এই আবেদন ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক মহলেই অপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। অবশ্য এই ব্যাপারে কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণের আগেই বাংলাদেশের কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টরাই প্রথম আন্দোলন শুরু করেন। লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের (১৯৩৬) পূর্ব মুহূর্তে কলকাতায় কমিউনিস্ট, কংগ্রেস-সোশ্যালিস্ট, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরাই যুদ্ধ ও ফ্যাসি বিরোধী সঙ্ঘের একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করেন। এর অনতিকাল পরেই বিশ্বশান্তি কংগ্রেস-এবং আবিসিনিয়া, প্যালেস্টাইন ও স্পেনের ব্যাপারে বাংলাদেশে এঁরাই প্রধান নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক বাহিনীর অসীম বীরত্বের ও আত্মোৎসর্গের সংবাদে তাদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা ও উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।[1] ক্রমে স্পেনের পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকলে—বিশেষত রোলাঁর

১. ৩০শে জানুয়ারী (১৯৩৭) শনিবার কলকাতা 'মহৎ আশ্রমে' বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্যোগে Ralph Fox-এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে এক জনসভা হয়। সত্যেন মজুমদার, অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, প্রবোধ সান্যাল প্রমুখ বিভিন্ন বক্তা তাঁর মহান আত্মদান ও সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। [দ্র. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭]

ঐ আবেদনবাণীর পর স্পেনে সক্রিয় সাহায্য পাঠাবার জন্য তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠলেন। অল্পকাল পরে তাঁদেরই উদ্যোগে League Against Fascism And War-এর সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায়। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রমুখেরা এই কমিটির সভাপতিপদ গ্রহণের অনুরোধ নিয়ে কবির নিকট উপস্থিত হন। কবি সংবাদপত্রযোগে সব খবরই পাচ্ছিলেন; স্পেনের দুঃখে কবির হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। কবি সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে স্পেনে ফ্যাসিস্ট বর্বরতার তীব্র নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারের সাহায্যের জন্য দেশবাসীর উদ্দেশে এক আকুল-উদাত্ত আহ্বান জানান।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই কমিটির প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হওয়ায় সঙ্ঘের মর্যাদা ও গুরুত্ব খুবই বেড়ে যায়। অধ্যাপক কে. টি. শাহ ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যথাক্রমে কমিটির চেয়ারম্যান ও জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। L. A. Fascism and War-এর ভারতীয় শাখা কমিটির বিশিষ্ট সদস্যরা ছিলেন: আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সরোজিনী নাইডু, এস. ব্রেলভি (সম্পাদক, 'বম্বে ক্রনিকেল'), কে. শান্তনম (সম্পাদক, মাদ্রাজ 'ডেলি এক্সপ্রেস'), আর. এস. রুইকর (সহঃ সভাপতি নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস), তুষারকান্তি ঘোষ, ডঃ ধীরেন সেন, অধ্যাপক সুরেন্দ্র গোস্বামী (সম্পাদক, বঃ প্রগতি লেখক সঙ্ঘ) সাজ্জাদ জহীর (সাধারণ সম্পাদক, নিঃ ভাঃ প্রগতি লেখক সঙ্ঘ), ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, স্বামী সহজানন্দ (সম্পাদক, নিঃ ভাঃ কিষাণ সভা), এন. জি. রঙ্গ (সভাপতি, নিঃ ভাঃ কিষাণ সভা), এস. এ. ডাঙ্গে, পি. ওয়াই. দেশপাণ্ডে, ডাঃ সুমন্ত মেটা, মিঞা ইফ্‌তিকারউদ্দীন, কমলা দেবী, জয়প্রকাশ নারায়ণ, দেবেন সেন, নবকৃষ্ণ চৌধুরী ও ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী প্রমুখ আরও অনেকে।

স্পেনে ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামে পূর্ণ সহানুভূতি এবং অর্থ ও উপকরণাদি দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করবার আবেদন জানিয়ে এই সময় সঙ্ঘের পক্ষ থেকে বারবুস্, রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের ছবি ও আবেদনবাণীসহ SPAIN নামে একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে এই অমূল্য দলিলটি বাজারে প্রায় দুষ্প্রাপ্য বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথের আবেদনবাণীটি ছিল এই:

TO THE CONSCIENCE OF HUMANITY

"In Spain the world civilisation is being menaced and

trampled under foot. Against the democratic government of the Spanish people Franco has raised the standard of revolt. International Fascism is pouring men and money in aid of the rebels. Moors and foreign legionaries are sweeping over the beautiful plains of Spain, trailing behind them death, hunger and desolation.

"Madrid, the proud centre of culture and art is in flames. Her priceless treasures of art are being bombed by the rebels. Even hospitals and creches are not spared. Women and children are murdered, made homeless and destitute.

"The devastating tide of International Fascism must be checked. In Spain this inhuman recrudescence of obscurantism, of racial prejudice, of rapine and glorification of war must be given the final rebuff. Civilisation must be saved from its being swamped by barbarism.

"At this hour of the supreme trial and suffering of the Spanish people, I appeal to the conscience of humanity.

"Help the peoples' front in Spain, help the Government of the people, cry in million voices '*Hal*' to reaction, come in your millions to the aid of democracy, to the succour of civilisation and culture." [*The Statesman, 3rd March*, 1937]

এর কয়েকদিন পর—১১ই মার্চ (১৯৩৭) যুদ্ধ ও ফ্যাসি-বিরোধী সঙ্ঘের উদ্যোগে কলকাতায় এলবার্ট হলে স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারের সাহায্যের আবেদন জানিয়ে এক বিরাট জনসভা হয়। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক সুরেন গোস্বামী, অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়, গুণদা মজুমদার, ডঃ রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ সঙ্ঘের কর্মকর্তারা স্পেনের ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামের তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করে স্পেন-সাহায্য-তহবিলে দেশবাসীকে অকাতরে সাহায্য করবার আবেদন জানান। সরোজিনী নাইডু সভায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণের শুরুতেই বলেন:

"স্পেনের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে আজ এই সভা আহূত হইয়াছে। আজকাল প্রায়শই জিজ্ঞাসা করা হইয়া থাকে, আমরা নিজেদের সংগ্রাম লইয়া ব্যস্ত,

আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কলহ বর্তমান রহিয়াছে এবং এই সাম্প্রদায়িক কলহকে অন্তর্বিপ্লব বলা যাইতে পারে—আমরা কেন এই দূরদেশস্থ স্পেনবাসীর জন্য শক্তিক্ষয় ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতে যাই? আমরা ঐ সুদূর সমুদ্রতীরবর্তী অজ্ঞাত, অখ্যাত ও মধ্যযুগীয় একটা দেশের জন্য—যে-দেশের আধুনিক ইতিহাসে কোনো মূল্য নাই—যে দেশে আমেরিকার পরিব্রাজকগণ নানা দৃশ্য ও ষাঁড়ের লড়াই দেখিতে যায়—সেই দেশের ব্যাপার লইয়া আমরা কেন এত মাথা ঘামাইব? কিন্তু কে ভাবিয়াছিল যে, এই ক্ষুদ্র দেশটিতে যে-দেশ পৃথিবীর আধুনিক যুগের ভাবধারার প্রভাব হইতে সর্বদাই বহুদূরে দাঁড়াইয়া থাকিত, সেই দেশে দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংগ্রাম দেখা দিবে। কে ভাবিয়াছিল যে, ইহা চক্ষের পলকে এখন দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইবে, যাহাদের মধ্যে ভারতবাসীকেও অবশ্যই একটি বাছিয়া লইতে হইবে। আমি সর্বদাই এই কথা বলিয়া থাকি যে, যেখানে—যে-সংগ্রামে গণতন্ত্রের নীতি ও অধিকার বিপন্ন সে-সংগ্রাম পৃথিবীর যে কোনো স্থানেই হউক না কেন তাহা হইতে ভারত কখনও বিচ্ছিন্ন ও নিস্পৃহ থাকিতে পারে না। এই জন্যই আমরা আজ এইখানে সমবেত হইয়াছি; সমবেত হইয়াছি এই জন্য নয় যে, স্পেন আমাদের সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইয়াছে। পরিশেষে স্পেনের ভাগ্যে যাহাই থাকুক না কেন সেই ভাগ্যের সহিত আমাদের ভাগ্যও জড়িত আছে বলিয়াই আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি।

"...যাহারা আজ গণতন্ত্রের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত, তাহাদের পশ্চাতে যে আমাদের সঙ্ঘশক্তি রহিয়াছে, এই কথা সামান্য অঙ্গুলি-সংকেতে জানাইয়া দেওয়াও আমি পণ্ডিত জওহরলালের মতো সম্মানের কাজ বলিয়া মনে করি। স্পেনের ভাগ্যে কি আছে তাহা লইয়াও আমি বিব্রত নই। আমি বিব্রত এইজন্য, সমগ্র ইয়োরোপ স্পেনের এই আন্তর্বিপ্লবের শোণিত সমুদ্রে নিজেরই ভবিষ্যতের চিত্র দেখিতে উদ্যত।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৪৩, ১২ই মার্চ, ১৯৩৭]

ঐ দিনই সভায় স্পেন-সাহায্য-তহবিলের উদ্বোধন হয়।

এই সময়ই কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল এবং League Against Fascism And War-এর সারা ভারত কমিটির উদ্যোগে স্পেন-সাহায্য কমিটি গঠিত হয়। স্পেনের সংগ্রামরত জনগণের জন্য সাহায্যসংগ্রহ এবং এই সংগ্রামের

গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য ও শিক্ষাটি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাখ্যা করবার উদ্দেশ্যে বাংলা কমিটি কলকাতায় একসপ্তাহব্যাপী সভা-সমিতি-মিছিলের কার্যসূচী গ্রহণ করেন। ১২ এপ্রিল (১৯৩৭), বঙ্গীয় স্পেন-সাহায্য কমিটির উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ারে 'স্পেন-সপ্তাহের' প্রথম দিবস উপলক্ষে এক বিরাট জনসভা হয়। 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের' সম্পাদক সুরেন গোস্বামী সভায় সভাপতিত্ব করেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণদা মজুমদার প্রমুখ কমিটির নেতৃস্থানীয়দের কয়েকজনই সভায় বক্তৃতা করেন। পরদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হয়। কলকাতার ছাত্র ও যুবসমাজ এবং আগুয়ান শ্রমিকশ্রেণীই এই আন্দোলনে যে গৌরবজনক ভূমিকা গ্রহণ করেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বলা বাহুল্য, স্পেনের ব্যাপারে দীর্ঘকাল ভারতে এই আন্দোলন চলেছিল। শুধু আবিসিনিয়া ও স্পেনের ক্ষেত্রেই নয়, এর অনতিকাল পরে ফ্যাসিস্ট শক্তি যখন চীন, সুদেতন ও চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করে তখনও রবীন্দ্রনাথ এবং এই যুদ্ধ ও ফ্যাসি-বিরোধী সঙ্ঘই তার প্রতিবাদে দেশে প্রবল আন্দোলন চালিয়েছিলেন।*

* রচনাটি "লেখা ও রেখা" পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৫ সংখ্যা থেকে লেখকের অনুমতিক্রমে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করা হলো। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক

প্রগতি লেখক-আন্দোলনের সূচনাপর্ব / নেপাল মজুমদার

১৯৩৫ সালের মার্চ-এপ্রিলের কথা। জার্মানীতে তখন নাৎসীবাদের প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলা চলেছে। কমিউনিস্ট ও ইহুদী নিধন পর্বের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন চিন্তা ও বিবেক-বুদ্ধিকেও সেখানে টুঁটি টিপে হত্যা করা হয়। হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক, শান্তিবাদী ও স্বাধীন চিন্তাবিদকে জার্মানী থেকে বিতাড়িত করা হয়। বলা বাহুল্য, সাহিত্যিক ও দার্শনিকরাও বাদ গেলেন না। হিটলার ও নাৎসীরা চূড়ান্ত ক্ষমতায় আসার (১৯৩৩) পরই সর্বপ্রথম সংবাদপত্র ও সাহিত্যের কণ্ঠ-রোধ করতে এগিয়ে এল। শুধু কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল সাহিত্যই নয়,—সেই সঙ্গে যে-সমস্ত গ্রন্থে স্বাধীন চিন্তার লেশমাত্রও আছে, সেগুলিকে হয় পুড়িয়ে ফেলা হয় নতুবা বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ করা হয়। এই সম্পর্কে রোঁলাঁ লিখেছেন :

"ইয়োরোপের যে-সকল আন্তরিক লেখকগণ সংগ্রামে যোগদান করা সম্পর্কে মন স্থির করিতে পারেন নাই, তাহাদের জবাব দিয়াছে ইতিহাস। ১৯৩৩ সালের ১০ই মে বার্লিনের স্কোয়ারে-স্কোয়ারে জার্মান ফ্যাসিস্টরা যে-সকল বই পোড়াইয়া বহ্ন্যুৎসব করে সেগুলি কেবল স্ট্যালিন, গোর্কি অথবা রেনের মতো জার্মান মজুরদের লেখা বই নহে, সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত মানবপ্রেমিক লেখকদের রচনাও উহাদের মধ্যে ছিল।……

[দ্র. 'শিল্পীর নবজন্ম,' পৃ. ৩৬২]

বলাবাহুল্য, এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পুস্তক-পুস্তিকাগুলিও বাদ যায় নি।

কিন্তু ফ্যাসিস্ট ও নাৎসীদের সাম্রাজ্যলালসা ও ব্যাপক যুদ্ধপ্রস্তুতি তখন সারা পৃথিবীর দুশ্চিন্তা ও ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত জাপান, ইতালি এবং বিশেষ করে জার্মানীতে তখন পুরোবেগে যুদ্ধ প্রস্তুতি চলেছে। ১৯৩৫ সালের ৯ই মার্চ হিটলার প্রকাশ্যেই জার্মান বিমানবাহিনী গঠন করার কথা ঘোষণা করেন; তার এক সপ্তাহ পরে (১৬ই মার্চ) সারা জার্মানীতে Conscription বা বাধ্যতামূলক সামরিকবৃত্তি আইন জারি হয়। এইভাবে হিটলার প্রকাশ্যেই জার্মানীর বিশাল এক সেনাবাহিনী ও বিমানবহর গঠনের

প্রস্তুতি চালালেন। হিটলারের লুব্ধ দৃষ্টি তখন অস্ট্রিয়ার দিকে। ডলফাস্ হত্যার পর হিটলার প্রকাশ্যেই অস্ট্রিয়া আক্রমণের তোড়জোড় করতে থাকেন। অপরদিকে আবিসিনিয়া আক্রমণের জন্য মুসোলিনীও তখন প্রবল রণহুঙ্কার ছাড়ছেন।

ফ্যাসিজমের এই দানবিক ঔদ্ধত্য ও যুদ্ধপ্রস্তুতিকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য রোলাঁ, গোর্কি ও আঁ্যারি বারব্যুস্ সারা বিশ্বের বিবেকী ও প্রগতিশীল সাহিত্যিক-দের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ-আন্দোলনের উদ্দেশ্যে এক সম্মেলন আহ্বান করলেন। ১৯৩৫ সালের ২১শে জুন প্যারিসে এই সম্মেলন হয়। আঁদ্রে জিদ্, ই. এম. ফর্স্টার, আঁদ্রে মাল্‌রো, অল্‌ডস্ হ্যাকস্‌লি, জুলিয়াঁ বাঁদা, ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্ক, মাইকেল গোল্ড ও জন স্ট্রাচি প্রমুখ বহু খ্যাতনামা (বলাবাহুল্য এঁরা কমিউনিস্ট নন) সাহিত্যিক ও মনীষী এতে যোগদান করেছিলেন। একদিকে যেমন তাঁরা ফ্যাসিস্ত বর্বরতার তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করলেন অপরদিকে তেমনি সাহিত্যিকদের প্রকৃত জনসংযোগ ও নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে প্রগতিশীল ভাবধারার জন্য আন্দোলনের আহ্বান জানালেন। প্রখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদ্ তাঁর ভাষণে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে বললেন :

"আমার বৈরিতা আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নয় ; সেই সংস্কৃতির ঝুটা রীতিনীতির বিরুদ্ধে। আমি দৃঢ়স্বরে বলি, তারাই হচ্ছে সংস্কৃতির শত্রু যারা মিথ্যাকে সমর্থন করে এবং সেই সঙ্গে আমাদের বর্তমান মিথ্যাচারী সমাজ-ব্যবস্থাকে সমর্থন করে। আমি দৃঢ়স্বরে বলি, সংস্কৃতির শত্রু আজ ফ্যাসিস্তরা, নাৎসীরা এবং আমাদের স্বদেশের জাতীয়তাবাদীরা।"

সাহিত্যে বাস্তবতা ও প্রকৃত গণসংযোগ এবং সাহিত্যিকের নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে (বিশেষত বুর্জোয়া-সমাজে) সচেতন করে দিয়ে তিনি বলেন,

"......"সংযোগ স্থাপনই অবশ্য লেখকের লক্ষ্য হবে, কিন্তু সব সময়ে প্রথম চেষ্টাতেই তিনি এতে সফল হবেন না। আমার নিজের কথা ধরুন (আমার নিজের সম্বন্ধে উল্লেখ করার জন্যে ক্ষমা করবেন) আমি জন্মে ও শিক্ষায় বুর্জোয়া হলেও আমার সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভ থেকেই অনুভব করতাম যে, আমার মধ্যে যা কিছু খাঁটি, যা কিছু মূল্যবান, যা কিছু সাহসিক, তার সঙ্গে প্রচলিত রীতিনীতি অভ্যাস ও আমার পারিপার্শ্বিক মিথ্যাচারের ঠোকাঠুকি লাগছে।

আমার মতে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রকৃত সাহিত্যকে বিরোধিতার হতে হবে, না হয়ে উপায় নেই।

..... "সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সামনে আজ অভূতপূর্ব দৃশ্য ধরেছে, এর গুরুত্ব বিরাট, আশাতীত ও আদর্শস্থানীয়। এই সেই দেশ যেখানে লেখক সোজাসুজি তাঁর পাঠকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। আমাদের যেমন স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাটতে হয়, এখানে তার বদলে লেখককে শুধু স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে দিতে হয়, তাঁর চারদিকের বাস্তবে তিনি একই সঙ্গে পান প্রেরণা, পদ্ধতি ও তাঁর রচনার পদ্ধতি। · এখনও আমাদের সামনে রয়েছে সংগ্রাম, এখনও গর্ভধারণকাল ও প্রসববেদনা। আমি বিরাট পটভূমিকায় আঁকা নবকালের বার্তাবাহী রচনার জন্যে প্রতীক্ষা করছি, যে রচনার মধ্যে দিয়ে লেখক বাস্তবকে অতিক্রম করে তার অগ্রদূত হবেন, বাস্তবকে পথ দেখিয়ে যাবেন আগে আগে।" [দ্র. 'প্রগতি', পৃ. ১৮-২২]

ই. এম. ফর্স্টার তাঁর ভাষণে বললেন:

"এই পরিষৎ যখন বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করে আমাকে গৌরবান্বিত করলেন এবং তার একটি বিষয় নির্বাচন করতে বললেন, তখন উত্তরে আমি জানিয়েছিলাম যে আমার বিষয় হবে 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা' অথবা 'সংস্কৃতির ঐতিহ্য'—পরিষদের যেটা মনঃপূত, তবে উভয় প্রসঙ্গে আমি একই বক্তৃতা করব বলে স্থির করেছি।"

ফ্যাসিবাদ এবং 'ফোবিও-ফ্যাসিবাদ'—উভয় ব্যবস্থার নিন্দা করে তিনি বললেন, "আমি চাই সাহিত্যসৃষ্টিতে ও সাহিত্যবিচারে পূর্ণতর স্বাধীনতা।"

পরিশেষে আসন্ন যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে গিয়ে তিনি তাঁর ভাষণের উপসংহারে বলেন:

"এটা নিশ্চিত যে আমাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে, এবং আগামী যুদ্ধও আসন্ন-প্রায়। আমার বিশ্বাস যে জাতির পর জাতি যদি রণসম্ভারে কেবলই ভাণ্ডার ভরতে থাকে তাহলে তাদের কামানবন্দুক থেকে গুলিবর্ষণ তেমনই অনিবার্য যেমন অনিবার্য নিরন্তর খাদ্যরত জন্তুর পক্ষে মলত্যাগ।......

"যুদ্ধের দুর্ভাবনা নিজের মৃত্যুর দুর্ভাবনার চেয়েও আমাকে বেশি বিব্রত করে, যদিও ও-দুটো কদর্য ব্যাপারে আমার একই কর্তব্য। ...বর্তমান সঙ্কটের প্রতি-বিধান সম্বন্ধে মতানৈক্য যতই ঘটুক, এবং অনিবার্যরূপে তা ঘটবেই, নির্ভীকতার

প্রয়োজন আমরা সকলেই স্বীকার করি। লেখকের মন যদি ভয়শূন্য ও সংবেদনশীল হয় তাহলে আমার বিশ্বাস যে সাধারণের কাছে আপন কর্তব্য সে পালন করছে; আসন্ন দুর্যোগে মানবজাতিকে দলবদ্ধ করতে সে সহায়তা করছে। এবং আমি এখানে বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত সহযাত্রীদের মধ্যে যে নির্ভীক চিত্তের সাক্ষাৎ পাব, আমার সাহসকেও তা বলিষ্ঠ করবে।" [দ্র. ঐ, পৃ. ২৬, ৩৩-৩৪]

প্যারিস সম্মেলনের পর বিলেতে কয়েকজন ব্রিটিশ ও ভারতীয় লেখকদের মিলিত উদ্যোগে একটি প্রগতি সাহিত্য সঙ্ঘ গঠিত হয়। হ্যারল্ড ল্যাস্কি, হার্বার্ট রীড, মণ্টেগু শ্ল্যাটার, মুলকরাজ আনন্দ, পামি দত্ত, ই. এম. ফর্স্টার প্রমুখ লেখক ও চিন্তাবিদরা এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এরপর ভারতবর্ষেও অনুরূপ উদ্দেশ্য ও আদর্শবাদের ভিত্তিতে প্রগতিশীল লেখকদের সঙ্ঘবদ্ধ ও সংগঠিত করার চেষ্টা চলতে থাকে। এবং কয়েক মসে পরে তাঁরা সফলও হলেন।

১৯৩৬ সালে ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের সময় ভারতবর্ষে শিল্প ও সাহিত্যক্ষেত্রে এই গুরুত্বপুর্ণ ঘটনার সূচনা হয়। ১০ই এপ্রিল লক্ষ্ণৌতে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' (All India Progressive Writers' Association) আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়।

বাংলা দেশে অবশ্য ইতিপূর্বেই 'প্রগতি সাহিত্য' 'গণ সাহিত্য' ইত্যাদি নিয়ে বিক্ষিপ্ত আলোচনা শুরু হয়েছিল কিন্তু তা ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সঙ্ঘবদ্ধ ও সংগঠিত কোনো আন্দোলন ছিল না। তাছাড়া 'প্রগতি সাহিত্য'-এর আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কেও তাঁদের সুস্পষ্ট কোনো ধারণাও ছিল না। লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের সময় কয়েকজন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী এই সর্বপ্রথম বিভিন্ন প্রগতিশীল সাহিত্যিকগোষ্ঠীকে সঙ্ঘবদ্ধ করে সারা ভারতব্যাপী প্রগতিশীল সাহিত্যের এক সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনে প্রয়াসী হলেন। সমস্ত মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং দেশে প্রগতিশীল চিন্তার অবাধ বিস্তারের সূচনা করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য বলে ঘোষণা করলেন। বিখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক মুন্সী প্রেমচাঁদ এবং সাজ্জাদ জহির সারা ভারত কমিটির যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। এর কিছুদিন পরই তাঁরা তাঁদের আদর্শ ও কর্মনীতির ব্যাখ্যা করে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করলেন। তার মর্মার্থ ছিল এই :

"কিছুকাল হতে ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনে আমূল পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে।

প্রগতির পথ যারা এতদিন আটকে বসেছিল তারা যদিও আজ মৃতপ্রায় তবু তাদের জীবনের মেয়াদ বাড়াবার মরিয়া চেষ্টা চলেছে। সনাতনী সংস্কৃতিতে ভাঙন ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যে আটপৌরে জীবনের বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার আত্মঘাতী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আমাদের নূতন সাহিত্য প্রত্যক্ষ ও প্রাকৃতিককে ছেড়ে অপ্রত্যক্ষ ও আধ্যাত্মিকের দিকে ধাবিত হয়েছে, পৃথিবীর মাটি পরিত্যাগ করে অল্প লোকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ফলে তার রচনাভঙ্গী অন্ধ নিয়মানুগত্যের বিষম জালে জড়িয়ে পড়েছে, তার ভাবসম্পদ হয়েছে রিক্ত ও বিকারগ্রস্ত।

"আমাদের সমাজ যে নবরূপ ধারণ করেছে তাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে প্রগতিকামী মননধারাকে বেগবান করা এই আমাদের লেখকদের কর্তব্য। তাঁদের উচিত সাহিত্য-বিচার ক্ষেত্রে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করা যা পারিবারিক যৌন, ধর্ম চিন্তাগত, যুদ্ধবিগ্রহাদি সমস্ত সাহিত্য-প্রসঙ্গ থেকে প্রগতিবিমুখ ও পশ্চাদগামী মনোবৃত্তিকে উন্মূলিত করবে এবং সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ, যৌন স্বৈরাচার, ও সামাজিক অবিচারের যে ছায়া সাহিত্যে পড়েছে তার অপসারণের জন্য তাঁদের সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

"যে পরিবর্তন-বিদ্বেষী শ্রেণীর হাতে থেকে বহুকাল যাবৎ সাহিত্য ও অন্যান্য কলার অধোগতি ঘটেছে, তাদের কবল হতে সাহিত্যকে উদ্ধার করা আমাদের সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। আমরা চাই জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সর্ববিধ কলার নিবিড় সংযোগ। আমরা চাই যে, সাহিত্য প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলুক আর যে-ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আমরা করছি তাকে এগিয়ে আনুক।

"ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ আমরা তার উত্তরাধিকারের দাবি করি এবং আমাদের দেশে নানারূপে যে প্রগতিদ্রোহ আজ মাথা তুলেছে তাকে আমরা সহ্য করব না। ভারতীয় ও বিদেশী উৎস হতে ভাষান্তর সংগ্রহ ও মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টি দিয়ে যা কিছু আমাদের দেশকে নবজীবনের পথে এগিয়ে দেবে তার প্রোৎসাহন আমাদের কাজ হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষের নবীন সাহিত্যিককে আমাদের বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা—ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পরাঙ্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা—নিয়ে আলোচনা করতেই হবে।

যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে, তাকে আমরা প্রগতি-বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজ-ব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপটু, সমাজের রূপান্তরক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।

আমাদের লক্ষ্য :

১) ভারতবর্ষের নানা ভাষাকেন্দ্রে সঙ্ঘের শাখা বিস্তার, সম্মেলন আহ্বান ও পুস্তকাদি প্রকাশ করে বিভিন্ন শাখার সুব্যবস্থিত প্রাদেশিক শাখা ও কেন্দ্রীয় সঙ্ঘের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন ও যেসমস্ত সাহিত্যসঙ্ঘের সঙ্গে আমাদের উদ্দেশ্যগত বিরোধ নাই তাদের সঙ্গে সহযোগিতা; ২) ভারতবর্ষের প্রতি বিশিষ্ট শহরে শাখা স্থাপন; ৩) প্রগতিশীল সাহিত্যসৃষ্টি ও অনুরূপ বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ; ৪) প্রগতিশীল লেখকদের স্বার্থ সংরক্ষণ; ৫) চিন্তা ও মতবাদের অবাধ প্রকাশের অধিকার প্রচার।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ই আষাঢ়, ১৩৪৩, ২৮শে জুন, ১৯৩৬]

সংবাদপত্রে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের ইস্তাহারটি প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পরই সর্বপ্রথম আঘাত এল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভুভক্ত রক্ষী তৎকালীন 'Statesman' পত্রিকার কাছ থেকে। ৩রা জুলাই এঁদের সিমলাস্থিত বিশেষ প্রতিনিধি এই সম্পর্কে দীর্ঘ দু'কলম ব্যাপী সমালোচনা করে উদ্যোক্তা ও নেতৃস্থানীয়দের বিরুদ্ধে যা অভিযোগ আনলেন তার মর্মার্থ হচ্ছে—এসব প্রগতি সাহিত্য-টাহিত্য কমিউনিস্টদের বাজে বুজরুকী মাত্র। আসলে গত বৎসর মস্কোতে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের ৭-ম অধিবেশনের পর 'কমিণ্টার্ন' ও ব্রিটিশ কমিউনিস্টরা ভোল পাল্টে এই ধরনের প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের আড়ালে তাদের প্রভাব-বিস্তার ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির ফিকির খুঁজছে। তারাই মস্কো, বার্লিন ও লণ্ডনে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মগজ ধোলাই করে ভারতবর্ষে এই আন্দোলন করার নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন বা পাঠাচ্ছেন। কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য তার অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

Communist Propaganda : Moscow Changes Tactics

Some references to one of the Communists' side-tracks in

India may be of interest at a time when they are cultivating the new liberty of tactics allowed them by the Communist Seventh World Congress at Moscow last year.

এরপর 'কমিনটার্ন' ও ব্রিটিশ কমিউনিস্টদের এই প্রগতি সাহিত্য সম্মেলন করার মতলবের বিস্তারিত ফিরিস্তি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সাংবাদিকটি 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের' উৎপত্তির রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের ঘোষিত বা প্রকাশিত ফতোয়াটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সাংবাদিকটি লিখেছেন :

The I. P. W. A. held its first annual conference at Lucknow during the last Congress session, and published the inevitable manifesto. This noted the desperate resistance put up by the spirit of reaction against the "radical changes taking place in Indian society", Indian literature had become anaemic through its fight from reality to a heaven of "baseless spiritualism and ideality," The cure must be scientific rationalism.

* * * * *

That sounds innocuous enough, and even praiseworthy, But it lacks candour to the extent that it is not the whole or most important part of the story, and the manifesto might have attracted more attention if it had said something about the Progressive Writers' antecedents.

One important point is that a large majority of the manifesto's signatories came from well-to-do middle class families, and have had their higher education in England, where for several years the Communist Party has been trying hard to attract just this type of Indian students. The famous raid on the party's headquarters in 1926 produced plenty of evidence of this, and most people will remember the excitement it caused in the English press. When the news paper campaign faided out the party got to work again in 1930 or

'31 decided that it must "work actively among the Indian residents in Britain (workers, sailors, students, etc) and establish the best possible connexions with India through them.

This part of its work, of course, fell to the late Shapurji Sakhlatwala, and many of to-day's Progressive Writers were members of the group he rallied round him. One of their earliest ventures was a Communist monthly, *New Bharat*, which they described as "The Journal of Indians Abroad."

এরপর ভারতীয় কমিউনিস্ট যুবকদের মস্কো ও বার্লিন গ্রুপের কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করে পরিশেষে সাংবাদিকটি লিখেছেন :

These, then are the men who, now returned to India, from the kernal of the *Indian Progressive Writers' Association*. Some probably get posts at wages sufficient to distract them from their old thoughts, others have undoubtedly learned wisdom with maturity ; but many continued to shock their parents,

Events in India were not altogether satisfactory to their point of view, but changes in the Commintern's tactics were brewing before the Seventh World Congress, and here they were anticipated in miniature by amalgamation between the Red Trade Union Congress and the A.I.T.U.C., by its pact with the Congress-Socialists, and by condonation of a new facade of friendliness, towards the Congress proper and other distressingly bourgeois bodies.

Hence a good deal of overlapping could be managed without insubordination to the Commintern. A local leader of the I. P. W. A., for instance, combines service in the foreign-propaganda section of the Congress with work as an accredited and correct Communist ; and any sort of connexion with recognized political institution is useful for the dissemination of 'progressive' literature that has nothing to

do with 'art for art's sake' or with realities of India's traditi onal Civilization, [The Statesman, 7th July, 1936]

* * * * *

উল্লেখযোগ্য, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র তৎকালীন সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বাংলা দেশের এই প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা স্বরূপ ছিলেন। বলাবাহুল্য, তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না। স্টেটসম্যান-এর বিশেষ সংবাদদাতার এই হীন জঘন্য অপপ্রচার এবং সেই সঙ্গে ব্রিটিশ দমননীতি ও সেন্সর বিভাগের চরম কাণ্ডজ্ঞানহীনতার তীব্র সমালোচনা করে পরদিনই তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এর জবাব দিলেন। এখানে তার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হলো :

সাহিত্যে সরকারী দৌরাত্ম্য

"আধুনিক ভারতের ইংরাজশাসন নাগরিকগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করিয়াছে। চিন্তা, বক্তৃতা, সঙ্ঘ, সংবাদপত্র ও নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতা এই দেশে লুপ্ত।······এই সমস্ত আইন এত ব্যাপক এবং পুলিশের স্বেচ্ছাচারবুদ্ধি এমন প্রবল যে, কোন্ পুস্তক 'আপত্তিকর', কিম্বা কোন্ সাহিত্য পাঠ করিলে গোয়েন্দাবর্গের আড্ডায় হাজিরা দিয়া চতুর্দশ পুরুষের ইতিহাস বিবৃত করিতে হইবে, অথবা কোন্ নিষিদ্ধ রচনা কাছে রাখিলে সোজা জেলখানায় পৌছিতে হইবে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। এতৎ সম্পর্কে বাংলা দেশে এই পর্যন্ত কতজন যুবকের দণ্ড হইয়াছে, তাহা হিসাব রাখিলে আমরা হিটলার বা মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত গবর্নমেন্টকে ভারত সরকারের তুলনায় হিংস্র ও বর্বর বলিয়া গালি দিতে পারিতাম না। এই দেশের পুলিশ, গোয়েন্দা ও সেন্সর-কর্তাগণ যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে লেখকগণের পক্ষে যেমন নিছক যৌন-কাহিনী রচনা ছাড়া আর উপায় নাই, তেমনই পাঠকবর্গের পক্ষেও 'দগ্ধহৃদয়ের বার্তা' ছাড়া আর কিছু পড়িবার নাই।······ বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদ হইতে সাম্যবাদ পর্যন্ত সমস্ত কিছুই এই ভয়ঙ্কর সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত এবং এই আচারের সর্বাপেক্ষা পীড়াদায়ক বৈশিষ্ট্য এই যে, যেসমস্ত সরকারী কর্মচারীর সাহিত্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নাই, বিশেষ আইন ও ডিক্টেটারি বিধানের কৃপায় তাঁহারাই অনায়াসে সাহিত্যের এবং পাঠকসাধারণের উপর দৌরাত্ম্য করিতেছেন।

"সম্প্রতি 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা এ বিষয়ে গভর্নমেন্টকে যথেষ্ট উস্কানি দিতেছেন। মায়ের চেয়ে যেমন মাসীর দরদ বেশী তেমনিই 'স্টেটস্‌ম্যান' নিরন্তর সাম্যবাদ সম্পর্কে ভারতবাসীকে সজাগ করিয়া সরকারী দমননীতিকে উগ্রতর করিবার প্ররোচনা দিতেছেন। মস্কো-ফেরৎ কমিউনিস্টদের লাল-আতঙ্ক বিস্তারের কোনো প্রমাণসিদ্ধ সন্ধান না-পাইলেও এই পত্রিকার 'বিশেষ অজ্ঞ' সংবাদদাতাগণ প্রায়শই জুজুর ভয়ে আঁতকাইয়া উঠিতেছেন। গত ৭ই জুলাই তারিখে কাগজে তাঁহারা পুনরায় 'কমিউনিস্ট প্রোপাগ্যাণ্ডা' শীর্ষক দীর্ঘ দুই কলমব্যাপী সংবাদ রচনা করিয়া এই দেশের অজ্ঞ জনসাধরণকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, Progressive Writers' Association নামে গত বৎসর ইংলণ্ডে ভারতীয় ও ব্রিটিশ লেখকদের যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল এবং বিগত লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসে যাঁহাদের ভারতীয় শাখার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল, তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতবর্ষকে রসাতলে লইয়া যাওয়া। এই সমিতি যে ভূমিষ্ঠ হইতে না হইতেই মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণের মতো একেবারে মারমুখ হইয়া উঠিয়াছে, এত বড় বিপজ্জনক খবর আমরা জানিতাম না। ইংলণ্ডে হারল্ড ল্যাস্কি, হাবার্ট রীড্, মণ্টেগু স্লাটার, মুলকরাজ আনন্দ, পামি দত্ত, ঈ. এম. ফরস্টার প্রভৃতি কয়েকজন শক্তিশালী লেখক একটি প্রগতিবাদী সাহিত্যিক সঙ্ঘ গঠন করিয়াছেন। ভারতবর্ষেও এইরূপ একটি সঙ্ঘ গঠনের চেষ্টা চলিতেছে বটে; কিন্তু এই চেষ্টা এখনও দানা বাঁধিয়া ভয়ঙ্কর বস্তুতে পরিণতি লাভ করে নাই এবং তেমন কোনো ভীতিজনক প্রমাণও পাওয়া যায় নাই। গত ২৯ শে জুন তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এই সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহাতে কেবলমাত্র এই কথাই বলা হইয়াছে যে, যে-সাহিত্য এতকাল বুর্জোয়াপন্থী ও আর্টবিলাসী ছিল, উহাকে নবযুগের বাস্তব জীবনের দাবীতে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। সাহিত্যের বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ সম্পর্কে যাঁহাদের কিঞ্চিৎ ধারণা আছে, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, প্রগতিশীল সাহিত্যিক-বৃন্দের এই লক্ষ্য আর্টের দিক হইতে বিতর্কের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ইহারা রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মকে সর্বনাশের পথে লইয়া যাওয়ার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছে, এত বড় মিথ্যা প্রচার কেবল মূর্খতার পরিচায়ক নহে, 'কুকুরকে বদনাম দিয়া ফাঁসিতে' লটকাইবার মতো ইহা এক হীন চক্রান্ত মাত্র! দেড়শত

বৎসরের ইংরাজ-শাসনে যে দেশ ও জাতি মনুষ্যত্বের মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, যাহার গৃহ ও পরিবার অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও স্বাধীনতার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের পক্ষে নিশ্চয়ই এমন কোনো সাহিত্যের প্রয়োজন নাই, যে সাহিত্য তাহাদিগকে জীবনের বাস্তবতা হইতে দূরে রাখিয়া দাসত্বের সুখনিদ্রায় ঘুম পাড়াইয়া রাখিবে। প্রকৃতপক্ষে যাহাতে আমরা সাহিত্যের বিলাসিতা লইয়া মুগ্ধ থাকি এবং জাতীয় দৈন্য. অপমান ও বুভুক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করিয়া প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার শোষণকেই একমাত্র বরণীয় বলিয়া গ্রহণ করি, এই দেশের ধনিক রাষ্ট্র ও সমাজকর্তাগণের ইহাই হইতেছে সর্বপ্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই শাসন কর্তৃপক্ষ জাতীয়তা, সাম্যবাদ কিংবা বাস্তববাদমূলক সমস্ত রচনার গলা টিপিয়া ধরিতেছেন এবং 'আপত্তিকর ও নিষিদ্ধ'—এই দুই ধোঁয়াটে নীতির দোহাই দিয়া পাঠকসাধারণকে নিরন্তর বিপাকে ফেলিতেছেন। 'স্টেটস্‌ম্যান'-এর সম্পাদকমণ্ডলীও এই সরকারী গূঢ় উদ্দেশ্যের সহিত একজোট হইয়া নূতনতর সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"···

[আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪শে আষাঢ়, ১৩৪৩, ৮ই জুলাই, ১৯৩৬]

'স্টেটস্‌ম্যান'-এ ঐ সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার দিন তিনেক পরেই এলাহাবাদ থেকে নিঃ ভাঃ প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক মিঃ এস. সাজ্জাদ জহির তার তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা করে এক প্রেস্‌-বিবৃতি দেন। তার মর্মার্থ ছিল এই :

"স্টেটস্‌ম্যান'-এর সিমলাস্থ 'বিশেষ প্রতিনিধি' কাহারও ইঙ্গিতে লিখিত 'পাঞ্জাব কমিউনিস্ট দল'—এই জমকালো শিরোনামার এক প্রান্তে ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ সম্পর্কে পূর্ণ এক স্তম্ভব্যাপী আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে আন্তর্জাতিক প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দ্রুত বিস্তৃতি দেখিয়া (ছয় মাসের মধ্যে সঙ্ঘের এগারটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে) ভারত গভর্নমেণ্ট যে আমাদের ক্রিয়াকলাপের পশ্চাতে মস্কোর অদৃশ্য হস্ত আবিষ্কারের চেষ্টা করিবেন ও আবিষ্কার করিবেন তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। দায়িত্বহীন সংস্কৃতিবিহীন ও বাস্তবের সহিত সমস্ত সংস্রবহীন একদল ব্রিটিশ ও ভারতবাসী কর্তৃক পরিচালিত, নীতিভ্রষ্ট, জনসাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতিবিবর্জিত ভারত গভর্নমেণ্ট এই দেশে যাহা কিছু সজীব ও শক্তিমান দেখেন, তাঁহারা তাহারই

বিরোধী। অকারণ ভীতির সঞ্চার করিয়া এবং ভয়সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহারা জনসাধারণের দৃষ্টি তাহাদের দিকে আকর্ষণের প্রয়াস পান। চণ্ড আইন প্রণয়নপূর্বক তাঁহারা স্বৈরক্ষমতা হাতে লইয়াছেন সুতরাং মধ্যে মধ্যে ঐ ক্ষমতা প্রয়োগের হেতু আবিষ্কার করা আবশ্যক। আপাতত হেতু দাঁড়াইয়াছে সোশ্যালিজম ও কমিউনিজম।

"গত এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণৌতে নিঃ ভাঃ প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রথম অধিবেশনে গৃহীত সঙ্ঘের ইস্তাহারেই ইহার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। 'স্টেটস্‌ম্যান'-এর বিশেষ প্রতিনিধি উক্ত ইস্তাহারের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া মাতব্বরী চালে মন্তব্য করিয়াছেন, 'আপাতদৃষ্টিতে ইহা নির্দোষ, এমনকি প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে হয়।' কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বিজ্ঞের ন্যায় বলিয়াছেন, 'কিন্তু কোনো কোনো প্রগতি লেখকের অতীত ইতিহাস তলাইয়া দেখিতে হইবে।' তাহার পর লণ্ডনের একদল ভারতীয় ছাত্র কিরূপে 'রেলওয়ে পুল ভাঙ্গিবার ও অন্যান্য ভীষণ অপরাধ অনুষ্ঠানের ষড়যন্ত্র করিয়াছেন' —তাহার এক কৌতুককর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। নেহাৎ তাজ্জবের কথা এই যে, স্টেটস্‌ম্যান-এর বিশেষ প্রতিনিধির মতে এই রক্তপিপাসু ছাত্রদের কর্মতালিকায় নারীধর্ষণ, গোহত্যা, মন্দির-মসজিদ ও গীর্জা অপবিত্রকরণের সঙ্কল্পও আবিষ্কার করেন নাই। 'স্টেটস্‌ম্যান'-এর সবজান্তা বিশেষ-প্রতিনিধির মতে, এই শ্রেণীর লোকেরাই 'এখন ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের গোড়াপত্তন করিয়াছে।' সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, শিক্ষিত চিন্তাশীল ভারতবাসীদের এই সঙ্ঘে যোগ দেওয়া উচিত নহে; এবং তাহা অপেক্ষাও জরুরী বিষয় এই যে, গভর্নমেণ্টের অবিলম্বে এই সঙ্ঘ দমন করা উচিত। আমি গভর্নমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করি, এই সকল মূর্খোচিত কাল্পনিক কাহিনী বিশ্বাস করিব, তাহারা কি আমাদিগকে এমনই অন্ধ বিশ্বাসী মনে করেন? টিকটিকি, চুকলি-খোর ও মোসাহেব দলই যে-গভর্নমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহের একমাত্র সূত্র, ভারত-বাসীদের বিচারবুদ্ধি সেই গভর্নমেণ্ট অপেক্ষা অনেক বেশী। প্রগতি লেখক সঙ্ঘ কোনো গুপ্ত প্রতিষ্ঠান নহে; সুতরাং যে কেহ ইচ্ছা করিলে নিজেই প্রমাণ করিতে পারিবেন যে, 'স্টেটস্‌ম্যান'-এর প্রবন্ধে আমাদের সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ডাহা মিথ্যা। আমাদের সঙ্ঘের অধিকাংশ সদস্যই বিশিষ্ট ভারতীয় লেখক; দৃষ্টান্ত-বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন,—শুধু মুন্সী প্রেমচাঁদ,

প্রফেসর আব্দুল হক, ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডঃ আবিদ হোসেন, ষোশ মালীহাবাদী, এস. ভি. কির্লোস্করকর, বুদ্ধদেব বসু, ডঃ জে. সি. ঘোষ, প্রফেসর জি. এম. তারাস্থম, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—এই কয়জনের নাম উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। আমাদের সঙ্ঘের অনেক সদস্য কদাপি ভারতবর্ষের বাহিরে যান নাই। আমাদের ইস্তাহারে বর্ণিত উদ্দেশ্য যাঁহারা সমর্থন করেন, তাঁহারাই আমাদের সঙ্ঘের সদস্য হইতে পারেন। প্রগতিবাদী সমস্ত ভারতীয় মনীষীদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া সংস্কৃতিকে প্রতিক্রিয়া হইতে রক্ষা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই ঐক্যের ন্যূনতম ক্ষেত্রে আমরা এই কথাই সুস্পষ্ট ব্যক্তি করিয়াছি।

'আমরা ভারতীয় সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী;··· ভারতের নবীন সাহিত্য রচনা করা কর্তব্য।'

"স্টেটস্‌ম্যান ও ভারত গভর্নমেণ্ট এই ব্যাপারে যতটুকু বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি তাহা অপেক্ষা বেশী বুদ্ধি আশা করি না; কিন্তু ভারতের শিক্ষিত সমাজ প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য প্রণিধান করিয়া সঙ্ঘকে সমর্থন করিবেন, তাহা আমি নিশ্চয়ই সমর্থন করি।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭শে আষাঢ়, ১৩৪৩, ১১ই জুলাই, ১৯৩৬]

লক্ষ্ণৌ-এ নিখিল ভারত সম্মেলনের অল্পকাল পরেই কলকাতা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আলিগড়, দিল্লী, লাহোর, বোম্বাই, পুণা, দেরাদুন, ওয়াল্টেয়ার প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের শাখা কমিটি গঠিত হয়। বলা বাহুল্য, কলকাতায় ইতিমধ্যেই নিঃ বঃ প্রগতি লেখক সঙ্ঘের একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী মশায় ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা ও সংগঠক।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এর কয়েকদিন পরই, ১৮ই জুন (১৯৩৬), মস্কোতে ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যু হয়। এ দেশের, বিশেষত বাংলা দেশের, প্রগতি লেখক গোষ্ঠীর কাছে এ যে কত বড় মর্মান্তিক দুঃসংবাদ তা আর বিশেষ ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন হয় না। বাংলা দেশের বিপ্লবী যুবকদের কাছে গোর্কির 'মা' গ্রন্থখানি ছিল যেন 'অগ্নিবেদ'। বাংলা দেশের তরুণ বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকরাই এ দেশে সর্বপ্রথম গোর্কির সাহিত্যকৃতির অনুশীলন-চর্চা এবং তর্জমার কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন। গোর্কির দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাশৈলীই ছিল তাঁদের প্রধান আদর্শ ও অনুকরণের বস্তু।······

উল্লেখযোগ্য, নিঃ ভাঃ প্রগতি লেখক সঙ্ঘ আনুষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ দেবার আগেই বাংলা দেশের সাংগঠনিক কমিটি গোর্কির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের উদ্দেশ্যে ১১ই জুলাই কলকাতায় এলবার্ট হলে এক শোকসভা আহ্বান করেন। ১০ই জুলাই উদ্যোক্তাদের পক্ষে 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল সেটি যথাযথভাবে এখানে উদ্ধৃত হলো :

বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ : ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যুতে শোকসভা

ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যু উপলক্ষে ১১ই জুলাই শনিবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ সময় এলবার্ট হলের কমিটি রুমে এক শোকসভার অধিবেশন হইবে। ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ সভায় যোগদান করিবেন। সর্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

আহ্বায়ক : সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (সম্পাদক, আনন্দবাজার পত্রিকা), কাজি নজরুল ইস্‌লাম, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন (সম্পাদক, এড্‌ভান্স), খগেন্দ্রনাথ সেন।

পরদিন—১১ই জুলাই যথা সময়েই এলবার্ট হলে সভা হয়। ডঃ নরেশ সেনগুপ্ত অবশ্য সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি। তাঁর অনুপস্থিতিতে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সভাপতিত্ব করলেন। বাংলা দেশের প্রগতি লেখক গোষ্ঠীর অনেকেই সভায় উপস্থিত হয়ে গোর্কির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উল্লেখযোগ্য, এর প্রায় এক পক্ষকাল আগে প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব সুতাহাটায় অন্তরীণাবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে কলকাতায় আসেন (২৫শে জুন, ১৯৩৬। তিনিও সভায় উপস্থিত হয়ে গোর্কির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সাফল্য কামনা করে ভাষণ দেন। সবচেয়ে যেটা উল্লেখযোগ্য, গোর্কির প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁর অনুসৃত পথ ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণের প্রতিশ্রুতি নিয়েই এই দিনের সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে 'নিখিল বঙ্গ প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' গঠিত হয়। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় এই সভার যে বিবরণ প্রকাশিত হয় সেটি যথাযথ এখানে উদ্ধৃত হলো :

"গত শনিবার এলবার্ট হলের কমিটি রুমে বাংলার লেখকগণের এক সম্মেলন হয়। ডঃ নরেশ সেনগুপ্তের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্মেলনে বাংলায় নিঃ ভাঃ প্রগতি

লেখক সঙ্ঘের একটি শাখা আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়। সভায় সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী সঙ্ঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিবৃত করেন।

এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে, নিঃ ভাঃ প্রগতি লেখক সঙ্ঘ গত ১০ এপ্রিল লক্ষ্ণৌ শহরে গঠিত হয়। উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুত প্রেমচাঁদ নিঃ ভাঃ সঙ্ঘের সভাপতি। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্পর্কে ইতিপূর্বেই সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

এই দিন প্রগতিক লেখক সঙ্ঘের প্রথম সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে :

১. জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও সর্বদেশের জনগণেব মুক্তি-সাধক ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যুতে বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের এই সভা গভীর শোক-প্রকাশ এবং তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছেন।

২. এই সভা প্রস্তাব করিতেছেন যে, বিভিন্ন দিক হইতে ম্যাক্সিম গোর্কির জীবন ও রচনাবলীর আলোচনা করিয়া একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হউক।

গত ৭ই জুলাই তারিখের 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর সম্পর্কে যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও দুরভিসন্ধিমূলক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, এই সভা তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছেন। 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংস্কৃতি বিস্তারের উদ্দেশ্যে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে যে ঘৃণ্য প্রচারকার্য চালাইয়া থাকেন, উক্ত বিবৃতি তাহারই একটি অংশমাত্র বলিয়া এই সভা মনে করে।

পূর্বেই সংবাদপত্রে কেন্দ্রীয় সমিতির যে ইস্তাহার প্রচার করা হইয়াছে, তদনুযায়ী এই দেশে সংস্কৃতিমূলক শক্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করিবার সঙ্কল্পই প্রগতি লেখক সঙ্ঘ গ্রহণ করিয়াছেন। 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিককার অজ্ঞাতনামা সংবাদ-দাতা মিথ্যা আতঙ্কসৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রগতি লেখক সঙ্ঘকে বিশেষ কোনো রাজ-নৈতিক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া যে দুষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন, এই সভা তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রথম দুটি প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় সভায় উপস্থিত করেন এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শেষ দুইটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া

দেশে প্রগতিমূলক ভাবধারা বিস্তারের বিরুদ্ধে 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার প্রচারকার্য বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বাংলাদেশে প্রগতি-কামী লেখকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাতেই গভর্নমেণ্টের দমননীতি সর্বাপেক্ষা প্রবল, সাহিত্যও ইহার হাত হইতে রেহাই পায় না। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু পুস্তক, কাব্য, উপন্যাস, রাজনীতি সর্বপ্রকারের পুস্তক গেজেটের দু'ছত্র নোটিসে গভর্নমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। দুঃস্থ লেখকগণ তাহার কোনোই প্রতিকার করিতে পারেন নাই। এই ক্রমবর্ধমান বিপদ প্রতিরোধের জন্য এবার দেশে প্রতি-ক্রিয়া-বিরোধী চিন্তাধারা প্রচারের জন্য সমস্ত লেখকগণকে এই সঙ্ঘের সদস্য হইয়া ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতে তিনি অনুরোধ করেন।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, সমস্ত সংকীর্ণতা ও ঈর্ষা পরিত্যাগ করিয়া বাংলার লেখকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে এবং নবযুগের সাহিত্যসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্য-ভাগে রচিত সাহিত্যে মৃত সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে আর চলিবে না। বক্তা অন্যান্য ভাষা হইতে অনুবাদের উপর বিশেষ জোর দেন। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সঙ্ঘের সাফল্য কামনা করিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে আষাঢ়, ১৩৪৩, ১২ই জুলাই, ১৯৩৬]

এর দিন দশেক পর—২১শে জুলাই এলাহাবাদ থেকে সারা ভারত কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহির ৩১শে জুলাই দিনটিকে 'নিখিল ভারত গোর্কি-দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপন করবার আবেদন জানালেন। সেটি এই :

"ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যুতে শুধু যে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী সাহিত্যিকের তিরোধান ঘটিয়াছে, বার্নার্ড শ, আনতোল ফ্রাঁস ও রোমাঁ রোলাঁর ন্যায় আধুনিক ইয়োরোপীয়ান সাহিত্যের অন্যতম দিকপালের তিরোধান ঘটিয়াছে তাহা নয়,—তাঁহার মৃত্যুতে জগৎ এমন একজন মানুষকে হারাইয়াছে, যিনি জনসাধারণের মধ্যে সমাজের নিম্নতম স্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া দীন নির্যাতিত জনগণের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহাদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন। তাহা করিতে গিয়া তিনি কারাদণ্ড, নির্বাসন, তাঁহার পুস্তকের

উপর নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি জারের গভর্নমেন্টের সর্ববিধ অত্যাচার বরণ করিয়াছেন। পরবর্তী জীবনে তিনি যুদ্ধ-বিরোধী ও ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। বিগত গ্রীষ্মকালে প্যারীতে এই সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। ভারতীয় প্রগতিক লেখকগণের আন্দোলন বলিতে গেলে এই আন্তর্জাতিক আন্দোলনের অংশ।

"প্রগতিক লেখক সঙ্ঘ এই মাসের শেষে নিখিল ভারত গোর্কি-দিবস উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং র‍্যাডিকেল সাহিত্যিক আন্দোলনের প্রতি যাঁহাদের সহানুভূতি আছে, তাঁহাদের নিকট আমার অনুরোধ, তাঁহারা আমাদের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া ম্যাক্সিম গোর্কি-দিবসের অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করিবেন। ঐ দিন সভার অধিবেশন হইবে, সভায় গোর্কির গ্রন্থাবলী ও তাঁহার কার্যাবলীর মর্ম ব্যখ্যা করা হইবে এবং আমাদের আদর্শ অনুসারে যে ব্যক্তি প্রায় প্রগতিক লেখক স্থানীয়, তাঁহার জীবন হইতে লভ্য শিক্ষা আলোচনা করা হইবে। কলিকাতা, এলাহাবাদ, আলিগড়, দিল্লী লাহোর, বোম্বাই, পুণা দেরাদুন ও ওয়ান্টেয়ারে প্রগতিক লেখক সঙ্ঘের শাখা আছে। এই সকল শাখা ম্যাক্সিম গোর্কি-দিবস উদ্‌যাপনের বন্দোবস্ত করিবেন।····· জনসাধারণের নিকট বিশেষত ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ ও ছাত্র সম্প্রদায়ের নিকট আমার অনুরোধ তাঁহারা প্রগতিক লেখক সঙ্ঘের সহযোগিতা করিয়া গোর্কি-দিবসের অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করিবেন,এবং আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীরের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবেন।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ই শ্রাবণ, ১৩৪৩, ২২শে জুলাই, ১৯৩৬]

কিন্তু কমিটি নানা কারণে গোর্কি-দিবস উদ্‌যাপনের দিন পিছিয়ে দিয়ে ১৬ই আগস্ট ধার্য করেন। ঐদিন কলকাতার আশুতোষ কলেজে 'গোর্কি-দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশের প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্যোগে এক জনসভা হয়। ডঃ নরেশ সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গোর্কির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ-প্রমুখ মনীষীরা যে বাণী পাঠান সভায় তা পাঠ করা হয়। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এই সভার যে-বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল তা যথাযথভাবে এখানে উদ্ধৃত হলো :

"গত রবিবার ১৬ই আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় কলিকাতা আশুতোষ কলেজে নিঃ ভাঃ ম্যাক্সিম গোর্কি-দিবস উপলক্ষে বঙ্গীয় প্রগতিক লেখক সঙ্ঘের

উদ্যোগে এক জনসভার অধিবেশন হয়। ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী সভার প্রারম্ভে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ ডব্লু. এস্ আর্কুহার্ট ও অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের প্রেরিত বাণী পাঠ করেন। অতঃপর হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট শ্রীযুত জ্ঞানকুমার চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। সভায় শ্রীযুত নীহারেন্দু দত্তমজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বঙ্কিম মুখার্জী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জসিমউদ্দিন প্রভৃতি অনেকে গোর্কির সাহিত্যিক প্রতিভা, তাঁহার সৃজনশক্তি, সমগ্র মানবজাতির—বিশেষভাবে পদদলিত ও পীড়িত মানবের প্রতি অপার প্রেম এবং বিশ্বসাহিত্যে গোর্কির অসামান্য দান প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর সভাপতি নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সভায় উপস্থাপিত করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করেন:

"নিখিল ভারত ম্যাক্সিম গোর্কি-দিবস পালন উপলক্ষে কলিকাতার সর্বশ্রেণীর নাগরিকদের এই সভা জনগণের শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র ও সাহিত্যশিল্পী ম্যাক্সিম গোর্কির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে। মৃত মহাপুরুষ মুক্তি-সংগ্রামে ও সংস্কৃতি প্রচারোদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে তিনি ফ্যাসিজম ও যুদ্ধের দ্বৈত আক্রমণ হইতে মানবসভ্যতার রক্ষাকল্পে সকল প্রগতিবাদীকে একত্রীকরণের জন্য তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন।"

"উপসংহারে সভাপতি মহাশয় আবেগময়ী ভাষায় গোর্কির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। তিনি বলেন, সাহিত্যে গোর্কি এক নূতন ধারা আনিয়াছিলেন। তাঁহার সামাজিক ও ঐতিহাসিক অবস্থা ও গতি দেখিবার-বুঝিবার এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। এই কারণেই তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য সকল শ্রেণীর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মতবাদে বিশ্বাসী নহেন, তাঁহারাও তাঁহার মানবপ্রীতি এবং তাঁহার রচনার রসরূপের সমাদর করিয়া থাকেন। ইহা কম শক্তির কথা নহে। গোর্কি যে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাহা চেষ্টা করিয়া ফরমাইস দিয়া তৈয়ারী করা যায় না। গোর্কি-শ্রেণীর সাহিত্যিকরা জন্মগ্রহণ করে; কোনো রাজনৈতিক দল-বিশেষের তাগিদ বা প্রয়োজনে কোনো সাহিত্যিকই চেষ্টা করিয়া গোর্কি হইতে পারেন

না। বাংলার সাহিত্যিকগণ একাল পর্যন্ত যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, গোর্কির সহিত তুলনায় তাহা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের বস্তু তাহা নহে। আমরা অবশ্যই প্রত্যাশা করিব, বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রেও শক্তিমান সাহিত্যিক আবির্ভূত হইয়া পীড়িত মানবের দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিবেন এবং তাঁহারাও গোর্কির মতো দেশ-কাল অতিক্রম করিয়া সাহিত্যে সর্বমানবের সর্বকালের সম্পদ দান করিবেন। আমাদের তরুণরা গোর্কির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রচনাগুলি যেন অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন।"

রবীন্দ্রনাথ গোর্কির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে যে বাণীটি পাঠান সেটি ছিল এই :

"ম্যাক্সিম গোর্কি স্বীয় মানবপ্রেম ও সাহিত্য-সৃষ্টি দ্বারা বিশ্ব-সাহিত্য ক্ষেত্রে অমর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।"

ইতিমধ্যে বিশ্বপরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। আবিসিনিয়া, স্পেন ও চীনে ফ্যাসিস্তদের সঙ্ঘবদ্ধ বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে ভারতবর্ষে প্রবল বিক্ষোভ-আন্দোলন শুরু হয়। ভারতে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে এবং বিশ্বশান্তি আন্দোলনে 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। তাছাড়া ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে এবং শ্রমিক ও কৃষক-আন্দোলনেও প্রগতি লেখক সঙ্ঘ এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করে।...*

* চতুষ্কোণ, আশ্বিন, ১৩৭৬, পৃ. ৫৩৭-৫৬। অপ্রয়োজনীয় কয়েকটি পংক্তি বাদ দিয়ে লেখকের অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত হলো। শিরনাম, বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।— সম্পাদক

বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে ভারতীয় মনীষীদের বাণী

[গভর্নমেণ্ট কর্তৃক পুস্তক ও পত্রিকাদি নিষিদ্ধ করা এবং আর এক মহাযুদ্ধের আয়োজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভারতের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রচার করিতেছেন। রোমাঁ রোলাঁর আহ্বানে ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ তারিখে ব্রুসেলসে যে বিশ্বশান্তি সম্মেলন হইয়াছে ইস্তাহারটি তথায় প্রেরিত হইয়াছে। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের লেখক, শিল্পী ও মনীষীরা এই ইস্তাহারে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্যোগেই এই প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।]

দেশে এবং বিদেশে সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহা অত্যন্ত আশঙ্কা ও উদ্বেগজনক। উন্মত্ত প্রতিক্রিয়া এবং জঙ্গীবাদ আজ সভ্যতার ভাগ্য লইয়া খেলা করিতেছে এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়াছে। সুতরাং আমরা ইহার বিরুদ্ধে ভারতের লেখক ও শিল্পীগণের এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি যাঁহাদের দরদ আছে তাঁহাদের সকলের প্রতিনিধিরূপে প্রতিবাদ জানানো অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। এ সময়ে আমাদের নীরব থাকা অপরাধ হইবে, সমাজের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য তাহার ঘোর ব্যত্যয় করা হইবে।

ভারতের নাগরিক অধিকার হইতে জনগণকে যেরূপ সাঙ্ঘাতিকভাবে বঞ্চিত করা হইতেছে, তাহা শুধু রাজনীতির দিক দিয়াই সর্বনাশকর নহে, উহা দ্বারা সংস্কৃতি ও জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতি বিস্তারের চেষ্টাকে খোলাখুলি আক্রমণ করা হইতেছে। প্রায়শই যেভাবে পুস্তকাদি বিশেষত সমাজতন্ত্রের মতবাদ ও কার্যপদ্ধতি-সংক্রান্ত পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা হইতেছে তাহা আমাদের মতে অত্যন্ত কলঙ্ককর। নামজাদা বাণিজ্য শুল্ক আইনের (সী কাস্টমস অ্যাক্ট) ১৯ ধারা অনুসারে বিদেশ হইতে প্রেরিত পুস্তক, পুস্তিকা ও পত্রিকা আটক করার কথা প্রায়ই শুনি। শ্রেষ্ঠ সমাজতত্ত্ববিদ হিসাবে সিডনী ও বিয়াট্রিস ওয়েবের প্রচুর খ্যাতি আছে, কিন্তু তাঁহাদের সে খ্যাতি সত্ত্বেও তাঁহাদের লেখা "সোভিয়েট কমিউনিজম" নামক পুস্তক পর্যন্ত ঐ আইনে ভারতে আমদানী করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এমন কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রাশিয়ার চিঠি"-র ইংরাজী অনুবাদ নিষিদ্ধ হইয়াছে। গভর্নমেণ্টের সংস্কৃতি ও প্রগতি-বিরোধী মনোভার ছাড়া ইহার আর কোনো কারণ থাকিতে পারে না। বোম্বাইতে সম্প্রতি লো'র "রাশিয়ান

স্কেচ বুক" বাজেয়াপ্ত হয়; ব্যাপারটি অত্যন্ত বিস্ময়কর হইলেও উহা হইতে সেন্সর-নীতির কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাজেয়াপ্ত বা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের আদেশে নিষিদ্ধ পুস্তক ও পত্রিকার তালিকা প্রকাশ করিলেই বোঝা যাইবে, এ দেশে সরকারী কার্যপদ্ধতি কিরূপ নিন্দার্হ। ইহা ছাড়া, দেশে স্বাধীন ও শক্তিশালী সংবাদপত্র সৃষ্টির বিরুদ্ধে অবিরাম আক্রমণ তো আছেই।

সরকারী হিসাব অনুসারে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ৩৪৮ খানি সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। চিন্তার ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা আমরা ভোগ করি বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহার দুরবস্থা সকলের উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে।

সংস্কৃতির প্রতি যাহাদের দরদ আছে তাহাদের কাছে ভারত অপেক্ষাও ভারতের বাহিরের অবস্থা আরও উদ্বেগজনক। মহাযুদ্ধের প্রেতচ্ছায়া পৃথিবীময় বিচরণ করিতেছে। ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরী খাদ্যের পরিবর্তে অস্ত্র যোগাইয়া এবং সংস্কৃতির সুযোগের পরিবর্তে সাম্রাজ্য গঠনের প্রলোভন ধরিয়া নিজের জঙ্গীবাদী রূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছে। আবিসিনিয়াকে পদানত করিবার জন্য ইতালী যে-সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহা যুক্তি ও সভ্যতার প্রতি বিশ্বাসবান সকলকে কঠিন আঘাত করিয়াছে। বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধিতা, স্থূল জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তিকে ইচ্ছাপূর্বক প্ররোচনা দান, দ্রুত অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধি, সঙ্কটময় পরিস্থিতির এই সব পূর্বসূচনা। আমরা এই সুযোগে আমাদের এবং আমাদের দেশবাসীর পক্ষ হইতে অন্যান্য দেশের জনসাধারণের সহিত সমস্বরে বলিতেছি যে, আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি এবং যুদ্ধ পরিহার করিতে চাই; যুদ্ধে আমাদের কোনো স্বার্থ নাই। কোনো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতবর্ষের যোগদানের আমরা ঘোর বিরোধী; কারণ আমরা জানি যে আগামী যুদ্ধে সভ্যতা ধ্বংস হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়নই হউক, বা নাৎসী জার্মানীই হউক —যেখানে সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে সেখানেই উহার রক্ষার জন্য আমরা উদগ্রীব এবং আমাদের মহৎ উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য আমরা যথাশক্তি সংগ্রাম করিব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জওহরলাল নেহরু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, নন্দলাল বসু, প্রেমচাঁদ প্রভৃতি। ১৪ ভাদ্র, ১৩৪৩*

* দ্র. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ ভাদ্র ১৩৪৩, ৩০ আগস্ট, ১৯৩৬। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

একসূত্রে বাংলার প্রগতি লেখকরা / হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রগতি লেখকদের আন্দোলন বাংলায় ব্যাপক ও সক্রিয় সাড়া তুলেছে। প্রগতি লেখকদের দ্বিতীয় সারা-ভারত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে কলকাতায়, ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে। এই অসাধারণ সভায় যাঁরা যোগদান করেছেন তাঁদের স্মৃতিতে এই সম্মেলন উজ্জ্বল হয়ে আছে। তবে কিছুকাল হলো সঠিক সাংগঠনিক ভিত্তির অভাবে আন্দোলনের গুরুতর ক্ষতি হচ্ছিল। গত মে মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এই ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা হয়—এটি এমন এক ব্যাপার যা স্পষ্টতই বিকারগ্রস্ত আমলাতন্ত্রকে অসন্তুষ্ট করেছে। ফলে, আন্দোলন পুনর্গঠনেব ভার যাঁর ওপরে ছিল 'হান্‌স' পত্রিকার সম্পাদক সেই এস. এস. চৌহান ভারতরক্ষার "আভ্যন্তরিক" আইনে সম্পূর্ণ অকারণে অপসৃত হয়েছেন।

প্রগতি লেখকদের ফ্যাসিস্ট-বিরোধী রূপগ্রহণ

তবে বাংলার লেখকরা ভীত হন নি। তাঁরা জানেন, এই যন্ত্রণাকাতর বিশ্বকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছে এক ধরনের করুণ নির্বুদ্ধিতা। তাঁরা জানেন, তাঁদের পূর্বগামীরা যে গজদন্তমিনারে আশ্রয় নিতেন তা আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে এক ধরনের আলেয়ার আলো মাত্র। তাঁরা জানেন, উটপাখির মতো বালিতে মুখ লুকালেই ঝড় নির্বিবাদে মাথার ওপর দিয়ে পার হয়ে যায় না। বস্তুত তারা পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত। আর তারপরে হিটলার যখন সোভিয়েত দেশকে আক্রমণ করে এবং তার এশীয় সাকরেদ যখন ভারতের প্রতিরক্ষার ওপরে শকুনির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন তাঁরা উপলব্ধি করেন যে যা-কিছু জীবনকে সার্থক করে তোলে তার নির্মম ধ্বংসকাণ্ড ভয়ংকরভাবে আসন্ন। তাঁরা বিপুলভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন ফ্যাসিবাদ নামক নৃশংসতার বিরুদ্ধে জনগণের লড়াইয়ে অংশভাগী হতে।

বাংলায় এমন সব ঘটনা ঘটছিল যাতে সাধারণত এত শান্ত ও নির্বিরোধী যে লেখক ও শিল্পীরা তাদেরও ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সোভিয়েত মৈত্রী সমিতিতে কাজ করছিলেন। কেউ কেউ ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তারপরে যখন এ-বছরের মার্চ মাসের গোড়ার দিকে ঢাকার ফ্যাসিস্টরা স্বভাবসিদ্ধ ধরনে প্রতিহিংসা নেয় এবং শ্রমিক-আন্দোলনে আত্মনিবেদিত তরুণ ও উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন লেখক সোমেন চন্দকে নৃশংসভাবে হত্যা করে, তখন রাজনৈতিক বিশ্বাস নির্বিশেষে লেখক ও

শিল্পীরা ধিক্কার দিয়ে ওঠেন। বহুজনের স্বাক্ষরযুক্ত এই ইস্তাহারে একবাক্যে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করা হয়। শুধু নিন্দা নয়, আরো কিছু বেশি—আমাদের জনগণকে অবহিত করা হয় কেমনভাবে আমাদের প্রিয় দেশের অভ্যন্তরেও ফ্যাসিবাদ বিচরণ করছে এবং তাকে উৎপাটিত করার জন্য কেমন-ভাবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। ২৮শে মার্চ তারিখে ভারতীয় সাংবাদি-কতার শিরোমণি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একটি জনবহুল সভায় সভাপতিত্ব করেন। সুপরিচিত সাহিত্য-যোদ্ধারা এই সভায় ফ্যাসিবাদের নারকীয় দিক-গুলো নিয়ে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লেখক ও শিল্পীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা তোলেন। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ সংগঠিত করার জন্য একটি কমিটি তৈরি করা হয়। কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল এমনি সব তাৎপর্যপুর্ণ নাম : যামিনী রায়, ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের মধ্যে যাঁর চেয়ে বেশি সৃজনশীল আর কেউ নেই; অতুল গুপ্ত ও আয়ুব, শীর্ষস্থানীয় সমালোচক; সত্যেন মজুমদার, হিরণ সান্যাল ও সজনী দাস, সকলেই সম্পাদক; পরিণত গল্পলেখক নরেশ সেনগুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; গল্প-উপন্যাস জাতীয় লেখার শ্রেষ্ঠ শিল্পী বুদ্ধদেব বসু; অমিয় চক্রবর্তী (শান্তি-নিকেতনের), বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও অন্য কবিরা।

পরবর্তীকালে সঙ্ঘ থেকে কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, বুদ্ধদেব বসুর, 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম্'—জোরালো ভঙ্গিতে ও অতীব আন্তরিকতার সঙ্গে লেখা এই পুস্তিকায় এমন একজনকে দেখানো হয়েছে যাঁর মুখ্য আগ্রহ লেখা ও শিল্পমূল্য হওয়া সত্ত্বেও ফ্যাসিবাদকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করার অবস্থায় যাঁকে আসতে হচ্ছে; বিজন রায়ের* 'জাপানী শাসনের আসল রূপ', প্রচার-পুস্তিকা কতখানি স্বচ্ছভাবে লেখা যেতে পারে তার একটি আদর্শ এটি; প্রতিভা বসুর 'ফ্যাসিজম ও নারী', এই পুস্তিকায় সরল ও সার্থকভাবে উপস্থিত করা হয়েছে ভারতীয় নারীদের দৃষ্টিভঙ্গী যারা ফ্যাসিবাদের শোচনীয় দাসত্বের আশঙ্কায় বিপন্ন; বিষ্ণু দে-র জোরালো কবিতা-পুস্তিকা '২২শে জুন', যিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সহ ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের সম্পাদকের কাজ করছেন; রাহুল সংকৃত্যায়নের 'ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ', এই লেখকের নতুন করে পরিচয় দেবার কোনো প্রয়োজন নেই; এবং 'জনযুদ্ধের গান', ত্রিশটি

* অধ্যাপক সুশোভন সরকার-এর ছদ্মনাম।—সম্পাদক

গানের একটি সংকলন, এমনকি দূর দূর গ্রাম থেকে পাঠানো বহু গান থেকে এই ত্রিশটি গান নির্বাচিত, সংকলনটির প্রচুর জনপ্রিয়তা থেকে বোঝে যাচ্ছে যে অবশেষে জনগণের নিজস্ব ভাষায় জনগণের নিজস্ব গান আমরা পেয়েছি। আরো একটি সংকলন, সম্ভবত আরো কিছুটা পরিশীলিত, ছাপা হচ্ছে। এই সংকলনে আছে পঞ্চাশ জনেরও ওপর লেখক—হিন্দু ও মুসলমান, প্রত্যেকেরই একটি করে কবিতা—প্রত্যেকটিই গত ডিসেম্বরের পরে লেখা। কবিতাগুলো আশ্চর্যরকমের ভালো, বিশেষ করে—যাকে বলা হয় সমবেত পাঠ—তেমনিভাবে পড়লে। সংকলনটির অন্যতম সম্পাদক হচ্ছেন ছাত্র-কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, যাঁর গান আজ প্রত্যেকের মুখে মুখে। লেখা হচ্ছে চীনা ও রুশ থেকে প্রচুর সংখ্যক অনুবাদ—যুদ্ধের নক্‌শা, গেরিলা কাহিনী, কবিতা ইত্যাদি। কতকগুলো ইতি-মধ্যেই বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকাগুলোতে ক্রমেই বেশি বেশি সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে আমাদের লেখকদের লেখা ফ্যাসিস্ট-বিরোধী প্রবন্ধ ও কল্পনাশ্রয়ী রচনা।

সম্প্রতিকালে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের একটি অতি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে গান গাওয়া এবং এটি খুবই ফলদায়ক। এতে জনগণের সকল শ্রেণী থেকে আশ্চর্য রকমের সাড়া পাওয়া গিয়েছে এবং প্রায়ই এমন হয়েছে যে গানগুলো বারে বারে গাইতে হয়। প্রদেশের বিভিন্ন অংশের ছেলেমেয়েরা এই সমস্ত গানের সুর শিখতে খুবই আগ্রহী এবং তা শেখাবার জন্য মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিনয় রায়ের পরিচালনায় একজাতীয় স্কুলও শুরু করা হয়েছে। মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছেন বিদেশের বিপ্লবী গানের অনুবাদে পথিকৃৎ আর সুকণ্ঠী বিনয় রায় হচ্ছেন অক্লান্ত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী,যিনি এতদিন তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভাকে পাথর-চাপা দিয়ে রেখেছিলেন মনে হয়।

তাছাড়াও অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিছু সভাসমিতি—নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা, কবিতা-পাঠ, মুসলমান লেখকদের সঙ্গে বৈঠক (যাঁদের আছে নিজস্ব কিছু সমস্যা) ও নিছক সামাজিক আসর। বাংলার লেখকরা প্রকৃতই একসূত্রে মিলিত হচ্ছেন, তাঁরা আর পৃথক পৃথক বিবরে নিশ্চিন্ত বোধ করেন না। আর ফ্যাসিবাদের সংগ্রাম বিভিন্নগামী লেখকদের একই মঞ্চে সমবেত করেছে—আগে ভাবা যায় নি যে এই লেখকদের বিভেদ কোনো কিছু দিয়ে দূর হতে পারে। দেখা দিয়েছে নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনা।*

['পীপ্‌লস ওঅর', ১৫ নভেম্বর, ১৯৪২]

* দ্র. বাংলার ফ্যাশিস্ট-বিরোধী ঐতিহ্য, ১৯৭৫, পৃ. ১৪৭-৫০। এই প্রতিবেদনটি কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আকারে ইংরেজী থেকে অনূদিত হয়েছে।—সম্পাদক

বাংলার লেখক ও শিল্পীরা / হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলার ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন শেষ হবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই আকাশ থেকে জাপানী বিমান কলকাতার উপরে মৃত্যু ও ধ্বংস বর্ষণ করে গেল — কলকাতা লাভ করল তার প্রথম অভিজ্ঞতা। সম্মেলনের একটি প্রস্তাবে যে কথা বলা হয়েছে—"ফ্যাসিবাদ আর দূরের ব্যাপার নয়; তার বিষাক্ত চোয়াল আমাদের প্রিয় দেশকে গ্রাস করবার জন্য উদ্যত।"

সম্মেলনের উভয় দিনই—১৯শে ও ২০শে ডিসেম্বর তারিখে—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউটের প্রশস্ত হলঘরটি ভিড়ে উপচে পড়েছিল। গত মার্চ থেকেই প্রয়াস চলে আসছিল ফ্যাসিবাদের সর্বব্যাপী বিপদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মঞ্চে বাংলার লেখক ও শিল্পীদের সমবেত করার। অবশেষে এই সম্মেলনে সকল প্রয়াসের যথাযোগ্য ফল পাওয়া গেল। এটা কোনোক্রমেই কেবলমাত্র না-সূচক মঞ্চ নয়। সম্মেলনে একথা স্পষ্ট করা হয়েছে, বিশেষ করে সভাপতি-মণ্ডলীর সভাপতি শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাষণে, এই মঞ্চে নিহিত রয়েছে সবচেয়ে সদর্থক ধরনের উৎসাহী তৎপরতা।

বাংলার সেরা লেখক ও শিল্পীরা ঐক্যবদ্ধ

যেমন অন্যান্য জায়গায়, তেমনি বাংলায়, লেখকদের রয়েছে নিজস্ব বাছাই করা চক্র। সম্ভবত বড়ো বেশি দল-ভাগাভাগিটাই বরং যেন চোখে পড়ে। কিন্তু এটা হচ্ছে জীবন্ত সাহিত্যিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। তবে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়, সম্মেলনে প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের লেখক ও শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক মাত্রায় সাধারণ মতৈক্য। সভাপতিমণ্ডলীর গঠন থেকেই তা বোঝা যায়। সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি), যিনি একজন শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও গল্প লেখক এবং যিনি সম্প্রতি নাটকে মন দিয়েছেন; বিখ্যাত চিত্রশিল্পী যামিনী রায়; অন্যতম শীর্ষস্থানীয় তরুণ সমালোচক আবু সয়ীদ আয়ুব; প্রখ্যাত মুসলিম লেখক হবিবুল্লা বাহার; এবং বুদ্ধদেব বসু, যাঁর খ্যাতি এদেশের বাইরেও ছড়িয়েছে। সম্মেলনে যোগদানে অক্ষমতার

জন্য দুঃখ প্রকাশ করে যামিনী রায় বার্তা পাঠান এবং তাঁর স্থান গ্রহণ করেন 'যুগান্তর'-সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

কথা ছিল সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন মহাপণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন, কিন্তু অনিবার্য কারণে তিনি অনুপস্থিত থাকেন। উদ্বোধনী ভাষণ দেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। সম্মেলনে বার্তা পাঠান রাহুলজী, যামিনী রায়, সজ্জাদ জহীর, সত্যেন মজুমদার (সম্পাদক, 'অরণি'), শ্রীমতী জেরট্রুড এমার্সন সেন (সহকারী সম্পাদিকা, 'এশিয়া'), পি. সি. গুপ্ত (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়), নন্দলাল রায় (সম্পাদক, 'দুনিয়া', বারানসী) ও আরো অনেকে। তৎপরে ভাষণ দেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিরণকুমার সান্যাল (সম্পাদক, 'পরিচয়')। দ্ব্যর্থহীন সংজ্ঞায় উজ্জ্বল একটি ভাষণে তিনি প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান।

সন্ধ্যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ। তাঁর বয়স এখন চল্লিশের কোঠার মাঝামাঝি, লিখতে শুরু করেছেন তিরিশ পেরিয়ে আসার বেশ কিছু পরে। শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দুতে তিনি দেশপ্রেমিক, দেশের মানুষকে ভালোবাসার জন্যে কারাবাস করেছেন। আত্মজীবনীতে অনুপ্রবেশ সহ তিনি অসাধারণ এক ভাষণ দেন।···

২০শে ডিসেম্বর তারিখে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন হবিবুল্লা বাহার। তাঁর এবং তাঁর সহযোগী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ উচ্চপ্রশংসিত হয়। কার্যবিবরণী পাঠ করেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।···

সম্মেলনের প্রধান প্রস্তাবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতি এবং জনগণের স্বাধীনতার জন্য সারা বিশ্বে যে লড়াই চলছে তার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখকদের গ্রেপ্তার ও অন্তরীণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। ওড়িশার লেখকদের পক্ষ থেকে সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান 'মাঝি ছেলে'-র বিখ্যাত লেখক শচী রাউত রায়। উদ্দীপনাময় গান ও আবৃত্তি করেন অমৃত রায়, ডঃ অমিয় চক্রবর্তী, ডঃ নীহার রায় (গ্রন্থাগারিক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেকে।

সম্মেলনে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন ঢাকা থেকে, যেখানে প্রগতি লেখক ও শিল্পীরা 'প্রতিরোধ' নামে একটি চমৎকার পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন: এসেছিলেন মুর্শিদাবাদ, খুলনা ও ময়মনসিংহ থেকে। মার্কসবাদী লেখকদের

'অরণি' গোষ্ঠী সম্মেলনে ভালো সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। অবস্থা আরো অনুকূল থাকলে বরিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও সুরমা উপত্যকা থেকেও প্রতিনিধিরা আসতে পারতেন। এই সমস্ত স্থানে কিছুকাল প্রকাশিত হচ্ছিল 'বলাকা', 'সংহতি', 'নবযুগ' ও 'সপ্তক'-এর মতো পত্রিকা।*

['পীপলস ওঅর', ১০ জানুয়ারী, ১৯৪৩]

* দ্র. বাংলার ফ্যাশিস্ট-বিরোধী ঐতিহ্য, ১৯৭৫, পৃ. ১৫০-৫২। এই প্রতিবেদনটিও কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আকারে ইংরেজি থেকে অনূদিত হয়েছে। সম্পাদক

SHED YOUR PRIDE, JOIN HANDS WITH THE PEOPLE / Hiren Mukherjee

"The Fascist is not a beast, but something incomparably worse,—he is a mad animal that should be destroyed, the same henious brute as the White officer who cuts stripes and stars out of the skin of the Red Army man."

This quotation from what Gorki had said as early as 1934, featured in the message sent by the All-India Progressive Writers' Association, when its Bengal Branch, the Anti-Fascist Writers' and Artists' Association, met in its second annual conference at Calcutta on January 15.

Our writers and artists had assembled to re-affirm their utter detestation of the dark, insatiable malevolence which burns in the hyena-heart of Fascism, and their determination to clasp the hand of our people in the fight for freedom and the fight against Fascism and all forms of reaction.

A very Positive Stand

Welcoming the delegates and visitors who had thronged the Indian Association Hall, Tarashankar Banerjee, Chairman of the Reception Committee, repudiated the charge that the term 'anti-fascist' implied a negative conception ; it implies, he said, a very positive fight for our country's freedom, without which the arts are sure to languish ; a very positive fight against Fascism and all its insidious varieties, a fight against the forces that still keep India in chains, against 'man-made-famine' and the greedy piling-up of criminal war-profits ; a very positive fight for the writers' anb artists' link-up with our long-suffering, great-hearted people.

A presidium of seven conducted the proceedings of the conference : Premendra Mitra (Chairman), a great name in Bengali fiction and poetry ; Manik Banerjee, whose 'Padma

Nadir Majhi' (Boatmen of the Padma) is already a classic ; Atul Bose, one of India's leading portrait makers ; Monoranjan Bhattacharyya, front-rank actor and playwright ; Abul Mansoor Ahmad, patriot, journalist and a finished satirist ; Gopal Haldar, parhaps our leading Marxist writer ; and Sachin Devbarman, whose musical reputation has travelled all over India.

War on crafty Fascists

Most notable of all in the opening session was the speech of the Chairman of the presidium, Premendra Mitra.

The writer, he said, has a kind of pride of his ineffable position, but he has shed that pride today, humbly to join hands with his people. And as sure as anything, the writer must condemn Fascism, which is the new name given to the malice, cruelty, oppression and all un-charitableness, that has continued through the ages, but which has now at its disposal the most malevolent weapons, the most subtle and crafty and venomous stratagems.

The writer and the artist cannot escape responsibility for this malignity overpowering man's innate good sense in so many countries, and that is all the more reason why "it is our job to be vehicles of thought that is simple and kindly and beneficient, and never to perplex our people with tenuous inanities."

A Cultural Festival

The Conference adjourned next morning (January 16) to Sraddhananda Park, hallowed scene of countless patriotic meetings, where a stage was improvised, and before a crowd of 6,000 people, the cultural squads from different districts gave a memorable display. Never before has Calcutta seen such a spectacle. Nearly a hundred delegates had come from the districts—from Rangpur, Jalpaiguri, Sylhet, Mymensingh, Dacca, Maldah, Khulna, Jessore, Murshidabad, Hooghly,

Howrah, 24 Parganas, Bankura and Barishal ; many of them are active political workers, but they showed aesthetic talent which, surely, their countrymen will not let them hide under other pre-occupations.

Among them were Nibaran Pandit of Mymensingh, whose panchalis entrance even townspeople. Hemanga Biswas, composer of haunting and rousing melodies ; Nirmal Choudhuri, who leads Sylhet's song group ; Panoo Pal whose death-dance, even without a mask, will not be easily forgotten; Amulya Sen, leader of the Kirtan group from Rangpur; Satish Mondol, who directed the 'Gambhira' song-and-dance team from Maldah : Himangshu Chakravorti from Khulna ; Haripada Kushari of Calcutta, Nepal Sarkar from Jessore, adept in the Kavi-gan form ; and Dayal Kumar of Kayyur 'Panchali' fame from Hooghly.

Like the performance, the crowd, too, was memorable. There were women with babes-in-arms ; there were the park's habituees, surprised out of their usual Sunday morning roaming; there were workers who had heard of the show and come in groups and, of course, there were writers and others interested in literature and the arts. They thrilled to the themes of patriotism, of unity and freedom, of the re-fashioning of society, rendered before them in broad daylight, without the appurtenances of a theatrical show and rendered with so much sincerity and vitality than one sees elsewhere.

They applauded Anoo Dasgupta dancing superbly to the tune of the tea-garden worker's song composed by Sudhngshu Ghose of Sylhet ; they reacted spontaneously to the realistic rendering of Benoy Roy's "Main Bhooka Hoon", the grim little play which touched all hearts ; nearly seventy Rupees were contributed in ten minutes' time.

Conference Re-assembles

This feast of joy ended about one O'clock, but the dele-

gates, never too tired, held a meeting in the afternoon and assembled in open session in the evening.

Atul Bose, in his address, called on his fellow-artists to drink deep in the country's traditions and to convey the message of undaunted India.

Gopal Haldar dealt cogently with the thesis that the arts must ever seek vitality and beauty in contact with the life of society, and that now, above all, is the time when the writer must not be content with observation and contemplation, but must take his share of responsibility for the fate of the world.

Abul Mansoor Ahmad explained that Indian ideals, both Hindu and Muslim, are a drastic negation of Fascism.

The Finale

The conference concluded on January 17, with another cultural festival at Minerva Theatre, which was inaugurated by a leading dramatist, Sachin Sengupta. Apart from the items noticed before, the feature of the evening was Bijan Bhattacharyya's 'Jabanbandi,' the most successful play on the food crisis which we have got so far. It tells of the trek of a peasant family to a town in search of food, of death and the slow, unwilling degeneration of some in the family, and of the toughness and the simple nobility of the worker on the land who decides on going back home. Written in an idiom which is racy, of the soil, 'Jabanbandi' is a play to cherish : Bijan Bhattacharyya excelled also as one of the main characters. Gangapada Bose gave a superb piece of acting, and Sudhi Pradhan's performance was hardly less creditable. No praise, however, can be adequate for Tripti Bhaduri and Anoo Dasgupta, who in roles of peasant women would beat any professional hollow, for Reba Ray, and the two little kids who moved on the stage as to the manner born. We all thought of the director of the play, comrade Sambhu Mitra.

who was kept away by an attack of malaria contracted at the Mymensingh Kisan School.

Scenes of enthusiasm marked the end of the proceedings. Benoy Roy auctioned a bangle brought back from the Punjab by his squad and it fetched Rs 1100/-. We missed trams and buses—for the proceedings were protracted—but trudged home happy that the conference had altogether been a splendid success and augured even better than last year for the future of our movement. [*People's war, February* 13, 1944]

---

* Reprinted from '*Anti-Fascist Traditions in Bengal*' 1969. P. 85-87—Editor.

BENGAL'S LEADING WRITERS AND ARTISTS MEET IN CONFERENCE / Hiren Mukherjee

[Six-day Cultural Festival in Calcutta : March, 3-8, 1945]

Sixty thousand men and women present altogether at different sessions of the Conference, which was a six-day festival in Calcutta ;

A village bard and a potter included in the presidium, side by side with Bengal's best known writers and journalists ;

A blind, untutored musician from Cooch Beher, producing out of a two-stringed instrument (Dotara) sounds that thrilled the most sophisticated connoisseur ;

A contest of 'Kavis' (village bards), enthralling a city audience with rapid impromptu compositions from about five in the evening till after midnight ;

Performances of the Bengali play 'Navanna' (The Harvest). and the ballet 'The Spirit of India,' produced by the Indian People's Theatre Association's (IPTA) Central Cultural Squad, before enormous and enraptured audiences ;

Publication of a selection of the best Bengali patriotic songs from the 1860's to the present day ;

An exhibition of paintings on Bengal life which brought together the most representative collection of artists in recent years ;

District delegations from every part of Bengal rendering songs, all the motifs and tunes having been picked up from among the people themselves.

Such were the high-lights of the six-day festival (March-3-8) held in a finely decorated pandal at Muhammad Ali Park, Calcutta, where Bengal's Anti-Fascist Writers & Artists

met in their third Annual Conference. Nearly two hundred delegates came from different Bengal districts, and fraternal greetings were offered by delegates from Bombay and Delhi.

Never before had a comparable conference been held in Bengal, a conference which marked the eagerness of our most talented writers to obliterate, at long last, the cleavage between the town and the country, between the upper and lower classess, which has cast for so long a dark shadow on all creative work in our province. On its eve was published a splendid brochure, edited by Sudhi Pradhan, where one gets some idea of the richness of folk-poetic forms in Chittagong, Noakhali, Sylhet, Birbhum, Murshidabad and Nadia Districts—ballads, Kavi-gan, Tarja. And in the composition of the presidium was reflected this attempt to know our country and its people, to take the arts back again to the life of the common folk.

Remarkable Presidium

The Chairman of the presidium was Sailajananda Mukherjee who in his early days had to defy his critics in ordar to portray through stories the life of the worker, and especially the Bengal Coalminer. His colleagues were Tarashankar Banerjee, the greatest figure today in Bengal fiction ; Manik Banerjee, author of a classic novel on the life of the Padma boatmen ; Provabati Devi Saraswati, noted woman writer ; Dhiren Sen, leading journalist and scholar ; Editor of Amrita Bazar Patrika ; Sheikh Gomhani, perhaps the greatest of the 'Kavis' (village bards) in Western Bengal, whose name is a household word in many districts ; and Pashupati Bhattacharyya, a Brahmin who looks his lineage, but prctises in his village the potter's craft and is widely respected as an artist.

Sailajananda spoke in his address of his early struggles, the way he was moved by what he had seen of working-class life, the bridge which, he felt most urgently, must be built between life and letters. Manik lashed out against those who, in varied garbs, represented reaction, who feared movement

and progress in every aspect of life and wanted nothing but ugly factionalism. They were enemies, he declared, of human advancement, and it was no wonder they tried to slander the organisation of Bengal's foremost writers and artists. Gomhani in a characteristic speech, part prose, part verse, asked his audience to bridge the gulf between the city and the country, and thus to save Bengal, the common mother of us all. Pashupati affirmed his faith that a deep sense of kinship with life, the life of the people, was the only passport to achievement in the arts, Tarashankar proclaimed that the famine and the myriad ills of our land had not succeeded in throttling Bengali writing, which reflected more and more the emotions and aspirations of our people. We will not rest, he exclaimed in a fiery peroration, till we sing the hymn of life, free and great, sing so that our people, dead and dying, wake up to the brave new role that awaits them.

Participants in Session

"Indian men and women, I send you an Irish greeting, send it surging through your own drum-beat and the sound of the Indian bugles blowing...A new Asia, with India and China leading, will bring about a civilization justifying itself to God and man. May that day come swift for the world's sake !"

Thus did Sean O'Casey, the great Irish playwright, greet the conference. Greetings came also from Sajjad Zaheer, Secretary, of the All-India Progressive Writer's Association, from Raja Rao representing the Andhra provincial unit of the IPTA, from Professor Dhurjati Mukherjee (Lucknow) from Irawat Singh, leader of the freedom mevement in Manipur (Assam), from the poet Kumudranjan Mullick and others.

Bhupendra Nath Datta (Vice-President, All India Friends

of the Soviet Union), Bankim Mukherjee (General Secretary, All India Kisan Sabha), and Satyendranath Majumdar, one of the country's most eminent journalists, greeted the Conference in person. On the second day there spoke the octogenerian scholar, Moulvi Abdul Karim Sahityavisharad, an authority on early Bengali and particularly on the Bengali Muslim poet of many centuries ago, the great Ala-ol. All his life has been devoted to the study of the literature he loves so well ; and he said, he could not help responding eagerly to the invitation to what he described as a unique conference.

To the various sessions of the Conference came Daulatunnesa Khatoon, writer and Congress worker from Rangpur ; the poet Amiya Chakravarti, Bishnu Dey and Bimal Ghosh ; Jyotirmoy Ray, famous author of the film-novel 'Udayer Pathey' ; Narayan Ganguli, well-known writer from Jalpaiguri ; Ashokbejoy Raha from Sylhet, Radhikaranjan Ganguli ; literary critics like Abu Sayeed Ayyub and Hiran Kumar Sanyal ; Professor Ahmad Ali, author of 'Twilight in Delhi', who gave recitations from urdu poet Faiz Ahmad Faiz ; and Congress leaders like Professor K. P. Chattopadhyay and Dr. Nalinaksha Sanyal, M. L. A.

Conference's Call

Among the resolutions which were passed on the second day of the session was one affirming the duty of writers and artists to join hands with all patriots to rehabilitate the crumbling life of Bengal .by united endeavour which alone could lead the country to freedom. By another it was decided to change the name of the Association from "Anti-Fascist Writers' and Artists' Association". to "Progressive Writers' and Artists' Association". Other resolutions referred to collection of funds for the Tagore Memorial,

to the need for a better type of children's literature, and a drastic improvement in the standards provided by the radio and the cinema.

Art Exhibition

The art exhibition which had been opened on March 2, had for its caption "This Our Land". The inauguration was by Asit Kumar Haldar, Principal of the Lucknow School of Art and perhaps the best known disciple, next to Nandalal Bose, of Abanindranath Tagore. Nearly six-hundred people came on the opening day. They saw and admired paintings by, among others, Atul Bose, Ramen Chakravarti, Benod Behari Mukherjee, Sudhir Khastagir, Zainul Abedin, Satish Sinha, Saila Chakravarti, Govardhan Ash, Rathin Maitra, Makhan Dutta Gupta, Muralidhar Tali and Mani Ray ; they saw also some specimens of Dacca Muslin and of Krishnagar pottery.

The feast of music listned to by nearly the thousand people on the morning of March 4, was a memorable event. There were representatives both from the city and the countryside. Of the singers from the districts mention should be made of Saheb Ali, foremost Baul singer of Agartala, the Sylhet Squad led by Nirmal Chaudhuri and Khaled, and the Chittagong Squad rendering Chittaprasad's heart-rending song of the district's unending woes, Brajen Biswas, a blind musician from Comilla. showed remarkable virtuosity.

The Rangpur Squad, however, furnished the sensation of the day,for they had brought from Coochbehar an instrument-alist who should have an all-India reputation. This was Tagar Adhikari, blind frtm birth, whose 'Dotara' (a two-stringed instrument) thrilled and amazed the audience. Any number of prizes was announced for the artist,and

there was something of a scramble in the audience to go up the platform and offer more and more prizes. Tagar was far and away the star of the performance, but second only to his achievement was the rendering by Jyotirindra Maitra and his troupe of a cycle of patriotic songs from the 1860's to the present day. This item stirred the heart of every one of the vast audience and will not be easily forgotten.

The Kavi-Contest

Monday evening began with a repeat performance of Tagar Adhikari together with Brajen Biswas—in a joint programme, followed by the Songs of the New Life written and set to tune by Jyotirindra. It was, however, the prelude to the feature performance, which was the contest of Kavis. All awaited the appearance of the famous bards billed for the evening—RAMESH SEAL, nature's own patriotic poet from Chittagong with an able lieutenant in Phani Barooa on the one side, and SHAIKH GOMHANI, champion bard of West Bengal with his lieutenant the voluble LAMBODAR on the other.

This 'Kavi' contest is a traditional form of village folk art in Bengal which is being left to become extinct, but our 'Kavis' have revived it and brought to it a new content that kept spell-bound the city audience. The poets on either side invoked not only the deities of long ago, but great men of our recent past, our patriots and artists. How Bengal must be saved was the theme of these bards, and one could feel from the way they declaimed, and the refrains as they were repeated, that it was for very good reasons, indeed, that our people responded spontaneously to such appeal. When Ramesh Seal portrayed the devastation that imperialist exploitation has brought upon our land, and sang of national unity, it was obvious that any day Ramesh could beat most speakers hollow.

The 'Kavi'-Contest started at five in the evening and went on till past midnight—and even then the audience wanted more of it and was prepared to sit through all night !

The last three days were earmarked for performances—before at least 7.000 people—of Bijan Bhattacharyya's NAVANNA (the famous Bengali play, *The Harvest*) and the IPTA central squad's dances. Never before in Calcutta had a play or a ballet been produced before such vast congregations, which brings together perhaps the country's most talented dramatic team under the joint direction of Bijan Bhattacharyya and Sambhu Mitra, and the IPTA ballets directed by Shanti Bardhan, have become so popular that the Calcutta public keeps on coming to see them in increasing numbers every time. They provided a fitting *finale* to the celebrations during the Conference.

Tasks Ahead

Manik Banerjee and Swarnakamal Bhattacharyya were elected joint secretaries of the Association for the ensuing year, and it may well be expected that the rate of progress achieved so far will be rapidly multiplied. Fourteen branches of the organisation function today in different districts; a library and reading room named after late Somen Chanda (writer and patriot murdered three years ago at Dacca by pro-Fascist thugs) is run by it in conjunction with the FSU ; a number of publications were brought out last year, and meetings and other discusssion-groups organised ; the art exhibition held during the peak of the famine period, depicting destitution and its myriad ills, was a notable event ; the financial help which the Association sent to the ailing poet Nazrul Islam deserves special mention.* [*People's war, April* 1,1945]

*Reprinted from '*Anti-fascist Traditions in Bengal*', 1969, P 89-93:—Editor.

'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক' / প্রথম খণ্ড

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সমালোচকদের মন্তব্য

"আলোচ্য পুস্তকের সম্পাদক ধনঞ্জয়বাবু বাঙলার শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী চিন্তাধারার বিকাশের নাতিদীর্ঘ পটভূমিকা যোগ্যতার সঙ্গেই তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে বঙ্গদেশের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী এবং তাত্ত্বিকেরা যেসব বিতর্ক উত্থাপন করেছিলেন সেগুলির মধ্যে কয়েকটি সংকলন করেছেন। ...প্রবন্ধগুলির গুরুত্ব আজকের দিনেও অস্বীকার করা যায় না,...ধনঞ্জয়বাবু নিষ্ঠার সঙ্গে যে দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করেছেন সেটিও একটি ঐতিহাসিক দলিল হয়ে থাকবে। ..এইরূপ একটি প্রচেষ্টার যে প্রয়োজন ছিল এবং সম্পাদক যেভাবে সেই কর্তব্য পালন করেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে দ্বিধা নেই।"

[সত্যযুগ, ১৮ আগস্ট, ১৯৭৫]

"...প্রতিটি রচনাই এখন দুষ্প্রাপ্য ও তীব্র বিতর্কমূলক। এই সঙ্গে 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে' শীর্ষক শতাধিক পৃষ্ঠার যে রচনাটি ধনঞ্জয় দাশ লিখেছেন, প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের গবেষণার ক্ষেত্রে তা এক মূল্যবান সংযোজন। এই প্রথম মার্কসবাদী-শিবিরের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সফলতা-ব্যর্থতার বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলো। আমরা...এই বলিষ্ঠ ভূমিকার প্রতি পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।"

[যুগান্তর, ২০ অক্টোবর, ১৯৭৫]

"মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য ও শিল্পকে বিচারের নানান সমস্যা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে আমাদের দেশে ব্যাপক আলোচনা চলে আসছে।...এই আনুপূর্বিক বিচার-বিতর্কের সুগ্রথিত, তথ্যনিষ্ঠ একখানি পুস্তক আমাদের হাতের কাছে নেই।...একটি সংকলন সম্প্রতি 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক' নাম দিয়ে শ্রীধনঞ্জয় দাশ প্রকাশ করেছেন।...একটা বিতর্ক-কণ্টকিত সময়ের যন্ত্রণাক্ষুব্ধ প্রশ্নগুলির ওপর লিখিত দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধগুলির এই সংকলন মার্কসবাদী চিন্তাধারার বিকাশের ব্যাপ্যারে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তির দীর্ঘকালের একটা অভাব মেটালো। প্রধানত সাহিত্য ও শিল্প-সংক্রান্ত...প্রশ্নে আগ্রহী যে-কোনো ব্যক্তির পক্ষে এই বইখানি মূল্যবান বলেই গণ্য হবে। শ্রী দাশ এই বইয়ে ১০৪ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন।...শ্রী দাশের অসাধারণ শ্রমের গুরুত্বকে ছোট করে দেখা অনুচিত কাজ হবে বলেই আমার বিশ্বাস।...একথা স্বীকার করতে হয়—'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক' 'সম্প্রতিকালের একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন।"...

[সাপ্তাহিক বাঙলাদেশ, ২৪ অক্টোবর, ১৯৭৫]

"...এই প্রয়াসের মধ্য থেকে গোটা ভারতবর্ষের শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে রাজনৈতিক ধারণার একটি পরিচয় পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।...ধনঞ্জয় দাশের এই প্রয়াস...সেই ঐতিহাসিক মর্যাদা দাবী করতে চায়।...ধনঞ্জয় দাশের ভূমিকা থেকে মনোযোগী পাঠক কিছু তথ্য পেয়ে যাবেন...। এই রচনাগুলি আজও মূল্যবান...আজকের মার্কসবাদী সমালোচকেরা এগুলিকে সামনে রাখলে বুঝবেন কতটুকু গ্রহণ করতে হবে, কতটুকুই বা বর্জনীয়।"

"ধনঞ্জয়বাবু এরূপ সংকলনগ্রন্থ তৈরি করে ইতিহাসের একটি ইঙ্গিতকেই ধরে রাখতে চেয়েছেন এই কারণেই মার্কসবাদী—মার্কসবাদ-বিরোধী—অমার্কসবাদী—সকল শ্রেণীর চিন্তাশীল পড়ুয়া লোকের কাছে এ বইটি একটি মূল্যবান প্রকাশনা বলে গণ্য হবে।...মার্কসবাদে যাঁদের আস্থা নেই তাঁরাও কিন্তু এই প্রবন্ধগুলির গুরুত্ব না মেনে পারেন না।...ধনঞ্জয় দাশকে সুপ্রতিষ্ঠিত কবি রূপেই দেখেছি। কিন্তু গবেষক হিসাবে এই প্রথম দেখলাম। প্রবন্ধগুলির নির্বাচন, কালানুক্রমিক বিন্যাস, প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য পরিবেশন,...প্রতিবেদনের সন্নিবেশ, বিতর্কিত বিষয়ে যুক্তিনিষ্ঠ নিরপেক্ষতা—একথার সত্যতা প্রমাণ করবে।"

"...'বাংলাসাহিত্যের কয়েকটি ধারা' এবং 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'...এক সময় তুমুল বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছিল।...বইটির নামের মধ্যেই এর মূল্যবত্তার ইঙ্গিত আছে। দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধকে পাঠকের হাতের কাছে পৌঁছে দিয়ে লেখক জিজ্ঞাসুদের উপকার করেছেন।"

"...দুটি সংকলন গ্রন্থে ধনঞ্জয় দাশ প্রচুর পরিশ্রম করে বাঙলাদেশে মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্কের ইতিহাসটি স্পষ্ট করে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।...লেখক অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তাঁর ভূমিকায় ১৯২৫ সালের আগে থেকেই কীভাবে মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা ধীরে ধীরে আমাদের লেখকদের উপর প্রভাব বিস্তার শুরু করেছিল এবং ঠিক কোন সময় থেকে সাহিত্যে মার্কসবাদী দর্শন-চিন্তার প্রয়োগ স্পষ্টভাবে শুরু হলো তার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন।...দু'খণ্ডের ভূমিকা মিলিয়ে পড়লে মনে হয়, বাঙলাসাহিত্যের সাম্প্রতিককালের ইতিহাস যা লেখা হয়েছে তা অসম্পূর্ণ এবং নতুন করে লিখিত হওয়া উচিত।"